শ্রীপান্থের কলকাতা

শ্রীপান্থ

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৭

মুদ্রাকর
ননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, এণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার

অলঙ্করণ
সুধীর মৈত্র

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

প্রচ্ছদমুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
ইউনিভার্সাল বাইণ্ডার্স

দামঃ সাত টাকা

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ সেন

করকমলেষু

প্রসঙ্গত

আমি ঐতিহাসিক নই, সমাজ বিজ্ঞানীও নই, বরং বলতে পারি—সাংবাদিক। ফলে, এই বইয়ের তথ্যগুলো নিশ্চিতভাবে ইতিহাসের হলেও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা আহৃত। এবং একটা বিশেষ প্রয়োজনবশতও। বলাবাহুল্য, সে প্রয়োজনের প্রেরণা সেকাল, বিশেষ করে কলকাতার সেকাল সম্পর্কে একালের মানুষের অফুরন্ত আগ্রহ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়—রচনাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল প্রথমত সাময়িকপত্রে। অধিকাংশই আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী'তে এবং কিছু কিছু অন্যত্র। স্বভাবতই, দর্শকেরা যেহেতু আধুনিককালের, দৃষ্টিভঙ্গীতেও সেইহেতু সাময়িকতার ছাপ রয়ে গেল। সেদিক থেকে এই বই সেকালের কলকাতার 'ইতিহাস' নয়, একালের চোখে দেখা সেকালের কলকাতার জীবনচিত্র।

দ্বিতীয়ত, 'সেকাল' অর্থে প্রধানত এখানে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা হলেও সন তারিখের কোন বাঁধা চৌহদ্দি ঘিরে আমি চলাফেরা করিনি। একালের মানুষের কাছে যখনই যা অপরিচিত বলে মনে হয়েছে সেখানেই থেমেছি। এমন কি কলকাতার কাহিনী বলতে গিয়ে কখনও কখনও চলে গিয়েছি কলকাতার বাইরেও।

উল্লেখযোগ্য, এই বইয়ে এমন দুটি কাহিনী আছে যার ঘটনাস্থল হু-বহু কলকাতা নয়। তবুও এখানে তা যুক্ত করা হল, কারণ, তদানিন্তন কলকাতার মানসিক পটভূমির সঙ্গে তাদের যারপরনাই সাযুজ্য। এদুটো কলকাতায় ঘটেনি বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে পড়লে আশা রাখি পাঠকেরাও মানবেন যে—ঘটতে পারত।

২৬শে জানুয়ারী, শ্রীপান্থ
১৯৬১

সূচীপত্র

কলকাতার নাম কলকাতা না হয়ে বোম্বাই, ডোভার বা হংকং হল না কেন? মিসেস হোয়াই যদি একান্তই তা জিজ্ঞেস করে বসেন তবে মিস্টার বিকজ-এর পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি!

এই অদ্ভুত নামটি নিয়ে অনেক ভেবেছেন মিস্টার বিকজ। ভাবতে ভাবতে এক সময় কলকাতাকে ঠেলে দিয়েছিলেন সোজা কলিঠাকুরের কোলে। হ্যাঁ, কলি থেকেই কলকাতা। কলকাতা কলির শহর। সিদ্ধান্তটা মোটামুটি ভালই লাগল মিস্টার বিকজ-এর। তিনি তক্ষুনি ছুটলেন মিসেস হোয়াইকে খবরটা জানাতে। কিন্তু সহসা তাঁর মনে পড়ে গেল স্বয়ং কলির উৎপত্তির কথা। 'ক্রোধের ঔরসে তাহার ভগ্নী হিংসার গর্ভে কলির জন্ম। কলি স্বীয় ভগ্নী দুরুক্তির পাণিগ্রহণ করেন। ভয় উহার পুত্র,—মৃত্যু কন্যা।' কলকাতা মিসেস হোয়াই-এর ভালবাসার শহর। এ শহরের এমন বীভৎস আদি ইতিহাস শুনলে নিশ্চয় শক্‌ড হবেন তিনি। তাঁর মনে দাগা লাগবে। সুতরাং গবেষণার ফলটাকে মনে মনে হজম করে ফেললেন মিস্টার বিকজ। কলকাতার সঙ্গে কলির যোগাযোগের কথাটি অতঃপর আর জানতে পেল না কেউ।

কিন্তু মিসেস হোয়াইকে খুশী না করলেও নয়। বাধ্য হয়েই মিস্টার বিকজ প্রত্নতাত্ত্বিক সাজলেন। তিনি জানেন, কলকাতা ব্যাবিলন বা হরপ্পার মত প্রাচীন শহর নয়। এমন কি তার প্রতিবেশী শহরগুলোর মতও প্রবীণ নয়। ঢাকা রোমান আমলের শহর। রাজমহলে রাজত্ব করেছেন পর পর একশজন রাজা। নদীয়া ছিল পাঁচ শ' বছর ধরে বাংলার অক্সফোর্ড।—আর মুর্শিদাবাদ? কলকাতা যখন সামান্য একটা মফঃস্বল গঞ্জও নয়, মুর্শিদাবাদ তখন লণ্ডনের চেয়েও জমকাল শহর। ক্লাইভ নিজে বলেছেন সে কথা।

তাহলেও শাবল নিয়ে নামতে দোষ কি! মিস্টার বিকজ কলকাতার পুরানো পুকুরগুলোর তল হাতড়ালেন, এখানে ওখানে মাটি খুঁড়লেন, তারপর সগর্বে এসে হাজির হলেন মিসেস হোয়াই-এর বৈঠকখানায়। মিসেস হোয়াই তখনও চোখ বুজে এক মনে 'হোয়াই, হোয়াই' জপে চলেছেন। '—হোয়াই ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা?—হোয়াই? হোয়াই?'

'—বিকজ,'—সর্বাঙ্গে মাটি মাখা মিস্টার বিকজ এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। '—বিকজ, কালকাটা ইজ ক্যালকাটা।' মিস্টার বিকজ কৈফিয়ত দিলেন—'কিন্তু মাদাম, কলকাতা প্রাচীন সিটি। আমি তা প্রমাণ করতে পারি। আমার হাতে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

মিসেস হোয়াই বললেন—'দেখি!'

মিস্টার বিকজ পকেটে হাত দিলেন। তারপর কতকগুলো কিসের যেন ছোট ছোট বীজ বের করলেন। মিসেস হোয়াই-এর হাতে সেগুলি তুলে দিয়ে তিনি বললেন—'এই আমার প্রমাণ।'

মিসেস হোয়াই বিচিগুলি দেখলেন। তাঁর চোখে আবার জিজ্ঞাসা দেখতে পেলেন মিস্টার বিকজ। তিনি বললেন—'মাদাম, বোধহয় জানতে চাইছেন এগুলো কিসের বীজ? এগুলো খাপড়া ফলের বীজ। যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক জানেন এর কি মূল্য। যেখানে এই বীজ পাওয়া যায়—'

মিসেস হোয়াই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বীজগুলো। 'আই অ্যাম নো বোটানিস্ট! আমি বোটানিস্ট নই।—তবুও আমি অনুমান করছি, আপনি বলতে চান—যেখানে এই বীজ পাওয়া যায়, সেখানে অনেককাল আগে গাছ ছিল। গাছ কেন, বন ছিল হয়ত এখানে। কিন্তু আমি চাই, এখানে যে শহর ছিল তার প্রমাণ!'

মিস্টার বিকজ দমলেন না। তিনি অন্য পকেটে হাত দিলেন। এবার বের হল দুটো লোটা (সঙ্গে কম্বল ছিল না কিন্তু) ওরফে দুখানা ঘটি। একখানা মাটির, অন্যখানা পিতলের।

কিন্তু তাতেও মন ভরানো গেল না মিসেস হোয়াই-এর। তিনি বললেন—'এবার না হয় প্রমাণ হল, এখানে মানুষ ছিল। (মিসেস হোয়াই আধুনিক সমাজদর্শনে যথেষ্ট পারদর্শিনী হলে হয়ত বলতেন—সেই মানুষগুলোর মধ্যে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত দুটি শ্রেণীও ছিল!) কিন্তু নিশ্চয় সে কথা প্রমাণ হল না যে, এখানে শহর ছিল।'

মিস্টার বিকজ এবার ঐতিহাসিকের শেষ নজরানাটি বের করলেন। তিনি কতকগুলো মুদ্রা টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন—'কালীঘাটের কাছে মাটি খুঁড়ে এগুলো পাওয়া গেছে। মুদ্রাগুলো কবেকার জানেন মাদাম? —গুপ্তযুগের! এই তিনটে হচ্ছে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের, যাঁর উপাধি ছিল দ্বাদশাদিত্য, তাঁর। আর এই পনেরটি হচ্ছে বিষ্ণুগুপ্তের!

মোটেই বিস্ময়ের লক্ষণ দেখা গেল না মিসেস হোয়াই-এর চোখে মুখে। তিনি হাসলেন—'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, কোন পর্তুগীজ বা ডাচ বা আমাদেরই কোন পিন্সটন বা লোরি কর্নোজের কাছ থেকে জোগাড় করে এগুলো কলকাতায় এনেছিল। কালীঘাটে বেড়াতে গিয়ে সেগুলো খোয়া যায়। শেষে এশিয়াটিক সোসাইটির এক দরোয়ান একদিন কুড়িয়ে পেল। এবং বাজারে চালাতে না পেরে শেষে দান করে দিল সোসাইটিকে। সোসাইটি দেবে হয়ত ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে। —সো, ইউ সি, ডিয়ার বিকজ,—দিস ইজ নট কনভিনসিং!—আমার বিশ্বাস হয় না এসব প্রমাণ।' ঠোঁট উল্টে ঘোষণা করলেন মিসেস হোয়াই।

মিস্টার বিকজ প্রমাদ গুনলেন। কি-ই বা করতে পারেন তিনি? সত্য বটে, বিপ্রদাস পঞ্চম শতকের লোক। এবং তাঁর 'মনসামঙ্গল'এ কলকাতার কথা আছে। মুকুন্দরামের চন্ডীতেও তা আছে বলে তিনি শুনেছেন। আর 'আইন-ই-আকবরী'তে যে আছে সে তো তিনি নিজেই পড়েছেন। কিন্তু কলকাতার নাম আর তার উৎপত্তি তো এক কথা নয়। নাম তো কতই থাকতে

পারে। কিন্তু তার উৎপত্তির কারণ কোথায় পাবেন তিনি।

নেটিভদের ওপর নির্ভর করতে যাওয়ার অনেক বিপত্তি। কে জানে, ওঁরা প্রত্যেকেই হয়ত দাবি তুলবেন—আমিই কলকাতার উৎপত্তি। গোবিন্দপুর নিয়ে সেবার যা হল। বিশেষজ্ঞরা বললেন—এই গাঁখানার আদি গোবিন্দ দত্ত। প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায়ের কর্মচারী ছিলেন ভদ্রলোক। ভগবান গোবিন্দজী একদিন তাঁকে স্বপ্নে বললেন—মাটি খোঁড়, টাকা পাবি। গোবিন্দবাবু কালীঘাটের কাছে একটা পছন্দসই জায়গা খুঁড়লেন। অনেক টাকা পাওয়া গেল সেখানে। সুতরাং, গোবিন্দজীর নামে তিনি গ্রাম পত্তন করলেন একখানা। নাম তার গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুর এখন কলকাতার ভুবন-বিখ্যাত ময়দান। কিন্তু আশ্চর্য এই, শেঠরা এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরেরা বলেন—তাঁদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউ থেকেই গোবিন্দপুর। হাটখোলার দত্তরা এবং কুমারটুলীর মিত্রদের মতে গোবিন্দপুরের আদি তাঁদের পূর্বপুরুষ জনৈক গোবিন্দবাবু।

সুতানটী নিয়েও অনেক তর্ক। কেউ কেউ বলেন—দুটো খুব ডেলিকেট জিনিস নিয়ে সুতানটী। সুতা এবং নটীর ব্যবসা থেকেই তাদের মতে সুতানটী। আবার কেউ কেউ বলেন, দূর, এসব বাজে কথা। আসলে সুতানটীর উৎপত্তি অন্য জিনিস থেকে। জাহাঙ্গীরের সময়ে মানসিংহ বড়িশার জনৈক লক্ষ্মীকান্তকে কলকাতা জায়গীর হিসাবে দান করেন। তিনিই বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের আদি। এই চৌধুরীদের ঠাকুর ছিলেন শ্যামরায়। শ্যামরায় ঠাকুরের মন্দিরের সামনে ছিল বিরাট এক চন্দ্রাতপ বা ছত্র। পুজোর শেষে এই ছত্রের নীচে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ বা লুট হত। সেই থেকেই ছত্রলুট। ছত্রলুট থেকে সুতালুটী। ক্রমে লুটী থেকে নুটী। অবশেষে—নটী।

মিস্টার বিকজ জানেন—মিসেস হোয়াইকে এসব কথা বললে তিনি হেসেই খুন হয়ে যাবেন। কিন্তু জব চার্নকের ওপরও তো দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না। চার্নক কলকাতার আদি—একথা যে ঐতিহাসিক ভুল। তিনি আজকের কলকাতাকে সুতানটী বলেই জেনে গেছেন। ১৭০০ সনের ২৭শে মার্চ অবধি কোম্পানীর সাকুল্য ডেসপাচ-এ সুতানটীই কলকাতার নাম। এপ্রিল থেকে কলকাতা।

সুতরাং, ইংরেজদের আশা ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়ে মিস্টার বিকজ এবার হিন্দুস্থানী হলেন। কোম্পানীর সিপাইদের মত তিনি গান ধরলেন—

'কালি গৈয়ে কলকাত্তাকি, যিনকে পুজা ফিরিঙ্গি কিন
বাঙ্গালী কো মুলুক ধন দৌলত দখল করলিন।'

মিসেস হোয়াই ভ্রূ কোঁচকালেন। 'মানে?'

'—মানে, কালী থেকে কলকাতা'—জবাব দিলেন মিস্টার বিকজ। 'কালী + থা = কলকাত্তা।' এক সময়ে এখানে কালী ছিলেন—। তিনি উঠে গিয়ে যেই কালীঘাটে বসলেন, তক্ষুনি এই জায়গাটার নাম হয়ে গেল কলকাতা।

মিসেস হোয়াই প্রশ্ন তুললেন—'কেন উঠে গেলেন তিনি?'

মিস্টার বিকজ বললেন—'সে অনেক কথা। আপনাকে তাহলে শৈব আর শাক্তের পার্থক্য জানতে হবে, বৌদ্ধ মহাযান আর কাপালিকদের সাধন-ভজন-পদ্ধতি বুঝতে হবে। তার চেয়ে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন—তখন বেহালা

থেকে দক্ষিণেশ্বর ছিল—কালীক্ষেত্র আর তার অধীশ্বরী কালী বাস করতেন কলকাতায়। কাপালিকরা একদিন তাঁকে নিয়ে পালিয়ে গেল কালীঘাটের বনে। ঘটনাটাকে একটু ঐতিহাসিক রং দেওয়ার জন্য একজন ইংরেজ ঐতিহাসিককে 'কোট' করলেন মিস্টার বিকজ। 'জানেন তো, তিনি বলেছেন দক্ষিণেশ্বরও এককালে ছিল বাংলার রাজধানী!'

মিসেস হোয়াই গম্ভীর হয়ে উঠলেন। '—তা না হয় ছিল। কিন্তু কালী থেকে কলকাতা হবে কি করে? তাহলে তো মিস্টার বিকজ থেকেও বসরা হতে পারে, মিসেস হোয়াই থেকে হতে পারে—সাংহাই!'

'আচ্ছা, তাহলে কালী দেবীকে না হয় বাদই দিচ্ছি'—মিস্টার বিকজ আবার মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন। তারপর মিসেস হোয়াই-এর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলেন—'যদি বলি কলকাতা হয়েছে 'কিলা কিলা' থেকে তাহলে আপনি মানবেন তো? রাধাকান্ত দেব কিন্তু তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন—কবি রামের বইতেও নাকি তাই আছে।'

'কিলা বা কেল্লা থেকে কলকাতা'—মিসেস হোয়াই এবার হেসেই অস্থির।

মিস্টার বিকজ বললেন—'হাসছেনই যখন তখন শেষ থিওরীটি শুনেই হাসুন। কলকাতার নামকরণের শেষ গবেষণার ফলটি কি জানেন? 'কলি' মানে চুন, আর 'কাতা' মানে ভাটি—অর্থাৎ, কলকাতা বা কলিকাতা হচ্ছে চুনের ভাটি। এখানে জেলেদের বাস ছিল আপনারা শুনেছেন। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জানেন না যে—মাছের চেয়ে তাদের বেশী নজর ছিল ঝিনুক আর শামুকের ওপর। ওসব পুড়িয়ে চুন তৈরী হ'ত তখন এখানে। সেই চুন বা কলি থেকেই কলিকাতা। মোটামুটি সবাই (কলকাতা কর্পোরেশন সহ) এই যুক্তিটা মেনে নিয়েছেন, সুতরাং আশা করি আপনিও মানবেন।'

মিসেস হোয়াই নির্বাক। বোঝা গেল, এমন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটিকে তিনি প্রকাশ্যে বাতিল করতে যেমন সাহস পাচ্ছেন না, মনে মনে তেমনি মেনে নিতেও পারছেন না। আবার সমস্যায় পড়লেন—মিস্টার বিকজ। তিনি জানেন মিসেস হোয়াই দুনিয়ার অনেক সিদ্ধান্তের জননী। তাঁর কাছে যেমন-তেমন যুক্তি ওরফে গোঁজামিল সম্পূর্ণ অচল। যদিও, কলকাতার নামের আদি হিসাবে চুন এবং কালী দুটোই তাঁর মনঃপূত হয়েছিল, তবুও মিসেস হোয়াই-এর মুখ চেয়ে আবার তাঁকে সন্ধানে বের হতে হল।

মিস্টার বিকজ এবার ফিরে এলেন ডাচ হয়ে। মিসেস হোয়াই এখনও অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছেন আর বলছেন—'হোয়াই,—হোয়াই? হোয়াই ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা?'

মিস্টার বিকজ এসে বললেন—'বিকজ,—ক্যালকাটা ওয়াজ গলগাথা।'

'গলগাথা?—মানে?'—থমকে দাঁড়ালেন মিসেস হোয়াই।

মিস্টার বিকজ উত্তর দিলেন—'মাদাম, ডাচ ভাষায় 'গল' মানে মড়ার খুলি। 'গলগাথা' মানে মরা মানুষের খুলিতে বোঝাই দেশ।—কলকাতা তাই ছিল কিনা প্রথম দিকে—।'

'প্রথম দিকে কেন,—এখনও আছে। কলকাতা এখনও অবশ্যই নরককুণ্ড। কিন্তু তাহলেও এ শহরের আদি হিসাবে ডাচ পর্যটকদের মানতে পারি না আমি।—আই অ্যাম সরি মিস্টার বিকজ।'—মিসেস হোয়াই মিস্টার বিকজের

মতই খাঁটি ইংরেজ। অসত্যকে সত্য বলে ঘোষণা করা যদিও এঁদের দুজনের কারও স্বভাব নয়, তবু প্রায়-সত্যকে সেধে এনে সত্যের আসনে বসিয়ে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষ, তাতে যদি ইংরেজদের গৌরব হানি হয়। সুতরাং ডাচরা বাতিল হয়ে গেল। 'গলগাথা' থেকে কলকাতা?—অসম্ভব বলে রায় দিলেন মিসেস হোয়াই।

আবার মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন মিস্টার বিকজ। সহসা দেবী অ্যাক্সিডেণ্টেশ্বরীকে মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি ধীরে ধীরে বললেন—'কলকাতার কলকাতা নামটা নেহাত-ই অ্যাক্সিডেণ্ট মাদাম।'

মিসেস হোয়াই বললেন—'কেমন?'

মিস্টার বিকজ বললেন—'আমার মনে হয়, 'খাল কাটা' থেকে আমাদের এই ক্যালকাটা হয়েছে মিসেস হোয়াই।'

'—খাল কাটা?'

'—আজ্ঞে হ্যাঁ, মারাঠা ডিচের নাম শুনেছেন তো মাদাম। কলকাতার লোকেরা বর্গিদের ঠেকাবার জন্যে তখন খাল কেটেছিল একটা। সেটাই মারাঠা ডিচ। কলকাতার লোকের নাম হয়ে গিয়েছিল তখন ডীচার।—সুতরাং, খাল কাটা থেকে ক্যালকাটা খুব অসম্ভব কি?'

মিসেস হোয়াই বললেন—'অসম্ভব হয়ত ছিল না, কিন্তু এখন এই যুক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কেননা, আগেই আপনি বলে ফেলেছেন, ১৭০০ সনের এপ্রিল থেকে কলকাতা ক্যালকাটা। অথচ বর্গিদের টাইম-টেবল দেখছি তার বিয়াল্লিশ বছর পরে—'

লজ্জায় জিভ কাটলেন মিস্টার বিকজ। 'তা, তা আমারই ভুল হয়ে গেছে মিসেস হোয়াই। —খাল কাটা নয়, আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম ঘাসকাটার কথা। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—এটা কোন্ জায়গা! ঘেসুড়ে ভাবল—সাহেব বুঝি জানতে চায় এ ঘাস কবেকার কাটা? সে বলল—কাল কাটা। সাহেব তখুনি তার নোট বইতে টুকে ফেলল—ক্যালকাটা!

'—হাসছেন কেন? হতেও পারে। সিরাজউদ্দৌলাকে আমরা 'স্যার রজার ডৌলার' করতে পেরেছি, জুম্মামারীকে 'জেমস অ্যাণ্ড ম্যারী,' আর এটুকু পারব না?' মিস্টার বিকজ সিরিয়াস হয়ে উঠলেন—'শ্রীরামপুর কোথা থেকে হয়েছে জানেন তো? গরিবেরা সেখানে ডাচদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করত আর বলত—'সার, আই অ্যাম পুওর, অ্যাম পুওর'—তাই থেকে হল 'সি-রাম-পোর।' এবার নিজেও আর না হেসে পারলেন না মিস্টার বিকজ।

তাঁদের এই হাসির মধ্যেই বোমা পড়ল একখানা। হাত বোমা। এক অখ্যাত ঐতিহাসিক নিক্ষেপ করলেন সেটি। তিনি বললেন—ক্যালকাটার আদি কালীও নয় কলিও নয়। ক্যালকাটার আদি তোমরা।—ইংরেজেরা। ক্যালকাটা তোমাদেরই সৃষ্টি বন্ধু।

মিসেস হোয়াই এবং মিস্টার বিকজ দুজনেই সাগ্রহে শুনতে বসলেন সে কাহিনী।

ঐতিহাসিক মুচকি হেসে বললেন—কালিকটকে মনে পড়ে তোমাদের? দাক্ষিণাত্যোপকূলের সেই কালিকট?

'—আলবৎ, ওখানেই তো প্রথম ঠেকেছিল পশ্চিমের জাহাজ। নোঙর

ফেলেছিল পর্তুগীজরা।—কালিকটের তখন কি ঐশ্বর্য!' মিস্টার বিকজ এগিয়ে এসে জানিয়ে দিলেন—কালিকট অপরিচিত নয় তাঁদের কাছে।

ঐতিহাসিক আবার হাসলেন। '—কালিকটের ঐ ঐশ্বর্যই হল কলকাতার আদি। ইউরোপে তখন কালিকটের ভীষণ খ্যাতি। ওখানকার জিনিসপত্তরের ভীষণ কদর। ইণ্ডিয়ার জিনিস বলতেই লোকে জানে—কালিকটের জিনিস। —আলবৎ এই জিনিস 'মেড ইন কালিকট।' সুতরাং, কালিকটকে নিয়ে বিপত্তিতে পড়লেন—ইংরেজেরা। ওখানে কোন মতেই স্থান করতে পারলেন না তারা। ভাসতে ভাসতে অবশেষে ঠেকলেন এসে সুতানটীর তটে। ফ্যাক্টরী একটা হল বটে। কিন্তু 'মেড ইন হুগলী' বা 'মেড ইন সুতানটী' বললে—কে কিনবে তাদের জিনিস? ইউরোপে পর্তুগীজদের কালিকট যে তখন বাজারের রাজা।

'সুতরাং,'—ঐতিহাসিক এবার উকিল হলেন। '—সুতরাং ইংরেজ ব্যবসায়ীরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। —কি উপায়?'

একজন বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে। তিনি বললেন—'উপায় অতি সহজ। নামাও সব প্যাকিং বক্স আর বস্তা। উপায় আমি এক্ষুনি বাতলে দিচ্ছি।'

কাস্টমস হাউস, কলকাতা

তাই করা হল। তিনি কালির ডিবেতে ব্রাশ ডুবিয়ে বস্তার গায়ে বড় হরফে লিখে গেলেন—'KALIKATA'। কালিকটও তখন 'কে' দিয়ে শুরু। বানানটাও অনেকটা এরকম। সুতরাং, এ ফাঁকি আর ধরে কে? খদ্দেররা যদি একখানা 'এ'র উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি নিয়ে ভাবিত হয়েই ওঠে, তবে আর তারা খদ্দের কি! সুতরাং ইংরেজ ব্যবসায়ীরা 'হুররা' দিয়ে উঠলেন।—সাবাস বন্ধু, সাবাস! সুতানটী সেদিন থেকেই কলকাতা।

মিসেস হোয়াই এবার নির্বাক। মিস্টার বিকজ বাক্‌রুদ্ধ। তাঁদের মুখ-খোলার আগেই ঐতিহাসিক বলে চললেন 'তাই যদি না হবে তবে আলীনগরে রাজী হলে না কেন তোমরা? কেন তবে মীরজাফরকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে যে,—আলীনগরকে ক্যালকাটা করতে অমত নেই তাঁর। পলাশীর যুদ্ধের চেয়েও

এ খবরটা দেশে পাঠানোর জন্যে কেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে তোমরা ?—কেন ?—কেন ?—তা মন খারাপের কিছু নেই ভাই।—আমরাও তা করি। বড়বাজারে জিনিস বানিয়ে ছাপ লাগাই 'মেড ইন ইনল্যাণ্ড' নয়ত 'মেড এজ জার্মানী।' এ তো আর মিথ্যে নয়। এ আমাদের মহাভারতেও চলে।' বলেই হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মিসেস হোয়াই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—'অ্যাণ্ড সো, ক্যালকাটা ইজ কালকাটা ?'

মিস্টার বিকজ মাথা চুলকে উত্তর দিলেন—'আই ডু নট নো।'

কলকাতা শহরটাকে কোনমতে একবার বেচে দিতে পারলে এক্ষুনি গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসেন—এ নগরীর এমন ওয়ারিশ যে একেবারে একজনও নেই সেকথা কেউ হলপ করে বলতে পারবেন না। তেমনি, থেকে থেকেই যাদের মন হয় 'সবসে বড়িয়া হত যদি কলকেত্তাটা হামার হত' তাদের সংখ্যাও যে কেবলমাত্র কবি এবং উন্মাদের মধ্যেই নির্দিষ্ট, তাও বলা যায় না।

যদি এদেরই কেউ কোনদিন এগিয়ে এসে জানতে চায়—'কেতনা লেগা', তবে কি দাম চাইবে কলকাতা?

কলকাতার নগর-সভা কানে পেন্সিল গুঁজে খাতা খুলে বলবে,—চারশ' কোটি টাকা। তাদের অ্যাসেসমেণ্টের মতে কলকাতার নাকি তাই দাম।

অপজিশনের সাবধানী সদস্য টেবিল চাপড় দিয়ে ঘোষণা করলেন—মিথ্যে কথা। ওসব হিসেব মিথ্যে,—বোগাস!

একজন খপ করে নগর-সভার কান থেকে পেন্সিলটি তুলে নিয়ে তক্ষুনি হিসেব কষতে বসে গেলেন। দৈর্ঘ্য প্রস্থ গুণ করলে কলকাতার ক্ষেত্রফল সাঁইত্রিশ বর্গ মাইল। এর মধ্যে ছাব্বিশ বর্গ মাইল—ফসলী। অর্থাৎ ঘর বাড়িতে বোঝাই। বাকীটুকু উপস্থিত পতিত। অর্থাৎ আপাতত সেখানে পথ, ঘাট, পার্ক ইত্যাদি। পথ বা পার্ক বিন খরচে তৈরী হয় না সত্য, তাহলেও এত বড় শহরটাকে যে কিনবে তাকে 'ফাউ' হিসেবে এগুলো ছেড়ে দেওয়া যায়। নয় কি?

তাহলেও দেখা যাচ্ছে, আমরা যদি কাঠা প্রতি জমির দাম ধরি গড়ে তিন হাজার টাকা এবং বাড়ির দাম ধরি গড়ে তার দ্বিগুণ, তাহলে কলকাতার দাম দাঁড়ায় একুনে বারশ' কোটি টাকা!

কলকাতা যদি কথা বলতে পারত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে থামতে বলত লোকটিকে। তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বুড়ো শহর বলত—'হিসেবটা তোমার অঙ্ক হিসাবে নির্ভুল বন্ধু।—হয়ত, এই বুড়োর হাড়পাঁজরের দাম হিসাবে একটু বেশীই ধরে ফেলেছ তোমরা! ইটের দাম আর কত ছিল তখন! বেশী হলে হাজার তিন টাকা! একশ' মণ জ্বালানীর দাম ছিল দশ টাকা! আর মুনিষের মজুরী দশ পয়সা!

তাও লোকের জন্যে বিশেষ টাকা লাগত না, আমাদের টাকা যা লাগত সে লোক ধরে আনতে। এই ধর আমাদের কেল্লাটা। এটা যখন তৈরী হয়,

তখন কালেক্টরকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলেন ক্লাইভ : দেখ বাপু, লোক না থাকে তোমাকে আমি মফস্বল থেকে চার হাজার মানুষ জোর করে ধরে আনবার অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু কাজ আমার, সময়মত শেষ হওয়া চাই।

সময় একটু লাগত বটে, কিন্তু খরচ বিশেষ হত না। তোমরা এখন এক কাঠা ইটের বাড়ির দাম ধরছ ছ' হাজার টাকা। কিন্তু ভাবতে পার কি, লাট-ভবনটা তৈরী করতে আমাদের লেগেছিল মোটে ১৩ লক্ষ টাকা। তাও, এ বলতে গেলে সেদিনের কথা। মার্কুইস অব ওয়েলেসলি তখন গভর্নর-জেনারেল। নবাবী মেজাজ ছিল তাঁর। তিনি বললেন : ভারতবর্ষকে যদি আমাদের শাসন করতেই হয়, তবে তা কুঁড়ে ঘরে থেকে করলে চলবে না। আমি প্রাসাদ চাই। শাসনও করব আমি রাজকুমারের মত, নীল আর মসলার খুচরা দোকানীর মত নয়!

সুতরাং জমি কেনা হল। জমি যে সেকালে বিনা পয়সায় না পাওয়া যেত তা নয়। কালেক্টর আপিসের নথিপত্র খুললেই দেখবে অনেক দলিলের নীচে লেখা আছে—'The rent is excused, being cutcherry servant' সেখ মানুল্লা কালেক্টর সাহেবের জমাদার। কোম্পানী বিনা পয়সায় চিরদিনের জন্য কয়েক বিঘা জমি দিয়ে দিল তাকে—for pious uses, অর্থাৎ দেব-সেবার জন্যে। মিঃ জর্জ ভোসিটার্ট নামে একটি লোক ছিল। ১৭৬৮ সনে ৬৩১ বিঘা ১১ কাঠা ৮ ছটাক জমি পেয়ে গেলেন তিনি মাত্র বার্ষিক ৭৮৯ টাকা খাজনার বিনিময়ে। কেননা, ভদ্রলোক কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। প্রায় প্রায়ই এমনি জমি জুটত এই পর্তুগীজ ভদ্রলোকটির ভাগ্যে। কখনও পুকুর কাটিয়ে জনসেবার জন্যে, কখনও অন্য কোন 'সাধু' কারণে।

অথচ, জমি যে তখন অনেক ছিল এমন নয়। বাস করা যায় কলকাতায় এমন জমি ছিল মোটে ৮৪০ বিঘা। এর মধ্যে বাড়ি-ঘর ছিল মোটে ২০৪ বিঘায়। আর ৪০০ বিঘা জুড়ে ছিল একখানা 'গ্রেট বাজার,' আজ যার নাম বড়বাজার। জমির দাম ছিল তখন ইটের দামের চেয়েও অনেক কম। দেবোত্তরী, ব্রহ্মোত্তরী, কোম্পানীত্তরী যদি না করাতে পার, তবে কড়ি ফেলে কিনে নাও না। দাম মোটে—আট আট আনা বিঘা। সাহেবপাড়ার গা ঘেঁষে হলে অবশ্য একটু বেশী দিতে হবে। তখন দাম বার আনা!

১৭১০ সন বা কাছাকাছি সময়ের কথা বলি। শহর তখন ধীরে ধীরে শহরের চেহারা নিচ্ছে। লম্বায় তার দেহ তখন প্রায় তিন মাইল। চওড়ায় এক মাইল। কোলে পিঠে জমিও বিস্তর। প্রায় দু হাজার বিঘার কাছাকাছি। কিন্তু জমি তখনও জলের দামে পাওয়া যায়। ১৭৫২ সনে হলওয়েল সাহেবের বিবরণ মত—কলকাতায় তখন মোট জমি ৫৪৭২ বিঘা। তার মধ্যে কোম্পানী নিজে ব্যবহার করে ৩১০ বিঘা। ৭৩৩ বিঘা খাজনাহীন। বাদ বাকী সব ঈশ্বরের খাস এলাকা। গির্জা, মসজিদ, মন্দির এবং ব্রাহ্মণে বোঝাই।

জমি বিলি হত তখন বার্ষিক তিন টাকা খাজনায়! তাও যে অতি কম জনই দিতে চাইত, সেকথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, লাট-ভবনের জন্যে বেশী ভাবতে হল না ওয়েলেসলিকে। জমি কিনতে তাঁর লাগল মোটে ৮০ হাজার টাকা। বাড়ি করতে তের লক্ষ, আর আসবাবপত্র, সাজসজ্জায় পঞ্চাশ হাজার। বাস্, হয়ে গেল ভারতে কোম্পানীর রাজপ্রাসাদ।

কলকাত্তার বিস্ময়কর দ্রষ্টব্যগুলোর জন্যে কত খরচ হয়েছে জান? মনুমেণ্টটার কথাই ধর না। একশ' বাহান্ন ফুট উঁচু চুনার পাথরে তৈরী এই বিজয়স্তম্ভটি বানাতে খরচ লেগেছে মোটে প'য়ত্রিশ হাজার! দমদম-বারাসত রাস্তাটা ভাল করে সারাই করতে লেগেছিল—কুড়ি টাকা! সুতরাং বুড়ো কলকাতা মাথা নেড়ে বলবে, আজকের নগরের ইট পাথরের দাম হিসাবে বারশ' কোটি টাকা—একেবারে মন্দ বল নি তোমরা। কিন্তু বন্ধু, বিক্রির দামটা বলার আগে কেনা-দামটা ভেবে দেখেছ কি? তোমরা ক'জন জান এ শহরের 'কস্ট প্রাইস?'

আউরঙ্গজেবের নাতি আজিম উশ্বান বললেন—'হ্যাঁ, উচিত দাম দিয়ে ইচ্ছে করলে কলকাতার জমিদারী তোমরা কিনতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। ইতিপূর্বে অনুমতি ছিল ব্যবসা করবার। বছরে দিল্লীশ্বরকে থোক তিন হাজার টাকা নজরানা দিলেই চলবে। এবার (১৬৯৮ সন) অনুমতি পাওয়া গেল—সুতানটী, গোবিন্দপুর আর কলকাতা গাঁ তিনখানা কেনবার।

সাবর্ণ চৌধুরীরা কিছুদিন ইতস্তত করলেন—তারপর কাওলা করলেন ইংরেজদের সঙ্গে। সেই দলিল নাকি আজও আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। (অবশ্য দিল্লীশ্বরের সেই উদার অনুমতিপত্রটি হারিয়ে গেছে।) তাতে লেখা আছে, চৌধুরীরা তিনখানা গাঁয়ের দাম বাবদ পেয়েছিলেন—মোটে তের হাজার টাকা!

কথাটা সত্য। কিন্তু ইংরেজরা বলেন—তাদের আসলে খরিদ দাম পড়েছে তিরিশ হাজার। কারণ, আজিম উশ্বানের সম্মতিটা কিনতে তাদের নগদ উপঢৌকন তথা উৎকোচই দিতে হয়েছে ষোল হাজার টাকা! তারপর পথ খরচ, পান খরচ ইত্যাদি আছে।

১৭১৫ সনের সরমান-দৈত্য যখন ফারুক শায়ার-এর হাত থেকে মাত্র আট হাজার আট শ' ছত্রিশ টাকায় হুগলীর দুই তীরে দশ মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ আটত্রিশখানা গাঁয়ের অধিকার নিয়ে ফিরে এলেন, তখন অনেকে হয়ত ভাবলেন—জলের দরে বিক্রি হয়ে গেল দেশটা!

কিন্তু কোম্পানীর অ্যাকাউণ্টস বই খোল—দেখবে, এর অনেক অনেক গুণ বেশী পড়েছে তার দাম। ১৭০৯ সনে ভবিষ্যৎকে না জেনেই বাদশাহকে ছেচল্লিশ হাজার টাকা ভেট পাঠিয়েছে তারা। আর দূতবাহিনীর সঙ্গে গেছে তিরিশ হাজার পাউণ্ডের উপহার। ক'দিন ধরে মিটিংএর পর মিটিং চালাতে হয়েছে, শুধু কি দিলে বাদশার মন খুশী হতে পারে তাই স্থির করতে। তার উপর, আর্মেনিয়ান শারহেদকে দিনের পর দিন বাদশাজাদার সঙ্গে বসে পুতুল খেলা খেলতে হয়েছে, হ্যামিলটনকে ডাক্তারি করতে হয়েছে। এবং আরও কত কি! সে সব বলতেও এখন লজ্জা পাবে কলকাতা।

মোটকথা, কলকাতায় খাজনার চেয়ে বাজনায়ই সেকালে কাজ হত বেশী। হুগলীর ফৌজদার কত আর খাজনা পেতেন ইংরেজদের থেকে? সুতানটী বাবদ তাঁরা দিতেন—৩০৫ টাকা, গোবিন্দপুর বাবদ—৭০ টাকা আর কলকাতা বাবদ—৩৩ টাকা। কিন্তু বাজনা দিতেন। কখনও মোমবাতি, কখনও আয়না, কখনও অন্দরের জন্যে হীরের মালা। বছরে বছরে প্রায় তিন হাজার টাকা চলে যেত তাদের এই উপহারের ডালিটি সাজাতে। শুধু মোমবাতিতেই তো

লাগে এগারশ' টাকা। একজোড়া যেমন তেমন আয়নার দাম সাড়ে পাঁচশ টাকা। একখানা ঘড়ি দিলে প্রায় নয়শ'!

এই হচ্ছে একদিকের দাম। কোন দলিলে এর উল্লেখ নেই, কিন্তু কলকাতার পকেটে তার চিহ্ন আছে। কোম্পানীকে কি কম কিপ্টেমি করে চলতে হয়েছে—এসব ভেটের টাকা তুলতে! ১৭৫৯ সনের কথা বলছি। ইংরেজরা যখন ফাঁকার উপর ছিল তখন দুম দাম কত তোপ দেগেছে কলকাতায় তার ইয়ত্তা নেই। অথচ, পলাশীর যুদ্ধের দু'বছর পরে কিনা তাঁরা ঘোষণা করলেন—'তোপের বদলে এবার থেকে জয়ধ্বনি চালাও। কামানের বদলে গলা বাজাও।' কেননা, বারুদ বাঁচাতে হবে ("to prevent needless expense of Powder") বলা বাহুল্য এই হুঁশিয়ারিটা পরের কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়, বিগত যুদ্ধটির জন্যে এখানে-সেখানে যা দাম দিতে হয়েছে তারই কিঞ্চিৎ তুলবার চেষ্টা মাত্র!

কিন্তু আসল দাম কি আর এতে ওঠে? সেই খরচের বহর যদি জানতে চাও তো চলে যাও—পার্ক স্ট্রীটের কবরখানাগুলো কিংবা সেণ্ট জন চার্চের প্রাঙ্গণে। দেখবে ইটে ইটে লেখা আছে সেই ত্যাগের কাহিনী। জাহাজ থেকে ঊনিশ বছরের ছেলেটা নামল। একটা রাতও কাটল না, পরের দিনই কবরখানায় শয্যা নিতে হল বেচারাকে।

মাসে মাইনে মোটে কুড়ি টাকা। জ্বালানী আর খাওয়া-দাওয়া অবশ্য ফ্রি। কিন্তু, তাহলেও কে রাজী হবে কলকাতার মত জায়গায় আসতে? জীবনের দৈর্ঘ্য যে সেখানে ঘোড়ার দৌড়ের মত গ্যালপ-এ গ্যালপ-এ শেষ হয়ে যায়। এমন কি, নেটিভদের পর্যন্ত সয় না এই শহরের জলহাওয়া। হিজলির পানি খেলে যেমন 'যমে মানুষে টানাটানি,' তেমনি তখন নেটিভদের কাছে কলকাতার পানিও। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় নিজে লিখে গেছেন—কলকাতায় নাকি 'মৎপাত্রে অধিক দিন লবণ রাখিলে যা হয়' মানুষেরও তাই হত। 'অত্যল্প আঘাতে গায়ের ত্বক উঠিয়া যাইতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া যাইতে লাগিল। এবং ইত্যাদি। লোকে একে বলত 'লোনা লাগা।' কার্তিকবাবু অবশ্য গাঁয়ের হাওয়াতেই সেরে উঠেছিলেন, কিন্তু অন্যদের রীতিমত ওষুধ খেতে হত। কঠিন ওষুধ। কাঁচা থোড়, ঘোল ও কলমীর ঝোল খেতে হবে! তার ওপর গায়ে কাঁচা হলুদ মাখতে হবে। সুতরাং দুটো বর্ষাও লাগে না, দেখতে দেখতে অ্যাংলো-স্যাক্সন জোয়ানেরা গলে কাদা হয়ে যায়। মৃত্যুহার তখন কত জান? ১৭০০ সনে কলকাতায় ইংরেজ ছিল মোট বারশ'। বৎসরান্তে দেখা গেল চারশ' ষাটজন কমে গেছে তাদের থেকে। দেশে তখন তুলার গুদাম বা সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকদের মত কলকাতাবাসী ইংরেজের ইনস্যুওরেন্স প্রিমিয়ামের রেট বেশী।

তবুও এরা এসেছে। মরেছে, আবার এসেছে।—কেন? লাভের জন্যে? তবে সে কাহিনীটুকুও শোন। বুড়ো শহর আবার সুরু করল—রাতারাতি লাভের শহর হয় নি কলকাতা। ১০০০ সনের খবর শোন। বছরে তিন হাজার টাকা কোম্পানীকে দিতে হয় তখন। অথচ কলকাতা থেকে তখন রাজস্ব আদায় হয় মোটে বারশ' টাকা। চার বছর চলে গেল। কোন লাভ নেই। পাঁচ বছরের মাথায় ঘরে এল—মোটে চারশ' টাকা। এত কাঠখড়

প্রুড়িয়ে এই জমিদারী নেওয়া অথচ বার্ষিক তিন হাজার টাকা লাভের জন্যে, অপেক্ষা করে বসে থাকতে হল দশ-দশটি বছর।

দশ বছর পরেও যে খুব একটা কিছু হল তা নয়। ১৭৪২ সনের জমা-খরচের খাতাটি দেখ। এপ্রিল মাসের হিসেবে। রাজস্ব আদায় হয়েছে এই মাসে মোট —৯৭২৯৲ টাকা। আদায় বাবদ খরচ—২৪৮১৲ টাকা। অথচ এদিকে কোম্পানীর এস্টাব্লিশমেণ্ট-কস্টই তখন মাসে কুড়ি হাজার টাকা। গ্রাচুইটি নিয়ে কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের মাসিক মাইনে—২৫৪৲ টাকা। পাদ্রী আছেন একজন। তাঁর মাইনে মাসে—৮৪৲ টাকা। চিকিৎসক আছেন একজন। তাঁকেও দিতে হয় মাসে মাসে তিরিশ টাকা।

সুতরাং, কলকাতা শুধু মুনাফার জন্যেই বড় হয়েছে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা ভুল ভাবেন। লাভ যদি এ শহরের অস্থিমজ্জা হয়, তবে মমতা কলকাতার প্রাণ।

শুধু সাহেবদের নয়, কলকাতা নেটিভদেরও ভালবাসার শহর। কখনও ব্যবসায়ী সেজে সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে কলকাতায় এসে বসত করেছে তারা, কখনও এসেছে সিরাজউদ্দৌলার ফৌজে নাম লিখিয়ে, কখনও বা আবার তল্পিতল্পা নিয়ে ছুটে পালিয়েছেও ইংরেজের পিছু পিছু। কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার ফিরে এসেছে সেই কলকাতারই কোলে। কারণ কলকাতা ইংরেজের রাজধানী হলেও বাংলাদেশের মস্তিকাজাত শহর।

সেকালের গভর্নমেণ্ট হাউস

সেদিক থেকে কলকাতা তাই বাঙালীর মনের মুকুর। বাঙালী-চরিত্রের যত কিছু দোষ ত্রুটি, হীনতা, দুর্বলতা কলকাতা তার একটি অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভ। কিংবা, এও বলা যায়, কলকাতা বাঙালী-দর্শনে সর্বোৎকৃষ্ট ম্যাগনিফায়িং গ্লাস। আবার, তেমনি হাল আমলের বাঙালী-চরিত্রের যত কিছু মহত্ত্ব, যা কিছু গৌরব কলকাতা তার জাদুখানা। এখানে এখনও পথে বের হলে আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়িটি দেখা যাবে, দেখা যাবে সুকিয়া স্ট্রীটের সেই বাড়িটি যেখানে প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল।

তাছাড়া, কলকাতা ভারতবর্ষের কাছে দুনিয়ার জানলাও বটে। এখানে হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-শিষ্যরা একদিন নতুন যুগের বার্তা নিয়ে পথে বেরিয়েছিল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীটের একটা পুরানো বাড়িতে দ্বারকানাথেরা ভারত-চিন্তায় বসেছিলেন এবং ইত্যাদি। কলকাতা হিন্দু কলেজের শহর, ডিরোজিওর শহর, কলকাতা দ্বারকানাথ, রামমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের শহর।

আসল বিক্রিওয়ালা হলে—তাদের খাতায় এঁরা এতদিনে তিলে তিলে যা যোগ করেছেন—তাও যোগ হত। কারণ, ব্যবসায়ীরা একে বলেন—'গুড উইল।' আমরা যাকে সুনাম বলি—কলকাতার গুড উইল যে তার চেয়েও অনেক বেশী। হিন্দুস্থানীরা এখনও বলে—'ব্যোম কালী কলকেত্তাওয়ালী, তেরা নাম না যায় খালি।' শুধুমাত্র কলকাতার নাম নিলেও যে কিছু না কিছু এসে যায়। তা পকেটেই আসুক আর মনেই আসুক। ইট কাঠ পাথরের কলকাতাকে হয়ত পকেটের বলে কেনা যায়, কিন্তু মনে গর্ব জাগায় যে 'গুড উইল' তার দাম দেওয়ার লোক কোথা?

সাদা কথায় 'হবসন-জবসন' একটি শব্দ। ইংরেজি শব্দ। আসলে 'হবসন-জবসন' একটি ভাষা। যদি বলেন, কি ভাষা? তবে উত্তরে বলতে হয় 'চাউ-চাউ' ভাষা। 'চাউ-চাউ'এর মতো সহজ কথাটারও যদি টীকা দরকার হয়, তবে আপনার পক্ষে এর পুরো ইতিহাসটা শোনা ভালো।

লোকে বলে, সম্রাট পঞ্চম চার্লস খুব উঁচুদরের ভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনি নাকি বলতেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলবে স্প্যানিশ ভাষায়, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বলবে ইতালিয়ানে, তরুণী মেয়েদের সঙ্গে ফরাসীতে এবং সৈন্যদের সঙ্গে জর্মানে। ইংরেজি বলতে হয়, বলবে রাজহংসীর সঙ্গে, কবুতরের সঙ্গে বলবে সুইডিস, ঘোড়ার সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান—আর শয়তানের সঙ্গে চেক।

'ইন্ডিস,' 'ইন্ডুস্থান' বা ভারতবর্ষের লোকেদের সঙ্গে কি ভাষায় বাক্যালাপ করা উচিত মহামান্য সম্রাট তা বলেননি। ফলে, সপ্তদশ শতকে ইংরেজেরা এদেশে এসে বিপাকে পড়লেন। কারণ, তাদের মুখে রাজহংসীর ভাষা। অথচ 'জেণ্টু' কেন, এদেশের তরুণী মেয়েরা পর্যন্ত পর্তুগীজ ভাল বোঝে না। তবুও পর্তুগীজরা আগে এসেছে। তাদের কথা কেউ না বুঝলেও, তারা 'জেণ্টুদের' কথা বোঝে। 'জেণ্টু' কথাটাও তাদেরই দেওয়া। পর্তুগীজ ভাষায়—জেণ্টিও (Gentio) বা 'জেণ্টাইল (Gentile) মানে 'হিদেন্' বা বিধর্মী। তাই থেকে ক্রমে 'জেণ্টু,' অবশেষে 'জেণ্টলম্যান' বা ভদ্রলোক, ওরফে—'বাবু'।

ইংরেজেরা তাই পর্তুগীজ 'দো-ভাষ' বা 'দো-ভাষী' ধরলেন। সাহেবরা 'তুমি'কে 'টুমি' বলে। এক কানে-খাটো সাহেবের পাল্লায় পড়ে দু'দিনের মধ্যেই 'দো-ভাষ' তাই 'টোপাস' (Topass) হয়ে গেল। 'টোপাস' মানে ক্রমে দাঁড়ালো—পর্তুগীজ। কারণ তারা দু'দেশের ভাষা জানে। ক্রমে দু'দেশের রক্ত যাদের গায়ে তারাও 'টোপাস' হয়ে গেল। 'টোপাস' মানে এখন আর মোটেই দো-ভাষী নয়, টোপাস মানে—ইউরেশিয়ান, ফিরিঙ্গি বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। দো-ভাষী থেকে দো আঁশলা।

দো-ভাষী দিয়ে কাজ চলে, কিন্তু মন ভরে না। তাছাড়া কোম্পানী ব্যবসায়ী। দো-ভাষীর খরচ তাঁরা বাজেখরচ বলে ভাবতে শিখে গেলেন। কর্মচারীদের উপর আদেশ এলো, ভাষা শেখ। তাতে মাইনে বাড়বে। বুদ্ধিমানদেরও তাই পরামর্শ। সার্ জন শো'র বললেন—নেটিভদের শ্রদ্ধা

অর্জনের একমাত্র পথ, তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলা। কোন রকম বিকৃতি না করে—ওরা যেমন বলে, ঠিক তেমনি বলা।

জেণ্টুদের মতো বলতে গিয়ে তাঁরা সব সময়ই 'পুডিং'কে 'পুটিন্' বলেন, 'স্টু'কে বলেন—'এস্‌স্টু' এবং 'কাউন্সেল'কে 'কাউন্সেলি'।

তবুও এঁরা শিখলেন। ইমা রবার্টস নামে এক মহিলা ভ্রমণকারী (এবং লেখিকাও) লিখেছেন—'এত শিখতে যাবো কোন্ দুঃখে— A very few words will suffice to carry a Dak traveller over India.' মিস রবার্টস নাকি নিজে চারটে শব্দ জানতেন—'ওঠাও' (Otaw), 'জলদি যাও' (Jeldi Jaw) আর 'পিনেকো পানি লাও' (Pinnake Pannee Low)! বেহারারা কিছু জিজ্ঞেস করা মাত্রই তিনি উত্তর দিতেন—'দস্তুর কা মাফিক!' (Dustoor Ca Maffic) অর্থাৎ চিরকাল যা করে আসছ, তাই কর!

তাতেও কখনও কখনও বিপত্তি ঘটে। বেহারারা পায়ের সঙ্গে গলায় তাল রেখে চলে, গান গায়, এক সাহেব সেটা জানতেন না। 'হেঁইয়ো-হো' কানে আসতেই তিনি লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে।—ঈশ্বর জানেন, বেটাদের কি হয়েছে! আশ্চর্য এই, পাল্কী-বেহারা কিন্তু তখন হাসছে।

সুতরাং ইমার পরামর্শে চলবে না। কোম্পানীর কর্মচারীরা ভাষা শিখতে আরম্ভ করতেই বিলেতে বসে বড় কর্তারা তাদের চিঠি খুলেই বুঝতে পারলেন—এককালের পরামর্শ এখন আবার তুলে নেওয়ার দিন এসেছে। কোম্পানীর পুরানো ইণ্ডিয়াফেরত কর্মচারী নিজেই আঁতকে উঠলেন—তাদের মিনিটস পড়ে।—আরে—বাপ রে,—এ কি ভাষা!

জুনিয়াররা পেয়ে বসলো। "কি বললেন সার্?—হোয়াট ইজ 'আরে—বাপ্ রে'?" বুড়ো কিছুক্ষণ মাথা চুলকালেন। তারপর পুরানো একটা ফাইল টেনে বার করলেন। ফাইলটা হেস্টিংস-এর আমলের। তাতে একজন প্রত্যক্ষদর্শী নন্দকুমারের ফাঁসীর বিবরণ দিয়ে লিখছেন—দাঁড়টা তাঁর গলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত নেটিভরা চোখে হাত দিল। আর তাদের গলা দিয়ে বের হলো—একটা কাতর ধ্বনি,—'আরে বাপ রে!' অন্য একজন শব্দটার নোট দিচ্ছেন পাশেই:

If a Hindoo was to see a house on fire, to receive a smart slap on the face, break a China basin, cut his finger, see two Europeans boxing or a sparrow shot he would call out—Ah-baup-aree or Ahi-baprehh!

নোটে আর কতদিন চলে! ভারতীয় ভাষা-কণ্টকিত চিট্ পড়তে পড়তে বিলাতী কর্তারা ক্রমে হাঁপিয়ে উঠলেন। শেষে আদেশ দিলেন, এসব শব্দের ব্যবহার বন্ধ কর।

বে-সরকারী ভাষাবিদেরাও তাই সমর্থন করলেন। তাঁরা বললেন—ঠিক-ই তো, চিট্, ব্যাঙ্কশাল, গোডাউন (Godown), কম্পাউণ্ড (Compound) বা দপ্তরখানা (Dufftcrkhana) বা আতর (Ottar) লেখার কি মানে হয়? বুঝতাম, এই জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের দেশে নেই তবে একটা কথা ছিল! বার্ক বললেন, তবুও কোম্পানীর ব্যবসায়িক চিঠিপত্রে এগুলো চলতে

পারে, তবে দয়া করে পার্লামেন্টের বাইরেই যেন এগুলো থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, হেস্টিংসের বিরুদ্ধে বার্ক সাহেব নিজেই এ ভাষার সাহায্যে পেশ করেছিলেন তাঁর 'আর্জি'। বোধ হয় 'হবসন-জবসনে'র মর্ম তখনও তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি।

তার প্রমাণ আজকের অক্সফোর্ড ডিক্সনারী। ওতে ৯০০টি মূল ভারতীয় শব্দ আছে যা 'হবসন-জবসন'-বংশজাত। তা ছাড়া আছে এদের কয়েক হাজার আত্মীয়স্বজন। তারা সবাই আজ ইংরেজি বলে গ্রাহ্য।

কি করে এই শব্দগুলো 'অক্সফোর্ড ডিক্সনারী'র মতো বনেদী বাড়িতে জায়গা পেলো তা জানতে হলে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আর একবার ঢুকতে হয় নিজেদের দেশে।

প্রথমেই কালিকট। সপ্তদশ শতকে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ভারতে। কালিকট দক্ষিণের অন্যতম বন্দর। মিঃ রাইসকারি কালিকটে নামলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লেডি মেরী ম্যাংগো আর কন্যা মিস ম্যাক্ টডি (তিনটে নামই কিন্তু থ্যাকারের দেওয়া)।

কালিকটে নেমেই তাঁরা দেখলেন, ওখানকার জমাটি ব্যবসা হলো কাপড়ের ব্যবসা। পর্তুগীজ এবং ফরাসীরা সাদা কাপড় বলতেই বুঝতেন—'কালিকাট' বা 'কালিকো' (kaliko)। মিঃ রাইসকারি সাদা লাল মানলেন না। তাঁর মিসেসের কাছে কাপড় মানেই—'কালিকট'। ক্রমে সব ইংরেজই 'কালিকট' বলতে কাপড় বুঝলেন। ধীরে ধীরে 'কালিকটের' সীমা আরও বেড়ে গেল। সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে চালু হলো—'কালিকো-কাবার্ড', 'কালিকো-ম্যাণ্টল' (Calico-mantle) এবং শেষ পর্যন্ত 'কালিকো-বল' বা কালিকো নাচ। তখনও ভারতীয় সিল্কের ব্যাপক প্রচলন হয় নি। অভিজাত মহিলারা রেশম পরেন। তাই 'কালিকো-বল'—মানে, যে নাচের আসরে মহিলারা সুতি কাপড় পরে নাচেন। সিল্কের চলন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—তার মানে হয়ে গেল—'সস্তা নাচ'। আর 'কালিকো-বেলি' (Calico-bally) মানে সুন্দরী মেয়ে নয়,—হোঁৎকা ধুমসী তরুণী। বিলেত থেকে যেসব সাহেব আমেরিকায় গেলেন—তাঁরা সাদা কাপড়ে যে যান নি তার প্রমাণ ওদেশে 'কালিকো' মানে ছাপা কাপড়। আর কালিকো গার্ল মানে—মোটা মেয়ে নয়; সুন্দরী মেয়ে। ওদেশের কালেজ বয়েরা কোন মেয়েকে সুন্দরী বলতে হলে নাকি বলতো—Oh! She is a piece of Calico! কিংবা,—ডরোথি সত্যিই 'A choice bit of Calico!' ফরাসী দেশে আবার—কালিকো মানে—মদওয়ালার সহকারী।

কালিকট থেকে মিঃ রাইসকারি এলেন সুরাটে। সুরাটের জিনিসপত্তর কালিকটের মতো ভালো নয়। রাইসকারি তাই 'সুরাট' মানে করলেন—ভেজাল, নিকৃষ্ট (Adulterated)।

সুরাট থেকে রাইসকারি-পরিবার আবার কালিকটে ফিরলেন। কালিকটই ভালো। এখানে দিব্যি বায়াদারি (Bayadere) নাচ হয়। অর্থাৎ বাইজীরা নাচে। দো-ভাষী তাকে বলেছে—বাইজী মানে—'এ নাচ-গার্ল'। 'বেনিয়ান কোট্' প'রে রাইসকারি তাদের 'টামাসা' ('Tamasha') দেখেন, চুরুট ফোঁকেন। নয়ত 'ছিলাম' (Chillum) খান। 'হুক্কা' তাঁর বড্ড ভাল লাগে।

কখনও কখনও 'পাউন'ও (Pawn) চিবান। তবে সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে—এখানকার 'টডি' (Toddy) এবং 'পাঞ্চ' (Punch)। টডি মানে তাড়ি, আর পাঞ্চ মানে—ভারতবর্ষের পাচন। পিলে জ্বরের ঔষধ নয়, উত্তেজনাবর্ধক সুরাসার।

যা হোক, রাইসকারি সাহেব অতঃপর সপরিবারে বাংলায় এলেন। 'আপ্-কান্‌ট্রি'র দিকে গেলেন না। কেননা রালফ্ ফিচ্ বহু আগেই লিখে গেছেন—ওদিকে 'গ্রেট্ মুগর'দের (Great Mogar) বাস। তার চেয়ে 'বেঙ্গল' নিশ্চয় ভাল হবে। কারণ যে-সব 'বেঙ্গল' তিনি দক্ষিণে দেখেছেন—তাতে তাঁর মনে ঐ নামের দেশটি সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ। বলে রাখা ভাল, সাহেব দক্ষিণে 'বেঙ্গল' দেখেছেন শুনে ভাববেন না তিনি এত দূরদেশে বাঙালী দেখেছেন। 'বেঙ্গল' মানে তখন বাংলার জিনিসপত্তর। এবার তিনি 'বেঙ্গল' বা বঙ্গভূমিতে এলেন।

কলকাতায় পা দিয়েই তিনি মনে মনে একটা সমস্যায় পড়লেন।—দেশটা ঠিক কার?—'জেণ্টু'দের না 'মুর'দের। 'জেণ্টু' মানে তাঁর কাছে হিন্দু, 'মুর' মানে—মুসলমান। বৈয়াকরণ হলহেড সাহেবের কাছে ছিল 'জেণ্টু' মানে—হিন্দুস্থানীদের ভাষা, 'মুর' মানে—উর্দু! কলকাতায় যেমন হিন্দু আছে, তেমনি আছে মুসলমানও। থাক্‌গে, রাইসকারির তা নিয়ে ভাবনা নেই। তিনি 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে' অর্থাৎ ডালহৌসিতে থাকবেন।

তাঁর বাড়িখানা ছোট। অদ্ভুত গড়নের। নদীপথে আসতে আসতে যেমন খড়োঘর দেখেছেন তেমনি। এ-বাড়ির নাম দিলেন—তিনি 'বাংলো'। চমৎকার বাংলো। টাট্টি (মাদুর) আছে, 'খসখস্' আছে, জানলায় 'চিক' আছে। তা ছাড়া 'সিরকার' খানসামা থেকে 'বেহারা', 'খিদমদগার', 'মলি' (Molly), কুকুরের জন্যে 'ডুরিয়া' সব দিয়ে গেছে। 'পাক্কা' (Pucka) ব্যবস্থা।

সকালে এক প্রতিবেশী এলেন চা খেতে। খিদমদগার 'টি-পয়' বা চায়ের টেবিল নিয়ে যেই সেলাম করে দাঁড়াল ওমনি ভদ্রলোক চমকে উঠলেন।—'আই সি, দ্যাট্ ফেলো!' ওর কিছু জিনিসপত্তর নিয়ে সরে পড়েছিল লোকটি। মিঃ রাইসকারিকে তাই তিনি সাবধান করে দিলেন—"ওর সম্বন্ধে হুঁশিয়ার! Because, there is no thikana of that fellow!" লোকটার কোন 'ঠিকানা' নেই মানে, লোকটা অসৎ।

ওরা বসে থাকতে থাকতেই ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদার এসে উপস্থিত। প্রতিবেশী বুঝিয়ে দিলেন—'হি ইজ হালালকোর' (Halalkore)।

বলা বাহুল্য, ঝাড়ুদার তাই শুনে তো মহাখুশী। কারণ সে জানে—হালালকোর মানে—হক্ ছাড়া যে নেয় না, খায় না। কেউ কেউ আবার তাকে বলে—হ্যারি (Harry), তার স্ত্রীকে 'হ্যারি-ওম্যান'। বোধ হয় 'হরিজনের' পূর্বাভাস!

যা হোক প্রতিবেশী উঠলেন। কারণ, তিনিও একজন এইচ-ই-আই-সি-এস (H.E.I.C.S., মানে অনারএবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সারভেণ্ট। তারই পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেম্বর হয়েছেন)। তাঁকে কাছারী (Cutcherry) যেতে হবে। নয়ত 'বোড়া সাহিব' (Burrah Sahib) রাগ করবেন। তিনি তাঁর মহালেই (Mohal) কাছারী করেন।

মিঃ রাইসকারিও উঠে পড়লেন। তাঁকেও কাছারী যেতে হবে।

পিলাউ, চিকেন-কারী, কেড্‌গীরি ইত্যাদিতে তার মধ্যাহ্নভোজ হলো। রাইসকারির বাবা এ-সবের একটি চীজও খান নি। বেঁচে থাকলে—চিঠি লিখে লিখে তিনি তাঁকে সব খাওয়াতেন। বৈঠকখানার সেই বিখ্যাত 'Bread & Cheese Banglow'র চাপাটি পর্যন্ত।

যাকগে, যা সম্ভব নয় তা নিয়ে আর ভেবে লাভ কি! মিঃ রাইসকারি চেনাশুনা আত্মীয় বন্ধুদেরই চিঠি লিখে লিখে নামগুলো চিনিয়ে দিলেন। তারা সেগুলোকে চালু করে দিল—অক্সফোর্ডের পাতায়।

এদিকে অফিস থেকে ফিরে বিকেলে একটু 'ভারাণ্ডায়' (Verandah) বসেছেন এমন সময় মিঃ সো এণ্ড সো এসে হাজির। তিনি কোম্পানীর একজন 'ক্রেনী' (Cranny)। রাইসকারি কেরানী নন, কিন্তু 'ব্রাদার ক্রেনীদের' সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সত্যিই বড়ো ভাইয়ের মতো। তিনি 'কর্মাপিটিশন-ওয়ালা' নন। মিঃ সো এণ্ড সো প্রস্তাব দিলেন—চলুন সার্, টোলা কোম্পানীতে আজ 'আউটক্রাই' (Outcry) হচ্ছে, একটু দেখে আসি! সেকালে 'আউটক্রাই' মানে—নীলাম। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। মিঃ রাইসকারি 'কটে' (Cot), ওরফে খাটে—মাত্র শরীরটা ঢেলেছেন—এমন সময় কানে এলো একটা বিশ্রী কর্কশ শব্দ।

—'ইট ইজ এ ডেভিল বার্ড' (Devil Bird)—উত্তর দিলেন মিসেস কারি। 'ডেভিল বার্ড' মানে—পেঁচা। 'ছোটা সাহিবে'র নবনিযুক্তা 'আয়া' বলেছে—এ-পাখি রাত্তিরে ডাকলে সমূহ অমঙ্গল। মিসেস কারি তাই এর নাম দিয়েছেন—'ডেভিল বার্ড'। প্রসঙ্গত বলে রাখি—'আয়া' শব্দটি 'আই-মা' জাত। যেমন—মেম সাহেবটি—'মা মা সাহেবের' ফল। প্রথমটির জন্যে যদি মিসেস কারি দায়ী হন, তবে দ্বিতীয়টির দায়—নিশ্চয় সেই আয়াটির।

এদিকে মিঃ রাইসকারি 'ডেভিল বার্ডে'র ভাবনায় পড়লেন। কি অমঙ্গল হতে পারে তাঁর সোনার সংসারে?

কিন্তু সত্যি সত্যিই পাখিটার বচন মিথ্যে হলো না। একদিন সাহেব কাছারী থেকে ফিরে শুনলেন তাঁর কন্যা মিস ম্যাকটিডি একটা গ্রিফিনের (Griffin) হাত ধরে পালিয়ে গেছে। ওটা 'গ্রিফিন' বা ভবঘুরে হলে ক্ষতি ছিল না—কিন্তু সবাই বলে—ছেলেটির নাকি 'কৈ হ্যায়'দের (Qui hai) ছেলে। —অর্থাৎ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান!

মনের দুঃখে মেম-সাহেব আর ছোটা-সাহেবকে নিয়ে মিঃ রাইসকারি বেড়াতে বের হলেন। যাওয়ার সময় বড়াসাহেব মিসেস কারিকে অভয় দিলেন—'কোন ভয় নেই। I shall write perwannahs to all police darogahs of all Zillahs. ওরা পথে পথে 'সিপয়' রাখবে।'

রাইসকারি সুন্দরবনে 'শিকার' (Shikar) করলেন। বনকে স্থানীয় লোকেরা বলে—জঙ্গল। রাইসকারি লিখলেন—'জাঙ্গল' (Jungle), ডাকাতকে —'ডেকয়েট্' ((Decoit)। ডাকাতের টীকা লিখলেন—Lottie-wallah. অবশ্য এটা লিখতেও ভুললেন না যে ওরা 'ঠগ' নয়।

আর এখানে নয়। এবার দেশে ফিরতে হয়। কিন্তু মেম-সাহেবের ভীষণ ইচ্ছা—যাওয়ার আগে একবার নিজের চোখে 'হবসন-জবসন' দেখে যান।

অগত্যা বাধ্য হয়ে মুর্শিদাবাদে আসতে হলো। তখন মহরম। রাইসকারি মিসেসকে টেনে বার করলেন—ঘর থেকে। এই তোমার 'হবসন-জবসন'। ইচ্ছে হয়—শোন, ইচ্ছে হয় দেখ। দেখেশুনে সাধ মেটাও। মিসেস কারি অবাক হয়ে দেখলেন—কতকগুলো 'মুর' একটা কফিন কাঁধে করে বুক থাবড়াতে থাবড়াতে চলেছে—আর চিৎকার করছে—হবসন-জবসন! হবসন-জবসন। অর্থাৎ—'হায় হাসান! হায় হোসেন!'

এই 'হায় হাসান, হায় হোসেন' শব্দটাই ১৬১৮ সাল থেকে শুরু করে ১৮৩৩ সালের মধ্যে নানা কান হয়ে 'হবসন-জবসনে' এসে স্থিতি নিলো। ইয়ুল সাহেব ১৮৩৩ সালে তার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডিক্সনারিটিকে এ নামে নামকরণ করে—চিরস্থায়ী করে দিলেন তাকে।

যা হোক, অবশেষে রাইসকারি একখানা 'ইণ্ডিয়ানম্যান'এ চাপলেন। এবার দেশে যেতে হয়। পকেটে তখন তার বিস্তর 'গোল্ড মোহর', মনে অপার শান্তি।

বিলেতে ফেরার পরে মিঃ রাইসকারি—লর্ড হলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে লর্ড বলে না। বলে—নবাব (Nabob)। 'নাবব কারী'। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে—'মোগলকারী!' মিসেস কারি সেই দুঃখে আত্মহত্যা করলেন। মিঃ কারি বললেন—She is a 'Suttee' বা সতী। কেননা, সে স্বামীর দুঃখে মরেছে। ক্রমে স্ত্রীর শোকে 'শহীদ' (Shahid) হলেন মিঃ কারিও। আর তাঁদের স্মৃতি হয়ে রয়ে গেলো—এই একগাদা 'চাউ-চাউ'!

'চাউ-চাউ' মানে—

কমলা লেবু আর বাঁশের কঞ্চির তরকারী।
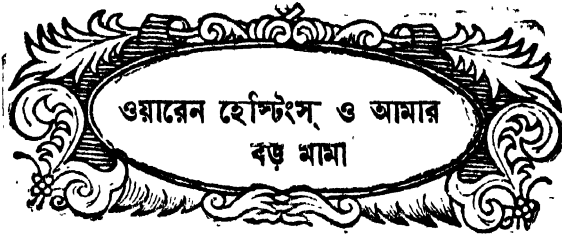
ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও আমার বড় মামা

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে কোথায়ও ওয়ারেন হেস্টিংস নামে কোন কবির উল্লেখ নেই। যেমন নেই, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমার বড়-মামার নামটি। অথচ বড়মামা যে কবি ছিলেন, আমি তা নিজের চোখে দেখেছি। আর, ওয়ারেন হেস্টিংস যে তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না, তা আমি না দেখলেও প্রমাণ করতে পারি।

অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে কবি প্রমাণ করা খুব সহজ কাজ নয়। এ-ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা এই যে, হেস্টিংস তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসতেন। সেকালের কবিরা স্ত্রীকে ভালবাসতেন না এমন নয়। কিন্তু তাঁরা স্ত্রী অপেক্ষা 'মানসসুন্দরী' প্রমুখা স্ত্রীলোকদের প্রতি অধিকতর আসক্ত ছিলেন বলেই জনশ্রুতি। বিশেষত, ওয়ারেন হেস্টিংসের মত বড় ঘরের কবিরা। অথচ আশ্চর্য এই, হেস্টিংস তাঁর দুই স্ত্রীকেই সমান ভালবাসতেন। বড়মামাও তাই। বড়মামার প্রথমা স্ত্রী অর্থাৎ বড়মামীমা যখন বিগত হন, তখন তাঁর দু-দুটি তিননম্বরী খাতাপূর্ণ কবিতা পড়ে অন্যদের মত আমারও ধারণা হয়েছিল যে, তিনি অচিরেই সাধু হয়ে যাবেন। প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর কাশিমবাজার না মুর্শিদাবাদ থেকে লেখা হেস্টিংসের চিঠিগুলো পড়লেও তাই মনে হয়। কিন্তু হেস্টিংস তা হন নি। পরিবর্তে, তিনি তখন গভর্নর-জেনারেল হয়েছেন এবং কবি হবেন। সুতরাং অচিরেই শোনা গেল, ওয়ারেন হেস্টিংস ব্যারন ইমহফের সুন্দরী স্ত্রীকে মুগ্ধ এবং ক্রমে দেখতে না দেখতে মারাঠাদের মত জয় করে নিয়েছেন। বড়মামার পক্ষে এই যুদ্ধটা বোধ হয় তত সহজ হয় নি। কারণ, বার্ধক্য, বংশরক্ষা ইত্যাদি যুক্তিগুলো তাঁর পক্ষে তেমন যুক্তি ছিল না। তা ছাড়া এই দুজনের কবিজীবনে আরও একটা পার্থক্য এখানে উল্লেখযোগ্য। হেস্টিংসের প্রথমা স্ত্রী যখন মারা যান, হেস্টিংস তখন ভাল চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু কবিতা লেখা ধরেন নি। তাঁর কবিতার উৎস এবং মোহনা দুই-ই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। বড়-মামার দ্বিতীয়া পত্নী বা আমার ন'মামীমা তাঁর যাবতীয় কবিতার খাতার শেষপাতা,—মলাট।

যা হোক, কবির সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর কবিতা। তা জীবনের প্রথমার্ধেই হোক, আর শেষার্ধেই হোক,—ওয়ারেন হেস্টিংস ও বড়মামা দুজনেই কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন। সুতরাং অনায়াসেই আমরা তাঁদের 'কবি' আখ্যা

দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু পাছে সমালোচকেরা সেগুলোকে নেহাত পদ্য বলে উড়িয়ে দেন, সেই ভয়ে সে চেষ্টায় আপাতত বিরত থাকতে হল। কারণ, তাতে বড়মামার কিছু হারাবার ভয় না থাকলেও হেস্টিংসের অপমান—কেননা, তিনি মানী ব্যক্তি। সুতরাং ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস যে বাস্তবিকই কবি ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁর কবিতাকে সর্বশেষে উপস্থিত করব। তার আগে বরং উল্লেখ করব স্পষ্টতর কয়টি উপসর্গের। শাস্ত্রসম্মত কবি-লক্ষণের।

প্রথম লক্ষণ, ওয়ারেন হেস্টিংস কাব্যামোদী ছিলেন। তিনি নিজে রাজ-কার্যের অবসরে কবিতা লিখতেন এবং পড়তেন। দ্বিতীয় লক্ষণ, হেস্টিংস ফুল, আকাশ, গাছপালা প্রভৃতি বা 'প্রকৃতি' ভালবাসতেন। প্রকৃতিপ্রেম

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দ্বিতীয়া পত্নী

চাট্টিখানি কথা নয়। সকলের তা আসে না। বড়মামার আসত। তিনি তরকারির বাগান করেছিলেন। কাছারি কামাই করে অনেক দিন তিনি মুলোক্ষেতে জল দিয়েছেন এবং সরষেফুলের বড়া তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল। তবে হেস্টিংস এ-ব্যাপারে তাঁর এককাঠি উপরে ছিলেন। তিনি শুধু নিজে বাগ-বাগিচার তদারক করতেন তাই নয়, একবার একটা গাছের শোকে একখানা দীর্ঘ পদ্যও লিখেছিলেন। গাছখানা ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে তিনি লাট বাহাদুরের মেজাজে ঝড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন, কিন্তু তার বদলে কবিতা দিয়ে প্রকৃতিকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। এতেও যদি প্রমাণিত না হয়ে গিয়ে থাকে যে, হেস্টিংস বাস্তবিকই কবি ছিলেন, তা হলে আমি আমার তৃতীয় এবং শেষ প্রমাণ উত্থাপন করব।

সেটি হচ্ছে এই যে, হেস্টিংস গরু ভালবাসতেন। তাঁর আলিপুরের বাড়িতে এক পাল গরু ছিল। হেস্টিংস নিজে লিখে গিয়েছেন যে, তারা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত। তাঁর সাড়া পেলেই লেজ তুলে ছুটে আসত। সাকুল্য ইংরেজকুলে হেস্টিংয়ের মত গো-ভক্ত দুর্লভ। বড়মামারও এক গোয়াল গরু ছিল। কারণ বড়মামা গাঁয়ে বাস করতেন এবং গরু যে উপকারী জীব তা তিনি হাড়ে হাড়ে জানতেন। কিন্তু হেস্টিংসের প্রেম আরও উঁচু, স্বার্থহীন। গরু উপকারী বা অবলা জীব বলে নয়, এদের "ভদ্র নম্র স্বভাব এবং নৈতিক চরিত্রের উচ্চমানের জন্য"ই নাকি তিনি গো-প্রেমিক ছিলেন। কবি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে কি এ-ধরনের প্রেম সম্ভব?

এবার কবি ওয়ারেন হেস্টিংসের কবিতায় আসা যাক। বড়মামাকে এখন অবশ্য আমাদের বিদেয় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবিতকালেই সেই খাতাগুলো দিয়ে ন'মামীমা উনুন ধরিয়েছেন। অবশ্য দ্বিতীয় মিসেস হেস্টিংসও ন'মামীমার চেয়ে কম ছিলেন না। তিনিও এক নম্বরের জর্নাল, চিঠিপত্র, হেস্টিংস সাহেবের মন ইত্যাদি যাবতীয় নশ্বর স্মৃতিকে এমনভাবে মুছে ফেলেছিলেন যে, হেস্টিংসের প্রথম বিয়ে বা তাঁর প্রথম দাম্পত্যজীবন ইতিহাসে এক গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

যা হোক, হেস্টিংসের সমগ্র কাব্যকৃতিকে আমরা ভাগ করতে পারি মোটামুটি তিন ভাগে। প্রথম ভাগ জুড়ে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মিসেস ইমহফ বা 'মারিয়ম বিবি'। দ্বিতীয় ভাগে স্বয়ং তিনি এবং তাঁর 'প্রিয়তমা মারিয়ম', তৃতীয় ভাগে তাঁর অন্নদাতা 'জন কোম্পানী', নয়ত অন্ন কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তকারীরা। যেমন—বার্ক। বড়মামার কবিতার কথা যতদূর মনে পড়ছে তাতে তাঁর নিজের বিষয়ে কোন কবিতা ছিল না। শুধু বড়মামী, আর কখনও কখনও শ্রীল শ্রীশ্রীযুত বাবু অমুকচন্দ্র বাহাদুর। অর্থাৎ বড়মামা যে-জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করতেন, তাঁর বন্দনা।

আগেই বলেছি, হেস্টিংসের কবিকর্মের প্রেরণা তাঁর মারিয়ম।

মারিয়মকে কলকাতায় থাকতে অনেক-কিছু দিয়েছিলেন তিনি—সুখ-সাগরের বাগানবাড়ি, গঙ্গায় ময়ূরপঙ্খী নাও, ডাঙায় পাল্কী, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ঘোড়া—কত কী! শেষে দিলেন একখানা কবিতার বই। সুন্দর চামড়ায় বাঁধানো হাতে-লেখা বই। কবি—স্বয়ং হেস্টিংস। উৎসর্গপত্রে হেস্টিংস দীর্ঘ পত্নীবন্দনা করে লিখেছেনঃ—

This Book replete with many a varied lay,
Which stream; though diverse, from one common source,
To thee, my Mariam seeks its destined course;
For it was from thee alone its glowing ray
My genius drew, that with resistless force
Impelled me first to sing, else mute, or hoarse..

কথাগুলো শুনতে মহাকবি কালিদাসের সরস্বতী-বন্দনার মত লাগলেও ঘটনাটা সত্য। মারিয়ম না থাকলে হেস্টিংসের কবিতা হত না।

মারিয়ম যখন চোখের সামনে, হেস্টিংস তখন শান্ত। মারিয়ম যখন চোখের আড়ালে হেস্টিংস তখন কবি। হয় চিঠি, নয় কবিতা। হেস্টিংসের

চিঠিগুলো পড়লে নেপোলিয়ানের কথা মনে পড়ে যায়। সেই অপ্রতিরোধ্য আবেগ। সেই কর্কশ কঠোর দিনপঞ্জী। চিঠির ফাঁকে ফাঁকে রাত জেগে জেগে কবিতা লিখতেন হেস্টিংস। প্রাতরাশের টেবিলে খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অতিথিদের তা পরিবেষণ করতেন। চার্টানর মত কেউ কেউ তার আগেই মুখ ধুয়ে ফেলতেন। কিন্তু তিনি ঘাবড়াতেন না। মারিয়ম আছেন শোনার জন্যে। একদিন মারিয়মকে একখানা কবিতা পাঠিয়েছেন। সঙ্গে চিঠি ঃ "যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে এই কবিতাটি পড় এবং পড়ার পরে আমার কবিকৃতিকে প্রশংসা কর (তোমার পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে আমি অবশ্য নিঃসন্দেহ) তবে তার কোন প্রয়োজন নেই। এটি পুড়িয়ে ফেলো। কারণ—কবিতা হিসাবে এর কোন মূল্য নেই।"

মারিয়ম তখন ইংলণ্ডে। ১৭৮৪ সনের কথা। কলকাতা থেকে পাল্কী চড়ে কাশী যাচ্ছিলেন হেস্টিংস। সঙ্গে সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে উইলকিন্সের 'মহাভারত'। মহাভারতের ইংরেজী সারানুবাদ। পড়তে পড়তে রুরু ও প্রেমদ্বরার উপাখ্যানটি ভাল লেগে গেল তাঁর। পাল্কী তখন পাটনায়। ওখানে বসে বসেই সেটি অবলম্বন করে একখানা দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন হেস্টিংস। সে কবিতা কাছাকাছি প্রথম ডাকে বিলেত গেল। তার শেষ ক'টি ছত্রে হেস্টিংস লিখছেন ঃ "মারিয়ম বিদেশের এই কাহিনীটি তোমাকে বললাম, কেন জান?"

"To me, and to my state, alike belong
The subject; and the moral of my song."

তখনও হেস্টিংসের বিচার আরম্ভ হয় নি। মিসেস বারওয়েল হেস্টিংসের প্রশংসা করে একখানা কবিতা লিখলেন। হেস্টিংস তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন কবিতায়। কবিতা যেন তাঁর স্বভাব হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে রঙ্গভূমে আবির্ভাব হয়েছে বার্ক। হেস্টিংস লিখলেনঃ—

"Oft have I wondered that, on Irish ground
No poisonous reptiles ever yet were found;
Revealed the secret stands, of Natures' work
She saved her venom, to create Burke!"

শত্রুপক্ষ পরাজিত হওয়ার পরে অ্যাবট নামে জনৈক শিল্পী একখানা প্রতিকৃতি আঁকেন হেস্টিংসের। ছবিখানা এত ভাল লেগে গেল তাঁর যে, তিনি উৎসাহভরে একখানা কবিতা লিখে ফেললেন। নিজের প্রশস্তিমূলক কবিতা! তার মোটামুটি মর্মার্থ ঃ এতকাল শত্রুরা ওয়ারেন হেস্টিংসকে এঁকেছেন যেন সে একটা রাক্ষস। তাঁর হাঁখানা এক কান থেকে আর এক কান অবধি বিস্তৃত। দাঁতগুলো বাঘ এবং নেকড়ের মত। চোখগুলো দেখলে মনে হয় যেন সব সময় ক্রুদ্ধ। চোখে তাঁর রক্তের তৃষ্ণা, লুঠের নেশা। তাঁর দিকে তাকালে লোকে কেঁপে ওঠে, মহিলারা মূর্ছা যায়।...কিন্তু এখন? এখন দেখুক এসে বার্ক এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা! কেমন 'মেটাফিজিক চোখ'—ইত্যাদি! এ কবিতায়ও মারিয়ম আছেন। কারণ মারিয়ম তাঁর এই চোখ দুটোকে বরাবর চিনতেন। তিনি তাঁর বন্ধু।

স্ত্রী এবং নিজের বিষয়ে ছাড়া হেস্টিংসের আর দুটো কবিতা উল্লেখযোগ্য।

একটা জন কোম্পানী নিয়ে। 'জন কোম্পানী' কী করে ব্যবসায়ী থেকে রাজত্ব লাভ করেছিল তার বিবরণ। অন্যটি কোম্পানী এবং তার সেবায়েত হিসেবে নিজের কথা নিয়ে। শেষবারের মত বিলেতের পথে জাহাজে বসে লেখা। হেস্টিংস এই কবিতাটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পরবর্তী গভর্নর সার্ জন শোরকে। তাতে তিনি নিজের মনের কথা বলেছেন। ক্লাইভ অনেকদিন বেঁচে ছিলেন—"to hate his envied lot." তিনি ততদিন বাঁচতে চান না। তবে যে ক'দিন বাঁচেন সে ক'দিন তিনি নিম্নোক্ত জিনিসগুলো পেতে চানঃ—

"A state above the fear of want
Domestic love, Heavens choicest grant—
Health, leisure, peace and ease."

এই তালিকায় 'কবিখ্যাতি' ছিল না। বড়মামাও কবি হিসাবে খ্যাতি চান নি। তবুও আজ হেস্টিংস সাহেবের কবিতা নিয়ে লিখলাম। কারণ সত্যিই দুর্ধর্ষ ওয়ারেন হেস্টিংস এক জায়গায় হলেও কবি ছিলেন। বড়মামা সম্পর্কেও আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও তাঁর কবিতা এড়িয়ে গেলাম। হাতে থাকলেও তাই করতে হত আমাকে। কারণ, বড়মামা নিতান্ত আটপৌরে গৃহস্থ মানুষ ছিলেন। সব গৃহস্থই কম-বেশী কবি। ওয়ারেন হেস্টিংস মামুলী গৃহস্থ ছিলেন না—তিনি ছিলেন ভারতের অধীশ্বর। ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর-জেনারেল। কবিতা লেখা গভর্নর-জেনারেলদের পেশা নয়। বিশেষত, ওয়ারেন হেস্টিংসের মত গভর্নর-জেনারেলের। তাই তাঁর পদ্যগুলো বড়মামার চেয়ে নিকৃষ্ট হলেও কবি হিসাবে তিনি নিশ্চয় বড়মামারও বড়। অন্তত, ইংরেজ ক্রিটিকেরা নিশ্চয়ই তা বলবেন।
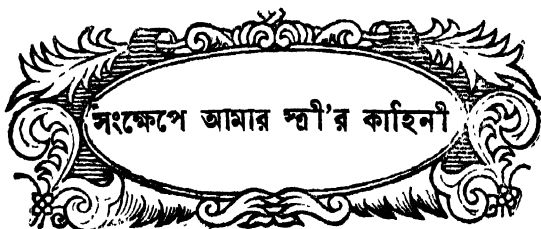
আমাকে আপনারা চিনবেন না। কারণ, নাম শুনে চিনবার মত কোন কেউকেটা আমি নই। সুতরাং আমার মা বাবার নাম কিংবা কবে কোথায় আমার জন্ম সে ফিরিস্তি দিয়েও লাভ নেই। এমন কি যদি বলি, আমি সেই ১৭৭৫ সালেরও আগে থেকে অনারএবল কোম্পানীর একজন কর্মচারী তাহলেও আপনারা আমায় চিনবেন কিনা সন্দেহ। যদিও শুনলে অবাক হয়ে যাবেন ১৭৭৬ সালের জুন মাস থেকেই আমি আপনাদের কলকাতার একজন বাসিন্দা।

মনে মনে ভাবছেন হয়তো, কলকাতায় তো কত লোকই ছিল, কত লোকই থাকে, তার মধ্যে তোমাকে চিনব কি করে সাহেব! কিন্তু বন্ধু, মিসেস গ্রাণ্ড একজন-ই ছিল তোমাদের শহরে। ওরা চিরকাল একটি দুটিই থাকে। তার বেশী নয়।

যদি বলি, আমি সেই মিসেস গ্রাণ্ড-এরই স্বামী মিঃ গ্রাণ্ড,—মিঃ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড, তাহলে নিশ্চয় তোমরা চিনতে পারছ আমাকে। শুধু তোমরা কেন, লণ্ডন-প্যারিসেও এমন লোক নেই এর পরও যাঁরা চিনতে না পারবেন এই হতভাগ্যকে।

নিজেকে হতভাগ্য বলছি কেন? সাধ করে বলছি না বন্ধু। অবশ্য এটা ঠিক, আজ আর আমি সেদিনের মত ভাগ্যহীন নই। কিন্তু তাহলেও কেন জানি না থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে বুকটা। তখন কি আমি জানতাম ক্যাথারিণ এমন করে চিরকাল পুড়িয়ে মারবে আমায়? ওর রূপের আগুনে একদিন এমনিভাবে ছাই হয়ে যাবে—আমার ইজ্জত। এমনকি চিরদিনের জন্যে কলুষিত হয়ে যাবে আমার নামটি পর্যন্ত।

তবে হ্যাঁ, রূপ ছিল মেয়েটার। নিজের মুখে নিজের স্ত্রীর রূপ বর্ণনা করতে চাই না আমি। যারা ওকে দেখেছে, আমারই মত যারা একদিন ওর রূপ-সাগরে হাবুডুবু খেয়েছে, তাদেরই কথাই শোন।

তোমাদের জুনিয়াস-এর মতে ও ছিল কলকাতার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। 'যেমনি দেহের গড়ন, তেমনি গায়ের রঙ। তার ওপর এক মাথা সোনালী চুল ছিল মিসেস গ্রাণ্ড-এর। দেখে মনে হত, যেন মর্তের মানবী নয়, স্বর্গের অপ্সরা।' রূপবিচারে প্যারিসের খুব খ্যাতি। ক্যাথারিণকে ওরা যখন দেখেছে সে তখন অনেককাল-ফুটে-থাকা ফুল। তার বয়েস ছত্রিশে পৌঁছে

গেছে। তাহলেও ওদের স্বীকার করতে হল যে, এতকাল যা প্রবাদের মত শুনে আসছে তারা আসলে তা প্রবাদ নয়, সত্য। 'সত্যই দেখবার মত চেহারা মিসেস গ্রাণ্ড-এর। ফুটফুটে নীল চোখে টানা টানা কালো ভুরু, ঘন পল্লব' এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত কবিতা করতে ভাল লাগে না আমার। কবিতা আমি করিওনি। প্রথম যেদিন দেখলাম ওকে, সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন সদ্য এসেছি কলকাতায়। হেস্টিংস-এর ওখানে থাকি। কাজ-কর্ম বিশেষ কিছু নেই। মনের আনন্দে লাট-বাহাদুরের সংগে ঘুরে বেড়াই। প্রতি সপ্তাহেই বেড়ানোর প্রোগ্রাম হত আমাদের। কখনও ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়ে আমরা যেতাম সুখসাগরে, ওঁর বাগান বাড়ীতে। কখনও ঘেরেটিতে। ঘেরেটিতে ছিল চন্দননগরের ফরাসী গভর্নরের বাড়ী। মহামান্য হেস্টিংস-এর সংগে খুবই বন্ধুত্ব ছিল ভদ্রলোকের। সেই সূত্রে কিছু কিছু আমার সংগেও। একদিন ওঁর ওখানেই ভোজের টেবিলে ক্যাথারিণের সংগে দেখা। সেটা ১৭৭৭ সালের কথা। আগেই বলেছি, কবিতা করতে ভালবাসি না আমি। মেয়েটাকে দেখে মনে ধরে গেল আমার। টেবিলেই জানা গেল—চন্দননগরের এক ফরাসী ভদ্রলোকের মেয়ে। নাম— Noel Catharine Werlee. হাই-কোর্টের জজেরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন এই নামখানা উচ্চারণ করতে। মিঃ হুইলার দুই দুইবার বলেছিলেন জাস্টিস হাইডকে—Put down a we, my Lord, put it down a we! আসলে বোধ হয় কথাটা হবে ভার্লে।

সে যাক। ক'পুরুষ আগে আমরাও ফরাসী দেশের লোক ছিলাম বটে, তবুও এসব ঝামেলায় না গিয়ে সোজা ক্যাথারিণ-ই বানিয়ে নিলাম ওকে। বললাম—ক্যাথারিণ, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

ক্যাথারিণ অসম্মত হল না। অর্থাৎ, মুখ ফুটে সেদিন কিছু বলল না। পরে শুনলাম—ও চায়, বিয়ের আগে আমি একটা কিছু ভাল কাজ-কর্ম জুটিয়ে নিই।

মাত্র এই সর্ত? তক্ষুনি ছুটে গেলাম বারওয়েল সাহেবের কাছে। বারওয়েল কাউন্সিলের একজন সদস্য। তখনকার কলকাতায় অন্যতম ক্ষমতা-বান লোক। তিনিও খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। মনের কথা অকপটে খুলে বললাম তাঁর কাছে। সব শুনে তিনি বললেন—ভেবো না বন্ধু, আমি তোমার ব্যবস্থা করছি।

সৈন্যবাহিনীর পে-মাস্টার-এর পদটা তখন খালি হওয়ার কথা। আমার হয়ে বারওয়েল হেস্টিংসকে অনুরোধ করলেন তার জন্যে। কিন্তু হেস্টিংস তার আগেই একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং এটা তাকেই দিতে হল। তবে আমাকেও নিরাশ করলেন না তিনি। একজনকে বরখাস্ত করে সল্ট কমিটির সেক্রেটারীর পদটিতে বসিয়ে দেওয়া হল আমাকে। সেই সংগে ওঁদের আনুকূল্যে আমি নিযুক্ত হলাম বোর্ড অব্ ট্রেডের হেড-এ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সেক্রেটারীর আপিসের একজামিনার। এক সংগে তিন তিনটে চাকরী! আমার রোজগার তখন মাসে তেরশ টাকার ওপর।

সুতরাং, এবার আর ক্যাথারিণকে পেতে বাধা কি? দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। ১৭৭৭ সালের ১০ই জুলাই ক্যাথারিণের হাত ধরে আমি বেরিয়ে এলাম চন্দননগরের গির্জা থেকে। আজ থেকে ক্যাথারিণ মিসেস গ্রাণ্ড! ওর বয়েস তখন পনের বছরের চেয়েও তিন মাস কম। আর আমার বয়েস? —বলব না। তোমরা, এ কালের লোকেরা হাসবে। তখন-ই কতজন হাসাহাসি করেছে আমাকে নিয়ে! ক্যাথারিণ নাকি আমার বাচ্চা-বউ, চাইল্ড-ওয়াইফ। মোটেই নাকি মানায়নি আমার সংগে। ফুঃ!

মাদাম গ্রাণ্ড

ক্যাথারিণের সংগে আমি মানিয়েছিলাম কিনা সে আমিই জানি। আর জানে সুপ্রিম কোর্টে যারা সাক্ষী দিয়েছিল তারা। সে কথা এখন থাক্।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। জুলাই-এর আগুনে কলকাতা গড়াতে গড়াতে এসে পেঁছাল ডিসেম্বরে। সেদিন ৮ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। বরাবরই সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে একটু বেড়াতে বের হই আমি। ক্যাথারিণ বাড়িতেই থাকে। ওর আয়ার সঙ্গে খেলে, নয়ত বই-পত্তর পড়ে।

সেদিনও ঠিক ন'টা বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম। বের হবার সময় আমি জানি, দুনিয়ার সবচাইতে সুখী লোক বোধ হয় আমি-ই। কিন্তু হায়, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে ঘণ্টা তিনেক পরে এমনি রিক্ত হয়ে ফিরতে হবে আমাকে?

না বন্ধু, সেদিন জুয়া খেলে হারিনি আমি। সত্য বটে, বারওয়েল-এর ওখানে নেমন্তন্ন ছিল আমার। তা সবাই জানে, প্রতি পনের দিন অন্তর বারওয়েল বন্ধুদের নিয়ে টার্ভার্ন-এ একটু আমোদ করে। কিন্তু সে নিছক খানাপিনা। তবুও সেই কাল ভোজে সর্বনাশ হয়ে গেল আমার।

ঘটনাটা খুলেই বলি। আমি তখন দিব্যি ভোজে মশগুল, এমন সময় হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে আমার এক ভৃত্য এসে হাজির।—কি ব্যাপার?

লোকটা আমার কানে কানে যা বলল, তা শুনে শিউরে উঠলাম আমি। মিঃ ফ্রান্সিস নাকি ধরা পড়েছেন আমাদের বাড়িতে! জমাদার আটকে রেখেছে তাঁকে।

পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে গেল আমার। সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল খাবার টেবিল, ভোজসভা সব। খানসামাকে বিদায় করে দিলাম। বললাম, জমাদারকে গিয়ে বল আমি আসছি।

পরক্ষণেই কাউকে কিছু না বলে উঠে পড়লাম। একজন বন্ধু বোধ হয় লক্ষ্য করছিলেন আমার ভাবান্তর। পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন তিনিও।

বাইরে এসে সব কথা খুলে বললাম তাঁকে। কিন্তু ফ্রান্সিসের কথা শোনা মাত্র তিনি পিছু হটলেন! ফিলিপ ফ্রান্সিস কলকাতার দ্বিতীয় ক্ষমতাবান পুরুষ! গভর্নর হেস্টিংস-এর পরেই কাউন্সিলে তাঁর আসন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করতে যে সবাই রাজি হবে না সে তো জানা কথা।

বাধ্য হয়েই পথে মেজর পামার-এর বাড়িতে থামতে হল একবার। পামার গভর্নর বাহাদুরের মিলিটারী-সেক্রেটারী এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে একটা তলোয়ার চেয়ে নিলাম।—আর নিলাম তাঁকে। মনে মনে আমার সঙ্কল্প, বাড়ি গিয়ে আজ ফ্রান্সিসের সঙ্গে যা হোক বোঝাপড়া করব একটা। আগামীকাল থেকে এ শহরে হয় ফিলিপ ফ্রান্সিস থাকবে, না হয় থাকবে মিঃ গ্রাণ্ড! দু'জনের একজনকে এ দুনিয়ার মায়া ছাড়তেই হবে আজ।

কিন্তু এ কি? পামার আর আমি বাড়ি ঢুকে দেখি ফ্রান্সিস নেই। বৈঠকখানায় জমাদার আটকে রেখেছে যাঁদের তাঁদের সবাইকে আমি চিনি। কই, ফিলিপ ফ্রান্সিস তো নেই এঁদের মধ্যে?

জমাদার বললেঃ হুজুর, সে সাহেব পালিয়েছে। আপনার জন্যে আমি তাঁকে আটকে রেখেছিলাম ঠিক-ই। কিন্তু সাহেব হঠাৎ হুইসেল বাজিয়ে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে এই তিন সাহেব এসে হাজির। তারপর সে কি ধস্তাধস্তি। ধস্তাধস্তির এক ফাঁকে পালিয়ে গেলেন ফ্রান্সিস

সাহেব। বাধ্য হয়ে তাই এঁদেরই আটকে রেখেছি হুজুরের জন্যে।

জমাদার যাঁদের আটকে রেখেছে তাঁরাও সবাই নামজাদা লোক। মিঃ জর্জ সী, মিঃ শোর আর মিঃ আর্কডেকিন! প্রথম দু'জন পরবর্তীকালে 'স্যর্' খেতাবও পেয়েছিলেন।

যাহোক, একে একে তিনজনকেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কি সত্য? তিনজনই আবোলতাবোল কৈফিয়ৎ দিলেন। তাঁরা নাকি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ নাকি শুনতে পেলেন যে, ফিলিপ ফ্রান্সিস খুন হয়ে যাচ্ছে আমার বাড়িতে! তাই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তাঁরা ঢুকে পড়েছেন। ইত্যাদি।

আমি ওঁদের ছেড়ে দিলাম। যদিও বুঝতে আমার বাকী রইল না যে, ওঁরাও সে দুর্বৃত্তের সহচর। রাগে অপমানে শরীর কাঁপতে লাগল আমার। ইচ্ছেও হল না একবার উঁকি দিই ভিতর-বাড়িতে। পামারের সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। অবশিষ্ট রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম একটা চেয়ারে বসেই। বসে বসে আমার শুধু এক চিন্তা, কখন ভোর হবে। কতক্ষণে শত্রুর সঙ্গে মোলাকাত হবে।

অবশেষে সেই সর্বনাশা রাত্রি ভোর হল। সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের কাছে চিঠি পাঠালাম আমি। লিখলাম, "গত রাত্রে আমাকে যে ভাবে তুমি অসম্মান করেছ তাতে বাধ্য হয়েই আমাকে আজ ইজ্জতের নামে তোমাকে আহ্বান জানাতে হচ্ছে। আমার মনে হয় তোমার এই নীতিবিগর্হিত আচরণের পরও তোমার দেহে এখনও এক আধ ফোঁটা হলেও আত্মসম্মান অবশিষ্ট আছে। যদি সত্যিই তা থেকে থাকে, তবে নিশ্চয় আজ সকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হবে না তুমি। কখন, কোথায় বা কি অস্ত্রসহ আমাদের দেখা হবে তা স্থির করার অধিকার তোমার ওপরই রইল।"

শুনলে অবাক হয়ে যাবে, সে কাপুরুষ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না। উত্তরে সে আমাকে জানালে, সে বুঝতে পারছে না আমি হঠাৎ কেন তার ওপর এমনি চটে গেছি। বোধ হয় এটা আমার কোন ভুল বোঝাবুঝির ফল। ইত্যাদি।

পুরুষকার কাপুরুষকে ক্ষমা করে শুনেছি। কিন্তু ফ্রান্সিসকে ক্ষমা করতে পারলাম না। যেমন করে হোক, প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে।

কিন্তু তার আগে বিদেয় করতে হবে ক্যাথারিণকে।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসেই চন্দননগরে লোক পাঠালাম ওর বোন আর ভগ্নীপতিকে নিয়ে আসবার জন্যে। ওরা না আসা অবধি নীচতলাতেই বসে রইলাম আমি। ক্যাথ্যারিণ ওপরে।

ওঁরা এলেন। ঠিক হল, আগামী রোববার ক্যাথারিণকে নিয়ে যাবেন ওঁরা। আমি-ই আপাতত জুগিয়ে যাব তার মাসোহারা।

যাওয়ার আগে ক্যাথারিণ বলে পাঠাল, সে একবার দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। কিছুতেই 'না' বলতে পারলাম না আমি। সত্যিই তো. ওর দোষ কি! মাত্র বছর ষোল বয়েস! পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের কি বুঝবে এইটুকু মেয়ে!

তিন ঘণ্টা সেদিন একসঙ্গে ছিলাম আমরা। ক্যাথারিণ অনেক কাঁদল। আমিও কাঁদলাম। তারপর দু'জনে বিদায় নিলাম দু'জনের কাছ থেকে।

এবার আমার প্রতিশোধের পালা। যথাসময়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ডাক পড়ল ফিলিপ ফ্রান্সিসের। সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হল জর্জ সীদেরও। আমার তরফ থেকে প্রধান সাক্ষী আমার ভৃত্যকুল। রামবক্স জমাদার, মিনকী আয়া, রেজাউল্লা দারোয়ান, ভবানী হরকরা প্রভৃতি।

ওরা কে কি বলেছিল সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তা শুনতে হলে তোমাদের কোর্টের পুরানো কাগজপত্তর ঘাঁটতে হবে। হাইকোর্টে সে সব নথিপত্র আজও রয়েছে। উপস্থিত সংক্ষেপে সে রাত্তিরের ঘটনাটাই আমি বলি।

রাতটা ছিল চাঁদনী রাত। আমি বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই চাকরদের হঠাৎ নজরে পড়ল আমার বাড়ীর দেওয়ালে একখানা মৈ। চাকরেরা ভাবল—তাই তো, এ সময়ে হঠাৎ এখানে মৈ এল কি করে?

জর্জ সী আদালতে নিজে স্বীকার করেছে যে, এই মৈখানা ফ্রান্সিসের অনুরোধে সে নিজে তদারকি করে তৈরি করেছে। এবং এটি তৈরি হয়েছে তাঁর বাড়ীতেই। সে আরও বলেছে যে, ফ্রান্সিস যখন সেদিন রাতে এই মৈখানা নিয়ে তার বাড়ী থেকে বের হয় তখন সে বাড়ীতেই ছিল। রাত তখন দশটা হবে। এমন সময় নাকি হঠাৎ ফ্রান্সিস এসে হাজির। ক'দিন আগেই তিনি একপ্রস্থ কালো পোষাক রেখে গিয়েছিলেন ওখানে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এবার তাই পরলেন। তারপর মৈখানা হাতে করে চললেন রাস্তার দিকে।

সী জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছেন সার্?

ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন—মিসেস গ্রাণ্ড-এর সঙ্গে একটু দেখা করতে।

সী চমকে উঠল। প্রতিবেশী হিসাবে সে জানে—মিঃ গ্রাণ্ড এখন বাইরে। তা ছাড়া এখন বলতে গেলে প্রায় মাঝরাত্তির। এমন সময়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতেতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা! তবুও ফ্রান্সিসকে কিছু বলতে সাহস পেল না সে।

আদালত প্রশ্ন করল—কেন?

সী উত্তর দিল—মাই লর্ড্স, ফ্রান্সিস আমার চেয়ে অনেক বড় মানুষ—A big man.

যাহোক, এদিকে মৈ দেখে চাকরেরা ভাবল নিশ্চয় কোন চোর ঢুকে পড়েছে বাড়ীতে। মৈখানা সরিয়ে রেখে তারা দল বেঁধে আড়ি পেতে রইল চোর কখন বের হয় তারই অপেক্ষায়।

ইতিমধ্যে নেপথ্যে অভিনীত হল আর এক নাটক। আয়ার মুখে আদালত শুনলেন সে কাহিনীও। মিনকী আয়া সেদিনও বরাবরের মত ক্যাথারিণের কাছে বসে পান চিবোচ্ছিল। হঠাৎ ক্যাথারিণ নাকি তাকে বলল—আয়া, নীচ থেকে একটা গোটা মোমবাতি নিয়ে এসো তো! মিনকী নীচে নেমে গেল। ফিরে এসে দেখে মেমসাহেবের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।—'মেম সাহেব! মেম সাহেব!'—দু'বার ডাকল সে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। আয়া ভাবল মাঈজী হয়ত রাগ করেছেন তার ওপর। ক্যাথারিণ চিরকালই একটু অভিমানী। অবশ্য বেশিক্ষণ রাগ থাকত না তার। আয়া সেটা জানত। তাই সে আর দরজা ধাক্কাধাক্কি না করে চলে এল নীচে।

নীচে তখন চাকরেরা ওত পেতে আছে চোর ধরার জন্যে। কিন্তু এ চোর

নয়, ডাকাত। কালো পোষাকে এগিয়ে এলেন ফ্রান্সিস।—কৈ, আমার মৈ কোথায়? যেন তাঁর মৈ এগিয়ে দেওয়ার জন্যেই আমি মাইনে দিয়ে লোক রেখেছি বাড়ীতে। খপ করে জমাদার হাতটি ধরে ফেলল তাঁর। ফ্রান্সিস ধমক লাগালেন—জান আমি কে?

জমাদার বললে—জানি হজুর। আপ ফ্রান্সিস সাহেব। ওঁর গলা শুনেই জমাদার চিনে ফেলেছিল ওঁকে। তাছাড়া চাঁদের আলোতে কালো পোষাকেও ফ্রান্সিসের চেহারাটা গোপন ছিল না আর। জমাদার বললে—'সাহেব বাড়ী না-আসা অবধি আপনাকে এখানে থাকতে হবে হজুর।'

ফ্রান্সিস বেগতিক দেখলেন। তিনি পকেট থেকে মুঠো-ভরা মোহর বের করলেন। হাম তুম লোগকো বড়া কর দ্যেগা। হিন্দুস্তানী ঘুষ বের হল জুনিয়াসের গলা দিয়ে। কিন্তু জমাদার নাছোড়বান্দা।

এদিকে ঝি তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব। সে ছুটে গেল ওপরে।—'মেম সাহেব, মেম সাহেব,—নীচে যে এক সাহেবকে মেরে ফেলল ওরা!' এবার দরজা খুলল ক্যাথারিণ। উপরের বারান্দা থেকে-ই উঁকি দিল উঠানে। চাকরেরা তখন ফ্রান্সিসকে নিয়ে টানতে টানতে চলেছে বৈঠকখানার দিকে। যেতে যেতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্যাথারিণকে কি যেন বললেন ফ্রান্সিস সাহেব। ক্যাথারিণও কি যেন বলল ওপর থেকে। সাক্ষীরা সবাই বলেছে—ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তখন তার একবর্ণও বুঝতে পারেনি তারা। কারণ সে কথা ইংরেজীতে হয়নি।

বাধ্য হয়ে আমার বৈঠকখানায় বন্দী হতে হল ফ্রান্সিসকে। জমাদার একটা চেয়ার দিল তাঁকে বসতে। এমন সময় ক্যাথারিণ নাকি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। এসে হিন্দুস্তানীতে আদেশ দিল—'জমাদার, ছোড় দো! সাহেবকে ছোড় দো!'

কিন্তু পাপের গন্ধ পেয়েছে হিন্দুস্তানী জমাদার। সে বলল—'মেম সাহেব, আজ আমি আপনার কথা শুনব না। সাহেবের জন্যে আদমি ভেজিয়ে দিচ্ছি। তিনি আসুন; তারপর যা হয় হবে।—আপ আভি আপকা ঘরমে যাইয়ে।'

ক্যাথারিণ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজিয়ে উঠলেন ফ্রান্সিস এবং দেখতে দেখতে এসে হাজির হল—সী এবং তার অনুগতের দল।

বিচারকরা ধৈর্য ধরে আনুপূর্বিক শুনলেন সব কাহিনী। তারপর ১৭৭৯ সালের ৬ই মার্চ, শনিবার বের হল তাদের সুচিন্তিত রায়। পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে—ফিলিপ ফ্রান্সিসকে। ইম্পেকে শুধরে দিলেন—জাস্টিস হাইড ঃ টাকা নয়, সিক্কা টাকা বল ভাই, সিক্কা টাকা।—'Siccas, Brother Impey, Siccas!'

বন্ধুর কাজই করলেন তিনি আমার জন্যে। সিক্কা টাকার চেয়ে চলতি টাকার দাম তখনকার বাজারে শতকরা এগার ভাগ কম। সুতরাং পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা পাওয়া মানে—আমি পাব পাঁচ হাজার একশ' নয় পাউন্ড, দুই শিলিং, এগার পেন্স!

এবার আমাকে আর পায় কে? ফ্রান্সিস বাধ্য ছেলের মত সে টাকা গুনে দিলেন আমার হাতে। খোঁজ নিলে দেখবেন হাইকোর্টের ভান্ডারে

আজও রক্ষিত আছে সেই পাপের খেসারতের রসিদটি।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। বিচারকদের একজন, মাননীয় বিচারপতি চেম্বার্স সাহেব তুলেও ছিলেন সেই প্রশ্নটা। আমি টাকা পেলাম সত্য, কিন্তু যে অপরাধের দাম হিসাবে তা পেলাম সত্যিই কি তেমন কিছু সে রাত্তিরে ঘটেছিল আমার বাড়ীতে? সত্যিই কি ফ্রান্সিস ঢুকতে সমর্থ হয়েছিল ক্যাথারিণের ঘরে? চেম্বার্স বলেছেন—তিনি মনে করেন না সাক্ষীদের বিবরণে এ ধরণের কিছু প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু আমাকে যে নিজে বলেছে ক্যাথারিণ। আমি আগেই বলেছি—বিদেয় নেওয়ার আগে ক্যাথারিণ ঘণ্টা তিনেক ছিল আমার কাছে। সে-সময় অকপটে সে আমার কাছে নিজের মুখে বিবৃত করেছে সেই পাপ কাহিনী। আমি তখন নির্বোধ বালিকাকে ক্ষমা করেছিলাম!

কিন্তু আদালতে এসে বুঝতে পারলাম—নির্বোধ আমি নিজে। চেম্বার্স বলেছেন—তিনি মনে করেন না যে, সে রাত্রিতে যদি অবাঞ্ছিত কিছু ঘটেও থাকে আমার বাড়ীতে, তবে আগে থেকেই তার সঙ্গে কোন যোগসাজস ছিল মিসেস গ্রাণ্ড-এর।

আমিই কি সে রকম মনে করেছিলাম কিছু? কিন্তু মিঃ সী যে চোখ খুলে দিল আমার। আদালতে সে বলেছে—ফ্রান্সিস যে গোড়া থেকেই মিসেস গ্রাণ্ড-এর অনুরক্ত তা সে জানত। অনেকবার তাদের একসঙ্গে ভোজসভাদিতে দেখেছে সে। কখনও ওরা নীচু গলায় কথা বলছে, কখনও হাসছে। একবার দু'জনে একসঙ্গে নাকি নেচেছেও।

কিন্তু কৈ ক্যাথারিণ তো কোনদিন নাচেনি আমার সঙ্গে! তবে কি ওদের কথাই ঠিক? তবে কি সত্যিই ক্যাথারিণের কাছেও 'বুড়ো' ছিলাম আমি? ওর চোখেও কি সত্যিই অতিরিক্ত মোটা মনে হত আমাকে? সত্য বটে, ফ্রান্সিসের সঙ্গে তুলনা হয় না আমার। ও তখন মোটে আটত্রিশ বছরের ছোকরা। বড় ঘরের ছেলে। সুশ্রী চেহারা। পদমর্যাদায়ও অনেক বড় আমার চেয়ে। বিলেতেও নাকি বাছা বাছা মেয়েরা খাতির করত ওকে। তাছাড়া, গড়গড় করে ফরাসী বলতে পারত লোকটা। ক্যাথারিণের মাতৃভাষাও ফ্রেঞ্চ। সুতরাং হতেও পারে মিঃ সীদের অনুমান-ই সত্য। ক্যাথারিণ-ই হয়ত সেই রাতে শয়তানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার ঘরে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে এ ঘটনার ক'দিন আগেই ক্যাথারিণ বল-নাচ উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিল মিঃ ফ্রান্সিসের বাড়ী। এবং সেদিনও নাকি মিঃ সী কথা বলতে দেখেছে ওদের দু'জনকে।

ফ্রান্সিস অবশ্য কখনও স্বীকার করেনি গোপনে এই ভিন্ন মানুষের হৃদয় নিয়ে খেলার কথা। পড়ন্ত বয়সে তাঁর স্ত্রীর কাছে বরাবরই নাকি সে বলত যে—আমি হচ্ছি মিসেস গ্রাণ্ডের একজন বিফল প্রণয়ী। তাঁকে মনে মনে চেয়েছি অনেকদিন, কিন্তু পাইনি কোনদিন।

যেমন জায়গা, তেমন কৈফিয়ত। এ ছাড়া নিজের বিবাহিত স্ত্রীর কাছে কি-ই বা কৈফিয়ত দিতে পারে বেচারা! কিন্তু ওর ডাইরী খুলুন, দেখবেন—তাতে ফরাসী ভাষায় লেখা আছে দিনের পর দিন ওঁর অভিসারের কথা।

জরিমানার টাকা নিয়ে আমি তো চলে গেলাম পাটনায়। গিয়ে কোম্পানীর

চাকরীর সঙ্গে ধরলাম নীলের চাষ। কর্ণওয়ালিশ গোলমাল না করলে হয়ত একদিন বিহারের নীল-রাজা হয়ে যেতাম আমি।—সে সব থাক্। এদিকে চলে যাওয়ার পর আমার স্ত্রীর কি হল সে-কথাই বলি।

আমি চলে যাওয়ার পর ক্যাথারিণ স্বাধীন হয়ে গেল। যাওয়ার আগে ডিভোর্স করে গেলাম না বটে, কিন্তু সে জানে, আইনে না ছাড়লেও মনে আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি ডিসেম্বরের সেই রাতে-ই। লোকনিন্দার ভয়ে মাস তিনেক চুপচাপ ছিল ওরা। ইতিমধ্যে শুরু হল ইংরেজ-ফরাসীতে যুদ্ধ। তাতে তছনছ হয়ে গেল—চন্দননগরে ওর বাপের বাড়ির সংসার। বাপ চলে গেলেন বালাসোরে। ভগ্নিপতি ইংরেজের বন্দী হিসেবে এলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি জেলে।

সুতরাং, ফ্রান্সিসের এই সুযোগ। সে ক্যাথারিণকে নিয়ে গেল হুগলীতে। তার বাগান-বাড়িতে। কলকাতা থেকে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তার সেখানে। বলতে গেলে—ছুটির দিনগুলো সে সবই প্রায় কাটাত সেখানে। তবুও কিনা লোকটা বলে—সে ক্যাথারিণের বিফল প্রণয়ী!

অবশ্য এটাও ঠিক যে ক্যাথারিণ চিরকাল আটকা পড়ে থাকেনি ওর হাতে। ক্যাথারিণের মত মেয়েরা কোনকালে তা থাকে না।

১৭৮০ সালের ডিসেম্বরে হুগলী থেকেই একটা ডাচ জাহাজে পাড়ি দিল সে বিলেতে। লোকে বলে, জাহাজে ওর সঙ্গী ছিল ওয়াটারপ্রুফের আবিষ্কারক বিখ্যাত মেকিনটস সাহেবের পুত্র—উইলিয়াম মেকিনটস। কিন্তু আমি পাকা মুখে শুনেছি তা সত্য নয়। যাঁর সঙ্গে ক্যাথারিণ সাময়িকভাবে জুড়ে দিয়েছিল তার ভাগ্যকে—তিনি মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের একটি তরুণ কর্মচারী। নাম তাঁর—মিঃ টমাস লিউন। কিছুদিন তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে কাটিয়ে, তাঁকে নিয়েই অবশেষে ক্যাথারিণ এসে ঠেকল—প্যারিস-এ।

অবশ্য তার পেছনে পেছনে সে-মাসেই ফ্রান্সিসও এসে হাজির হয়েছিল বিলেতে। কিন্তু ক্যাথারিণ নাকি আর বিশেষ পাত্তা দেয়নি ওকে। এমন কি প্যারিস-এ চলে যাওয়ার পরও ফ্রান্সিস নাকি চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে, সে তাকে নিয়মিত মাসোহারা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ক্যাথারিণ নাকি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে সে প্রস্তাব।—করবে না? নতুন বন্দরের সন্ধান পেয়েছে যে তখন ক্যাথারিণ। ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিকর্তা নেপোলিয়নের অন্যতম সহচর মঁসিয়ে তালেরাঁ (Talleyrand) তখন তার সেবায়েত।

প্যারিসে তখন সবাই জানে মঁসিয়ে তালেরাঁ সম্রাটের পররাষ্ট্র-সচিব বটে, কিন্তু তাঁর নিজের ঘরের স্বরাষ্ট্র-সচিব যিনি, তিনি মিসেস গ্রাণ্ড। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতদের আদর-আপ্যায়ন অভ্যর্থনা সব করেন তিনি। শোনা যায়, রাষ্ট্র-দূতরা সেইজন্যে নাকি খুঁত খুঁত করতেন মঁসিয়ের বাড়ি যেতে। হাজার হোক, মহিলাটি তো আর ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী নয়।

কথাটা ক্রমে সম্রাটেরও কানে গেল। তিনি তালেরাঁকে বললেন—একি কথা শুনতে পাচ্ছি মঁসিয়ে! তুমি নাকি তোমার মিস্ট্রেসকে দিয়ে রাজকর্তব্য সম্পাদন করাচ্ছ আজকাল?

তালেরাঁ বললেন—আচ্ছা সম্রাট, এবার থেকে আমার স্ত্রীকে দিয়েই তা করাব।

বাধ্য হয়ে তালেরাঁকে বিয়ে করতে হল ক্যাথারিণকে। সেটা ১৮০২ সালের কথা।

সে বছর আমিও প্যারিসে। মীর্জা আবু তালেব খান আপনাদের হয়ত বলেছেন ডিভোর্সের খরচা হিসেবে আমি নাকি আশী হাজার ফ্রাংক ঘুষ পেয়েছিলাম প্যারিসে! তালেব সাহেব বরাবরই কুৎসা রটায় আমার নামে। আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না যেন। ক্যাথারিণকে কুমারী বানাবার খরচা হিসেবে আমি যা পেয়েছিলাম সেদিন—সে একটা চাকরী। নগদ ফ্রাঙ্ক নয়।

মিথ্যে বলব না, চাকরীটা দরকার ছিল আমার। কর্ণওয়ালিশ কিছুতেই টিঁকতে দিল না আমাকে পাটনায়। বাধ্য হয়ে তাই ১৭৯৯ সালেই ভারতবর্ষ ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হল বিলেত। বোর্ড অব ডাইরেক্টারের কাছে দরবার করলাম। কিন্তু তাতেও সুবিধে হল না কিছু। শেষে প্যারিসে এসে দেখি এই ব্যাপার।

ইম্পের ছেলে লিখেছেন প্যারিসে ক্যাথারিণের সঙ্গে আমার নাকি দেখা হয়েছিল। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। আমার সঙ্গে তো হয়-ই নি, এমন কি ফ্রান্সিসের সঙ্গেও না। ক'বছর আগে, ১৭৮২ সালে ফ্রান্সিসও একবার এসেছিল এখানে। কিন্তু ক্যাথারিণ নাকি ওকে বিশেষ করে অনুরোধ করে এখানে আর ওর সঙ্গে দেখা না করতে। তবে পুরানো বন্ধুত্বকে অস্বীকার করেনি সে। ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে একগাদা বই নাকি উপহার দিয়েছিল তাঁকে। আমাকেও দিয়েছিল। বেইমানী করব না, আমার উত্তমাশা অন্তরীপের এই নতুন চাকরীটি ওর-ই দান। মাদাম দ্য তালেরাঁর অনুরোধপত্র পেয়েই না বাটাভিয়ান রিপাবলিক এত বড় একটা পদ দিয়ে এই আফ্রিকায় পাঠিয়েছে আমাকে। নয়ত এই বুড়ো বয়সে কি যে গতি হত আমার, ভেবে পাই না।

ক্যাথারিণের কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কম দেয়নি মেয়েটা। কলকাতায় দিয়েছিল নগদ পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা। আজ আবার দিলে এই চাকরী।

মনের মত চাকরী। খাই-দাই ঘুমাই। মাসের শেষে হাতভরা মাইনে পাই। আজ আমি সত্যিই সুখী মানুষ। বোম্বাইয়ের সার্ জেমস ম্যাকিনটস দিন কয়েক আগে নেমেছিলেন আমার এখানে। তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন—আমার দ্বিতীয় স্ত্রীটি সত্যিই খুব ভাল।

প্রশ্নমালা

ওহে বাঙালী পাঠক, তোমার কাছে এই গল্পের মর্যাল কি?

(উঃ—শ্রীপান্থ-কৃত 'ক্যাথারিণ ভাষ্য' দ্রষ্টব্য)

[মৃত্যুর পর ক্যাথারিণের জবানবন্দী হইতে]

বুড়োটার কথা তোমরা নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে পড়েছ। পড়েও যদি কিছু না বুঝে থাক, তবে আমার কিছু করবার নেই।

ওর প্রতি আমার করুণা হয়। কেন জান? ও একটা আস্ত আহাম্মুক। নয়ত, বই ছাপিয়ে কেউ কি কখনও বলে যে আমি মোটা, আমি বুড়ো—আমার জুয়া খেলার অভ্যেস ছিল,—রোজ রাত্তিরে আমি বাড়ি থেকে নৈশ ভ্রমণে বের

হতাম, আমার আচার ব্যবহার ভাল ছিল না, আবু তালেব আমাকে যা-তা বলেছে—ইত্যাদি! কি বলতে বাকী রেখেছে লোকটা? পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকার লোভটা পর্যন্ত গোপন করতে পারল না তোমাদের কাছে! ছিঃ, অমন চাকরী ত কতজনকেই দিয়েছি আমি, কিন্তু কৈ! কেউ ত এমন করে আমার স্তুতি করতে বসেনি কোনদিন! আচ্ছা, তাও না হয় করলে। কিন্তু কবরের মুখে এই আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করার গল্পটাও কি গর্ব করে বলার মত?

তোমরা হয়ত ভাবছ—লোকটা খুব সরল। তাই কোন কথা পেটে রাখতে পারেনি। কিন্তু তাই কি?

কৈ, মহামান্য হেস্টিংস বাহাদুর সম্পর্কে তো একটি কথাও লেখেনি সে। অথচ মিসেস হেস্টিংস যখন মিসেস ইমহফ তখনও সে চিনত ওদের। কলকাতায় কে না জানে সেই কেলেঙ্কারীর কথা? ব্যারণ ইমহফ সাহেব এলেন আর তার স্ত্রীকে হেস্টিংস-এর হাতে তুলে দিয়ে বাড়ী চলে গেলেন—এতই কি আটপৌরে কাহিনী সেটা? থাক্, ও নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। কারণ সে পুরানো কাহিনী।

কিন্তু বারওয়েলকে ছাড়ব না আমি। গ্রাণ্ড ছেড়েছে। কারণ ওর দুনিয়াতে একটা চাকরী বা কিছু টাকা অথবা বড় মানুষের একমুখ হাসিই বড়। কিন্তু আমাদের, মেয়েদের এত সহজে ভুললে চলে না। বারওয়েল যখন বদান্যতা দেখিয়ে চাকরী দিয়েছিল ওঁকে -- তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার। কারণ, আমি চন্দননগরের মেয়ে হলেও কলকাতার খবর রাখতাম কিছু কিছু। আমি জানতাম—ক্লাইভের মত মানুষও কি বলে গেছে ওঁকে।

"The only qualification of Mr. Barwell I know of is that he is a good seducer of friends' wives."

এরপর যখন গ্রাণ্ড আমাকে নিয়ে তুলল—তাঁরই বাগান-বাড়িতে তখন আমার মানসিক অবস্থা কি হওয়া সম্ভব বুঝতেই পার। এ বাড়িটাতে আমার বিয়ের ক'বছর আগে কি ঘটে গেছে তা যদি শোন তবেই বুঝতে পারবে—সেদিন কেন এমন ভেঙে পড়েছিলাম আমি।

১৭৬৯ সালের কথা। কোম্পানীর নৌ-বহরে এক সহকারী ক্যাপ্টেন ছিলেন। নাম তার মিঃ হেনরী এফ, থমসন। ভদ্রলোক ছুটিতে দেশে গিয়ে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলেন। মেয়েটির নাম সারা বোনার।

কত লোকই তো ভালবাসে। কিন্তু থমসনের মত কম লোক। থমসন কিছুতেই সারাকে রেখে আর ইণ্ডিয়ায় আসবেন না। অথচ হাতে এমন সময় নেই যে বিয়ে করেন। কলকাতায় বন্ধুদের লিখে দিলেন যে, তোমরা শুনলে সুখী হবে যে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছি। সে পরের জাহাজে আসছে।

থমসন কলকাতায় এসে নামলেন। সে কি খাতির তাঁর! দেখতে দেখতে তাঁর পদোন্নতি হয়ে গেল। এবং তা হল বলতে গেলে শুধু এই পরহিতৈষী বারওয়েল সাহেবেরই চেষ্টায়।

সারা কলকাতায় নামবার সঙ্গে সঙ্গে বারওয়েল ওদের নিজের একখানা বাড়ি ছেড়ে দিলেন। ওরা পরমানন্দে সংসার শুরু করলে সে বাড়িতে। বারওয়েল-এর অতিথি তারা। সুতরাং খোঁজ-খবর নিতে নিয়মিতভাবে যাওয়া-

আসা করেন তিনি। তাঁর আন্তরিকতায় থমসন মুগ্ধ।

দিন যায়। হঠাৎ শোনা গেল থমসনকে বহরমপুরে চলে যেতে হবে। মিঃ বারওয়েল সেখানে একটা মস্ত চাকরীর ব্যবস্থা করেছেন তাঁর। থমসন নাচতে নাচতে চলে গেলেন। বারওয়েল বললেন—তুমি ভেবো না ভাই, আমি তো রয়েছি, তোমার সংসারের দায়িত্ব আমার ওপর রইল।

এদিকে সহসা এক ওলট-পালট ব্যাপার ঘটে গেল। স্বয়ং বারওয়েল-ই বদলী হয়ে গেলেন বহরমপুরে। ঠিক বহরমপুরে নয়, তার থেকে মাইল সাতেক দূরে—মতিঝিল-এ। তিনি আব্দার ধরলেন—থমসনকেও আমার এখানেই ট্রান্সফার করা হোক। কিন্তু কেন জানি না, কর্তৃপক্ষ উল্টো চাল চাললেন। তাঁরা থমসনকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

থমসন আর সারা এখন কলকাতায়। থমসনের কেন যেন মনে হয় সারা আর আগেকার মত নেই। সারার আচার-ব্যবহার যেন এখন কেমন-কেমন। সবাই ত আর মিঃ গ্রান্ড নয়। থমসন ভাবতে বসল—কি হল মেয়েটার! কেন, মাত্র এই ক'বছরেই এমন হয়ে গেল সারা!

পিয়ন এসে সেলাম করে একটা চিঠি দিল মিঃ থমসনের হাতে। ওপরে নাম লেখা মিঃ কার্টারের। কার্টার পাশেই থাকেন। সেও বারওয়েল-এর আশ্রিত। কি জানি কি মনে করে—চিঠিটা খুলে ফেললেন থমসন। সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল সারার সমস্ত ব্যাধির কারণ।

বারওয়েল-এর চিঠি।—

'You do my affections great wrong, and your own beauties great injustice; look in your glass, it will convince you, you have charms capable of warming old age, can a young man be indifferent to them? I love you, I wish you were with me and your husband at a distance.' ইত্যাদি, চিঠির পর চিঠি। বোঝা গেল—অনেকদিন বন্ধুকৃত্য করে ফেলেছেন বারওয়েল। কিন্তু তাহলেও সারাকে কিছু বললেন না—থমসন। মিঃ গ্রান্ডের মত ছুটে গেলেন না আদালতে। সারাকে ডেকে বললেন—তোমাকে দেশে চলে যেতে হবে সারা। এখানে আর নয়।

সারা দেশে যাবে। সব ঠিক। এমন সময় এসে হাজির মিঃ বারওয়েল। তাঁর পদোন্নতি হয়ে গেছে। এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবেন তিনি। সুতরাং সারা দেশে যাবে কোন্ দুঃখে! উল্টে বারওয়েল এবার দেশ ছেড়ে যেতে হুকুম দিলেন থমসনকে।

বে-সরকারীভাবে একটা দলিল হল। স্থির হল দুটা সন্তানের খোরপোষ বাবদ বারওয়েল পাঁচ হাজার পাউন্ড দেবে, আর ডিভোর্সের খরচা বাবদ দেবে—তিনশ পাউন্ড। দলিলে সই করলেন—মিঃ স্যান্ডারসন, মিঃ হেস্টিংস এবং আরও আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। সে দলিল হাতে নিয়ে থমসন চলে গেলেন—চীনের দিকে। কিন্তু মাঝপথে বারওয়েলের চিঠি: 'সত্বর চলে এস কলকাতায়। তোমার নিজের স্বার্থেই আসা দরকার জানবে।'

বেচারা থমসন ফিরে এলেন। এসে শুনলেন সারাকে দেশের জাহাজে তুলে দিয়েছে বারওয়েল। তাকেও যেতে হবে।—'টাকা? দলিলের টাকাটা

লণ্ডনে নামবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাই দিয়ে দেবে তোমাকে'—বারওয়েল কথা দিলেন।

থমসনের জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়—আবার হাঁপাতে হাঁপাতে বারওয়েল এসে হাজির।—'এই কাগজটা সই করে দাও তো ভাই। নয়ত ওরা আবার গোলমাল করবে। তোমাকে টাকাটা দিতে চাইবে না।'

লণ্ডনে নেমে শুনলেন—তার কোন প্রাপ্য নেই। কারণ, তিনি নিজে সই করে নাকচ করে দিয়ে এসেছেন সেই দলিল।

থমসন—বোকা বনে গেলেন। তিনি আর কি করেন, বারওয়েল-এর কীর্তি-কাহিনী লোকেদের গোচরে আনার জন্যে বই বের করলেন একখানা। সারার কাছে লেখা বারওয়েলের চিঠি-পত্র সব ছেপে দিলেন তাতে। সে বইয়ের নাম—'ইনট্রিগস অব এ নাবব।'

কিন্তু তাতে আর কি হয়! বারওয়েল যে কলকাতার সাদা-নবাব! নয়ত থমসনের দলিলে একজন সাক্ষী থেকেও কি করে মিঃ স্যাণ্ডারসন তাঁর ফুটফুটে মেয়েটাকে তুলে দিলেন ওর হাতে! হ্যাঁ, লোক বটে ক্লেভারিং। বারওয়েল-এর বড় সাধ ছিল ওঁর মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। কিন্তু ক্লেভারিং কিছুতেই 'জোচ্চোরের' হাতে মেয়ে দেবেন না।

হ্যাঁ, জোচ্চোর-ই নাকি প্রকারান্তরে মিঃ ক্লেভারিং বলেছিলেন ওকে। তাই নিয়ে শেষে দু'জনের ডুয়েল!

এহেন বারওয়েল ছিল মিঃ গ্রাণ্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভাবতেও লোকটার ওপর ঘেন্না ধরে যায় আমার। বন্ধুকৃত্য করতে নিজের স্ত্রীকে আদালতে তুলতেও লজ্জা হল না ওর?

হয়ত, তোমরা ভাবছ—তবে কি সবটাই সাজানো ব্যাপার? ব্যাপারটি কি তবে পলিটিক্যালই? এ কথার উত্তর আমি দেব না। হেলেন দেয়নি, তোমাদের সীতা দেয়নি। কোন মেয়ে কোনদিন এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তারা গোপনে কাঁদে। আমি কেঁদেছি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। আলিপুরের সেই লাল বাড়িটায়, হুগলীর বাগান-বাড়িতে, ম্যাকলিন-এর জাহাজে, তালেরাঁর প্রাসাদে। কার জন্যে কেঁদেছি জান? তোমাদের গ্রাণ্ড সাহেবের জন্যে নয়, ম্যাকলিন-ফ্রান্সিস বা তালেরাঁর জন্যেও নয়। কেঁদেছি আমার নিজের জন্যে। শুধু আমারই জন্যে।

সুতরাং হে পাঠক, আমার কাহিনীতে কোন মর‍্যাল নেই তোমাদের জন্যে। এটা নিছকই কলকাতার মর‍্যালিটির একটা কাহিনী।

ইতি—

মাদাম দ্য তালেরাঁ

একটি কবিতার ইতিহাস

সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানা। কবরখানা নয়ত যেন, কবরের বন। ছোট-বড়-মাঝারি, পিরামিড-ওবলিস্ক-কুপলাস। আকারে-প্রকারে স্থাপত্যে এখানকার কবর বহুবিধ, পরিচয়ে সহস্রবিধ। একটু চোখ মেলে হাঁটলেই মনে হয়—এ তো কবরের বন নয়, স্মৃতির অরণ্য। মাত্র ২৩ বছরের নাতিদীর্ঘ-জীবন। (এই কবরখানার উদ্বোধন, অর্থাৎ প্রথম নরদেহের পৃষ্ঠসঞ্চার উৎসব হয় ১৭৬৭ সালে এবং এখানে শেষ মানুষটি আশ্রয় নিয়েছেন ১৭৯০ সনে) একটা সম্পূর্ণ যুগের ইতিহাস। চারটে ভাঙা দেওয়ালের বেষ্টনীতে একটা অখণ্ড যুগের স্মৃতি।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এ যুগ গৌরবের যুগ। বিটোভেন, সেরিডন, বিউনাস এবং নেপোলিয়নিক যুদ্ধের মরসুম চলেছে তখন সাগরপারে। আর এই এশিয়াখণ্ডে চলছে—চন্দননগরের লড়াই, হেস্টিংসের শাসন, মিসেস লীচের নাচ, লেডি এ্যানির বড়মানুষি পার্টি এবং হুক্কা-এক্কার যুগ।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম সেই যুগের কথা। এখানে ওখানে মাত্র একটুকরো পাথরের পরিচয় বুকে ধরে পড়ে রয়েছেন বোটানিস্ট কীড্ সাহেব, ডাক্তার ক্যাম্বেল, প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ উইলিয়াম জোন্স, নবাবঙ্গের অন্যতম অবাঙ্গালী প্রবক্তা ডিরাজিও প্রমুখ যুগধুরন্ধরগণ। রয়েছেন 'উন্মাদ' স্টুয়ার্ট, বীর ক্লেভরিং এবং আরও কতো কে। বিবিধ নাম, বিচিত্র পরিচয়। যেন গণ্যমান্য এবং নগণ্য মানুষের এক বিরাট জমায়েত।

আজ এখানে কবরের বন। কিন্তু সেদিন? সেদিন সত্যি সত্যিই অরণ্য এখানে। শহরের পাল্কীবাহকেরা এদিকে আসতে দ্বিগুণ ভাড়া চায়। তাও, যাত্রার আগে গায়ের 'দামী' জামাকাপড়গুলো রেখে আসতে চায়। কেননা, পথে ডাকাতেরা ওৎ পেতে আছে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যাহ্নেও এখানে রাত্রির অন্ধকার। দূর দূরান্তব্যাপী শুধু বন আর বন। মাঝে মাঝে পতিত জলা, নয়ত ধানের ক্ষেত। তারই ধারে ধারে এখানে ওখানে গুটিকয় গরীব মানুষের কুটির। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পর্যন্ত তখন বাঁশবন এবং সে বনে একমাত্র বাসিন্দা তখন—বাঘ। স্বভাবতই সাহেবসুবারা বড় একটা আসতেন না এদিকে। এলেও আসতেন বন্দুক হাতে, শিকারে। হেস্টিংস নাকি নিজ হাতে বাঘ মেরেছেন এখানে।

কিশোর কোলকাতা তখন লালিত হচ্ছে লালদীঘির কোলে। নবাগত

যাদের আবির্ভাব ঘটে শহরে তাদের যেমন বাস ওখানে, যারা চলে যায় চিরদিনের জন্যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত স্থানটুকুও তখন ওদিকেই। সেণ্ট জন চার্চের উঠানে। ক্রমে লোকসমাগম বৃদ্ধি পেলো। সেই সঙ্গে বেড়ে উঠলো লোকান্তরণের পরিমাণও। আর ঠাঁই নেই। অপরিসর উঠোনে আর কাজ চলে না। বাধ্য হয়ে মড়া কাঁধে পা বাড়াতে হলো এদিকে। তদানীন্তন শহরের এই প্রান্তে।

সহসা ভাবনায় ছেদ পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো পা দুটোও। সুন্দর একখানা কবর। একটা বন্ধ্যা আমগাছ আদর করে ছায়া দিয়ে কাছে করে রেখেছে। গায়ে জ্বল জ্বল করছে সোনার হরফে লেখা ক'টি লাইন। আশ্চর্য উজ্জ্বল গুটিকয় ছত্র। কাছে গিয়ে দেখি লেখাগুলোকে রক্ষা করছে একখণ্ড কাঁচ। তাই এতকাল পরেও এমন সহজপাঠ্য। মনে হয় গতকাল যেন লেখা হয়েছে। ধীরে ধীরে পড়লাম—

"..Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep, but never see,
A night of memories and sight
I consecrate to thee."

সাধারণতঃ এসব শোকপদ্যে 'কবির' নাম থাকে না। বিশেষ অর্থও থাকে না। কারণ, প্রাপ্য এবং অপ্রাপ্য ঋণ শোধের এমন প্রশস্ত স্থান তো আর হয় না! ব্যক্তিগত ঔদার্য কিংবা পারিবারিক মহিমা কীর্তনের পক্ষেও এই স্থানটি নিঃসন্দেহে নিরাপদতম। তাই তেমনি ভাবেই চিরকাল এগুলো পড়ে থাকি আমি। নাম ধাম কিংবা পরিচয়টুকু কোনমতে পেয়ে গেলে বাকীটুকু আর শেষ করি না। করি না, অর্থ, প্রয়োজনই পড়ে না। কারণ সবার বক্তব্যই এখানে মোটামুটি এক। কিন্তু এ-কবিতায় I consecrate to thee পড়তে গিয়েই আমি বা "I" কথাটা যেন আর সর্বনাম রইলো না আমার কাছে। সংগে সংগে বিশেষ্য হয়ে ভেসে উঠলো একটি বিশেষ মানুষ। একটু নজর দিতেই দেখি কবিতাটির নীচেই রয়েছে তাঁর স্বাক্ষরঃ --Walter Savage Landor। ল্যাণ্ডার পরিচিত কবি। সুতরাং তাকালাম ওপরের দিকে যার জন্যে কবি এমন করে গেয়েছেন এই শোকগাঁথা। পাথরের গায়ে তাঁর নামটিও অতি স্পষ্ট। —অনারএবল্ মিস্ রোজ উইথাট এলমার।

এলমার আর ল্যাণ্ডার কোলকাতার ইতিহাসে একটা কাহিনী। এ নগরের মনের পাতায় একটুকরো ট্রাজেডি।

১৮০০ সালের মার্চ মাস। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সহসা গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ। দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে চমকে উঠলো এ পাড়ার দরিদ্র বাসিন্দারা। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। এ আওয়াজ তাদের চেনা। তাদের যেমন 'হরি বোল', সাহেবদের তেমনি রাইফেলের বোল। মড়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কবরখানায়। বারিয়েল গ্রাউণ্ড রোড ধরে শব-মিছিল আসছে। আগে-পিছে মশালচি, বন্দুকধারী সেপাই। জায়গাটা তো ভাল নয়। বাঘ ভাল্লুকের ভয় আছে। তাই মাঝে মাঝে এমনি ফাঁকা আওয়াজ। একজন বলে উঠলো—আহা, আজ আবার একটা গেল।—অনুকম্পার স্বর তাঁর কণ্ঠে। সংগে সংগে হয়ত কল্কে হস্তান্তরিত করতে করতে উত্তর দিল

অন্যজন—'তা এত ধকল সইবে কেন, এমন সোনার শরীর! এ তো আর আমাদের চাষাড়ে কপাল নয়, রাজার জাত কষ্ট দেখলেই পালিয়ে যায়—।'

কে বিদেয় নিল, কেউ জানে না। নেটিভপাড়া এসব খবর বিশেষ রাখা দরকার মনে করে না। কিন্তু সারা সাহেবপাড়া সেদিন বিষণ্ণ। সারাদিন অপেক্ষা করে সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃতদেহ নিয়ে পথে নামে তারা। তাই রীতি। রাত্রে কবর দেওয়াই তখন প্রথা। বিবিরা রয়েছেন। তাঁরা কোমলহৃদয়া। এমন জায়গায় মরতেও হয়, এত সুখ চিরদিন থাকে না একথা মুখোমুখি জানতে পারলে তাঁদের মতিভ্রম হতে পারে। উল্লাস আনন্দে অরুচি ধরে যেতে পারে। দেশে যাওয়ার জন্যে বায়না ধরতে পারেন। তাই রাত্রেই ভালো। রাত্রে কবর হয়ে গেল এলমারেরও। দু'দিন বাদে ক্যালকাটা গেজেটে শোকসংবাদ হিসেবে বের হলোঃ

"On Sunday last at the house of her uncle Sir Henry Russell, in the bloom of youth and possession of every accomplishment that could gladden or embellish life, deplored by her relatives and regretted by a society of which she was the brightest ornament, the honourable Miss Rose etc."

ক্যালকাটা গেজেট যে পরিচয় দিয়েছেন এলমারের, তারপর তাঁর নতুন কোন পরিচয় আছে তা নয়। আবার এখানেই তা শেষও নয়। যদি তা হতো, যদি রূপে-গুণে তাঁর সমাজের মধ্যমণিই শুধু হতেন তিনি, তা হলে আজ তাঁকে নিয়ে পাতা নষ্ট না করলেও চলতো। কিন্তু এই এলমার, কোলকাতার এই সমাজমণিটিই যে ছিলেন আর একজনের হৃদয়-মণি। এলমার ল্যাণ্ডারের প্রিয় রোজ, তাঁর কবিতা।

ল্যাণ্ডার কবি। ইংলণ্ডের কবিসমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। এলমার কবি-প্রিয়া। শুধু কবিতা নয়, এলমার একদিক থেকে ল্যাণ্ডারের কবিতার ইতিহাসও।

এলমারদের পারিবারিক বাস ছিল ওয়েলস-এ। ল্যাণ্ডার সবে মাত্র অক্সফোর্ড ছেড়ে বেরিয়েছেন। তরুণ কবি তিনি। এমন সময় ঘটনাচক্রে পরিচয় হলো তাঁর এলমার-পরিবারের সঙ্গে। ক্রমে রোজের সঙ্গে। রোজেরা তিন বোন। বয়সের দিক থেকে এলমার ল্যাণ্ডারের কাছাকাছি। মনের দিক থেকেও তাই। এলমার ল্যাণ্ডারের চেয়ে বয়সে মাত্র চার বছরের ছোট। বৃদ্ধ ল্যাণ্ডার দীর্ঘকাল পরে বন্ধুর কাছে চিঠিতে স্বীকার করেছেন—কোলকাতায় এলমার আর আমার বিষয়ে রটনাটা ঘটনা।

"I was not indifferent to Rose, nor Rose quite to me."

ওয়েলসের উপকূলে নিবিড় বন্ধুত্বে অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছেন তাঁরা দু'জন। কানাকানি কথা বলেছেন, বোবা হয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুণেছেন। সে-কথার বিষয়বস্তু কি ছিল, কতখানি কাছাকাছি হয়েছিলেন তাঁরা আমরা জানি না। এলমার কাউকে সে কথা বলেননি। ল্যাণ্ডারের কবিতা একমাত্র স্বাক্ষর তার।

"..With a low tune I bent to hear;
How close I bent I quite forget,
I only know I hear it yet!"

এই একটি মাত্র কবিতা নয়। রোজ কবির অনেক কবিতার নায়িকা। ল্যান্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি—'Geber' যা পরবর্তীকালে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল শেলি এবং সাউদকে তার পেছনেও নাকি ছিল রোজ, আমাদের কোলকাতার এই এলমার। শোনা যায়, একদিন বেড়াতে গিয়ে ল্যান্ডার এলমারের হাত থেকে টেনে নিয়েছিলেন একখানা বই। স্থানীয় কোন লাইব্রেরী থেকে ধার করা সাধারণ বই। মলাটের পেছনে ছিল আরব্য উপন্যাসের কাহিনী-মূলক একটি ছবি। এই ছবিই Geber--এর প্রেরণা। রোজ হাতে তুলে না দিলে এ তিনি কোথায় পেতেন!

বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হল। কিন্তু হায় একদিন এই দুটো কাঁচা মনের সব সুখকে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়াল,—ল্যান্ডারের ভাষায় 'ব্রিটন্‌ফেরীর ওকবন।'

"When the buds began to burst
Long ago with Rose the first,
I was walking joyous then,
Far above all other men,
Till before us up there stood
Britonferry's Oken wood.

এলমারের বাবা মারা গেলেন। মা বিয়ে করে বসলেন আর এক ভদ্রলোককে। এলমারের সম্মতি ছিল না এ ব্যাপারে। স্বভাবতঃই মা তাকে কাছাকাছি না রাখাটাই ভাবলেন যুক্তিসঙ্গত। স্থির হলো ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কোলকাতায় মাসির বাড়ীতে। মেসো কোলকাতার বড় মানুষ। সার্ হেনরী রাসেল। রাসেল প্রথমে ছিলেন পুসান জজ, তারপর চীফ্ জাস্টিস্। সুতরাং দিন-ক্ষণ ধার্য হয়ে গেল এবং এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ল্যান্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়লেন এলমার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চড়তে হলো তাঁকে। ল্যান্ডার ঘরে ফিরে এসে লিখলেন ঃ

Where is she now? Called far away,
By one she dared not disobey,
To those proud halls, for youth unfit,
Where princes stand and judges sit,
Where Ganges rolls his widest wave.

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এলমার কোলকাতায় এলেন। সতের বছর বয়সের সুন্দরী মেয়ে। লর্ড এবং লেডি রাসেলের পরিবারের কন্যা। সুতরাং সঙ্গীর অভাব হলো না। সারা কোলকাতার সমাজ সানন্দে লুফে নিল তাঁকে। কিন্তু এলমার সহ্য করতে পারলেন না কোলকাতাকে। দিনে দিনে ক্রমেই যেন ভেতর থেকে শুকিয়ে এলো রোজ, গোলাপের পাপড়ি। ডাক্তার বদ্যি বৃথা। এক বছরও পার হলো না। এলমার চলে গেল। ল্যান্ডারের রোজ ঝরে পড়ল। জোর করে তাঁকে কোলকাতায় আটকে রাখতে ব্যর্থ হলেন তাঁর মা।

কোলকাতা শোক করল। ল্যান্ডারের কথা তারা জানে না। নিজেদের কথা ভেবেই কাঁদল রাসেল-পরিবারের নিকটজনেরা। তারা ভাবল দোষ কোল-

কাতার। কোলকাতার জল বায়ু হত্যা করেছে এই মেয়েটিকে। হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ এ নির্ঘাৎ পেটের ব্যামো। কতদিন মানা করেছি এই শয়তান এবং বিপজ্জনক ফলগুলো (আনারস) এতো বেশি বেশি না খেতে। তখন ঠাট্টা করতো আমায়। বলতো, রেখে দিন আপনার সারমন্। আর এখন?

এমনি নিরপরাধ ভাবনা অনেকেই ভাবলেন। কিন্তু সব ভাবনা থেমে গিয়ে রোগ এবং নিরাময় সবই জানা হয়ে গেল সবার যেদিন ইংলণ্ড থেকে এসে পেঁছাল ল্যাণ্ডারের শোকবার্তা এবং তৎসহ আনুষঙ্গিক কাহিনী। কিন্তু তখন চিকিৎসার সময় নেই আর। কোলকাতার শুভাকাঙ্ক্ষীরা কবরের গায়ে কবিতাটুকুই সেঁটে দিয়ে চলে গেল যে যার ঘরে। এমনকি সেই ছেলেটি পর্যন্ত। শোনা যায়, রোজকে হারিয়ে কোলকাতায় সবচেয়ে মন খারাপ হয়েছিল যাঁর তিনি আর্ল অব লিভারপুলের জনৈক কাজিন। তাঁর নাম—মিঃ রিকেটস। তিনি পর্যন্ত অবশেষে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন সমসাময়িকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী জনৈকা আইরিশ মেয়ের হৃদয়ে। (in the arms of a vulgar, huge, coarse, Irish slammerkin, Miss Prendergast.)

কিন্তু ল্যাণ্ডার আর ঘরে ফিরতে পারলেন না সারা জীবনে। শেষ জীবনে চলে যান তিনি ফ্লোরেন্সে। তারপর একদিন আরও দূরে। এলমার যেখানে গিয়েছে, সেখানে। কবি সুইনবার্ণ শেষ বারের মতো দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। তিনিই তাঁব কবরে লিখে রেখে এসেছেন আর ক' লাইনের একটি কবিতা।

"..so shall thy lovers, come from far
Mix with thy name,
As morning-star with evening-star.."

ইত্যাদি। বোধ হয় সুদূর কোলকাতার এই কবরখানা থেকে আজও নিঃশব্দে ভোরের আকাশে ওঠে একখানা তারা। একটি লজ্জিত নক্ষত্র। ভীত ত্রস্ত পায়ে ছুটে ছুটে অবশেষে এক সময় স্পর্শ করে ফ্লোরেন্সের আকাশ। তারপর সারা দিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ এলিয়ে দেয় এক টুকরো নরম ঘাসের জমিতে। সেখানে এই সন্ধ্যার অপেক্ষায় আর একটি ত্রস্ত হাতে সারা দিন চলে তারই আয়োজন। মাঝ রাত্তিরে আবার পূর্বগামী হয় এলমার। এ কি অসম্ভব? ক' লাইনের কবিতায় কাহিনীর চারটে লাইনই শুধু সত্য, আর পুরোপুরি মিথ্যা দু' লাইনের সামান্য কামনাটুকু?

"সমস্ত গ্রামবাসী পালাইয়া গেল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাহাদের পুঁথি-পত্র নিয়া পালাইলেন, সুবর্ণবণিকেরা তাহাদের দাঁড়িপাল্লা নিয়া। গন্ধবণিকেরা তাহাদের মালপত্র, ব্যাপারীরা তাহাদের পণ্য নিয়া পালাইলেন। কামার হাতুড়ি নিয়া পালাইল, কুমার তাহার চাক নিয়া পালাইল। জেলেরা জাল নিয়া পালাইল। বানিয়ারা পলায়ন করিল। চারিদিকে কত লোক পালাইয়া গেল তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। গ্রামে গ্রামে যত কায়স্থ এবং বৈদ্য ছিল তাহারা বর্গির নাম শুনিবামাত্র পলায়ন করিল। ভদ্র রমণীগণ—যাঁহারা কদাপি ঘরের বাহিরে গমন করেন নাই তাঁহারাও মাথায় মালপত্র নিয়া পালাইলেন। যে সব রাজপুত কৃষি কাজ করিত, বর্গির নামোল্লেখ মাত্র তাহারা তরবারি ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া পালাইল। গোঁসাই মোহন্তগণ পাল্কি চড়িয়া পালাইলেন।.. কৈবর্ত, সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান সকলে পালাইল। গর্ভবতী রমণীগণও ছুটিয়া পালাইলেন। দশ-বিশজন লোক হয়ত রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তাহারা বর্গিদের দেখিয়াছে কিনা—তাহা হইলে সকলেই সমস্বরে উত্তর করিবে—'না'। সকলে পালাইতেছে তাই তাহারাও পালাইতেছে।" (মহারাষ্ট্র পুরাণ)

নবাব আলিবর্দির ভূমিকা যত ভালো অভিনীতই হোক, তরুণ সিরাজ ভারাপ্লুত কণ্ঠে যত বীরত্বই প্রকাশ করুক—অপেরা পার্টির 'বঙ্গে বর্গী' দেখে বাংলার মানুষের মনে সেদিন যে আতঙ্কের অন্ধকার নেমে এসেছিল তাকে বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না—মঞ্চের ভাস্কর পণ্ডিতকে দেখে বর্গির অত্যাচারের পরিমাণকে। বাংলার সারা পশ্চিম খণ্ডে সেদিন মৃত্যুর মহোৎসব। হত্যা, লুণ্ঠন, আগুন আর পাশব প্রবৃত্তির খেলা।

বলা বাহুল্য, ভাগীরথী পেরিয়ে এসে এ কান্না পেঁাছাল কিশোর নগরী কলকাতার কানেও। কিন্তু সে কান তখন বধির। 'নেটিভরা' অক্ষম বাঙালী। কোম্পানী দায়িত্বহীন বিদেশী। বর্গির অত্যাচার থেকে বাংলাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাদের নয়, বাংলার নবাবের। কিন্তু নিজেদের? নিজেদের রক্ষা করবে কে? বর্গিরা যে কোলকাতায় আসবে না—এমন তো কোন হলফ করেনি তারা। বরং 'লুঠবো তো ভাণ্ডার' বলে এদিকেই এগিয়ে আসার সম্ভাবনা এদিকটায়ই বেশী। কোম্পানীর মনেও ঘনিয়ে এলো আতঙ্কের বেশী সম্ভাবনা। সুতরাং কোম্পানীর মনেও ঘনিয়ে এলো আতঙ্কের ছায়া।

কোম্পানী আতঙ্কিত। নেটিভেরাও ভয়ে কাঁপছে। সুতরাং কোলকাতায়ও 'সাজ সাজ' রব উঠলো।

তখনকার কোলকাতা, তখনকার কালের যুদ্ধ। আমার মত গেল মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি যাঁরা দেখেছেন কাগজ-আঁটা জানলার কাচের ফাঁক দিয়ে তাঁদের পক্ষে কষ্টকর সেদিনের প্রস্তুতিকে অনুমান করা।

—হ্যাঁ গা,—কি হবে?

—কি আর হবে, গোবিন্দ পিসেকে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি বাড়ীটিকে একটু পয়-পরিষ্কার করাতে। আসছে মাসের মাইনে পেয়েই বিদায়। ততদিন 'দুর্গা দুর্গা' জপ।

—আফিস আদালত খালি করে, বাড়ীঘর ছেড়ে ছুড়ে কেরানী বাঙ্গালীর মতো সেদিন পালায়নি সুতানটী গোবিন্দপুরের মানুষ। হাওড়া স্টেশন নেই, রেল নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, নেই নিরাপদ আশ্রয়। পালাবে কোথায়? সুতরাং কোলকাতার মাটি আঁকড়েই পড়ে রইলো—বেনিয়ান, সরকার, মুৎছুদ্দি।—পড়ে রইলেন—শেঠ বসাক ধনপতিরাও। ভরসা মা গঙ্গা আর এই কোম্পানী।

এদিকে কোম্পানীর গবেষণার আর শেষ হয় না। সত্যিই তো আত্মরক্ষার ব্যবস্থাটুকু তো অন্ততঃ চাই। অবশ্য গড় একখানা গড়েছে তারা—তাদের পাড়ার উঠোনেই। লালদীঘির কোণে। কিন্তু সেটি নিতান্ত অপ্রতুল। কোম্পানী মিটিং বসালো। কমিটি গঠিত হলো একখানা। চারজন সাহেবের কমিটি। তারা সারা শহর ঘুরে এসে বললেন—রাস্তা-ঘাট, গলি-ঘিঞ্জি যা দেখে এলাম: তাতে আর যাই হোক, এটুকু বলতে পারি আমাদের বর্তমানে যা সৈন্য আছে তা তো কোন্ ছার, যদি আজ থেকেই শুরু হয় সৈন্য সংগ্রহ তাহলেও এ শহরকে রক্ষা করবার মতো ব্যবস্থা করে ওঠা সম্ভব হয়ে উঠবে না। সুতরাং—।

বিশেষজ্ঞরা এলেন, পরিকল্পনা দাখিল হলো, বাতিল হলো। আবার নয়া পরিকল্পনা হলো; নতুন করে দাখিল হলো। প্রথমে এখানে, তারপর বিলাতে। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বলে পাঠালেন—ভাল কথা। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবে বৈ কি! তবে দেখো খরচপত্র যেন কম হয়। আর দেখো মাননীয় নবাব বাহাদুর যেন বিরক্ত না হন। তিনি যেন মনে না করেন তোমরা বেশী বেশী শুরু করে দিয়েছ। তা'ছাড়া—যাই করো না করো বুঝে শুনে করো। গৃহস্থ বুদ্ধি থাকা চাই, দু'দিন পরেই যেন আবার নতুন খরচের দায় না পোয়াতে হয়। ওঃ, আর একটা কথা,—নেটিভদেরও দেখো। মনে রেখো ওরা না থাকলে—কোম্পানীর গণেশও থাকবে না। উল্টে যাবে।

নেটিভরা কান পেতে রইলেন। গড়ের সামনে দু'বেলা ঘোরা-ঘুরি করেন শেঠেরা, বণিকেরা। কি হয় না হয়। কি খবর এলো, কতো মঞ্জুর হলো তাই শোনার জন্য অধীর আগ্রহ তাঁদের। কোম্পানী বললো—এত ব্যস্ত কেন? আমরা তো সব ব্যবস্থাই করছি। তাঁরা বাগবাজারের ঘাটে দাঁড় করিয়ে দিলেন—একখানা জাহাজ। নাম—'টাইগ্রেস'। পেরিনস্ পয়েণ্টে এ জাহাজ দাঁড়াল আর একখানা, আর জায়গায় জায়গায় বসানো হলো গুটিকয় কামান। সাত জায়গায়।

—আর?

—আর কি করা যায় তাইতো ভাবছি। কোম্পানী আবার ভাবিত হলো।

এবার নেটিভ—রাগ চড়ে গেল গোবিন্দপুর সুতানটীর মানুষের মাথায়। তারাও মিটিং বসাল। স্থির হলো—'আমরাই রক্ষা করবো আমাদের।' ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, কামান-বন্দুক নেই—না থাক। খাদ কাটবো—শহর ঘিরে। খাদ—ডিচ্। ৪২ গজ চওড়া, ৭ মাইল লম্বা। বাগবাজার থেকে শুরু করে প্রায় বৃত্তের মতো করে উত্তর থেকে পূব দিক ঘুরে দক্ষিণ দিকে যাবে। খরচাপত্র যা লাগে—নিজেরাই দেব। নিজের খরচের খাত হবে—নিজেদের রক্ষার জন্য।

সে মিটিংয়ে সভাপতি প্রধান অতিথি কে ছিলেন জানি না, সেই সভার শ্রোতার দুর্লভ ভাগ্যও হয়নি আমার—তা'হলে দেখতে পেতাম—সংকল্পে উজ্জ্বল কতকগুলো মানুষের দৃঢ় মুখ। অন্যের হাতে নিজের জীবন রক্ষার দায়িত্বটুকু তুলে দিয়ে তারা কম্পিত বক্ষে ইষ্টনাম জপছে না—কোদাল হাতে নেবেছে খাত কাটতে। বর্গির লম্ফ সুতানটীর মাটি স্পর্শ করার আগেই ঘোড়া সমেত তলিয়ে যাবে—সেই খাদের গভীরে। দস্যুতার সমাধি হবে এখানেই।

কোম্পানী থেকে আগাম নেওয়া হলো কিছু টাকা। পঁচিশ হাজার টাকা। ১৭৪৩ সালের ২৩শে মার্চ। ধার নেওয়া হলো টাকাটা। কথা রইল, জনসাধারণ পরিশোধ করবে। দায়ী রইলেন,—শেঠদের বাড়ীর বৈষ্ণব দাস, রামকৃষ্ণ, রাসবিহারী আর উমিচাঁদ।

অবিরাম কোদাল চললো। নিঃশব্দে মাটি কেটে গেল কোলকাতার মানুষ। ছ'মাস কেটে গেল; তিন মাইল খাদ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ইতিমধ্যে সংবাদ এলো মারাঠাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া হয়ে গেছে নবাবের। তা'হলে আর কি দরকার মিছিমিছি মেহনত করে। কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের মতো সাংসারিক পরামর্শ দেবে—এমন অভিভাবক তো আর ছিল না—কোলকাতার সাধারণ মানুষের। তাই সেখানেই বিরতি দিল তারা। তাতেও বাগবাজার থেকে জানবাজার স্ট্রীট্—অর্থাৎ প্রায় বেগবাগান অবধি তৈরি হয়ে গেলো খাদ! কেউ কেউ বলেন, টালির নালাটাও ওরই অপভ্রংশ। বাগবাজার থেকে সোজা পূবদিকে চলে যায়নি সেটা। গোবিন্দ মিত্তির আর উমিচাঁদের বাগানবাড়ী তখন হালসি বাগানে। সেখান অবধি গিয়ে একটু বাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওটা। আজ সেখানটায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাড়ী।

তারপর? —তারপর, বর্গিও আর এলো না, খাদ কাটাও হলো না। তেমনিই পড়ে রইল ষাট বছর। কোলকাতার লোকেদের মাঝখান থেকে সারা বিশ্বে নাম হয়ে গেল 'ডিচার'। এবং অবশেষে এই মরা খাদের উপর দিয়ে তৈরি হলো রাস্তা। বাগবাজারের মারাঠা ডিচ্ লেন আর অপার এবং লোয়ার সার্কুলার রোড।

চম্‌কে উঠলেন মারাঠা ডিচ্ লেনের অধিবাসী বৃদ্ধ। 'আমাদের এই লেনটার সঙ্গে মারাঠা আক্রমণের যোগ আছে জানতুম কিন্তু—সার্কুলার রোডগুলো—তাতো জানিনে।'

অনেকেই জানেন না। মারাঠা ডিচ্ লেনের মুদি-বৌ, কেরাণী-গিন্নীও হয়ত জানেন না—সারা দিনের খাটুনীর পর গভীর রাত্রে দুরন্ত ছেলেটাকে যে বর্গির ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতে হয় তাঁকে—সে বর্গি সত্যিই একদিন

এসেছিল—ঐ সামান্য দূরে,—গঙ্গার ওপারে। জানেন না হয়ত—এই গলি তাদেরই পূর্বপুরুষেরা নিজেদের হাতে খুঁড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের শিশু-সন্তানদের মন থেকে বর্গির ভয় ভাঙ্গানোর জন্যে।

—সার্কুলার রোড তৈরি হয়েছে ১৭৯৯ সালে। অবশ্য এর বহু পরেও, এই সেদিন অবধিও বেঁচে ছিল একটুখানি খাদ। পাল লেন আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মাঝামাঝি। আজ সেও বুজে গেছে।

—আবার মাটি দিয়েই ভরাট করতে হলো তা'হলে?

—না কিছু করতে হলো না। অতি সহজেই পুরুষানুক্রমে জঞ্জাল ফেলে কলকাতা বুজিয়ে দিয়েছে পূর্বপুরুষের স্মৃতিকে।

—এতো জঞ্জাল? —তা হবে। ভদ্রলোক হাসলেন—কোলকাতার জঞ্জাল তো, বঙ্গোপসাগরও যে ভরে যায় তাতে।

টাউন হল

একটি পিতলের পাত
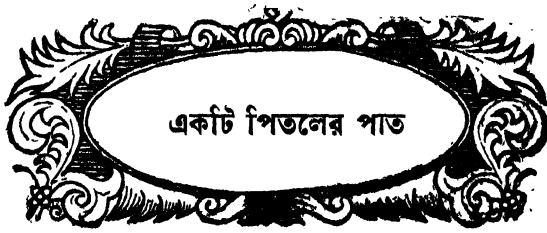
সকালে মস্ত মস্ত বাড়ির দরোয়ানেরা এখানে বসে দাঁত মাজে আর দেহাতী গান গায়। দশটা বাজতে না-বাজতেই এসে দাঁড়ায় সারি সারি গাড়ি। ফুটপাথ দিয়ে চলে সারি সারি পদাতিক। গা বাঁচিয়ে দেওয়ালটা ঘেঁষে পান সাজতে বসে একটি মেয়ে। একদল লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে তাবিজ-ওয়ালার। ছাড়া-পাওয়া ড্রাইভাররা পান চিবুচ্ছে রোদে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈস্টার্ন রেলওয়ের রেন-পাইপে বারো-মাসী বান। দর দর করে জল চলেছে ফুটপাথ ভাসিয়ে।

আরও একটু সরে দাঁড়াতে হল ড্রাইভারদের। চার্টকে আরও একটু সরিয়ে নিয়ে গেল তাবিজওয়ালা, বাক্সটাকে একটু কোলের দিকে টেনে নিল পানওয়ালী। হয়ত জুতো বাঁচাতে আপনিও একটু বেঁকে গেলেন বাঁ দিকে।

কিন্তু কোথায় গেলেন জানলেন কি? জানলেন কি, ঈস্টার্ন রেলওয়ের এই বিরাট বাড়িটার এই ছায়া-পুষ্ট ফুটপাথটি ছেড়ে যাওয়া মানে,—ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কয় কদম হটে যাওয়া!

হ্যাঁ, হটে যাওয়া ছাড়া কী? লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন—ঐ পান-ওয়ালীটির সামনে, ঐ নোংরা জলাধারটির নীচে, ধূলিমলিন ফুটপাথের বুকে আজও জ্বল জ্বল করছে একফালি পিতলের পাত, জ্যামিতির খাতায় মোটা লাইনে আঁকা একটি কোণ।

প্রতিদিন বহুজনের পদধূলি পড়ে এর ওপর। কিন্তু চোখ পড়ে বোধ হয় অতি অল্পজনের। পড়লেই বা ক'জন ভাবতে পারেন--একদিন এখানেই ছিল ইংরেজের আদি কেল্লা, কলকাতার প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম। এইখানেই দাঁড়িয়ে একদিন লড়াই করেছিলেন আমাদের তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা, এবং এইখানেই দাঁড়িয়ে একদিন আত্মসমর্পণের নিশান দেখিয়েছিলেন হলওয়েল।

কলকাতার ইতিহাসে সে এক কাহিনী।

১৬ই জুন, ১৭৫৬ সাল।

হৈ-হৈ করতে করতে নবাব-সৈন্যরা এসে হাজির হল কলকাতায়। মারহাটা ডিচ-এর পাহারাওয়ালারা ভয়েই পথ ছেড়ে দিল তাদের। 'পেরিনস পয়েণ্ট'এ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল কোম্পানীর নাবিকেরা, কিন্তু সেও বানের মুখে বালির বাঁধ।

পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেখতে দেখতে সিরাজউদ্দৌল্লা এসে দাঁড়ালেন ডালহৌসী স্কোয়ার-এ। সামনে তাঁর ইংরেজের উদ্ধত কেল্লা ফোর্ট উইলিয়াম। কেল্লার বাইরের লড়াইয়ে তিনি জিতেছেন। এখন বাকী শুধু এই ফোর্ট উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়াম দখল করা মানেই—ইংরেজের কেল্লা চিরকালের মত ফতে করে দেওয়া।

সিরাজউদ্দৌল্লা জানতেন, এই কেল্লাখানাই ইংরেজের সর্বস্ব। ওদের ধন-দৌলত, বাণিজ্য সওদা যা আছে তা এই কেল্লার ভেতরেই। এমন কি, এটাও তাঁর অজানা নয় যে কলকাতায় যত ইংরেজ আছে তাদের সবাই আজ এখানে।

সুতরাং, রাজদুর্লভের ওপর হুকুম হল—চল কিল্লা।

কেল্লার ভেতরে তখন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে রাশি রাশি ভয়। গতকাল কোম্পানীর হিসেবের খাতাপত্তর সব জাহাজে চড়েছে। আজ উনিশে। দশটার সময় পালিয়ে গেছেন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেণ্ট ড্রেক এবং বড় বড় সামরিক কর্তাব্যক্তিরা। এখন কেল্লায় আছে বলতে কয়েক হাজার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পর্তুগীজ, আরমেনিয়ান মেয়েপুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা, আর সাকুল্যে সব মিলিয়ে পাঁচ শ পনের জন সৈনিক। এর মধ্যে আড়াই শ মাত্র পাকা লড়িয়ে। বাদবাকীরা সব অ্যামেচার:

উপায়ান্তরহীন হলওয়েল বললেন, তিন-তিনটে সিন্দুক ভর্তি সোনাদানা গিনি মোহর রয়েছে কেল্লায়। এগুলো তোমাদের সমানভাবে ভাগ করে দেব আমি। তোমরা লড়াই কর।

২০শে জুলাই, ১৭৫৬ সাল।

দুপুরের আগেই তিন-তিনবার কেল্লায় গায়ে আছড়ে এসে পড়ল নবাব-সৈন্যরা। বিকেলে কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠল কেল্লা থেকে। লক লক করে আগুনের শিখা উঠল অন্ধকার আকাশে। রাজবল্লভ আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দিলেন ইংরেজদের। এক শ ছেচল্লিশটি নরনারীকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন হলওয়েল।

যুদ্ধ থেমে গেল। উত্তরের প্রবেশপথ দিয়ে বিজয়গর্বে সিরাজউদ্দৌল্লা ঢুকলেন বিধ্বস্ত ফোর্ট উইলিয়ামে।

ফোর্ট উইলিয়াম তখন একটা ধ্বংসস্তূপ মাত্র। ইংরেজের গর্ব যেন ইচ্ছে করেই গুঁড়িয়ে পড়ে আছে বাংলার নবাবের পায়ে।

এত বড় একটা ঘটনা হয়ে গেল খাস ডালহৌসী স্কোয়ারে—কিন্তু তার কোন সংবাদ রাখে না আজকের ডালহৌসী। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার মত কলকাতার লড়াই, ফোর্ট উইলিয়ামের পতন সবই তার কাছে ইতিহাসের স্মৃতি মাত্র। তার বেশী কিছু নয়।

নয় বলেই, ফেয়ারলি প্লেস দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসীর পথিকদের কদাচিৎ আজ নজরে পড়ে ফুটপাথের গায়ে মিশে থাকা আড়াআড়ি এই পিতলের পাতটিকে। পায়ে পায়ে প্রতিদিন কত লোক মাড়িয়ে যাচ্ছে এটি, কিন্তু কৈ কারও তো মনে পড়ে না একবার সিরাজউদ্দৌল্লার কথা, কিংবা ডালহৌসীর সেই ঐতিহাসিক লড়াইটির কথা। এর ক'পা দূরে—উত্তরের সেই প্রবেশপথটি দিয়েই তো একদিন বাংলার নবাব ঢুকেছিলেন ইংরেজের কেল্লায়।

তাকিয়ে দেখুন উল্টো দিকের দেওয়ালটিতে একবার। ঈস্টার্ন রেলওয়ের

বাড়ির দেওয়াল। মার্বেল পাথরে পরিষ্কার হরফে লেখা আছে "এইখানে এই পিতলের পাতটি বরাবর ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর-পশ্চিম কোণ।" কেল্লার উত্তর সীমা। গায়েই ছিল কেল্লার বিরাট ঘাট। জোয়ারের দাগ পড়ত এর দেওয়ালের গায়ে। পায়ে পড়ে থাকত ভাটার জলরাশি। নদী তখন স্ট্রাণ্ড রোডের ওপারে নয়। এখানে। ফেয়ারলি প্লেসের মাঝামাঝি।

কেল্লার পূর্ব সীমা ছিল নেতাজী সুভাষ রোড, দক্ষিণ সীমা জেনারেল পোস্ট আপিস। জেনারেল পোস্ট আপিসের ভেতরে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন গুটি কয়েক খিলান। ফোর্ট উইলিয়ামের অবশেষ। এখানেও যথারীতি লেখা আছে পাথরের গায়ে সেই পরিচয়লিপি। কলকাতার স্মৃতিশক্তি কম। কার্জন সাহেব তাই লিখিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে ১৯০০ সালের কথা। আজ তিনিও ইতিহাস।

কিন্তু আজও আছে—পিতলের এই স্মারকগুলো। এই ফেয়ারলি প্লেসের বুকে পর পর দু' জায়গায় চোখ মেলে তাকালে আজও দেখতে পাবেন জ্বল জ্বল করছে ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর সীমা। ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের নীচে থেকেও এখনও উঁকি দিচ্ছে ইতিহাসের একটি আস্ত অধ্যায়। এইখানে এই ফেয়ারলি প্লেসের এই জায়গাটিতেই একদিন উদ্ধত হয়ে উঠেছিল একটি সাম্রাজ্য-সাধনা এবং এইখানে এই পিতলের রেখাটি থেকে সামান্য কিছু দূরেই প্রথমবারের মত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সেই স্বপ্ন। এদিকেই ছিল ফোর্টের উত্তরের গেট। এবং সেই প্রবেশদ্বার দিয়েই বাংলার নবাব ঢুকেছিলেন একদিন ইংরেজের কেল্লায়।

ফোর্ট উইলিয়াম—১৭৩০

ইজ্জতের লড়াই
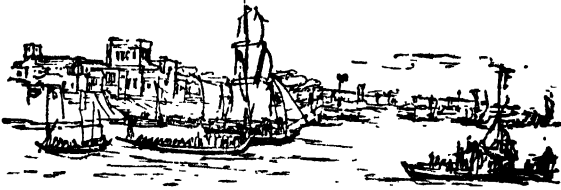
"পিস্তল লড়াই ॥--মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ডাক্তার জেমেসন সাহেব ও শ্রীযুত মেং বাকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত বাকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর সুইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তার জেমেসন সাহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন ৬ই জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই দুই জনকে মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মোং কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে এক বড় বৃক্ষের নীচে গিয়া ধারামত দ্বাদশ পদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন তাহাতে কাহারও হানি হইল না দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পুরিয়া মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাক্তার জেমেসন সাহেব তৃতীয়বার গুলি মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভয়পক্ষীয় সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।" —'সমাচার দর্পণ', ১৭ই আগস্ট, ১৮২২॥

লড়িয়ে দু-জনের একজন সাংবাদিক, অন্যজন সরকারী কর্মচারী। শ্রীযুত মেং বাকিংহাম 'ক্যালকাটা জার্নাল'এর বিখ্যাত সম্পাদক। আর ডাক্তার জেমসন স্বনামধন্য না হলেও বাকিংহামের কালে কোম্পানির একজন অন্যতম স্নেহধন্য ব্যক্তি। একা, একই সময়ে তিন-তিনটে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। একাধারে তিনি ছিলেন মেডিকেল বোর্ডের সেক্রেটারি, সরকারী স্টেশনারী বিভাগের ক্লার্ক এবং ফ্রি স্কুলের সার্জেন। সুতরাং কলকাতার লোক না চিনলেও কোম্পানির কাছাকাছি লোকেরা ডাঃ জেমসনকে জানতেন। বাকিংহামের সঙ্গে তাঁর এই লড়াইয়ের কারণ সহসা তাঁর চতুর্থ-পদপ্রাপ্তি। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মধ্যে জেমসনের মামা-মেসোর অভাব ছিল না, সেকথা বলাই বাহুল্য। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে জেমসনকে বসিয়ে দিলেন তাঁরা আরও একটি নতুন পদে। ভারতীয়দের জন্যে মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হলেন তিনি।

সেকালে ঘটনাটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু বাকিংহাম ছিলেন তাঁর কালের চেয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী। তাঁর কলমকে এড়িয়ে যাবার মত ঘটনা এটি নয়। ক্যালকাটা জার্নালের পাতায় তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন সরকারকে, সেই সঙ্গে ডাঃ জেমসনের লজ্জাহীনতাকেও। তারই ফলে এই লড়াই। জেমসন ক্ষেপে গেলেন। ইজ্জতের নামে তিনি পিস্তল হাতে আহ্বান

জানালেন বাকিংহামকে। সত্যের খাতিরে সে ডাকে এগিয়ে গেলেন সাংবাদিক বাকিংহাম। তাঁর হাতেও পিস্তল।

এটাই তখনকার কলকাতার রেওয়াজ। উপলক্ষ যাই হক, কারও মনে একটু আঁচড় লেগেছে কি, অমনি চরমপত্র চলে গেল প্রতিপক্ষের কাছে ;—তোমার সঙ্গে এক হাত লড়তে চাই। হিম্মত থাকে ত চলে এস অমুক দিন, অমুক জায়গায়। প্রতিপক্ষও হয়ত মনে মনে তাই ভাবছিলেন। তাঁরও ধারণা তলোয়ার বা পিস্তলে না হলে এ অপমানটা ঠিক মোছা যাবে না। সুতরাং তিনি সম্মত হলেন। ইচ্ছে না থাকলেও অসম্মতি প্রকাশের উপায় নেই। লোকে বলবে—কাওয়ার্ড, ভীরু। সুতরাং দুজনে লেখালেখি করে দিন-ক্ষণ স্থির করলেন। দুজন মধ্যস্থও ঠিক হলেন। দুপক্ষে দুজন। তাঁরাই এ লড়াইয়ের বিধিসম্মত সাক্ষী, বিচারক। কে কোথায় দাঁড়াবে বলে দেওয়া, গুলি বারুদ ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা কিংবা কেউ 'ফাউল' করছে কি না দেখা—তাঁদের কাজ। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তাঁরা রেফারি। তাঁদের বাঁশি বাজলে গুলি ছুটবে। তাঁদের 'হ্যান্ডস অফ্' সঙ্কেত উদ্যত হাত গুটিয়ে নেবে।

বিধি-ব্যবস্থাদি শেষ হয়ে গেলে তারপর লড়াই। যে যাঁর কাজকর্ম আগেই চুকিয়ে নিয়েছেন। আগের দিনই আত্মীয়-বন্ধুদের 'গুডবাই' জানানো হয়ে গিয়েছে। ভোর রাত্তিরে সাক্ষীসহ বেরিয়ে গেলেন লড়িয়েরা। গেলেন দুজন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরলেন হয়ত একজন, অন্যজন আহত কিংবা নিহত। ইজ্জত বাঁচানর সামর্থ্য ছিল না, তাই বিদায় নিয়েছেন। বিজয়ী বীর একাই বসেছেন তাই ব্রেকফাস্ট টেবিলে। কথায়ই বলে—"Pistol for two and breakfast for one!" ডুয়েল লড়তে গেলে ব্রেক-ফাস্ট টেবিলে একজনেরই ফেরার কথা। সুতরাং বিজয়ী বীর অক্লেশে খেয়ে চললেন। তাঁর মনে আজ অপরিসীম আনন্দ। আজ কলকাতার হোটেলে হোটেলে, টেভার্নে, গির্জায়, আপিসে তিনিই আলোচ্য। তিনিই আজকের মত এ শহরের হিরো।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় সব ইংলিশম্যানই হিরো, বীর। ছোট বড় নেই, মান-অপমানের প্রশ্নে সবাই সমান। সকলেই সমান স্পর্শকাতর। প্রত্যেকেই যেন এক-একটি ছোট দুর্গ, ফোর্ট। অষ্টপ্রহর বসে আছেন ইজ্জত নামক একটা অদ্ভুত বস্তু আগলে। তার চার দেওয়ালের কাছাকাছি কেউ এসেছে কি অমনি—গুড়ুম!—I want personal satisfaction! ব্যস, শুরু হয়ে গেল লড়াই।

গোরাদের মেজাজই আলাদা। কলকাতাতে তাও অনেক কম। অষ্টাদশ শতকের বিলেতে লড়াই নিত্যকার ব্যাপার। মধ্যযুগের বীরদের ছেঁড়া কোট পিঠে চাপিয়ে ব্যারন বাটলার সবাই তখন লড়াইয়ে মেতেছেন। কথায় কথায় তলোয়ার—নয় পিস্তল।

বন্ধুর বৈঠকখানায় তর্ক হচ্ছে দর্শন কিংবা সাহিত্য নিয়ে। হঠাৎ দুজনের একজন কী মনে করলেন। —'কাল ভোরে অমুক জায়গায় এর মীমাংসা হবে' বলে উঠে পড়লেন। অন্যজন রাত্তিরে বসে সংসারের কাজকর্ম গুছালেন। কাল কী মীমাংসা হবে কে জানে!

পার্লামেণ্টে তর্ক হচ্ছে। ডিউক অব হ্যামিলটন আর লর্ড মোহান বিতর্ক

করছেন। সহসা একজনের কানে যেন একটু অপমানের সুর বাজল। দুজন অমনি চললেন হল্‌ থেকে বেরিয়ে মাঠে। লড়াই হল, লর্ড মোহান মারা গেলেন। কয় মিনিটের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন আহত হ্যামিলটনও।

রাজনীতি নিয়ে এমনি লড়াই হামেশাই হত। অনারেবল মিঃ উইলিয়াম পিট (১৭৯৮) ও পার্লামেন্টের একজন সদস্য—মিঃ জর্জ টিয়ার্নে লড়েছেন। লড়েছেন ফক্স (Charles James Fox) আর অ্যাডম্‌স্‌ও। অবশ্য সৌভাগ্য-বশত এঁদের কেউই নিহত হননি। পিট আর টিয়ার্নে সাহেব নাকি গুলি-বদলের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-বদলই করেছিলেন সেদিন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে বন্ধু হয়ে ফিরেছিলেন তাঁরা।

রাজনীতির পরেই এসব লড়াইয়ের উপলক্ষ হিসেবে সেকালে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহিলারা। নাইটের মত মিস লিসনেকে পৌরুষ দেখাতে তলোয়ার হাতে নেমেছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার সেরিডন। এই মেয়েটির আর একজন স্যুটর বা পাণিপ্রার্থী ছিলেন ক্যাপ্টেন ম্যাথুস নামে এক ভদ্রলোক। সেরিডন তাঁকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে বললেন—হাতে একখানা তলোয়ার তুলে দিয়ে। কলম-ধরা আনাড়ী হাতে নিজেও তুলে নিলেন আর একখানা। লড়াই শুরু হল। দুজনের তলোয়ারই গেল ভেঙে। কিন্তু লড়াই তবুও থামল না। খালি হাতে দুজন জড়িয়ে ধরলেন দুজনকে। তারপর মাটিতে পড়ে ধস্তাধস্তি! সাক্ষীরা বিমূঢ়! কী করবেন? তাঁরা জানেন এঁদের এখন ছাড়াবার চেষ্টা বৃথা। কারণ তাঁরা ছাড়াও আর একজন সাক্ষী আছেন—এ লড়াইয়ের অন্তরীক্ষে। তিনি মিস লিসনে। তাঁর চোখের তারায় আজ যে ফলাফল ঘোষিত হবে—এঁদের নজর সেদিকেই। শেষে, ক্লান্ত লড়িয়েরা নিজেরাই ঠিক করলেন—অন্যদিন হবে।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতার বিখ্যাত সুন্দরী ক্লেভারিং-কন্যাকে নিয়ে লড়েছিলেন—'নবাব' বারওয়েল আর ক্লেভারিং সাহেবও।

চিরকাল যা হয়। লর্ড, জেণ্টলম্যানদের লড়াই থেকে ক্রমে সার্ফরাও বাদ রইল না। জুয়ার টেবিল থেকে তারাও চলে আসে—বর্শা, তলোয়ার যা পায় তাই হাতে নিয়ে মাঠে। ১৭৩৫ সনের একটি বিলিতী খবরের কথা বলছি। এক হোটেলে দুজন 'লেস্‌ উইভার' বা তাঁতী খেতে বসেছে। হোটেলওয়ালা ছোট মাছের এক ডিস চচ্চড়ি এনে দিল পাতে। একজন বললে, "চচ্চড়ি করেছে বটে, কিন্তু আসলে এ ভাজার মাছ।"

"কে বললে তোকে?" অন্যজন প্রশ্ন করলে, "এ মাছ চচ্চড়িতেই ভাল।"

"কে বললে?"

"আমি।"

"আমি বলছি ভাজাতেই এ মাছের স্বাদ।"

"আমি বলছি—"

শেষে খাওয়া ফেলে উঠে পড়ল দুজন। স্থির হল ভাজা ভাল কি চচ্চড়ি ভাল তা লড়াই করে ঠিক করাই সঙ্গত। বন্ধুরা সব শুনলে। তারপর চাঁদা তুলে—দুটো পিস্তল যোগাড় করল। সে পিস্তলে দুই জোলা লড়ল, তবে শান্ত হল।

কলকাতার ডাক্তার জেমসনেরা এদেরই স্বজাতি। সুতরাং সাংবাদিক-প্রবর

বাকিংহাম কলম ছেড়ে পিস্তল ধারণ করবেন এতে আশ্চর্য কী? বাকিংহাম ছাড়াও কলকাতার গড়ের মাঠে অনেক সাংবাদিক লড়েছেন। 'ইংলিশম্যান'এর প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত সাংবাদিক স্টককুইলার এখানে গায়ের বলের পরীক্ষা দিয়েছেন। 'জন বুল', 'এশিয়াটিক মিরার', 'হরকরা'র সম্পাদকরাও দরকার হলেই কাগজী-যুক্তির সমর্থনে পিস্তল নিয়ে নেমেছেন। কখনও তাঁদের হাত কাঁপেনি।

শুধু সম্পাদকরা নন, অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় সবাই লড়িয়ে। চারদিকে শুধু লড়াই, আর লড়াই। লক্ষ্ণৌর মোগলেরা এখানে কুস্তি লড়ে, উৎকলবাসীরা লড়েন রাম-রাবণের লড়াই (অবশ্য স্টেজে)। একমাত্র বাদ বাঙালীরা। বাবুদের লড়াইতে মতি নেই, তাঁরা লড়াই দেখতে ভালবাসেন। তাও হয় কবির লড়াই, নয় বুলবুলির লড়াই। গোরারা সব কোম্পানির লোক, বিলেত থেকে আসা—তাঁদের বুলবুলিতে চলে না, তাঁরা তাই পিস্তল লড়েন।

কলকাতায় এ লড়াইয়ের উদ্বোধন হয়েছিল ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের নিজের হাতে। ১৭৮০ সনের ১৭ই আগস্ট আজকের আলিপুরের ডুয়েল এভিন্যুতে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম ইজ্জতের নামে গুলি ছুঁড়েছিলেন এদেশের মাটিতে। তাঁর সেদিনের লক্ষ্য ছিলেন—স্যর্ ফিলিপ ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের প্রথম সদস্য, বিরোধী দলের তেজস্বী নেতা। হেস্টিংসের সঙ্গে শত্রুতা তাঁর জীবনের সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রেই ছিল। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, নারীপ্রেম সর্বত্রই তিনি ছিলেন হেস্টিংসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হেস্টিংস তাঁকে ভয় করতেন, ঘৃণা করতেন। এই ঘৃণার জবাবে একদিন সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিসের কাছ থেকে এল চরম পত্রঃ "You have left me no alternative but to demand personal satisfaction of you the affront you have offered me."

অতঃপর এ চ্যালেঞ্জের জবাব না দিলে লাটবাহাদুরের ইজ্জত থাকে না। পিস্তল হাতে তিনি এসে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিস আগে থেকেই তৈরী। দুজনের বিধিসম্মত ভাবে লড়াই হল। ফ্রান্সিস আহত হলেন, হেস্টিংস জিতলেন। গভর্নর-জেনারেলের মান রক্ষা হল।

দ্বিতীয় লড়িয়ে-গভর্নর হলেন—সার্ জন ম্যাকফারসন। এবার আর সেয়ানে সেয়ানে নয়। লাট বাহাদুরের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়ালেন কোম্পানির একজন সামান্য মেজর। মেজর ব্রাউন। লড়াইয়ের উপলক্ষ্যটিও তেমনি আটপৌরে। মেস-টেবিলে বসে দুজনে তর্ক করছেন—নেটিভদের মধ্যে মেয়ে বেশী, না পুরুষ বেশী। সেই তর্কের মীমাংসা করতে গিয়ে ১৭৮৮ সনের এক ভোরে সার্ জন প্রমাণ করলেন, ইংরেজদের মধ্যে অন্তত পুরুষ বেশী। তাঁর পৌরুষের হাতে প্রাণ দিলেন—মেজর ব্রাউন। লাটের হাতে মেজরের প্রাণ নেওয়া হঠাৎ কেমন অগৌরবের ঠেকল ম্যাকফারসনের কাছে। ফলে খবরের কাগজে বের হল—'মেজর ব্রাউন সহসা কলেরায় মারা গেছেন।' অবশ্য গোপনে কোম্পানির ধমক খেতে হল সার্ জনকে—ছিঃ, ছেলেমানুষের মত এমনি যার-তার সঙ্গে লড়তে আছে? তুমি না লাট!

লাট-বেলাট না হলে ডুয়েলে কোম্পানির তেমন আপত্তি নাই। অবশ্য বিলেতে এখন এই শখে ভাঁটা দেখা দিয়েছে। কড়া একখানা আইনও পাস

হয়ে গিয়েছে—এই মধ্যযুগীয় খেলাটিকে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু কলকাতা ত আর বিলেত নয়। এখানে বিলিতী আইন পেঁছতে সময় লাগে, তা ছাড়া আইনের ব্যাখ্যাও এখানে একটু অন্যরকম। ফলে তখনকার কলকাতার কাগজগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় ডুয়েলের সংবাদ। একদিন বের হলঃ—

"Died on Saturday morning Lieut. White of an wound which he unfortunately received in a duel the preceding evening." ('ক্যালকাটা গেজেট', ২৯শে জুলাই, ১৭৮৪)

১৭৮৭ সনের ৩১শে মে আরও একটি ডুয়েলের সংবাদ আছে, 'ক্যালকাটা গেজেটে'। তাতে লড়িয়ে দুজনের সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয়েছে মিঃ জি ও মিঃ এ। মিঃ জি একজন অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল, আর মিঃ এ "one of the Proprietors of the Library." দুজনেই শিক্ষিত ব্যক্তি সন্দেহ নেই। বিশেষত, মিঃ জি আইন-ব্যবসায়ী। ডুয়েল যে নিষিদ্ধ ব্যাপার তিনি জানেন। তবুও দুজনে লড়লেন। ঘটনাটা লড়াইয়ের উপযুক্ত বটে! 'কালকাটা গেজেটের' মতে, দুজনের মধ্যে জুয়া খেলতে গিয়ে একজন অন্যজনের কাছে কিছু দেনায় আটকে যান। তাতেই বিবাদ এবং অবশেষে তার নিষ্পত্তির কারণে—এই লড়াই!

যা হক, লড়াই হল। লাইব্রেরিয়ানের গুলিতে আইনজীবী মারা গেলেন। বিজয়ী জুয়াড়ি ঘরে ফিরলেন। কিন্তু পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে বসল তাঁকে। বোধহয় নিহত ব্যক্তিটি আদালতের লোক বলেই কর্তাদের মনে পড়ে গেল যে, এ বিষয়ে একটি আইন আছে কোম্পানির খাতায়ও। তাতে স্বেচ্ছায় লড়তে গিয়েও যদি কেউ মারা যায় কারও হাতে, তবে নরহত্যার দায়ে পড়বে দ্বিতীয় জন। মিঃ এ নরহত্যার দায়ে পড়লেন।

মাস তিনেক বাদে একদিন কাগজে বের হলঃ গত মঙ্গলবার মিঃ এ'র বিচার হয়ে গিয়েছে। বিকাল পাঁচটা অবধি তাঁর বিচার চলে, শেষে কিছুক্ষণের জন্যে জুরীরা আদালত-কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে তাঁরা একসঙ্গে সবাই ঘোষণা করলেন—'Not Guilty'—আমাদের মতে আসামী নির্দোষ।

আর দোষী হলেও মিঃ এ'র সাজা হত পাঁচ টাকা কি দশ টাকা জরিমানা। তার বেশী নয়।

উপসংহারে একটি প্রশ্ন থেকে যায়: বাঙালীবাবুরা ইংরেজের নকল করতে কোন ত্রুটি করেছেন এমন অপবাদ শত্রুতেও কোনদিন দেয়নি। কিন্তু তবুও কেন তারা এই বিলিতি খেলাটি সযত্নে পরিহার করে চললেন?—প্রাণের মায়ায়?

বোধহয় নয়। আমার মনে হয়, খেলাটা কম পয়সার বলেই তাতে ওঁদের মন ধরেনি। সাহেবদের ডুয়েল লড়াইয়ের জরিমানা পাঁচ-দশ টাকা, বাঙালীবাবু পাঁচ-দশ লাখের কম নামেন না। আর তাঁর লড়াইয়ের উপলক্ষ্যও যথেষ্ট কুলীন। শ্রাদ্ধ, বিড়াল অথবা নাতির বিবাহ কিংবা দুর্গোৎসব। গোটা শহরকে সাক্ষী রেখে পাঁচ লাখের অপমান তিনি সাত লাখে ঘোচান। সাত লাখের ফিরতি দেন আর একজন দশ লাখ পুড়িয়ে। তাতেও যদি কেউ না ঘায়েল হয় তবে আবার হবে আসছে পুজোয় কিংবা এই যে বুড়ো মাতামহ আছেন, তিনি

বিগত হলে তাঁর শ্রাদ্ধে। চ্যালেঞ্জ রইল। হিম্মত হ্যায় ত লড়ো!

এমনি চ্যালেঞ্জ দিতে এবং নিতে কত বঙ্গবীর যে ধরাশায়ী হয়েছেন সেদিনের কলকাতায় তার ইয়ত্তা নেই।

সুতরাং আমরা মিছিমিছিই সাহেবদের সুখ্যাতি করি। বিশেষত মনে রাখতে হবে, ইজ্জতের লড়াইয়ে লড়িয়ে বাঙালী একা মরেনি, অধস্তন কয় পুরুষদেরও কবর দিয়ে গেছে।

'অসবর্ণে আপত্তি নাই'
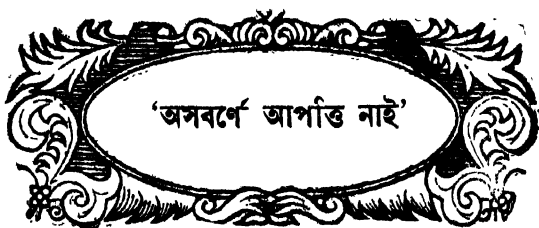
বর্ণ মানে যদি রং হয় এবং যদি তা গাত্রবর্ণ সম্পর্কিত হয় তবে আলবৎ আপত্তি আছে। আমরা যারা কালো, স্ব-বর্ণে রাজী হতে তাদের সব সময়েই গররাজী। এমন কি শ্যাম বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের যারা, তাদেরও নজর 'ফর্সা এবং সুন্দরীর' দিকে। 'ফর্সা' মানেই যে সুন্দরী এ বিষয়ে আমাদের পাত্রপক্ষ একমত। বোধ হয় পাত্রীপক্ষও। যে কোন রোববারে যে কোন একখানা বাংলা কাগজে চোখ বুলালেই বুঝতে পারবেন এই বর্ণ-দর্শন কত সত্য। নটিংহামের ছোকরারা এই কাগজ দেখিয়েই কাগজওয়ালাদের ঘায়েল করছে আজ। ভারতবর্ষের কাগজ থেকে 'কাটিং' নিয়ে তারা হাতেকলমে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে—'ফেয়ার কম্‌প্লেকশানের' দিকে কি ক্ষুধাতুর নজর নেটিভ এবং নিগারদের। পকেটে ওদের পয়সার জোর আছে। তাতেই আমাদের ফর্সা মেয়েদের ওরা নিয়ে নিচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে। যেমন ভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিয়েছিল মিসেস কেরীকে।

কেরীর গায়ের রং ছিল ফর্সা। বয়সও কম। সিরাজ তাই নাকি তাকে হাতে পেয়ে অন্য বন্দীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন তুষ্ট মনে। নয় বছর ছিলেন মিসেস কেরী সিরাজের হারেমে। বহুৎ খাতির ছিল তাঁর। ঐতিহাসিক এবং এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা অবশ্য এটা ভুলে গিয়েছিলেন যে—ন' বছর কেন, এ ঘটনার পরে পুরো একটি বছরও বেঁচে থাকার ভাগ্য হয়নি বেচারা নবাবের। পরবর্তী কালে এটাও অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে মিসেস কেরী অপহৃতা হননি। মিঃ কেরীকে তথাকথিত 'ব্ল্যাক হোলে' হারিয়ে তিনি অন্য একজনকে নিয়ে আঁধার ঘরে আলো জ্বালিয়ে সংসার পেতেছিলেন আবার।

নটিংহামের পাড়ার-ছেলেরা এ সব তথ্যে রাজী নয়। তারা ইতিহাস পড়ে না, ইতিহাস শোনে। মিস এমিলি ইডেন নাকি তাদের জানিয়ে গেছেন যে এ দেশের জনৈক রাজপুত্র 'ইংরেজী রাণীর' জন্যে পাগল! নটিংহামের ছেলেরা নিজেদের চোখে দেখেছে—ভারতবর্ষের রাজপুত্রেরা ফি বছর একটি দুটি করে রাজকন্যা না হলেও তাদের পাড়ার মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়—নিজেদের দেশে। টেডি ছোকরারা—প্লেনের সিঁড়িতে তাদের হাস্যমুখর 'টা-টা' মার্কা ছবিগুলো দেখে আর কোমরের বেল্ট কষে। বৃটেনকে সাদা রাখতে চায় তারা। অসবর্ণে তাদের ঘোরতর আপত্তি।

কিন্তু সব সময়ে নয়। আবার রোববারের কাগজটা খুলুন একটু। দেখবেন, আমরা সব সময়ে আপত্তি করি না। শতকরা দশজন অন্তত

প্রকাশ্যেই সে কথা জানিয়ে রেখেছেন। 'অসবর্ণে আপত্তি নাই—' যাদের সেই দশজনের একজন—বিপত্নীক, দ্বিতীয় জন বিপত্নীক এবং পাঁচটি সন্তানের জনক, তৃতীয় জন পঞ্চাশোর্ধ্বে, চতুর্থ জন—আরও ঊর্ধ্বে (এর বিবাহের উদ্দেশ্য শাস্ত্রালোচনা করা, কোন তরুণীকণ্ঠে গীতামাহাত্ম্য শ্রবণ), পঞ্চম জন—বিবাহিত, তবে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত, ষষ্ঠ জন—মেধাবী তরুণ, উচ্চাভিলাষী যুবক, পত্নী নামক ডিঙি নৌকার সাহায্যে ইনি সপ্তসাগর পার হয়ে বিলাত গমনে ইচ্ছুক এবং সপ্তম জন—সমাজসংস্কারক ও দেশহিতৈষী। শুধু অসবর্ণে নয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিষ্য হিসেবে ইনি কোন 'বয়স্থা বিধবার' পাণিগ্রহণেও সম্মত। বাকী তিনজনের কথা আর বলার দরকার নেই। তাঁরাও উল্লিখিত এই সপ্ত কুলোদ্ভব কুলীন রাঢ়ী অথবা বারেন্দ্র বঙ্গসন্তান। উল্লিখিত এক বা একাধিক লক্ষণাক্রান্ত।

যে যে পরিস্থিতিতে এই বঙ্গসন্তানেরা অসবর্ণে আপত্তি করেন না, তা লক্ষণীয়। লক্ষ্য করলেই দেখবেন, কারণগুলো ব্যক্তিগত। খুব বড়ো করে ধরলেও পরিবারের সীমার বাইরে তাদের আনা যায় না। তা ছাড়া আমরা বাঙালীরা পরিবারের সীতা-গন্ডীর বাইরে পা-ও বাড়াই বড় কম। কিন্তু ইংরেজদের ঘটনা ঠিক তার উল্টো। বার-ই তাদের ঘর, ঘর তাদের বার। এই সেদিন অবধিও তাই ছিল। আজ অবশ্য আবার ঘর নিয়েছে তারা। নটিংহামের ছোকরারা তাই ভুলে গিয়েছে সেদিনের ইতিহাস। তাই তারা দাঙ্গা করে। দাঙ্গা করে ইংলন্ডকে ফর্সা রাখতে চায়। অসবর্ণে তাদের ঘোরতর আপত্তি।

কিন্তু ইতিহাস বলে—আমাদের মতোই এককালে বর্ণ-বৈচিত্র্যে রাজী ছিল তারা, ইংরেজেরা। এবং রাজী ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন কারণে। সে কারণটির নাম দিয়েছি আমি একাদশ কারণ। ইংরেজীতে তার টীকাঃ—

"We are sure to find something blissful and dear
And that we are far from the lips we love
We make love to the lips that are near."

অষ্টাদশ শতকের কোলকাতায় এই নটিংহাম, ডাবলিন, ইয়র্কশায়ারের ছোকরাদেরই গান ছিল এটা। কোথায় লিসি-ডরোথি-এমেলি, খিদিরপুরের ক্ষেন্তমণির কালো কুচ্‌কুচ্ মেয়েটার মতো মেয়ে হয় না আর! জাহাজ থেকে লাফিয়ে ডাঙায় পড়তে ইচ্ছে করে ওকে দেখে। ও 'সাইরেন' (siren) ডার্ক সাইরেন। কালো মায়াবিনী।

শুকনো কাঠের দাউ দাউ আগুনে কালো মেয়েটাকেই ফর্সা দেখেছিলেন কোলকাতার জনক জব চার্ণক।

"Cries Charnoc—Scatter the Faggots!
Double that Brahmin in two!
The tall pale widow is mine,
Joe the little brown girl is yours."

পাটনার কাহিনী। গঙ্গার ধারে সন্ধ্যায় হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন চার্ণক। সঙ্গে সহচর ইয়ং বা তরুণ জো। জোর বয়স তখন চৌষট্টি। তাদের আগে আগে মশাল। পেছনে সিপাই। হঠাৎ নজরে এল হৈ হট্টগোল। চার্ণক

এগিয়ে গেলেন। 'সুতী' হচ্ছে। গঙ্গার ধারে সতীদাহ। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ছে। গৌরবর্ণা সুন্দরী সোমত্ত একটি মেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে চিতার দিকে। স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরবে। সতী হবে। সতীদাহ আরও হয়েছে। এদেশে হয়। চার্ণক তাতে বাধা দিতে যাননি কোনদিন। কিন্তু আজ তাঁর মনে লেগে গেল ঐ দীর্ঘাঙ্গী, ফ্যাকাশে (বা ফর্সা) মেয়েটিকে। কুঠিয়াল চার্ণক হুঙ্কার দিলেন—অসবর্ণে আপত্তি নেই। জো, ঐ বুড়ো বামুনকে কেটে দু' খণ্ড কর। কাঠ-খড় হটাও। এই মেয়েটি আমার। তোমারও চাই? বহুত আচ্ছা, ঐ বাদামী রংএর ছোট্ট মেয়েটি তোমাকে দিলাম। তুমিও তো কালো। সুতরাং আপত্তি কিসের জো? কৌটির কথা ভাবছ? ও ভাবনা ছেড়ে দাও এখন! আপাতত অসবর্ণে আপত্তি করো না।

হিন্দুস্থানীকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন চার্ণক। প্রকাশ্য সংসার। ছেলে মেয়ে জামাইয়ের ঘর। চার্ণক-গিন্নীর সতী হওয়ার কথা। সুতরাং তিনি খ্রীষ্টান হলেন না। সাহেবকে বলে কয়ে—পঞ্চপীরের শিষ্য করলেন। বরাবর চার্ণক তাই ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অন্য একজন সাহেব লিখে গেছেন: তিনি যে খ্রীষ্টান ছিলেন তার প্রমাণ স্ত্রীকে না পুড়িয়ে তাকে কবর দিয়েছিলেন তিনি। আর তিনি যে খ্রীষ্টতন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর বাৎসরিক মুরগী জবাই। প্রতিবছর একখানা করে মুরগী কাটতেন চার্ণক তাঁর বিবির কবরে।

খ্রীষ্টান মতে মুরগী না হলেও, কোম্পানীর মতে তখনও বিবি নিষিদ্ধ। জন লিচল্যাণ্ড নামে এক সাহেব দেশী বিবি নিতে গিয়ে চাকরী খুইয়ে ছিলেন কোম্পানীর হাতে। পাঁচ বছর বেকার থেকে শেষে সুরাটে গিয়ে তিনি কাজ পান। চিরস্থায়ী কাজ। কেউ বলেন—নরকের পাহারাদারের কাজ, কেউ বলেন—স্বর্গে ফুল তোলার কাজ।

উভয়বিধ কাজেই ক্রমে অনেক লোক হয়ে গেল। ফলে—কোম্পানীর কর্তাদের মনে 'হোলি ফাদার' নতুন মন্ত্র দিয়ে দিলেন। তাঁরা অতঃপর ঘোষণা করলেন—সার্জেণ্টের নীচুতে যারা, অর্থাৎ যারা সাধারণ নাবিক বা সৈনিক তাদের পক্ষে দেশীয় বিবি গ্রহণে কোন বাধা নেই। তবে মান্যগণ্যরা যেন এমন কাজ না করেন। তাতে মহিমান্বিত কোম্পানীর পক্ষে অসম্মান, এবং ঈশ্বরের পক্ষে ক্রোধের কারণ হবে।

লেঃ কর্নেল কির্কপ্যাট্রিক খুব মজলিসী মেজাজের মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন—ক্রোধ না ছাই। যে আগুন দেখেছিলাম আমি, তাতে কোম্পানীই ছাই হয়ে যায়, আমি তো কোন্ ছার! কির্কপ্যাট্রিক ছিলেন হায়দ্রাবাদে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট। দীর্ঘদিন (১৭৯৮-১৮০৫) এ কাজে বহাল ছিলেন তিনি। একবার নিজামের দরবারে গেছেন সরকারী কাজে। আরও অনেক-বার গেছেন। নিজামের যে বিবিমহল আছে তা তিনি জানতেন না। বিবিরা যে ইচ্ছা করলে জাফরীকাটা জানালা দিয়ে দরবার দেখতে পারেন তাও না।

সেদিন দরবার সেরে মাত্র নিজের বাংলোয় এসেছেন। বারান্দায় বসে হুঁকোর নলটা হাতে নিয়েছেন—এমন সময় দেখা গেলো একখানা পাল্কী আসছে তাঁর ঘরের দিকে। ঝালর ঘেরা সুন্দর দরবারী পাল্কী। প্যাট্রিক নড়ে চড়ে বসলেন। পাল্কী এসে থামলো তাঁর দোরগোড়ায়। ধীরে ধীরে

দরজাটা খুলে গেল। ভেতর থেকে নামলেন এক বৃদ্ধা।

বিস্মিত সাহেব তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। বুড়ি হেসে বললেন—তিনি একটি অতিশয় সুখকর প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। নিজাম বাহাদুর বক্সী সাহেবের একমাত্র কন্যা খয়ের-উন্নিসা তাঁর পাণিপ্রার্থী। তিনিই সাহেবের কাছে তাঁর মনোবাসনা জানবার জন্যে পাঠিয়েছেন ওঁকে। সাহেব বিশ্বাস করলেন না তাঁর কথা। কারণ, তাঁর তখনও এ জ্ঞান লোপ পায়নি যে ঘটনাটা ঘটেছে হিন্দুস্তানে এবং এই প্রণয়িনীটি হারেমবাসিনী।

ঘটকালি কাজে বৃদ্ধার প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু তাঁকে বিফল হয়ে ফিরতে হলো। সাহেব 'পাগলী' বলে উড়িয়ে দিলেন তাঁকে।

দিন যায়। হঠাৎ আর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে এমনি আর এক পাল্কীর আবির্ভাব। কির্কপ্যাট্রিক ভাবলেন—আবার বুঝি এলো সেই ডাকিনী বুড়ি। কিন্তু এবার আর বুড়ি নয়। পাল্কী থেকে নামলো একটি অষ্টাদশী মেয়ে। এবার আর প্রস্তাব করতে হলো না তাঁকে। সাহেব-ই প্রস্তাব করলেন।

বক্সী সাহেব শুনে বললেন—এমন জামাই পেলে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু সাহেবকে মুসলমান হতে হবে। সাহেব বললো—আলবৎ হব।

লেঃ কর্নেল জেমস কির্কপ্যাট্রিক হলেন—হাসমৎ জঙ্গ। তাঁর কুঠির নাম—রঙ্গমহল। ওয়েলেসলি তখন গভর্নর-জেনারেল। শুনে ক্ষেপে গেলেন তিনি। অনেকে ভাবলেন—এবার বুঝি বেচারার চাকরীটি যায়। কিন্তু কোম্পানী—কোম্পানী। কাজ পেলে তাদেরও আপত্তি নেই অসবর্ণে। ওয়েলেসলি তার 'সার্ভিসবুক'টা দেখলেন। দেখলেন—কির্কপ্যাট্রিক এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হওয়ার পর কোম্পানীকে যা দিয়েছে তাতে কোম্পানী তাকে একটি বিবি অনায়াসেই দিতে পারে। তিনি সানন্দে ঘোষণা করলেন—কির্কপাট্রিককে যাতে ব্যারন করা হয় তার জন্যে তিনি সুপারিশ করবেন।

ব্যারন হওয়ার আগে কির্কপ্যাট্রিক নবাব হলেন। তিনি হিন্দুস্তানীদের মতো গোঁফ রাখলেন, হাতে মেহেদী মাখলেন। এলিফ্যানস্টোন বলেছেন—ভয়ের কিছু নেই, গোঁফ হুঁকা এবং মেহেদী বাদ দিলে কির্কপ্যাট্রিক দিব্যি ইংরেজ আছেন এখনও।

কির্কপ্যাট্রিকের সন্তান ছিল দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি মারা গেল। ক্রমে তার বাবাও। ছুটিতে কোলকাতা এসে মারা গেলেন কির্কপ্যাট্রিক। মেয়ে গেল বিলেতে। খয়ের-উন্নিসার মেয়ে। তার মাধ্যমেই চিরকালের মতো বেঁচে রইলো—এই অসবর্ণ কাহিনীটি। কার্লাইল প্রেমে পড়লেন তার। তাঁর 'রেমেনিসেন্সের' নায়িকা—কিটি কির্কপ্যাট্রিকই—ক্যাথারিণ অরোরা। আমাদের এই কির্কপ্যাট্রিকের কন্যা।

কির্কপ্যাট্রিকের মতো রোমান্সের জীবন কর্ণেল গার্ডনারেরও। তবে গার্ডনার ঠিক কোম্পানীর কর্মচারী নন। তিনি ছিলেন ফ্রি লান্সার। তাঁর গল্পটা তাঁর নিজের মুখেই বলি। —

"আমি তখন জোয়ান ছোকরা। কাম্বের একজন দেশীয় রাজার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি নিয়ে আলোচনার ভার পড়লো আমার ওপর। দিনের পর দিন চললো দরবার। প্রতিদিন আমি যাই। একদিন আমার পাশেই দেখি ধীরে ধীরে নড়ে উঠলো একখানা পরদা। তাকাতেই চোখে পড়লো দুটি আশ্চর্য

চোখ। বড় বড় কালো, ডাগর দুটি চোখ। পৃথিবীতে এমন সুন্দর চোখ বুঝি আর হয় না। সন্ধিচুক্তি চুলোয় গেল। আমাকে পেয়ে বসলো সেই চোখ দুটি। I felt flattered that a creature so lovely as she of these deep black, loving eyes must be, should venture the gaze upon me!

দরবার ভাঙলো। জানতে পারলাম মেয়েটি যুবরাজের কন্যা। অপেক্ষায় রইলাম। আবার সেই দরবার। আবার সেই কালো চোখ। The Pardah again was gently moved and my fate was decided.

কথা হলো অভিভাবকদের সঙ্গে। আমি বললাম, মনে রাখবেন নবাব, আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করবেন না। আমি ঐ চোখের মালিককেই চাই। অন্য কাউকে নয়। সে চেষ্টা যদি করেন তবে ধরা পড়বেন। আমাকে ঠকায়, এমন সাধ্য কারও নেই ।

বিয়ের দিন আমি ধীরে ধীরে ঘোমটা উঠালাম। আর্শিতে ফুটে উঠলো তার মুখ। সে হাসলো। আমিও হাসলাম।

কর্নেল গার্ডনারের বাস ছিল খাসগঞ্জে। আগ্রা থেকে ষাট মাইল দূরে। বিস্তর সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। অসবর্ণ বিয়ের এমন পৃষ্ঠপোষক বোধহয় ইংরেজদের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন আকবর সা'র ভাইয়ের তালাক-দেওয়া স্ত্রী মুলকা বেগমের সঙ্গে। নাতনী সুসান গার্ডনারের বিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লীর এক বাদশাজাদার সঙ্গে। তাঁর নাতি-নাতকরদের আজও হয়ত পাওয়া যেতে পারে খিদিরপুর মাটিয়াবুরুজে কিংবা দিল্লি আগ্রার শহরতলীতে।

কির্কপ্যাট্রিক বা গার্ডনার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পরিশিষ্টে হলেও ইতিহাসে তাঁরা আছেন। কিন্তু হাজার হাজার গার্ডনার আছেন যাঁরা ইতিহাসে নেই, কিন্তু এখনও জ্যান্ত আছেন।

এবং ছিলেনও। এসিয়াটিকাস নামে এক সাহেব ১৭৭৪ সালে কোলকাতায় তাঁদের দেখেছিলেন। তাঁরা যে শুধু কালো মেয়েদের নিয়ে ঘর করতেন তা নয়, আস্তাবলের মতো কালো-মেয়েদের বা হিন্দুস্তানীদের নিয়ে হারেমও পুষতেন। এটা ছিল তাঁদের বিলাসের অন্যতম উপাদান। এসিয়াটিকাসের মতে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ 'কালো' বলে বদনাম থাকলেও হিন্দুস্তানী মেয়ে যারা চাক্ষুস দেখেছে তারাই জানে এ-কেমন কালো। "I have seen ladies of the Gentoo cast so exquisitely formed, with limbs so devinely turned, and such expression in their eyes, that if you can reconcile yourself to their complexions, you must acknowledge them not inferior to the most celebrated beauties of Europe. For my own part, I already begin to think of the dazzling of a copper-coloured face infinitely preferable to the pallid and sickly hue, which banishes the roses from the cheeks of a European Fair, and reminds me of the dark-struck countenance of ha-zarns races form the Grave." ইত্যাদি।

অর্থাৎ ফর্সার চেয়ে কালো ভালো। তামাটে হলে তো কথাই নেই। তবে ভিন দেশে। এসিয়াটিকাস শেষ অবধি কি মনস্থির করেছিলেন জানি না,—তবে এটা জানি যে, দ্য বোগে (De Boigue) দ্বিধা করেননি। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন খ্যাতনামা ভবঘুরে। তাঁর সবিশেষ খ্যাতির কারণ হিসাবে শোনা যায়, রুশ-সম্রাজ্ঞী 'ক্যাথারিণ দি গ্রেট' নাকি ছিলেন তাঁর একজন প্রণয়িনী। কিন্তু সাম্রাজ্ঞীর প্রেমের বাঁধন আটকে রাখতে পারল না তাঁকে। দ্য বোগে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন ভারতে। সিন্ধিয়ার অধীনে চাকরী মিলল একটা। ক'দিন যেতে না যেতে মিলে গেল মনের মত একটি বিবিও। মেয়েটি পারস্য-কুমারী, জাতিতে মুসলমান। তা হক, দ্য বোগের তাতে আপত্তি নেই। তিনি তাঁকে খৃষ্টান করে নিলেন। নামটাও পালটে পছন্দসই করে নিতে ভুললেন না। মুসলমানী মেয়ের নাম হল এখন—ক্যাথারিণ। সেই রুশ-সম্রাজ্ঞীর নাম।

সদ্য-পাওয়া এই নবীনা সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে দ্য বোগে এবার রাজধানী বসালেন। আলিগড়ে। ভবঘুরে এখন রীতিমত সংসারী। হিন্দুস্থানী গৃহস্থ। তাঁর বাড়ীতে এখন পোলাও কোর্মা ত কোন্ ছার, দিনরাত্তির গড়গড় করে হুঁকো পর্যন্ত চলে। বন্ধুরা বলেন—দ্য বোগের সংসারে সে কি শান্তি! চিরকালের ভবঘুরে। কিন্তু একবার মুখেও আনে না দেশত্যাগের কথা।

আনে না মানে, আনতে পারে না।—মিসেস শেরউড-এর মতে এসব মানুষ যে দেশে ফিরতে পারে না তার কারণ খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেন—এ ব্যাপারে বেচারাদের প্রধান প্রতিবন্ধক 'হিন্দু মেয়েরা এবং তাদের অগুন্তি জলপাই-রঙের ছেলেমেয়েগুলো। এদের জন্যেই প্রবাসী ইউরোপীয়ানদের হয় ঘরে ফিরবার ইচ্ছে নেই, কিংবা শক্তি নেই।'

তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ যে একেবরে না ফিরতেন তা নয়। এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ (১৮০৩) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে। বিজ্ঞাপনটির মর্ম : তালতলা বাজারের কাছে জমি সমেত একটি মস্ত বাগানবাড়ী বিক্রি হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতা জানাচ্ছেন—বাড়ীটি ক্রেতাদের পক্ষে খুবই 'ডিজায়ারএবল পারচেস' হবে। কেননা, ঐ একই দামে সেখানে তিনি একটি 'হিন্দুস্তানী ফিমেল ফ্রেণ্ড'ও পাবেন। বলা বাহুল্য, আজ যিনি বাড়ী বিক্রি করে স্বদেশে ফিরে চলেছেন—এই হিন্দুস্তানী মেয়েটি তারই 'বান্ধবী!'

এ ধরনের বান্ধবী নিয়ে ঘর করা কলকাতায় তখন চলতি রেওয়াজ। চার্লস ডি ওলি'র কবিতার নায়ক 'কৈ হ্যায়'ও (Qui Hi) তাই করে। কিন্তু তাই নিয়ে সাহেবপাড়ায় নানা কানাঘুষা। মিস ইণ্ডিগো যখন খবরটা শুনলেন—তখন তিনি মূর্ছা যান আর কি!

"Oh heaven!" Exclaimed Miss Indigo
And could he then used me so?
And with a black one too connected—?"

'কৈ হ্যায়' কিন্তু বিন্দুমাত্র দমলেন না। তার সংসার সংসারের রীতিতেই জমজমাট হয়ে উঠল। 'কৈ হ্যায়' পিতা হলেন।

"A precious precedent begun
A mistress first, and then a son."

বলা যেতে পারে, এগুলো অসামাজিক কাহিনী। গলিপথের গল্প। কিন্তু হেস্টিংস-এর বিশিষ্ট বন্ধু কর্নেল পিয়ার্স সাহেব যে আনুষ্ঠানিক-ভাবেই পান্না বেগমকে বিয়ে করেছিলেন তা গল্প নয়, ঘটনা। আজীবন নিষ্ঠাবান স্বামীর মত এই পারসিক মেয়েটিকে নিয়ে ঘর করেছিলেন পিয়ার্স। একটি ছেলেও হয়েছিল ওদের। নাম তার—মিঃ টমি। মা বললেন—এ নাম আমার পছন্দ নয়। ফলে ছেলে যখন হ্যারোতে গেল পড়তে তখন খাতায় নাম লেখা হল তার—মহম্মদ!

কাহিনী আর বাড়িয়ে লাভ নেই। সাহেবদের অসবর্ণে মতি ইতিহাসের ঘটনা। ইতিহাস যত্রতত্র বলে—তখনকার কোলকাতায় বড় মানুষদের ঘরে, ছোট মানুষদের বস্তীতে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হতেন সাদা মানুষেরা। অসবর্ণের প্রস্তাব তাঁদের চোখে। চাবাগানে, নীলকুঠিতে, কয়লাখনিতে সর্বত্র প্রায় দুটো শতক ধরে চলেছে তাঁদের আনাগোনা। তাঁদের কারও আপত্তি ছিল না অসবর্ণে।

অসবর্ণের এটাই একাদশ পরিস্থিতি। লণ্ডনের গলিপথে দরিদ্র ব্রজেন, হরিহর কিংবা আত্মারাম—এই পরিস্থিতিতে পড়েই কি আজ দাঙ্গার কারণ, কিংবা—রোববারের কাগজে কাগজে 'ফর্সা এবং সুন্দরী'র সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই তাদের এই বেপরোয়া জীবন, এ নিয়ে আমার সংশয় থাকলেও গার্ডনার-চার্ণক-কির্কপ্যাট্রিকের উত্তরপুরুষ নটিংহামের টেডিবয়দের তা নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগার কোন কারণ নেই।

আমি যদি বলি আমি কালিঘাটে বিয়ে করেছি তবে আমার স্ত্রী আপনাদের সামনে এমন ভাবে হো-হো করে হেসে উঠবেন যেন আমি একজন মস্ত গল্প-বলিয়ে। কিন্তু আমি যদি বলি আমার এক বন্ধু কালিঘাটে বিয়ে করেছেন তা হলে তিনি এমন ভাবে মুখ চোখ পেতে নড়েচড়ে বসবেন যেন সে-কাহিনীটা এক্ষুনি তাঁর না শুনলেই নয়।

অথচ আপনাদের মত তিনিও নিশ্চয় জানেন, এ বিষয়ে শোনবার মত সত্যিকারের মজাদার কোন কাহিনী কালিঘাটের তহবিলে কিছু নেই। তা বুড়ো বর আর কনে বৌ-ই হোক কিংবা থার্ডইয়ারের মেয়ে আর ম্যাট্রিক-ফেল ছেলেই হোক। এমন কি, ফলবতী কন্যা আর স্থিরমতি সমাজসেবী হলেও কালিঘাটের পক্ষে তা কোন কাহিনী নয়। কারণ, কাহিনী বলতে আপনারা পাঁচজনে সাধারণত যা ভাবেন তা যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা পড়ে থাকে সেই টালার গলিতে, ধরমতলার রেস্তোরাঁয়, ঢাকুরিয়া লেকের আনাচেকানাচে কিংবা আর আর সম্ভাব্য পাঁচ জায়গায় যেখানে চিরকাল গল্পরা সব জন্মায়, বড় হয়। কালিঘাটের ট্রাম স্টপেজ-এ তার কোন-কোনটা কখনও কখনও কিছুক্ষণের জন্য ছিটকে এসে দাঁড়ায় সত্য, কিন্তু সে কখনই পুরো গল্প নয়। গল্পের শেষ একটি কি দুটি লাইন মাত্র। হয়তো এটিও শেষ লাইন নয়, ছাপাখানার খাপছাড়া কপির মত আপাতত শেষ মাত্র। তার আগে যেমন আরও ছিল, পরেও তেমনি আরও আছে। কিন্তু কালিঘাটের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তা শুনতে চান না, ভাবতে চান না। তার শুধু এক কথাঃ ডালি কত'র হবে? পাঁচ আনার না পাঁচ সিকের?

রেগে গিয়ে বললাম—পাঁচ টাকার।

লোকটা থমকে দাঁড়াল। আরশুলার দিকে ত্রস্ত পায়ে এগুতে এগুতে টিকটিকিটা হঠাৎ যেমনি থমকে দাঁড়ায় তেমনি। তারপর একটা আশ্চর্য বিচক্ষণতায় আমার দিকে কানটা বাড়িয়ে দিয়ে নীচু-গলায় বলল—পাত্রী কোথায়?

এতটার জন্যে তৈরি ছিলাম না। ভাল করে তাকালাম লোকটির দিকে। হাড্ডিসার দেহে ব্রাহ্মণের রং। জায়গায় জায়গায় তামাটে হয়ে গেছে সত্য তবুও রংটা যে পাকা তাতে সন্দেহ নেই। গর্তে-বসা দুটি কটা চোখ। দুটি চোখই যেন নকল। তাতে কোন জিজ্ঞাসা নেই। কোন স্পৃহা আছে বলেও তো মনে হয় না। এ যেন পাকা মুদিওয়ালার মামুলি জিজ্ঞাসা—কত দেব?

এক পো, না—এক সের? যেন, পাঁচ সিকের ডালি আর পনের বছরের একটি পাত্রী এক জিনিস। লোকটার উপর মুহূর্তে আস্থা জন্মে গেল আমার। এ আমাদের সরকারী প্রজাপতি অফিসের সেই লোকগুলোর মত নয়। যতবার ওদের দেখেছি ততবারই আমার ভীষণ সন্দিগ্ধমনা মনে হয়েছে ওদের। বড্ড বেশি জানতে চায় ওরা। এমন কি, চোখমুখগুলো পর্যন্ত যেন পড়তে চায়। যেন বিয়ে দেওয়া নয়, কোন মতে বিয়েটা ভেঙে দেওয়াই ওদের কাজ, কর্তব্য। অথচ আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটি সে কত সংক্ষিপ্ত, সরল।

বললাম—পাত্র এবং পাত্রী দুই-ই আছে। ব্যবস্থা হলেই নেমে আসবে গাড়ি থেকে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কিন্তু জানতে চাইলেন না—গাড়িটা ঘোড়ার গাড়ি না মোটর! মোটর হলে, নিজেদের, না ভাড়া-করা! তিনি আমাকে চোখে ডাকলেন। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন। তার পিছু-পিছু একটা ঘরে এসে দাঁড়ালাম। মাটির ঘর। দেওয়াল মেঝে সব মাটির। দেখে মনে হয় শোবার ঘর। রাত্রে কেউ হয়তো ঘুমোয়। হয়তো কোন যাত্রী, হয়তো আমাদের রেজিস্ট্রার নিজেই। এক কোণে একটা মাদুর এবং গোটা দুই বালিশ জড়ানো। দরজায় দাঁড়িয়ে ভাল করে চারপাশটা দেখে নিলাম একবার। এই ঘরটার পিঠোপিঠি সামনের ঘরটায় দোকান, পেছনে এবং চারপাশে আরও ঘর। এমনি ছোট ছোট, এমনি নিস্তব্ধ।

বর-কনে ঘরে এসে বসলেন। কি করে খবরাখবর হল কলকেত্তাশ্বরীই জানেন,—রেজিস্ট্রার ঠাকুরের একটি সহকারিণী এসে জুটলেন। তিনিও তাঁর ওপরওয়ালার মতই প্রায় নির্বাক। তেমনি গম্ভীর, তেমনি রহস্যময়ী। মহিলাটিই দুটো মালা নিয়ে এলেন এবং অন্যান্য উপচার। দেখলেই বোঝা যায় আরও অনেক বিয়েতে ডিউটি দিয়েছে জিনিসগুলো। তা দিক। কিন্তু ওদের চালচলনটা হঠাৎ কেমন অতিরিক্ত ধীর ঠেকল আমার কাছে। তবে কি বর কনেকে ওঁরা বোঝাতে চান—যে এ-বিয়েও বরাবরের সেই বিয়ের মতই! আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—ঠাকুর, তাড়াতাড়ি।

রেজিস্ট্রার উত্তর দিলেন—যে আজ্ঞে।

এরপর দশ মিনিটও লাগল না বোধ হয়। ঠাকুর বললেন—ডালি নিয়ে আসি, মাকে দেখে যাবেন চলুন। বোঝা গেল—অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বের করে দিয়ে পাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।—নাঃ, তার আর দরকার নেই।

এবার সহকারী মেয়েটির পালা। সে হাত পেতে দাঁড়াল।—শুভ কাজ শেষ হল, আমাকে কিছু দেবে না বাবা?

আরও একটা টাকা খরচ হল। মোট এগারো টাকা। দরদাম কিছু হল না, পাঁজিপুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হল না, কুষ্ঠি-ঠিকুজির বিচার-ব্যাখ্যান কিছু দরকার হল না—নিঃশব্দে বিয়ে হয়ে গেল একটি ছেলের এবং একটি মেয়ের। সময় লাগল মাত্র মিনিট কয়েক, টাকা এগারোটি। ইচ্ছে করলে আরও বেশি দেওয়া যেত অবশ্য। কিন্তু ইকনমিকস-পড়া বন্ধু বললেন—সেটা অপচয় হত মাত্র।

—ইচ্ছে করলে আরও কমেও চালাতে পারতে তুমি—আমি বললাম।

—এর চেয়ে কমে বিয়ে হলেও করা ঠিক নয়। হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন নববিবাহিতা বন্ধু-পত্নী।

বর-কনেকে একটা বাসে তুলে দিলাম। এবার ওরা স্বামী-স্ত্রী। আর কেউ মানে বা না মানে,--এই মুহূর্ত থেকে ওরা অন্তত তাই জানে। অবাক লাগছিল ভাবতে। ওদের জীবনের ছোট্ট একটা গল্প ক'মিনিটে কেমন আশ্চর্য-ভাবে আমার চোখের সামনেই একটা বড় গল্পের মোড় নিয়ে হাসতে হাসতে বাসে চেপে বসল! জাগ্রত কালী, কলকাতা শহর, রাশি রাশি মানুষ, ট্রাম, বাস—কেউ জানলও না। কালিঘাটকে মনে মনে বড় ভাল লাগল আমার। কালিঘাটের ইতিহাস আমি জানি। কালী-মাহাত্ম্যের নানা কাহিনীও আমার মুখস্থ। কিন্তু এ যেন এই ঐতিহাসিক পীঠটির এক নতুন পরিচয়। এখানে বিবাহিত মেয়েরা কুমারী হয় শুনেছি। নিজের চোখে দেখেছি, শিশু অশোকের ডালে রাশি রাশি মাটির ঢেলা ঝোলে এখানে। কালিঘাট বন্ধ্যা নারীকে নাকি পুষ্পবতী করে। কিন্তু কালিঘাট দুটো মানুষের বে-আইনী গোপন বাসনাকে এক মুহূর্তে খুশীর আতরে চুবিয়ে এমন শাহান-শা বানিয়ে ছেড়ে দিতে পারে, এ নিজের চোখে না দেখলে কোনদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি। এই কলকাতা শহরে একটা অন্তত এমন জায়গা আছে তাহলে, যেখানে দিকে দিকে পেনালটির দাগ কাটা নেই, রেফারীর শাসন নেই এবং সামাজিক নিয়মেরা মুহুর্মুহু যেখানে নিষেধের বাঁশী বাজায় না। বাজালেও, কেউ শোনে না। কালিঘাটে কড়া সরকারী আইনকেও গোঁফচাড়া দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অপেক্ষা করতে হয় সেই মেটে ঘরটির দাওয়ায়। ঘরে ঢুকতে সাহস হয় না তার। অথবা, ইচ্ছে। নেহাত যদি কোন বেপরোয়া পিতৃপক্ষ পুলিস-কাছারির হাত ধরে ঢুকেও পড়েন সেখানে তাহলেও একবারের জন্যে হলেও নিশ্চয় থমকে দাঁড়াতে হবে তাঁকে। কেননা, স্থানটি—কালিঘাট।—অর্থাৎ দেবভূমি। এবং দশটি টাকা নিলেও যে হাত সিঁদুর পরিয়েছে কুমারী মেয়ের কপালে, তিনি মাইনে-করা রেজিস্ট্রার নন, পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

সুতরাং বে-আইনী হলেও মা কালীর ভারে আর পাণ্ডা পুরোহিতদের ধারে দিব্যি আছে কালিঘাট তার ম্যারেজ আপিস নিয়ে। চিরকাল তাই ছিল। দরকার হলে চিরকাল তাই থাকবেও।

আদি গঙ্গার ধারে আজকের এই কালিঘাট তার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারদের নিয়ে বরাবর হয়তো ছিল না। থাকলেও, এমন জমজমাটি কারবার নিশ্চয় ছিল না তাদের। কিন্তু অসামাজিকতার তীর্থ কোন-না-কোন কালিঘাট পৃথিবীর হেন দেশ নেই যেখানে না ছিল। এমন কি, ছিল আজকের তথাকথিত সিভিল ম্যারেজ-এর পীঠভূমি খাস বিলেতেও। তার নাম গ্রেটনা গ্রীন। ইতিহাস বলে, ঊনিশ শতক অবধিও এই গ্রেটনা ছিল গোটা ইংলণ্ডের কালিঘাট।

গ্রেটনা জায়গাটা ইংলণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের সীমানায়। ভূগোলে এবং আইনে তখন স্কটল্যাণ্ডের অধিকার ছিল তার ওপর। ফলে ইংলিশ চার্চের খারিজ-করা পাত্রপাত্রীরা সব ছুটতেন ওখানে। ঠিক যেমনি আজ শহরতলী এবং মফস্বল শহরের অসামাজিকেরা ছুটে আসেন এখানে, কালিঘাটে। কালিঘাটের

মন্দিরের মত গ্রেটনায় চার্চ ছিল একটা। তবে পাকা খ্রীষ্টানদের মতে ঈশ্বর রাত-বেরাতে কখনও থাকতেন না সেখানে। কেননা, চার্চটা ছিল নন-অফিসিয়াল। সেদিক থেকে আমাদের কালিঘাট নিশ্চয় যোগ্য অথরিটি। অবশ্য রেজিস্ট্রার পাদ্রী পুরোহিতেরা দুই জায়গায়ই প্রায় সমশ্রেণীর। এদের মধ্যে কুল-বিচারে কে বড় কে ছোট সে বিচার বড় কঠিন। শোনা যায়, গ্রেটনায় যারা পাদ্রী সেজে সারমন ঝাড়তেন তাদের পনের আনাই ছিলেন আশপাশের গাঁয়ের চাষা-ভুষো জেলে কামার। কালিঘাট সম্পর্কে যা শোনা যায় তা এখানে না বলাই বোধ হয় ভাল। গ্রেটনার চার্জ ছিল কালিঘাটেরই মত। অর্থাৎ যে যেমন দেয়। লর্ড চ্যান্সেলার এরিস্কিন সাহেব নাকি দিয়েছিলেন কুড়ি পাউন্ড এবং লন্ডনের এক গরীব শ্রমিক মাত্র এক পেগ হুইস্কি! তাহলেও, কালিঘাটের মত গ্রেটনায় গরীবদের ভীড় হতো কম। কারণ, জায়গাটা আর-আর জায়গা থেকে অনেক দূরে। যেতে দিনকয়েকের মামলা। এত পথ হেঁটে যাওয়ার মত উৎসাহী পাত্রী মেলে দৈবাৎ। তার ওপর ভেগে পড়লে অভিভাবকদের খোঁজাখুঁজির সুযোগও বেশি। এ তো আর এমন নয় যে, স্কুলের টিফিনে সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে ফেরা যায় অথবা ইভিনিং শো'র টিকিট নষ্ট করে! সুতরাং, বিশেষ করে তাঁরাই গ্রেটনা ছুটতেন যাঁরা চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে মাইলের পর মাইল চলতে পারতেন। এবং তৎসত্ত্বেও ট্যাঁকে যাদের বিন্দুমাত্র ঝাঁকি লাগত না কখনও। যেমন—লর্ড ওয়েস্টমুর ল্যান্ড। এই স্বনামধন্য লর্ডটির গ্রেটনা অভিযান এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ভদ্রলোক পালিয়েছিলেন লন্ডনের এক বিখ্যাত ব্যাংকারের একমাত্র কন্যাকে নিয়ে। সেয়ানে সেয়ানে ব্যাপার। সুতরাং মাইল কয়েক পরমানন্দে গাড়ি হাঁকিয়ে চলার পরেই লর্ড সাহেবের নজরে পড়ল আরও একখানা চার-ঘোড়ার গাড়ি আসছে তাঁর পিছু পিছু। দূরবীনটা চোখে লাগাতেই স্পষ্ট বোঝা গেল, কোচম্যানদের যিনি হাত-পা নেড়ে আরও জোরে চালাবার হুকুম দিচ্ছেন—তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং তাঁর ভাবী শ্বশুরমশাই। সুতরাং, এবার গাড়ির বেগ আরও বাড়িয়ে দিতে হল লর্ডকে। দুই গাড়িতে শুরু হলো এবার রেস। ছুটতে ছুটতে গ্রেটনা কাছে এসে গেছে। মাত্র আর ঘণ্টা কয়েকের পথ। এমন সময় হঠাৎ লর্ডের গাড়ির একটা ঘোড়া পড়ে গেল। পেছন থেকে বন্দুকের গুলিতে গাড়ি থামাতে চাইছেন বেপরোয়া ব্যাঙ্কার। কিন্তু ওয়েষ্টমুর ল্যান্ডও আজ বেপরোয়া। তিনি তিন ঘোড়াতেই চললেন। শেষে ঘোড়া কমতে কমতে একটায় এসে যখন ঠেকল তখন অবাক হয়ে ব্যাঙ্কার দেখলেন তিনি সীমানার এপারে দাঁড়িয়ে। ওপারে তাঁর মেয়ে ওয়েস্টমুর ল্যান্ডের হাত ধরে কালিঘাটে নামছে। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি।

গ্রেটনায় আরও একটা ব্যবস্থা ছিল। তা বিয়ের পর হানিমুনের ব্যবস্থা। চার্চের গায়েই নাকি ছিল সারি সারি ঘর। নববিবাহিত দম্পতিরা ইচ্ছে করলেই পয়সা দিয়ে ব্যবহার করতে পারতেন সেগুলো। এই ঘরগুলোকে বলা হতো—'নেপচুয়াল চেম্বার'। ব্যবস্থাপকরা নিজেরা বলে গেছেন—এই চেম্বার-গুলোর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, বিয়ের ভিতটাকে একটু মজবুত করা মাত্র। গ্রেটনা বে-আইনী কারবার। সুতরাং, তাকে আঁটঘাট বেঁধে চলতে হবে বৈ কি।

কেননা, যদিই বা লণ্ডনবাসী কোন পিতা অস্বীকার করেন গ্রেটনাকে, নেপচুয়াল চেম্বারকে অস্বীকার করার মূঢ়তা তাঁদের হবে না নিশ্চয়। যুক্তিটার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসায়িক বুদ্ধি সুস্পষ্ট। আমার ধারণা, আমাদের কালিঘাটের রেজিস্ট্রার ঠাকুররাও একেবারে এ-বুদ্ধিরহিত ঠনঠনে ঘট মাত্র নন। তবে কি কালিঘাটের সেই মেটে ঘরটি এবং চারপাশের আরও আরও খালি ঘরগুলোও একই উদ্দেশ্যে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁরা?

সে খবর যাচাই করার ভার পেট্রনদের ওপর রইল। আমি বরং ততক্ষণে আর দুটো কালিঘাটের খবর বলি।

এ দুটিই আমাদের দেশী কালিঘাটের। তবে হিন্দুদের জন্যে নয়। একটি ছিল পর্তুগীজদের জন্যে, অন্যটি ইংরেজদের জন্যে। ওদেরও এদেশে এসে আমাদের মত কালিঘাটের দরকার পড়তো কেন নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন তা। ভারতবর্ষ শুধু বিদেশ নয়, বহু দূরের দেশ। এখানে সপরিবারে আসা মানে, হাত-পা সম্বল করে অ্যাটলাণ্টিকে ঝাঁপিয়ে পড়া। ইউরোপীয়রা তাই প্রথম প্রথম লোটা-কম্বল নিয়ে সিঙ্গলই আসতেন। আসতেন, কিন্তু থাকতে পারতেন না। প্রথম পথ দেখালো পর্তুগীজরা। তারা পুরানো খ্রীষ্টান। তাই জাতের বাছবিচার তাদের মধ্যে কম। ফলে এদেশে পা দিয়েই তারা দেশী মেয়েদের নিয়ে ঘরকন্না শুরু করে দিল। দেখাদেখি ডাচরাও হিন্দুস্থানে রুচি ফিরে পেল। কিন্তু দাঁত কিড়মিড় করে পড়ে রইলো ডেনরা আর ইংরেজেরা। তাদের জন্যে সাপ্লাই আসতো দেশ থেকে। কিন্তু সাপ্লাই-এর চেয়ে ভারতবর্ষে ডিমাণ্ড তখন বেশী। সুতরাং, কর্তৃপক্ষকে রীতিনীতি শিথিল করতে হলো কিছু কিছু। যেমন—সার্জেণ্টের চেয়েও নীচু পদে যারা কাজ করে তারা ইচ্ছে করলে পর্তুগীজ-পন্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু, সার্জেণ্টের চেয়ে উঁচুতে যারা তারা? বাধ্য হয়েই কালিঘাটের পথ ধরতে হল তাদের। অর্থাৎ, গীর্জার পথ।

ডালহৌসির সেণ্ট জন চার্চ কলকাতার ইংরেজদের পুরানো গীর্জা। কলকাতার খ্রীষ্টানদের এটিই আদি কালিঘাট। দেশ থেকে কোন জাহাজ আসছে এবং সে জাহাজে কিছু অবিবাহিতা যাত্রী আছে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যেত গীর্জার চারপাশে বাঁশ খাটানো হয়েছে। এবার ঝাড়পোছ করে রং লাগানো হবে। এদিকে শিকারীরা সব বাক্স-তোরঙ্গে ভালমন্দ যা ছিল চাপিয়ে চাঁদপাল ঘাটে আনাগোনা শুরু করে দিয়েছেন। উপস্থিত, জাহাজটা ঠিক কবে নাগাদ পৌঁছবে এটাই তাঁদের জ্ঞাতব্য। যদি শোনা গেল শুক্রবার; তবে সবাই দম ধরে কোন মতে পড়ে রইলেন কবে রোববার ভোর হবে তারই অপেক্ষায়! কারণ, জাহাজঘাটায় হামলা না করে—চার্চের দিনটি অবধি সবুর সইতে পারলেই মেওয়া ফলবার বেশী সম্ভাবনা।

রোববার চার্চ লোকে লোকারণ্য। সিবিলিয়ান, মিলিটারী, ব্যবসায়ী, ভবঘুরে—যেখানে যত অকৃতদার ছিল—সবাই এসে হাজির। কেউ মোগলাই কায়দায় গোঁফে আতর দিয়ে এসেছেন, কেউ চুলে কলপ। এক এক করে মেয়েরা আসছেন। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাত নিয়ে কর্নেল আর সাব-অল্টার্নে কাড়াকাড়ি। কে তাকে আগে হাত ধরে আসনে বসিয়ে আসবেন

তাই নিয়ে বিবাদ। মেয়েদের হাত ধরে আসন অবধি পৌঁছানোটাই ছিল সেকালের কলকাতায় চলতি রেওয়াজ। আরও একটা অদ্ভুত রেওয়াজ ছিল তখন সেণ্ট জন চার্চে। মেয়েদের মুখোমুখি বসতে হতো পুরুষদের। ফলে, চার্চ ভাঙলেও দেখা যেত এখানে-ওখানে টুকরো ভিড় জমে গেছে। এবং রেট চড়িয়ে জোড়া-পিছু পঞ্চাশটি করে সোনা মোহর গুনেও মক্কেলদের সাফ করতে পারছেন না পাদ্রী সাহেব। একদিনে আর ক'টা বিয়ে করাতে পারেন তিনি? সোফিয়া গোল্ডবার্ন নামে এক মহিলা একবার উপস্থিত ছিলেন সেণ্ট জন চার্চে এমনি একটি পরবের দিনে। কাণ্ড দেখে তিনি অবাক। দেশ থেকে ভবিষ্যতে যারা কলকাতায় আসতে পারে তাদের সাবধান করে তিনি লিখছেন—'খবরদার, কলকাতা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার। জীবনের যে-কোন সন্ধ্যায় এখানে সামান্য অসতর্কতায় তোমায় সম্মতিটুকু লুঠ হয়ে যেতে পারে। ভাল করে ব্যাপারটা বুঝবার বা পিছু হঠবার আগেই দেখবে মহামান্য পাদ্রী এসে দাঁড়িয়েছে তোমার সামনে। শুভকার্যের মজুরি হিসেবে গোটা কুড়ি মোহর চান তিনি!'

খ্রীষ্টানী কালিঘাটের এই পাদ্রীরা কিন্তু আমাদের রেজিস্ট্রার ঠাকুরদের মত ছিলেন না। তাদের আদবকায়দা, চালচলন সবই ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। মানুষ হিসেবে তাঁরা যেমন মোটাসোটা ছিলেন—অনেক ইংরেজ লেখকই স্বীকার করেছেন, বুদ্ধিতেও তেমনি। একটু উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন সে-তুলনায় আমাদের কালিঘাটের মাথা কত পরিষ্কার।

বিশপ হিবার সবে কলকাতা নামছেন। বামুনেরা শুনলেন—এবার একজন বাঘা পাদ্রী নামছেন কলকাতায়। এক গণ্ডূষে হিন্দুধর্ম নাকি গিলে ফেলবেন তিনি। শুনে কালিঘাট ঘাবড়ে গেল একটু। সব বামুনেরা মিলে একজনকে চর করে পাঠিয়ে দিলেন চাঁদপাল ঘাটে। পাদ্রীটি সত্যি সত্যিই কেমন সরেজমিনে একটু দেখে আসতে। হাড্ডিসার সেই যজমেনে বামুন দূর থেকে তাকিয়ে দেখে নিলেন হিবার সাহেবকে। সুপুরুষ, ইয়া উঁচু, রাজার মত চেহারা। আগে না জানলে হয়তো রাজাই ঠাওরাতে হতো ওঁকে। এক নিঃশ্বাসে তিনি ছুটে চলে এলেন কালিঘাটে। সবাই ছেঁকে ধরলেন। কি ব্যাপার? কি দেখলে ভায়া?

বামুন ধীরে ধীরে বললেন—আর যাই কপালে থাকুক ভাই, আজ যে সাহেব এসেছেন তাঁর থেকে অন্তত হিন্দুধর্মের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নেই।

পাদ্রীরা রাজার হালে থাকতেন। বছর বছর মাইনে বাড়তো তাঁদের, বাড়তো বিয়ের দক্ষিণা, শ্রাদ্ধ শান্তির ফি ইত্যাদিও। কিন্তু তাহলেও চার্চের কাজে কিছুতেই যেন মন বসতে চাইতো না ওঁদের। ম্যাকবেরি সাহেব লিখেছেন—কলকাতার একজন পাদ্রী শিকারে অতুলনীয়, অন্যজনের ব্যবসা সৈন্যবাহিনীতে বলদ সাপ্লাই করা এবং তৃতীয়জনের নেশা চীনা কায়দায় বাগান করা। কারও কারও নেশা ছিল জুয়া খেলা। এমনও নাকি ঘটতো যে, কাউকে কবর দিতে হলে পাদ্রীকে ধরে আনতে হতো জুয়ার আড্ডা থেকে। তাছাড়া. তাদের কারও কারও অন্য গুণও ছিল। ব্যারিস্টার হিকি সাহেব লিখেছেন—ব্লাণ্ট নামে সেনাবাহিনীর একজন পাদ্রী ছিলেন কলকাতায়। মদ

খেয়ে তিনি নেচে-কুঁদে এক একদিন দেখবার মত দৃশ্য সৃষ্টি করতেন চার্চে। সুতরাং, এহেন পাদ্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার ইংরেজি কালিঘাট যে সেদিন কেমন জমেছিল সহজেই তা অনুমেয়।

এমনই হুবহু কারবার তখন সেখানে যে কলকাতার বাবুদের সুপ্ত বাসনাটি পর্যন্ত দাউ করে জ্বলে উঠত তা দেখে। কেননা, আমাদের কালিঘাট তখনও ম্যারেজ আপিস খোলেনি। বাবুরা তাই সেজেগুজে চার্চের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন। অন্তত নীচের সমসাময়িক হিন্দুস্তানী ছড়াটির তাই রিপোর্ট।

"কৈ গির্জামে যাত বাত শিখনে কে কারণ
কৈ গির্জামে যাত বাত শিখনে উচ্চারণ
কৈ গির্জামে যাত যৈ সে সুন্দর নারী
কৈ গির্জামে যাত দেখরণ সুরত প্যারি।" ইত্যাদি

সমসাময়িক রিপোর্ট অনুযায়ী পর্তুগীজদের কালিঘাটটির খবর আরও লোমহর্ষক। শেষ করার আগে আমাদের কালিঘাট-পেট্রনদের সে খবরই পরিবেষণ করছি কিছু। কারণ, এতে তাদের কলজেয় বলবৃদ্ধির সম্ভাবনা।

পর্তুগীজদের কালিঘাটটি ছিল কলকাতা থেকে মাইল কুড়ি দূরে, ব্যাণ্ডেলে। ব্যাণ্ডেলের গীর্জা গোটা বাংলাদেশে একটা পুরানো গীর্জা। এর প্রতিষ্ঠা ১৫৯৯ সালে। অর্থাৎ চার্নক সাহেবের সুতানটি নামবারও প্রায় একশ বছর আগে।

বিদেশিনী নর্তকী লোলা মনটেজ

রেভারেণ্ড লঙ সাহেব লিখেছেন—ব্যাণ্ডেলের গীর্জার সংগে নাকি 'নানারি' ছিল একটা। সুন্দরী এবং কমবয়েসী সব খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীরা বাস করতেন সেখানে। তাঁরা সবাই হয়তো জাতে পর্তুগীজ ছিলেন না, হয়তো ইউরোপীয়ানও না। তবুও তো খ্রীষ্টান! ফলে যেখানে যত খ্রীষ্টান ছিলেন তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে আসতেন এখানে। ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন লিখেছেন—মেয়েদের নাকি যদৃচ্ছ পাত্রী হিসেবে কিনতে পাওয়া যেত সেখানে! ("They have a church, where owners of such goods and Merchandize are to be met with, and the Buyer may be conducted to proper shops, where the commodities may be seen and felt, and a priest to be security for the soundness of the goods".)

এশিয়াটিকাস নামে এক ছদ্মনামী সাহেব এ-সব শুনে ১৮০৩ সালে একবার গিয়েছিলেন ব্যাণ্ডেলে। কিন্তু হায়! তখন সব ফাঁকা। এশিয়াটিকাস খেদ করে লিখেছেন—Poverty now stalks over the ground where once beguiling priests led the weary stranger in the morning to the alter of god and in the evening to the chamber of riot, regardless of their Sacerdotal robes, here priests for gold were factors of pleasure! অর্থাৎ, যে ব্যাণ্ডেলে এককালে পাদ্রীরা ক্লান্ত পথিককে সকালে এনে দাঁড় করাতেন ঈশ্বরের বেদীর মুখোমুখী এবং সন্ধ্যায় যদৃচ্ছতার কক্ষে, আজ সেখানে চারদিকে দারিদ্র্যের পদচিহ্ন।

ইতিহাসের নিয়মে ব্যাণ্ডেল গরীব হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির পেছনকার কারণগুলোর মৃত্যু হয়নি বোধহয় আজও। তাই এযুগে আমাদের হয়ে জন্মেছে কালিঘাট। মনোমত পাত্রীর টানাটানি আমাদের নেই, তাই কালিঘাট ব্যাণ্ডেল হচ্ছে না। মনের সঙ্গে রক্তের স্পীড মিলছে না, মেজাজের কড়াকড়িটুকু এখনও আছে, তাই কালিঘাটও আছে। তবে এও নিশ্চয় চিরকাল থাকবে না। গ্রেটনা গ্রীন, সেণ্ট জন চার্চ বা ব্যাণ্ডেলের মত কালিঘাটের রেজিস্ট্রার ঠাকুরও নিশ্চয় ইতিহাস হয়ে যাবেন একদিন। এবং সে-দিনটি যে খুব দূরবর্তী নয় সে খবরও আমি দিতে পারি আপনাদের। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। আমার সেই কালিঘেটে বন্ধু-পত্নী আমায় বলেছেন—মেটে ঘরের বিয়েটাকে হপ্তা-কয় হলো রেজেস্ট্রি করে নিয়েছেন তিনি।—বলা তো যায় না, আপনাদের পুরুষদের মন তো!

বন্ধুও তাই বলেন—বলা যায় না, মেয়েদের মন তো!
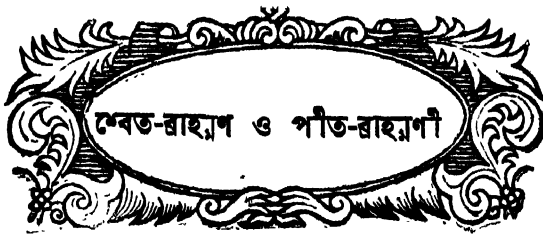
'আমি ব্রাহ্মণ। তুমি হবে আমার ব্রাহ্মণী।...দোহাই তোমার, কোন ধনবান নবাবের হাতে নিজেকে তুলে দিও না তুমি। আমি নিজেই বিয়ে করতে চাই তোমাকে। আমার স্ত্রী বেশী দিন বাঁচবে না। এর-ই মধ্যে সে বিকিয়ে দিয়েছে তার সব ঐশ্বর্য। তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়েকে আমি জানি না যে ভরে তুলতে পারে তার সেই শূন্য স্থান। সত্য বটে, আমি পঁচানব্বই এবং তুমি মাত্র পঁচিশ। ব্যবধানটা খুবই বেশী হয়ে গেল,—তাই না? কিন্তু ভয় পেওনা তুমি। যৌবনের অভাবটা আমি পুষিয়ে নেব জানবে আমার বুদ্ধিতে, আমার নির্মল রহস্যালাপে। সুইফট কোনদিন তাঁর স্টেলাকে এমন করে ভালবাসেনি। অথবা স্ক্যারন তাঁর মেনটেনকে কিংবা ওয়েলার তাঁর স্কারিনাকে; যেমন করে আমি ভালবাসব তোমাকে, হে আমার মনোনীতা! আমি তোমাকে ভালবাসব, আমি তোমার গান গাইব।'

লরেন্স স্টার্ন

স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ভালবাসার চিঠি। এ চিঠিতে কোন সাজানো কথা নেই, কোন মিথ্যে নেই। যা আছে, তা বোধহয় সামান্য একটু হেঁয়ালি। তাও বাইরের লোকের কাছে। যাঁকে এ চিঠি লেখা হয়েছিল একদিন, তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না এর একটি কথাও। তিনি জানতেন, কেন খাঁটি অ্যাংলো-স্যাক্সন রক্তের মানুষটি এমন করে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলছেন আজ, আর কেনইবা

তাঁর চুয়ান্ন বছরের বার্ধক্যকে ঠেলে দিতে চাইছেন অসহায় পঁচানব্বই-এ।

ব্যাপারটা হৃদয়গত। কিন্তু লোকে বলে—সেণ্টিমেণ্টাল। কারণ, দুনিয়ার লোকের কাছে এ চিঠির প্রথম ও প্রধান পরিচয় সাহিত্য হিসাবেই। বিশ্ব-বিখ্যাত 'জার্নাল টু এলিজা'র আর সব পরিচয় তাদের কাছে গৌণ। তাছাড়া সবাই জানে, 'জার্নাল টু এলিজা'র লেখক লরেন্স স্টার্ন 'সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি'রও লেখক। সুতরাং, তাদের মতে এ চিঠিগুলোও একরকমের সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি। মনে মনে ফুল ফোটানোর গল্প। এগুলো লেখা হিসাবে যতখানি, ঘটনা হিসাবে ঠিক ততখানি নয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণী বলেন—না, তা নয়। এ চিঠির কোথায়ও মিথ্যে নেই এক ফোঁটা। 'স্টার্নকে সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম আমি। নম্র ভদ্র উদার 'যুবক' স্টার্ন সত্যিই ছিলেন আমার বিশ্বাসের পাত্র। তাঁকে অবিশ্বাস করি এমন সাধ্য ছিলনা আমার।'

কেন তেইশ বছরের একটি বিবাহিত মেয়ের মনে চুয়ান্ন বছরের এক বৃদ্ধকে অস্বীকার করার শক্তি ছিল না সেদিন তা বুঝতে হলে ব্রাহ্মণীর পুরো কাহিনীটিই শুনতে হয় আমাদের।

'ব্রাহ্মণী' মানে এলিজা। এলিজা ড্রেপার। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের বনেদী লেখক স্টার্ন মনে মনে ব্রাহ্মণ সেজেছিলেন সেদিন, কারণ—এলিজা জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণদের দেশে, ভারতবর্ষে। কলকাতায় নয়, মালাবার উপকূলে, আঞ্জেনগোতে।

বাবা মে স্ক্লেটার ছিলেন কোম্পানীর একজন রাইটার। ইংরেজদের স্থানীয় স্টোরে কাজ করতেন। এখানেই, মালাবারের নারকেল কুঞ্জ, এলোমেলো সমুদ্রের হাওয়া, আর কালো মানুষের ভীড়ে ১৭৪৪ সালের এক সকালে জন্ম নিল এলিজা।

আঞ্জেনগো ব্রাহ্মণের গাঁ। গাঁয়ের বামুন বৌ দেখে বলল—মেয়েটা মেম-সাহেবের মত ফর্সা হল না যেন। স্টোরের আর আর সাহেবেরা বললেন—এলিজা যেন ইউরোপীয়ান নয়, ইউরেসিয়ান। গায়ের রং পাকা ইংরেজের নয়, ঈষৎ পীত। এলিজা যেন পীত ব্রাহ্মণকন্যা।

তবুও যেই দেখে সে-ই মায়া ছাড়তে পারে না মেয়েটার। কি যেন আছে ওর চেখে, ওর মুখের ডৌলে। জেমস ফরবেসের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল ওর। এলিজা তখনও কিশোরী। ফরবেস লিখেছেন: ওর পরিপূর্ণতা আমার কলমের ধার ধারে না। আঁরে রেঁনাল—ফরাসী দেশের লোক। প্যারিসে অনেক মেয়ে দেখেছেন তিনি। কিন্তু এলিজা দেখেছেন মাত্র একটিই। তিনি লিখে গেছেন—আঞ্জেনগো তুমি ধন্য, কারণ এলিজা তোমার কোলে জন্মেছে।

কেউ কেউ বলেন—বাচ্চা বয়সে একবার ওকে দেশে পাঠান হয়েছিল লেখাপড়া শেখবার জন্যে। কেউ কেউ বলেন—তা সত্য নয়। এলিজা পুরোপুরিই হিন্দুস্থানের মেয়ে। ওর লেখাপড়া বলতে যা তা ওর কাকার বাড়িতেই। অর্থাৎ রাজমুণ্ড্রিতে। বিকেলে গাঁয়ের পথে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে দিনের শেষে এলিজা এসে বসতেন রাজমুণ্ড্রির একটি পুরানো অশ্বত্থের নীচে। গাঁয়ের লোকে গাছটার নাম দিয়েছিল—'এলিজার গাছ।' এলিজা

মারা যাওয়ার পরেও প্রায় একশ' বছর বেঁচে ছিল গাছটা।

যা হক, দিনে দিনে তাল নারকেলের বনে নিঃসঙ্গ বন-লতার মত বেড়ে চলল—এলিজা। তখন সে চৌদ্দ বছরের কিশোরী। এমন সময় একদিন আঞ্জেনগোতে এসে হাজির হলেন—ডানিয়েল ড্রেপার। ড্রেপার বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারী। সুতরাং, খ্যাতিমান লোক। স্টোর কীপার-এর মেয়েটাকে চোখে লেগে গেল তাঁর। তিনি এলিজার বাবার কাছে প্রস্তাব নিবেদন করলেন। যদিও ড্রেপার এলিজার চেয়ে বয়সে কুড়ি বছরের বড় তবুও 'না' বলতে পারলেন না মিঃ মে। ড্রেপারের মত বড় মানুষকে তা বলা যায় না। তিনি মেয়ে সম্প্রদান করে দিলেন।

লোকে বলল—বিয়েটা ভাল হল না। কেননা, ড্রেপার আর এলিজা দুই ধাতুর মানুষ। এলিজা তরুণী, স্পর্শকাতর। ড্রেপার আধবুড়ো এবং ভোঁতা প্রকৃতির। তাঁর খাটবার ক্ষমতা আছে যতখানি, বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক ততখানি নয়। তাছাড়া, বোম্বাইয়ের লোকেরা বলে—স্বভাব চরিত্রও নাকি সুবিধের নয় লোকটার।

এলিজা কি ভাবতেন তাঁকে আমরা জানি না। আমাদের সঙ্গে আবার যখন দেখা হয় তাঁর তখন তিনি জাহাজে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে দেশে যাচ্ছেন তিনি। সেটা ১৭৬৫ সালের কথা। জাহাজে সহযাত্রী জুটেছেন দু'জন। ক্যাপ্টেন কমডোর জেমস আর তাঁর স্ত্রী। কমডোর খ্যাতিমান ব্যক্তি। দক্ষিণ ভারতের আতঙ্ক দস্যু আংগ্রিয়াকে পরাজিত করেছেন তিনি। কিন্তু তাহলেও তাঁর নিজের গর্ব তাঁর স্ত্রী। মিসেস জেমস যাকে বলে সত্যিই কালচার‍্যাল মহিলা। লণ্ডনের সাহিত্যিক মহলে দেদার বন্ধুবান্ধব আছে তাঁর। তিনি নিয়মিত আড্ডা দেন তাঁদের সঙ্গে। দস্যু-বিজয়ী বীর কমডোর সে গর্বে রীতিমত গর্বিত।

এলিজার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল মিসেস জেমসএর। নিবিড় বন্ধুত্ব। লণ্ডনে নেমে বাড়িতে একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন মিসেস জেমস। অনেক নামজাদা সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হলেন তাতে। নেমন্তন্ন পেলেন নতুন বান্ধবী এলিজাও।

এখানেই স্টার্নের সঙ্গে দেখা হল এলিজার। শ্বেত ব্রাহ্মণের সঙ্গে পীত ব্রাহ্মণীর প্রথম দেখা। লরেন্স স্টার্নের বয়স তখন চুয়ান্ন, এলিজার তেইশ।

স্টার্ন বললেন– আমি তোমাকে ভালবাসি এলিজা। এলিজা উত্তর দিলেন না। স্টার্ন নিজের একখানা ছবি উপহার দিলেন তাঁকে। বললেন—'এলিজা, আমার ছবি।' এলিজাও নিজের ড্রয়ার খুলে বের করলেন একখানা ছবি। '—এই নাও আমার ছবি।' দু'জনেই ভালবাসলেন দু'জনকে। ড্রেপার সে খবর রাখে না। খবর রাখেন না মিসেস স্টার্নও। এলিজার টেবিলে এসে নিয়মিত হাজিরা দেন বৃদ্ধ স্টার্ন। মিসেস জেমসএর আড্ডায় স্টার্নকে নিয়মিত সঙ্গ দান করেন এলিজা। ক'দিনই বা! মাত্র বছর দেড়।

১৭৬৭ সালের এপ্রিলে আবার ড্রেপারের সঙ্গে জাহাজে চড়লেন এলিজা। ভারতবর্ষে ফিরতে হবে। ব্রাহ্মণীকে আবার ফিরে যেতে হবে ব্রাহ্মণদের দেশে। যাওয়ার সময় এলিজা বললেন—'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি বন্ধু, তুমি আমার শিক্ষাদাতা, তুমি আমার 'মনিটার', আমার রক্ষক।'

এলিজা চলে গেলেন। সুরু হলো স্টার্ন-এর চিঠি। চিঠির পর চিঠি। 'এলিজা, তুমি চলে গেলে! সত্যিই চলে গেলে? সত্যিই চলে গেছ তুমি? ...কোচম্যানকে আমি বললাম—আমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে চল। তোমার এবং আমার—দু'জনেরই বন্ধু মিসেস জেমসএর বাড়ি। আমাকে দেখে দু গাল বেয়ে জল নেমে এল তাঁর। তোমার অভাবে আমি এমনই বিবর্ণ হয়ে গেছি, এমনি শুকিয়ে গেছি যে দেখে রীতিমত কান্না পেল তাঁর। কোনদিন কোন মেয়ে এমন আন্তরিক সহানুভূতি বোধহয় দেখায়নি কাউকে। তিনি বললেন—তুমি চলে যাও। যত অসুবিধাই হক, যত টাকাই লাগুক তুমি ছুটে চলে যাও এলিজার কাছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তাঁকে না পেলে তুমি বাঁচবে না স্টার্ন!'

স্টার্ন ওরমের লেখা একখানা ভারতের ইতিহাস কিনলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রও সংগ্রহ করলেন একখানা। কোথায় এলিপো, কোথায় মাদ্রাজ, কোন্ দিকে বয় 'ট্রেড উইণ্ড'? চিঠিতে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠলেন স্টার্ন—'I wish I was put into a ship for Bombay! সারা দুনিয়ার বদলে আমি শুধু তোমাকে চাই এলিজা। শুধু তোমাকে। আমি ব্রাহ্মণ, এলিজা, তুমি হবে আমার ব্রাহ্মণী।'

মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন স্টার্ন। এলিজার স্বামী মারা গেছেন। মারা গেছেন তাঁর স্ত্রীও। তাঁরা দু'জনে,—তিনি আর এলিজা এখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। সুখের সংসার তাঁদের। সংসারে অনন্ত শান্তি।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই একদিন সহসা অসুস্থ হলেন লরেন্স স্টার্ন ওল্ড বণ্ড স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। সেখান থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসা হল তাঁকে। কিন্তু আর সুস্থ হলেন না বৃদ্ধ লেখক। স্বপ্নের মধ্যেই এক সময় অনন্ত স্বপ্নলোকে চলে গেলেন তিনি। মৃত্যুশয্যায় যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন তাঁরা বলেন—শেষ মুহূর্তে স্টার্ন এমনভাবে হঠাৎ বুকের ওপর হাত দুটো তুলে ধরেছিলেন—যেন মস্ত একটা আঘাত ফিরাচ্ছেন তিনি।

মিসেস জেমসএর চিঠিতে ব্রাহ্মণের শেষ খবর পেলেন এলিজা। স্বপ্নের দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে এখন রুক্ষ বাস্তব, কর্তব্য। এলিজা এখনও মিসেস ড্রেপার। তবুও ব্রাহ্মণের শেষ সাধটুকু সুদূর ভারতবর্ষ থেকে মিটাতে চাইলেন ব্রাহ্মণী।

মরবার আগে স্টার্ন তাঁর মেয়ে লিডিয়াকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন এলিজার হাতে। অবশ্য চিঠিতে। অনেক চেষ্টায় গোপনে কিছু টাকা জোগাড় করলেন এলিজা। তারপর কর্নেল ক্যাম্বেল নামে একটি সৈনিকের হাতে সে টাকা পাঠালেন বিলাতে, লিডিয়ার কাছে। সঙ্গে এটাও জানালেন যে—যদি মত থাকে তবে ক্যাম্বেলকে বিয়ে করতে পারে লিডিয়া।

কিন্তু মা মেয়ে দু'জনেই একযোগে প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব। মিসেস স্টার্ন উল্টো ভয় দেখালেন—এলিজা যদি এখনও হাত বাড়ায় তাঁর পরিবারে তবে হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন তিনি। স্টার্নের কাছে লেখা তাঁর চিঠিপত্র সব ছাপিয়ে দেবেন দু' দেশে। এলিজা ভয় পেলেন। মিসেস জেমসকে সব জানিয়ে তিনি লিখলেন—'ভাগ্যিস, ড্রেপার এখন এখানে নেই! এমনিতেই এদিকে জানাজানি হয়ে গেছে যে আমার সঙ্গে নাকি লণ্ডনের সাহিত্যিকদের

বিস্তর খাতির। চিঠিপত্তরও আদানপ্রদান চলে।'

সবাই জানত বটে, কিন্তু ড্রেপার এতসব বুঝতেন না। তাঁর বোঝা দরকার ছিল না। তাঁর যা চাই তা তিনি পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তেলিচেরীতে কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর কর্তা হয়েছেন তিনি। ক্রমে—মনোনীত হলেন বোম্বাই কাউন্সিলের সদস্যও। গভর্নরের পরেই ড্রেপার এখন বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে, মেয়েদের মধ্যে মিসেস ড্রেপার-ই প্রথমা। বোম্বাইয়ে তখন সাকুল্যে সাঁইত্রিশজন মহিলা। তার মধ্যে তেত্রিশজন বিবাহিতা, পাঁচজন বিধবা,—আর একজন মাত্র কুমারী। সুতরাং, কোম্পানীর সুরসভায় এলিজাই তখন ইন্দ্রানী।

ওঁরা থাকতেন সমুদ্রের ধারে। মাজাগাঁওএর মেরিন হাউসে। বিরাট বাড়ি। বোম্বাইয়ের বেলভেডিয়ার। নতুন কোন জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই নাবিকেরা দল বেঁধে এসে হাজির হয় বেলভেডিয়ারে। ড্রেপার ভাবে—লোকেরা আসে তাঁর বাড়ি দেখতে। এলিজা জানেন—কেন এ কৌতূহল তাদের। ওরা স্টার্নের ব্রাহ্মণীকে দেখতে চায়। তবুও কোনদিন তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেন না ড্রেপারকে। কিন্তু একদিন বলতে হল।

বাড়ির পরিচারিকা মিসেস লিডের দিকে ড্রেপারের নজর যে একটু দুর্বল এলিজা সেটা লক্ষ্য করছিলেন অনেকদিন ধরেই। --কিন্তু এবার কি সত্যিই বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না ড্রেপার? শোবার সময় লিডকে ঘরে ডেকে নেন ড্রেপার। '—আমার পরচুলাটা খুলে একটা টুপি পরিয়ে দিয়ে যাও ত লিড। মিসেস লিড যায়। কিন্তু আর যেন ফিরতে চায় না মেয়েটা। এলিজা একদিন আপত্তি করলেন। ড্রেপার সে আপত্তিতে কান দিলেন না। বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু তাহলেও তিনি এখন বড়াসাহেব! সুতরাং শেষ পর্যন্ত একদিন নিষুতি রাতে বেলভেডিয়ার থেকে বেরিয়ে পড়লেন এলিজা। পরদিন তাঁর ঘরের দরজা খুলে ডানিয়েল ড্রেপার পেলেন একটুকরো কৈফিয়ত। এলিজা লিখে গেছে :

"I go, I know not whither, but I will never be a tax on you, Draper. The enclosed are the only bills that I know of, except six rupees to Doojee, the shoe-maker."

চিঠি পড়ে ড্রেপার কি ভেবেছিলেন তিনিই জানেন। লোকে বলে, তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। চিন্তিত হলেও করবার কিছু ছিল না তাঁর। কারণ এলিজার জাহাজ ততক্ষণে বন্দর ছেড়ে গেছে। চিরকালের মত ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন—স্টার্নএর ব্রাহ্মণী।

ক্যাপ্টেন জন ক্লার্ক নামে একটি তরুণ নাবিকের সঙ্গে এলিজা অবশেষে এসে পৌঁছালেন তাঁর নিজের দেশে। তাঁর সেই বুড়ো ব্রাহ্মণের দেশে। এটা ১৭৭৪ সালের কথা। লণ্ডনের সাহিত্যিক মহল সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে।

ব্রাহ্মণী ভাবলেন,—তবে আর ব্রাহ্মণের কথা গোপন করে লাভ কি! পরলোকেও তো শান্তি পায় আত্মা। তবে হতভাগ্য লরেন্স স্টার্নেরও তাই হক। সমস্ত দুর্নামের ভয় উপেক্ষা করে স্টার্নের চিঠিগুলো প্রকাশ করলেন তিনি। বের হলো—স্টার্নের লেখা পত্রগুচ্ছ। 'ইওরিকস্ লেটারস (১৭৭৫)'। 'জার্নাল টু এলিজা'।

এরপর মাত্র আর তিন বছর বেঁচে ছিলেন এলিজা। ১৭৭৮এ মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে বিদায় নিলেন তিনিও।

রাজমুণ্ড্রির সেই অশ্বত্থটি আজ নেই,—নেই বোম্বাইয়ে ড্রেপারদের সেই বেলভেডিয়ারও। কিন্তু এলিজা আজও আছেন। 'জার্নাল টু এলিজা' যতদিন আছে ততদিন তিনিও আছেন। ততদিন মৃত্যু নেই তাঁর। অন্তত, ভারতবর্ষ কোনদিন ভুলবে না তাঁকে। কেননা, এলিজা রক্তে বিদেশিনী হলেও তার কোলের মেয়ে। তাঁর কাহিনী, ভারতের নিজের স্মৃতি-কথারই একটা পাতা।
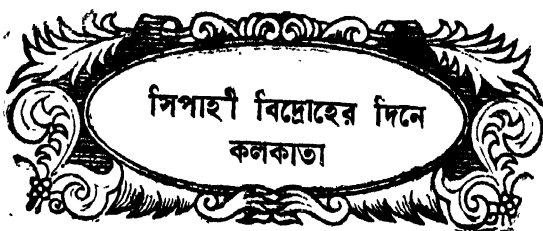
খুব বড় রকমের কোন খেলা থাকলে যেমন হয়, তেমনি; অথবা, খুব বড় রকমের কোন জনসভা। জওহরলালের মিটিং। পিল পিল করে লোক চলেছে ময়দানের উপর দিয়ে। রাশি রাশি লোক। সব সাহেব। পুরো সাহেব, হাফ-সাহেব—বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব, মেম সাহেব, বাচ্চা সাহেব। যেখানে যত সাহেব ছিল সব যেন ছুটছে আজ ময়দানের উপর দিয়ে। রাশি রাশি পাল্কী, গরুর গাড়ি, টমটম আর ব্রাউনবেরীর ভিড়। গাড়ির ব্যবস্থা যারা করতে পারেনি, পায়ে হেঁটেই চলেছে তারা। চলছে নয়, ছুটছে। কোন ট্রাফিক রুল নেই আজ। নেই কোন বাঁধাধরা পথও। যার যেদিকে ইচ্ছে, যার যেদিকে সুবিধে। সবাই সমান ত্রস্ত, সকলেরই সমান তাড়াতাড়ি।

দূর থেকে দেখলে ময়দানের এই ছবিটা খুবই সুন্দর। উপভোগের, আমোদের। বিশেষ করে, একশ বছর দূর থেকে দেখলে। কিন্তু কাছে থেকে এর চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রীতিমত ভয়ের, আতঙ্কের। প্রতিটি মানুষের মুখে আতঙ্কের ছায়া, উদ্বেগের চিহ্ন। ত্রস্ত পায়ে মৃত্যুভয়। জুনের আগুনে গরমে খোলা ময়দান জুড়ে জীবন্ত ভয়ের সে এক বীভৎস মিছিল। পম্পাই নগরীর মত আজ যেন কলকাতার মৃত্যুদিন। কাছেই যেন আগুন উদ্‌গিরণ করছে কোন ভিসুভিয়াস। অসহায় নরনারীর পিছনে পিছনে ক্ষুধার্ত জিহ্বা বাড়িয়ে তাড়িয়ে ফিরছে মৃত্যু। যেমন করে হক বাঁচতে হবে এর হাত থেকে। অন্তত বাঁচবার চেষ্টা। নিজে না বাঁচি, ডরোথিকে বাঁচাতে হবে। যেমন করে হক ওর কোলের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে। "কোচম্যান, বকশিস মিলেগা, আউর জোর,—আউর জোরসে—"। "আর একটুখানি চল মাই ডিয়ার,—এ ফিউ মিনিটস্‌ মোর!"

সাহেবের সামনেই শান্তি। আর ক'পা দূরেই ফোর্ট উইলিয়াম। পত পত করে নিশান উড়ছে তার মাথায়। ফোর্ট উইলিয়াম এখনও ইংরেজের কেল্লা। ভয়ার্ত সাহেবের অন্তরের সান্ত্বনা। ডাইনে যাচ্ছ, যাও! উপস্থিত সেখানেও শান্তি। ডাইনে ভাগীরথী। হিদেনদের ভাগীরথী আজ যেন সত্যিই হোলি মাদার। করুণাধারা। সারি সারি জাহাজ পাল তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার কোলে। ইংরেজী জাহাজ। সারি সারি দেশী বজরা। ইংরেজের অনুগত বজরা। কলকাতার ইংরেজের আজ একমাত্র আশ্বাস এরা। এই গুটি কয় জাহাজ আর নৌকো, আর এই কেল্লা। ফোর্ট উইলিয়াম।

বাদবাকী কলকাতা আজ ইংরেজের কাছে মৃত্যুশয্যার হারকিউলিয়ান। উদ্বেগ শহর, আতঙ্কের আবাস। তার চারদিক ঘিরে আজ ভয়। শুধু ভয় আর ভয়। ডাইনে ভয়, বাঁয়ে ভয়, পূবে ভয়, পশ্চিমে ভয়। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মত ধরমতলার সাহেব আজ যেদিকে ফিরে তার সেইদিকেই ভয়।

কেননা, পাণ্ডেরা আসছে। মঙ্গল পাণ্ডে নয়। ওর তো ফাঁসি হয়ে গেছে আজ ক'মাস। ২৯শে মার্চ সাহেবের বুকে রাইফেল দেগে সারা হিন্দুস্তানে আগুনের নিশানা দেখিয়েছিল মঙ্গল পাণ্ডে। বারাকপুরের সে ঘটনা কলকাতা জানে। কলকাতার এটাও অজানা নয় যে, এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি হিসেবে কোর্ট মার্শাল—৮ই এপ্রিল ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়েছে ওকে। মঙ্গল পাণ্ডে এখন আর জীবিত নেই। থাকতে পারে না। এটা জুন মাস। আজ ১৪ই জুন, রোববার। তবুও সকাল বেলায় চার্চ ভাঙতে না ভাঙতেই শহরময় রটে গেল—পাণ্ডেরা আসছে। বারাকপুর থেকে মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গীরা। সিপাহীরা। সুতরাং—দে ছুট।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল কলকাতা। কেউ কেল্লার দিকে, কেউ গঙ্গার দিকে। ছুটতে ছুটতে তারা সিপাহীদের বাপান্ত করে যত, তার চেয়ে বেশী শাপান্ত করে কলকাতার সরকারকে। ক্যানিং-হ্যালিডে'র গভর্নমেণ্টকে। কেননা, কলকাতার অধিকাংশ মানুষের মতে আজকের এই বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী তাঁরাই। কারণ, দেখেও তাঁরা দেখেননি কোনদিন। দিনের পর দিন সিংহাসনে বসে চোখ মেলে ঘুমিয়েছেন তাঁরা।

কলকাতার সাহেবদের তখন দুটো মন। একটা সরকারী মন, অন্যটা বে-সরকারী। প্রথমটি স্বভাবতই ক্ষমতায় বড় হলেও দলে ছোট, দ্বিতীয়টি অক্ষম হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ। দুই দলের দু রকম ধারণা, দু রকম চালচলন। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে বহরমপুরে সিপাহীরা যখন নয়া কার্তুজ ব্যবহারে গররাজী হল, সরকার তখন তাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে এলেন বারাকপুরে। এনে, অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল ওদের। ব্যস, এখানেই শেষ হয়ে গেল সরকারী কর্তব্য। কর্তৃপক্ষের এই ভুল শুধরে দেওয়ার জন্যেই যেন মার্চে সোজা হয়ে দাঁড়াল মঙ্গল পাণ্ডে। কিন্তু তবুও ঘুম ভাঙল না তাঁদের। অবশ্য পাণ্ডেকে ওরা ফাঁসি দিলেন, বারাকপুরের উপর খবরদারী করার জন্যে বার্মা থেকে নিয়ে এলেন ৮৪নং ইউরোপীয়ান রেজিমেণ্টটিকেও। কিন্তু ব্যবস্থা হিসেবে এটুকুই কি যথেষ্ট?

তা যে নয়—সে খবর পাওয়া গেল মে-র প্রথম দিকেই। ৩রা মে লক্ষ্ণৌ, ১০ই মিরাট, ১১ই দিল্লী। দেখতে দেখতে দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল গোটা উত্তর ভারতে। তবুও ২০শে মে ক্যানিং সাহেব কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন দেশেঃ বাজারে অবশ্য গুজব এই যে, আমি নাকি হুকুম দিয়েছি, শহরের সব পুকুরে নিষিদ্ধ মাংস ফেলবার জন্যে! লোকেরা এও বলাবলি করছে যে, ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্মদিনে আমার হুকুমে কলকাতার সব খাবারের দোকান নাকি বন্ধ থাকবে। বলা বাহুল্য, এগুলো গুজব মাত্র, সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই।

২৪শে ধুমধাম করে রাজভবনে কুইন ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন পালিত হল। সেদিন ছিল মুসলমানদের ঈদ। তদুপরি মহীশূরের এক নবাবজাদার

সাদীর দিন। ফলে কলকাতার মানসিক পরিস্থিতি যে সে রাত্তিরে খুব সুস্থ ছিল, এমন বলা চলে না। বে-সরকারী রিপোর্ট বলে,—আধাবয়েসী বাবা যখন রাজভবনে নাচে মত্ত, তখন তার দুটি সোমত্ত মেয়ে বাড়ি বসে
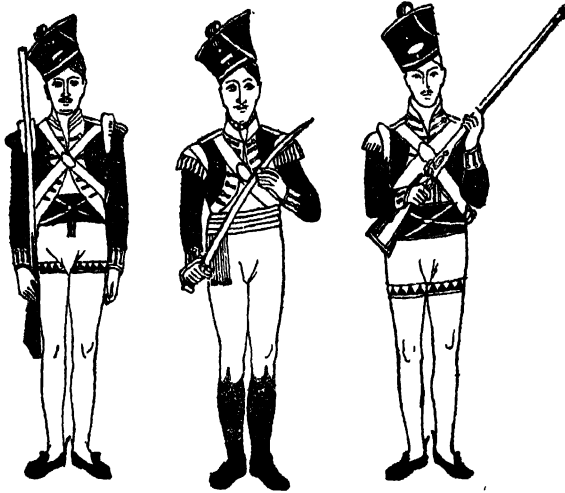
সেকালের সিপাহী

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদছে,—এমন নাচ এবং ভোজটা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে নয়, বাবা ফিরবার আগে যদি পাণ্ডেদের হাতে পড়তে হয়—সেই ভয়ে।

এক মহিলা নাকি সে ভয়েই অনেক বলে কয়ে দু'জন গোরা সৈনিককে রাত্তিরের জন্য পাহারা বসিয়েছিলেন নিজের ঘরে। অবশ্য রাত্রিবেলা তিনি নাকি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন যে, মনের পাণ্ডেরা যত ভয়ের তার চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্কের চোখের সামনে বসা দুই দুইজন গোরা। বিশেষ করে, বাড়িটা যখন ফাঁকা এবং সৈন্য দু'জন যেখানে অপরিচিত। তার উপর রাত দুটোয় যখন শুরু হল শাহাজাদার বিয়ের বাদ্য আর আকাশ-ফাটানো পটকা, তখন বাধ্য হয়েই ঠকঠক করে কাঁপতে হল গোটা কলকাতাকে।

তবুও পরের দিন রাজ-সরকারের সেক্রেটারি বিডন সাহেব লিখলেন—রাজধানী কলকাতার ছ'শ মাইলের মধ্যে গোলমাল কিছু নেই। সব শান্ত।

কলকাতার কাগজগুলো পড়লেও তাই মনে হবে যে-কোন বাইরের লোকের। গোটা উত্তর ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব যখন জ্বলছে, কলকাতার ইংরেজী কাগজ তখন রেস কোর্স নিয়ে চিন্তিত। অনেকদিন নাকি ঠিক মত জল দেওয়া হচ্ছে না মাঠটায়! কেন এমন হবে? মিউটিনি? যা ব্যবহার করছ তোমরা নেটিভ সৈন্যদের সঙ্গে, তা বিদ্রোহ করবে না তো কি? সবাইকে এক প্রার্থনা আওড়াতে হবে শুনলে ক্রমওয়েলের অনুগত সৈন্যরাও বিদ্রোহ করত নিশ্চয়।—এমনি সব যুক্তি তাদের। সুতরাং, কাগজে তখন মিউটিনি সাধারণ ব্যাপার।

তার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী ডাক পাল্কী, সৌখিন থিয়েটার এবং এটিকেট কলম!

এদিকে মিউটিনি তখন দিল্লী পুড়িয়ে কানপুর এলাহাবাদে এসে পেঁছে গেছে। অথচ বারাকপুরে তখনও সাড়ে তিনটি নেটিভ রেজিমেণ্ট। বার্মার সেই ৮৪নং বাহিনী চলে গেছে আপ-কানট্রির দিকে। বারাকপুরের নেটিভ-বাহিনী শাসনের নামে আছে ৩৫নং ইউরোপীয় বাহিনীর সামান্য একটা টুকরো। সিংহল থেকে ক্যাপ্টেন মাণ্ডে'র ৫৩নং পদাতিক বাহিনীটি ফোর্ট উইলিয়ামে এসে পেঁছেছে বটে, কিন্তু এ কেল্লাটিও তো একেবারে নেটিভশূন্য নয়। এখানেও রয়েছে আস্ত একটি নেটিভ রেজিমেণ্ট। যদি এরা ক্ষেপে ওঠে? চিনসুরা থেকে হাইল্যাণ্ডারদের আনবে? কলকাতার সিবিলিয়ান সাহেব মনে মনে ভেবে দেখে স্ট্রাটেজিটা। চিনসুরা কলকাতা থেকে পঁচিশ মাইল, আর বারাকপুর মাত্র চৌদ্দ মাইল!

সুতরাং ভয়ের কারণ আছে বৈ কি! তাছাড়া, আরও ভাববার বিষয় আছে। শুধু সাধারণ ইংরেজ নয়, জন পিটার গ্রাণ্ট বাংলাদেশের সহকারী গভর্নর। তিনিও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তা ভেবে। ফোর্ট উইলিয়াম এবং বারাকপুরের হিসেব না হয় হল। কিন্তু গার্ডেনরীচে যে অযোধ্যার নবাবের হাজার হাজার ভূতপূর্ব সৈন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধরতে হবে না হিসাবে? দুই পক্ষের সত্যিকারে সামরিক শক্তির হিসেব নিতে গেলে ধরা উচিত—দমদমে সিন্ধিয়া আমীরদের যে অগণিত চেলাচামুণ্ডা রয়েছে তাদেরও। তদুপরি, মনে রাখতে হবে ছয় লাখ লোকের এই শহরটির অধিকাংশ মানুষই নেটিভ, ব্ল্যাকগার্ড। এবং এটাও মনে রাখা উচিত আমাদের যে, সত্যিকারের বিপদ যদি ঘটেই কিছু তবে সে সময়ে নেটিভ-পুলিসের সাহায্য কিছু মিলবে না।

সাধারণভাবে এই যখন মনের অবস্থা, এমন সময় এলো ১৪ই জুনের খবর। পাণ্ডেরা ক্ষেপেছে। বারাকপুর থেকে সোজা মার্চ করে আসছে তারা কলকাতার দিকে। এদিকে গার্ডেনরীচেও নাকি শুরু হয়ে গেছে লুঠতরাজ। সুতরাং, কলকাতার এতদিনের মনের ভয় আজ ফুটে বের হল গা দিয়ে।

সরকারী কর্তারা অবশ্য ছুটলেন না। কিন্তু ভয় যে তাঁদেরও ছাড়েনি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেক্রেটারিরা তখন কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে আপিস করেন। কাউন্সিলের মেম্বাররাও যেন এক একজন ভয়ের বিজ্ঞাপন। তাঁদের দরজায় দরজায় ব্যারিকেড; কোমরে পিস্তল। এবং বিছানা ছেড়ে তাঁরা নাকি তখন সোফায় ঘুমান। এমনকি হ্যালিডে সাহেব পর্যন্ত তখন আর বেলভেডিয়ারে থাকেন না। ক্যানিং-এর কাছাকাছি থাকবার জন্যে তিনি উঠে এসেছেন কলকাতায়। সুতরাং সাধারণ মানুষের আর দোষ কি?

তারা ছুটতে লাগল। এণ্টালি, পার্কসার্কাস, খিদিরপুর, মেটেবুরুজ খালি করে গড়ের মাঠের দিকে। যারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যবসায়ী কিংবা হোটেলবাসী, তারাও অস্থির হয়ে উঠল। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ইতিহাসের অধ্যাপক স্বয়ং পড়লেন ইতিহাসের একটা ওলট-পালট অধ্যায়ে। ক'মাস মাত্র আগে কলকাতায় এসেছেন ভদ্রলোক। থাকেন সস্ত্রীক হোটেলে। ইতিমধ্যেই খিদমদগারের মুখে রিপোর্ট শুনে একখানা পিস্তল

কেনা হয়ে গেছে তাঁর। "চোদ্দই রোববার এক বন্ধু এসে বললেন—এখানে আর থাকা ঠিক নয়। চল আমার সঙ্গে নদীতে। কোন জাহাজে থাকবে। আমি ফ্যামেলি নিয়ে আপাতত সেখানেই চলেছি।"

ভদ্রলোক গেলেন না। কেননা, হোটেলে বসেই শোনা গেল, খবরটা গুজব মাত্র। বারাকপুরের সিপাইরা মতলব এঁটেছিল ঠিকই কিন্তু তা ফাঁস হয়ে গেছে গত কালই। অর্থাৎ—শনিবার। বিকেল চারটায় খবরটা এসে পেঁছিল সরকারের কানে। তাঁরা পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেবেন কেন? সঙ্গে সঙ্গেই চিনসুরা থেকে হাইল্যাণ্ডারদের তাঁরা গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলেন বারাকপুরে। অধ্যাপক বুঝলেন—এজন্যেই কাল কলেজে যাওয়ার জন্যে কোন গাড়ি পাননি তিনি। যাহক, হাইল্যাণ্ডাররা এসে যথাসময়ে অস্ত্র কেড়ে নিল নেটিভদের। সুতরাং বিদ্রোহ আর হল না। যদি তা না করা হতো তবে অবশ্য হতো। এবং হতো আজই।

অধ্যাপক খবরটা শুনে গুজবকে বিদেয় দিলেন। কিন্তু সে যত তাড়াতাড়ি ছড়ায় তত তাড়াতাড়ি হারায় না। ফলে, কলকাতার অস্থিরতা কাটল না একটুও। গড়ের মাঠের উপর দিয়ে সেই পলায়মান জনতায় তখন পুরোপুরি ভরে গেছে কেল্লা এবং নদীর সব নৌকো জাহাজ। ভরে উপচে গেছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,—ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে এমন কোন ফাঁকা জায়গা নেই যেখানে আর দুটো মানুষ ধরে। যাঁরা ভেতরে জায়গা পেলেন না, তাঁরা রেমপার্টে আস্তানা গাড়লেন। কেল্লার উঠোনটাও আজ নিরাপদ।

এদিকে শহরেও পুরোদমে চলেছে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি। শনিবার রাত্তিরে ভলানটিয়ার বাহিনী তৈরি হয়েছিল একটা। প্রসঙ্গত তাদের পাঁয়তারার কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য এখানে। বিপদভঞ্জন ভলানটিয়াররা আজ এ শহরের একটা সনাতন সম্প্রদায়। এদের জন্ম সেই সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময়ে। যাঁর হাতে প্রথম এঁরা অবয়ব পেয়েছিলেন তিনি আমাদের ডেকার্স লেনের মিঃ ফিলিপ মিলনার ডেকার্স। কিছুদিন কলকাতার কালেক্টার ছিলেন তিনি। তবে তার চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় অন্য কারণে। ডেকার্স লেনে অনেক জমিজমা ছিল ভদ্রলোকের। ১৭৮৪ সনে দেশে চলে যাওয়ার সময়ে একটি অদ্ভুত শর্তে তিনি তা দান করে যান একজন নেটিভকে। ডেকার্স সাহেবের সেই শর্তটি আজও শোনবার মত। বাংলা করে বললে তার মানে দাঁড়ায় : আমি পাঁচশ বছরের জন্যে আমার যাবতীয় ভূসম্পত্তি মিঃ অমুককে দিয়ে যাচ্ছি। তবে এক শর্তে। যদি কেউ দাবি করে তবে প্রতি বছর সেণ্ট মাইকেলের ভোজোৎসবের দিন তাকে অবশ্যই একটি পিপুল (Pepper corn) দিতে হবে!

ডেকার্স সাহেবের ভলানটিয়াররা আবার এসে দেখা দিলেন কলকাতায়। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হল তাদের হুড়োহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি। হোটেলে দাঁড় হলেন পঞ্চাশজন। বিপদকালে এ বাড়িটা রিফিউজিদের আস্তানা হবে।

হ্যামিলটনের বাড়িতেও জোর প্রস্তুতি। ওদের বোধ হয় ভলানটিয়ারদের উপর তেমন আস্থা ছিল না। তাই পাণ্ডে নাশের জন্যে গামলা গামলা সীসা গালিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। আর গরম জল। বিক্রীর জন্যে দুটো পুরনো কামান ছিল, সে দুটোতে বারুদ ভরে রাখা হল। মাঝে

মাঝেই সাহসী সাহেবেরা ছাদে ওঠেন। শত্রুরা আসছে কিনা সন্ধান নেন। কিন্তু পাণ্ডেরা আর আসে না।

সেকালের সিপাহী

বেলা তখন সাড়ে চারটা, আবার হৈ চৈ। বিদ্যুতের মত আবার একটা আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল কলকাতার 'হাড়' কাঁপিয়ে। নিশ্চয় কোথাও কিছু ঘটেছে। নয়ত এ সময়ে গোরা সৈন্যেরা কেল্লা থেকে এমনি দল বেঁধে বেরিয়ে আসছে কেন?

সৈন্যরা কিন্তু মার্চ করতে করতে এসে থেমে পড়ল রাজভবনের সামনে। ওয়েলেসলি প্লেসে। ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে গেল ক্যানিং বাহাদুরের গার্ডদের ছোট্ট আবাসটির কাছে। তাদের সামনে এসে দাঁড়াল গভর্নর জেনারেলের অফিসিয়াল গার্ড। হিন্দুস্তানী সৈন্যরা সামরিক কায়দায় হাতের রাইফেল নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর ব্যাক মার্চ করে আবার ঢুকে গেল নিজেদের খুপরীতে। গোরা সৈন্যরা সেসব অস্ত্র গাড়ি-বোঝাই করে আবার ফিরে গেল কেল্লায়।

ঘটনা দেখে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হল কলকাতা। কিন্তু তবুও ভয় কাটল না তার। কারণ এখন প্রায় সন্ধ্যা। এবং সামনেই অজ্ঞাত রাত। মাঝরাত্তির অবধি ভলানটিয়াররা দুই দলে ভাগ হয়ে টহল দিয়ে বেড়াল গোটা শহর। একদল চৌরঙ্গীপাড়ায়, অন্যদল নেটিভপাড়ায়। তবুও সে রাত্তিরে ঘুমাল না কেউ। ঘুমায় তার সাধ্য কি! চোখটা একটু লেগে আসছে কি না আসছে অমনি দড়াম দড়াম আওয়াজ। রাতভর বেপরোয়া ফাঁকা আওয়াজ চালাতে লাগল শহরতলির অসহায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা। আর চলল অবলবান্ধব পটকা। অসামরিক, অসামাজিক ইউরেশিয়ানদের আজ পটকাই একমাত্র অবলম্বন। রক্ষক।

কর্নেল মেলসন নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী সে রাত্তিরের কলকাতার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন—"আধ ডজন মানুষ আজ ইচ্ছে করলেই কলকাতার বারো আনা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। এবং গোটা কয় লণ্ডনের চোর যদি আজ থাকত এখানে তবে চৌরঙ্গীর আশপাশ থেকেই বিস্তর কামাতে পারত তারা।"

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বশতই হক, আর দুর্ভাগ্য বশতই হক কলকাতায় তখন সব ভদ্রলোক। কি আগুনে-মানুষ হরিশ মুখার্জি, কি ঈশ্বর গুপ্ত।

গুপ্তমশাই তখন কলকাতার শ্লোগান দিচ্ছেন—

"ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দুসমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়॥"

সুতরাং হুতোম জানাচ্ছেন—"বাঙ্গালীরা বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, যদিও একশ বছর হয়ে গেল, তবুও তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালীই আছেন। বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি।"

ফলে যদিও "তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিতা, কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালিঘাটের বড় হালদারের বাড়ির গিন্নিরে স্বপ্ন দেখেচেন ইংরেজের রাজত্ব থাকবে না (এবং যদিও) দুই একজন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দেখালেন" তবুও ১৪ই জুন রোববার রাত্তির যখন ভোর হল তখন দেখা গেল, কলকাতার ইংরেজ-রাজধানী ইংরেজের হাতেই আছে। পাণ্ডেরা আসেনি। সত্যিই শনিবার নিরস্ত্র করা হয়েছে তাদের। গার্ডেনরীচেও লুঠতরাজ হয়নি কোন। বরং অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাব এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী এখন কারাগারে। সুতরাং টাউন মেজরের অনুরোধ মেনে এবার ঘরে ফিরাই ঠিক।

আবার ফোর্ট উইলিয়াম খালি করে দলে দলে লোক চলল বাড়ির দিকে। আবার রবিবার সকালের সেই বিচিত্র মিছিল। যেন খুব বড়রকমের কোন খেলা ভেঙেছে, কিংবা মস্ত কোন জনসভা।

কলকাতার ইংরেজ এখন সত্যিই যাকে বলে—বিজয়ী বীর। খবরের কাগজ খুলুন, দেখবেন তার ভাষা এখন বীরের ভাষা। সেই থিয়েট্রিক্যাল সমাচার আর এখন নেই সেখানে। তার বদলে প্রতিদিন 'পোয়েট কর্নারে' বের হচ্ছে রাশি রাশি পদ্য। সেই কবিতার আগের লাইনে যদি থাকে wife and daughter, তবে পরের ছত্রে তার মিল দেন কবি যে শব্দটি দিয়ে—তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এসে যায়—slaughter! প্রতিশোধ চাই। একটি নেটিভকেও যেন আস্ত রাখা না হয় আর। ক্যানিং বাধা দেবেন সে তো জানা কথাই। এই মুহূর্তে ফিরিয়ে নেওয়া হক তাঁকে। —'উই ওয়াণ্ট রিকল।' আমরা লাটের মত লাট চাই। এংগলো-ইণ্ডিয়ান কবির প্রার্থনাঃ

"Baring humanity pretenders
To hell of none are we the willing senders.
But, if to Sepoys entrance must be given,
Locate them, lord, in the black-slums of Heaven."

তা ঈশ্বরের বিচার না হয় তাঁর উপরই ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু, উপস্থিত আমাদের বিচারটা চলুক তো! রানীগঞ্জ থেকে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি দিয়ে জানালেন—তিনি একাজে কলকাতার সাহেবদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। অনেক মাথা খাটিয়ে তিনি একটি দেখবার মত ফাঁসী-কাঠ তৈরি করেছেন। তাতে একসঙ্গে ষোলজন প্রমাণ সাইজের নেটিভকে একসঙ্গে ফাঁসী দেওয়া যাবে। অথচ মজা এই, তাতে কারও কোন

অসুবিধা হবে না। (will accomodate sixteen of the largest size without inconveniencing each other.)

ঠিক এতখানিতে অবশ্য রাজী হল না কলকাতা। তার প্রথম বিচারে "ডাকঘরের কতকগুলি ন্যাড়ে প্যায়াদার অন্ন গেল"। এবং অযোধ্যা-রোহিলাখণ্ডের ওয়াশীল চলল কলকাতার পথে পথে। গোরা সৈন্যরা পশ্চিমী কোচম্যান, সহিস, পাল্কী-বেহারা যাকে যেখানে পায়—তার উপরই বীরত্ব ফলায়। একটা ছোকরা সদ্য এসেছে বিলেত থেকে নতুন রিক্রুট হয়ে। তার জবানবন্দী শুনুন :

একদিন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় সহসা দেখি দুটি হিন্দুস্তানী গাড়োয়ান গল্প করতে করতে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছে। ওরা কথা বলছিল মুর ভাষায়। হঠাৎ 'কানপুর' কথাটা কানে এল আমার। সুতরাং আর বুঝতে বাকী রইল না ওরা কি বলতে চায়। অগত্যা বাধ্য হয়েই ছুটে গিয়ে টমকে নিয়ে আসতে হল। টমও শুনল ওরা মধ্যে মধ্যে 'কানপুর' বলছে। সুতরাং আর যায় কোথা! দু' ব্যাটাকেই দিলাম সাবাড় করে। (So, we polished 'em both off.)

যাদের এভাবে হাতের কাছে পাওয়া গেল না, তাদেরই কি ছাড় আছে? ক্যালকাটা ক্লাবের দেওয়ালে পোড়াকয়লায় লিখিত হল তাদের সম্পর্কে কলকাতার রায়। বিরাট প্রাচীরচিত্র : কাঠকয়লার মুরেল। নানা সাহেব উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে আর একগাদা সাহেব কথ্য অকথ্য নানা প্রক্রিয়ায় শাস্তি দিচ্ছে তাঁকে।

থেকার স্প্রীঙ্কএর পিকচার গ্যালারীটির দিকে তাকান যায় না। প্রত্যেকটি জেনারেলএর চক্ষু রক্তবর্ণ। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ক্যাপ্টেন হেজলউডকে। যেন চোখের আগুনে হিন্দুস্তানকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবেন তিনি।

আশ্চর্য এই কলকাতা তবুও ছাই হল না।

১৮৯২ সনের ২৮শে জুন। সেদিন রোববার। ছুটির দিন। সুতরাং চৌরঙ্গীপাড়ায় ভোর একটু দেরিতেই হওয়ার কথা। বেলা তখন প্রায় আটটা। বিছানা ছেড়ে মিঃ টর্মকিন দোতলার বারান্দায় এসে বসেছেন। ৮টা খুব বেলা নয়। কিন্তু জুনের সকাল। মিঃ টর্মকিনের মনে হয় এই খোলা বারান্দাটাও যেন একটা কিচেন। মনে মনে কলকাতাকে বাপান্ত করে বাইরের দিকে তাকালেন তিনি। এমনভাবে তাকালেন, যেন সত্যিই গরম পড়েছে কি না খুঁজে বের করাই তাঁর চোখ দুটোর উদ্দেশ্য। সামনেই ময়দান। ময়দানের ওপারে ফোর্ট উইলিয়ামের উপরে নোংরা একখানা রুমালের মত গুটিয়ে আছে একটুকরো ইউনিয়ান জ্যাক। থেকে থেকে একটু কাঁপছে নিশানটা। যেন লেজ নাড়ছে ঘুমন্ত ব্রিটিশ সিংহ। মনে মনে ভীষণ চটে গেলেন ক্লাইভ স্ট্রীটের ব্যবসায়ী মিঃ টর্মকিন। একখানা বড়, প্রমাণ সাইজের ফ্ল্যাগও জোটাতে পারে না ওরা! বিরক্ত টর্মকিন ডাইনে সরিয়ে নিলেন তাঁর দৃষ্টি। এদিকেও একই অবস্থা। গভর্নর হৌসের পতাকাদণ্ডটি সম্পূর্ণ নগ্ন। একটা চিল বসে আছে তার উপর!—উঃ, অসহ্য! অসহ্য গুমটে যেন দম বন্ধ হয়ে হয়ে আসছে মিঃ টর্মকিনের। শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে তিনি চুরুট ধরালেন একটা। এমন সময় সহসা জোনস এসে হাজির।

"গুড্ মর্নিং! টেক ইওর সীট জোনস!" টর্মকিন পাশের চেয়ারটা ঠেলে দিলেন জোনস-এর দিকে। জোনস শুধু প্রতিবেশী নয়, বন্ধু। দুজনের এক আপিস, এক কারবার। আপিস টাইম অবধি রোজ সকালে দুজনে আড্ডা দেন এখানে বসে। আড্ডাটা আরম্ভ হয় সাধারণত দিনের কাগজখানা নিয়ে। শেষ হয় রাতের প্রোগ্রামে। মিঃ টর্মকিন এবং জোনস দুজনেই অবিবাহিত কিংবা বিপত্নীক অথবা দুজনেরই স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা দেশে থাকে। মোট কথা, উপস্থিত তাঁরা একা, সিঙ্গল।

"এনি নিউজ জোনস?" চুরুটে একটা টান দিয়ে রোববার আরম্ভ করলেন মিঃ টর্মকিন।

"নো। দেয়ার নেভার ইজ এনি নিউজ ওয়ার্থ এ কৌরি।" ঠোঁট উল্টে উত্তর দিলেন মিঃ জোনস। "সেই সিমলার 'গাপ্', সেই এক্সচেঞ্জ মন্দা—আর সেই পুরানো কক্ অ্যান্ড বুল্ স্টোরি—রাশিয়ানরা আসছে। —দিজ পিপল্,—আই মিন—আওয়ার নিউজপেপারমেন—" কথাটা শেষ করতে পারলেন

না মিঃ জোনস। হঠাৎ দুড়ুম দাড়াম বাজি ফাটানোর আওয়াজে ছেদ পড়ল তাঁর বক্তব্যে।

পর পর আরও ক'বার দুড়ুম দাড়াম। একসঙ্গে চারটে কান পাতলেন দুজনে। হ্যাঁ, আওয়াজটা দক্ষিণ দিক থেকেই আসছে বটে।

"কিন্তু আজ ত গির্জের দিন! তবে এ কীসের আওয়াজ জোনস?" মিঃ টমকিন একটু চিন্তিতভাবেই জিজ্ঞেস করলেন।

জোনস উত্তর দিলেন, "আলিপুরে বুড়ো কর্নেল বোধ হয় এই গরমে ছোঁড়াদের হাত পাকাচ্ছে! কে জানে, ভলানটিয়ারদের কীর্তিও হতে পারে!"

"বাট্ দিস ইজ নট্ ভলানটিয়ার্স সীজন! কই, এ সময়ে তো চাঁদা নেয় না ওরা!" মিঃ টমকিনের মনে আজ এক অজানা শঙ্কা। কেন জানি, ভোর থেকেই আজ মেজাজটা ভাল যাচ্ছে না ওঁর।

এমন সময় সহসা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এল। মিঃ টমকিন ব্যবসায়ী হলেও সিক্কা টাকার চেয়ে ভাল চেনেন এ আওয়াজটা। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জোনসও।

ওঁদের দরজার সামনে দিয়েই তিনজন ঘোড়সওয়ার চলেছে। তাদের একজন আহত। লাল ইউনিফর্মটা আরও লালে ভেজা।

"আরে, এ ত দেখছি আমাদের উইলকিনস! লাইটহর্সের সেই ছোঁড়াটা!" জোনস ছুটে নেমে এলেন নীচে। পিছনে পিছনে এলেন টমকিনও।

উইলকিনসের শিথিল হাত ততক্ষণে আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও। দুজনে ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে তাকে নামাতে নামাতে মিঃ জোনস আর টমকিন শুনলেন, সে বিড় বিড় করছে, "এনিমি—ট্রুপস—রুশি—রুশি—"

ব্যস, এই তার শেষ কথা।

পরের দিন। আজ সোমবার। রোববারের ছুটি কাটিয়ে কলকাতার আজ কাজে লাগবার কথা। কিন্তু শহরের মুখের দিকে তাকানো যায় না আজ। কোথায় চৌরঙ্গীর মিঃ টমকিন, কোথায় তাঁর বন্ধু মিঃ জোনস! কলকাতা আজ শ্মশান। চারদিকে ভাঙা দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি। এতকাল লোকে কলকাতার রাস্তায় কুকুরটা গরুটা মরে পচতে দেখেছে। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় এমন মরা মানুষের ভিড় দেখেনি কেউ। না পঁচাত্তরে সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণের সময়, না ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। জুনের গরমে অলিতে গলিতে পড়ে পচছে সাদাকালো মানুষের শব। শকুনেরা পর্যন্ত নামতে সাহস পাচ্ছে না মাটিতে। কালো-মুখো কামান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারার সৈন্য। ইয়া উঁচু উঁচু কঠোর কর্কশ তাদের চেহারা। মুখে এক মাপের লম্বা দাড়ি, কোমরে এক মাপের লম্বা তলোয়ার, গায়ে মোটা কাপড়ের ধুসর কোট।

তাদের ভারী বুটের আওয়াজে ঠক ঠক করে কাঁপছে কলকাতার বনেদী হোটেল, গ্রেট ঈস্টার্ন। পাথর-বাঁধানো মেঝেটা যেন ফেটে পড়বে ওদের পায়ের চাপে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, কী চায় ওরা, কী পেলে ঠাণ্ডা হয়ে বসবে চেয়ারে, সেটা বুঝতে পারছে না কেউ। কি হোটেলের সেক্রেটারি,

কি খিদমদগার কেউ বুঝতে পারছে না ওদের বুলি। অবশ্য বোঝানোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই ওদের। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে চলেছে কিল চড় লাথি ঘুষি। মুখের কথার সঙ্গে হাত পায়ের টীকা ভাষ্য। তবুও একবিন্দু বুঝতে পারছে না কেউ।

এসব কথার আসল অর্থ ঝুলছে তখন ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায়। মিঃ টমকিন বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, কালকের সেই রুমালখানার জায়গায় পত পত করে উড়ছে এখন ডবল-বেড মাপের একখানা সাদা নিশান। তার মাঝে সেণ্ট এণ্ড্রুর ক্রস আঁকা। গভর্নমেণ্ট হৌসের সেই চিলটাও পালিয়ে গিয়েছে গঙ্গার ওপারে। ন্যাড়া পতাকাদণ্ডটার মাথায় একখানা নতুন নিশান। সাদা সিল্কের উপর সেণ্ট এণ্ড্রুর ক্রস। নেটিভদের কাছে অপরিচিত হলেও সাহেবদের চিনতে কষ্ট হল না,—এই জয়ধ্বজাটি কাদের।

অবিশ্বাসী চোখ দুটোকে রগড়াতে রগড়াতেও যখন এই ফ্ল্যাগটাকে কিছুতেই সরানো গেল না গভর্নমেণ্ট হৌসের উপর থেকে, সাহেবরা তখন বুঝতে পারলেন, তাদের কলকাতা এখন রাশিয়ার পদানত। রুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ-শহরে। নেটিভদের মত তারাও এখন রুশ-প্রজা।

এত বড় কেল্লা সমেত ইংরেজের এই শহরটাকে রাশিয়ানরা রাতারাতি দখল করে নিল কী করে, সেটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা চাই। এবং সেই সঙ্গে চাই ডিপ্লোমেসি তথা জাতিচরিত্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা।

১৮৯৯ সনের কথা। সেদিন ১৫ই অক্টোবর। মহামান্য রুশসম্রাট সহসা যুবরাজ য়ুরনঝভকে তলব করলেন তাঁর 'জারকো সেলো' প্রাসাদে। যথাসময়ে যুবরাজ এসে অভিবাদন করলেন ঃ "সম্রাট আমাকে তলব করেছেন?"

সম্রাট কোন কথা বললেন না। তিনি চাবি-দেওয়া একখানা পিতলের চোঙ বাড়িয়ে দিলেন যুবরাজের দিকে; যুবরাজ নতজানু হয়ে হাত পেতে নিলেন সেটি।

গালে হাত দিয়ে জার তাঁর স্বভাবজ গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন. "য়ুরনঝভ, অত্র তোমাকে পূর্ব দেশে ইংরেজদের রাজধানী কলিকাতা নগরী আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হল। কীভাবে তুমি এই নির্দেশ পালন করবে, তা ওই কৌটো-মধ্যস্থ পরিকল্পনা পাঠে জানতে পরাবে। আপাতত তুমি আমুর নদীর নিম্নাঞ্চলে খাবারোভস্কার দিকে যাত্রা কর। সেখানে গভর্নর-জেনারেল খুফ্ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে তুমি এর চাবি পাবে।"

যুবরাজ সম্রাটকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন। তিনি জানতেন, সম্রাট বর্তমানে ইংরেজদের সঙ্গে প্রকাশ্যে শান্তি আলোচনা চালাচ্ছেন। কিন্তু তবুও তিনি এই গোপন অভিযান নিয়ে কোন প্রশ্ন তুললেন না। কারণ জারের ডিপ্লোমেসি তাঁর জানা। তিনি জানেন, শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে সবচেয়ে সুন্দর পথ—তার মনে নিশ্চিন্তির ভাব জাগিয়ে তোলা।

যা হক. সেই রাত্তিরেই য়ুরনঝভের বাড়িতে এসে হাজির কাউণ্ট ডিমিট্রি টলস্টয়। লেখক টলস্টয় নন. তাঁর জনৈক আত্মীয়। ইনি রাশিয়ার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এবং গুপ্ত পুলিসবাহিনীর কর্তা। তিনি যুবরাজকে তিনজন লোক

দিলেন। তাঁদের নাম মিঃ এ, মিঃ বি এবং মিঃ জেড্। টলস্টয় বললেন, "বহু কষ্টে তোমার কাজের সুবিধার জন্যে এদের জোগাড় করেছি আমি। বেঙ্গলে ওরা পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। সবচেয়ে ভাল কাজ হবে তোমার মিঃ জেডকে দিয়ে। সে নিজে বেঙ্গলের লোক। অবশ্য তিনজনের মধ্যে ওকেই পাওয়া গেছে সবচেয়ে কম দামে। বাকী দুজনের একজন খাস ইংরেজ। ন্যাচারেলি কস্টলি। অন্যজন ফিরিঙ্গী। তবে কম বেশী সবাই রুশি জানে। মিঃ জেডের ত আমাদের ডায়ালেক্ট গড় গড় মুখস্থ। কী বল জেড ভাই?"

জেড বাঙ্গালী কায়দায় একগাল হাসলেন। কৃতার্থতার হাসি।

পরদিন ভোরে এই তিন সহকারীকে নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গ খাবারোভস্কা যাত্রা করলেন যুবরাজ য়ুরনঋভ। ওরেনবার্গ, টোমস্ক, ক্রাসনোইয়স্ক হয়ে মোটা চার হাজার সাতচল্লিশ মাইল পেরিয়ে প্রথমে এলেন তিনি ইরখুটস্ক। স্টীমারে বৈকাল হ্রদ পার হতে হল এবার। তারপর রিলে গাড়িতে চড়ে ভার্খনি, উদিনস্ক হয়ে অবশেষে খাবারোভস্কা। আসার সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল সেই চাবি। কৌটো খুলেই যুবরাজ বুঝলেন, এখানে থামলে চলবে না তাঁকে। আরও এগুতে হবে। আসতে আসতে ইরখুটস্ক থেকে পুরো দু'হাজার পঁচানব্বই মাইল এসে নিকোলাভস্কে থামলেন তিনি। তাঁর জন্যে বিরাট নৌবাহিনী তখন অপেক্ষা করছে সেখানে।

রাশিয়ার মত প্রথম শ্রেণীর শক্তির নৌবাহিনী যেমন হওয়া উচিত তেমনি বাহিনী। শিপ্, ক্রুজার, টর্পেডো ইত্যাদি মিলিয়ে বিরাট বহর। সঙ্গে আছে অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রের মধ্যে ষোল ইঞি ডিনামাইট গান। দু হাজার গজ দূরে গোলা ছোড়া যায় এই কামানে! আর আছে বিশ্বের কাছে অজ্ঞাত 'ক্লাপ্-গান।' এর বিশেষত্বের কথা পরে বলছি। সৈন্য বাহিনীতে আছে এক স্কোয়াড্রন ডন কসাক আর দুহাজার পদাতিক। পদাতিকের মধ্যে আবার রয়েছে কসাকদের দুর্ধর্ষ কারা ব্যাটেলিয়ান। নৌবাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পিত হয়েছে জেনারেল কাম্পোকোস্কির উপর। অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী পরিচালনা করবেন যথাক্রমে জেনারেল জাগড্কিন এবং আনুশ্চিন্।

নৌবাহিনী কলকাতার দিকে যাত্রা করলো। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্স-কাস্পিয়ানের পথে রাশি রাশি রুশ সৈন্য চলল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে। উদ্দেশ্য, বিপদের আসল পথটাকে আড়াল করে দেওয়া। যেহেতু আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করে ভারতের উপর পশ্চিমের সব আক্রমণের পথ এটি, তাই ইংরেজদের কড়া নজর এদিকে। তার উপর রুশ সৈন্যের এদিকে নড়াচড়ার খবর পেলে সব শক্তি ওরা অবশ্যই জড়ো করবে এখানে। ততক্ষণে ওদিকে ওদের রাজধানী কলকাতার কেল্লা ফতে।

এত পথ ঘুরে কলকাতাকে আক্রমণের লক্ষ্য করল কেন রাশিয়ানরা সে একটা প্রশ্ন বটে। তাদের এই ঝুঁকি নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের গর্ব চূর্ণ করা। কলকাতা যে কোন বিদেশী শক্তির আয়ত্তের বাইরে এটাই ছিল ইংরেজদের ধারণা। মাঝে মাঝে তাই নিয়ে প্রকাশ্যেও গর্ব করতেন তাঁরা। দ্বিতীয়ত তারা জানে, ভারতবর্ষের নেটিভদের কাছে ইংরেজদের যে খাতির এবং সম্মান তার বার আনাই নির্ভর করে কলকাতার উপর। তাছাড়া কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানীও বটে। একবার এটি হস্তগত করতে পারলে

—ইংরেজের ইজ্জত যাবে, সেই সঙ্গে পাটকাঠির মত ভেঙে দুটুকরো হয়ে যাবে তার মর‍্যাল। সুতরাং চল কলকাতা। লক্ষণীয় বিষয় এই, প্রকাশ্যে কিন্তু রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেনি তখনও। ক্রেমলিনে জার বাহাদুর তখনও যথারীতি শান্তি আলোচনা চালাচ্ছেন ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

এদিকে তরতর করে জল কেটে এগিয়ে চলেছে রুশ নৌ-বহর। প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, তারপর বঙ্গোপসাগর — অবশেষে কলকাতা। রাস্তায় ভারতীয় জাহাজ পড়ল দুখানা। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য জাহাজ। সে-দুটো দখল করে দলে ভিড়িয়ে নিলে ওরা। 'জাপান' নামে আরমেনিয়ানদের একখানা জাহাজ পালাতে চেয়েছিল। বাধ্য হয়ে ডুবিয়ে দিতে হল সেটিকে। রুশবাহিনীর স্টোরে নানা ধরনের নিশান ছিল। বঙ্গোপসাগরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারই এক-একখানা ঝুলিয়ে দেওয়া হল জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে। তারপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল যে যার জায়গা মত। খাস ইংরেজ গুপ্তচর যিনি ছিলেন, সুন্দরবন এলাকা তাঁর মুখস্থ। বহুদিন গাছপালা প্রজাপতি ইত্যাদি খোঁজার অছিলা করে এ-অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। সুন্দরবনে সাকুল্যে কটা নদী আছে, কোন্ নদীতে কী সাইজের জাহাজ ধরানো যেতে পারে সব তাঁর জানা। তাঁরই নির্দেশে গোটা রুশ নৌ-বহর আত্মগোপন করে ফেলল সেখানে। সেখান থেকেই রাতের অন্ধকারে এক জাহাজ পদাতিক সৈন্য চলে এল ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। আর এক দল ওদিকে গিয়ে দখল করে বসল সাগরদ্বীপের সিগন্যাল স্টেশনটিকে। তৃতীয় দল পায়ে হেঁটে চলল বনমালীপুর-বিষ্টুপুর হয়ে দক্ষিণ বারাসতের দিকে। তাদের নেতৃত্ব করছেন লেঃ মাউণ্টিনফ্। গাইড হিসেবে পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে চলেছেন সেই বাঙালী বাবু। ডায়মণ্ড-হারবারের গাইড মিস্টার বি। সেই ফিরিঙ্গী ভদ্রলোক। তাঁরা প্রথমেই এসে নষ্ট করে ফেললেন ডায়মণ্ডহারবার এবং শিয়ালদহের মধ্যে রেল এবং তারের যোগাযোগ। রাতের অন্ধকারে পোর্ট ক্যানিং রেলপথও দখল হয়ে গেল বিনাযুদ্ধে। এবার সোজা বালিগঞ্জ স্টেশন। এদিকে মাউণ্টিনফ ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন বারাসত থেকে শিয়ালদহে। তখন প্রায় ভোর রাত্তির। শিয়ালদহে পোঁছেই একখানা রকেট ছেড়ে দিলেন তিনি। যাঁরা গরম দেখে ছাদে ঘুমচ্ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, বোধ হয় কারও বিয়ে হচ্ছে, তারই হাউই উঠল আকাশে। কিন্তু বালিগঞ্জ থেকে জেনারেল কম্পোকোস্কি জানলেন. মাউণ্টিনফ কাজ হাসিল করে ফেলেছে। ধীরে ধীরে সুন্দরবন থেকে কলকাতার দিকে আসতে আসতে মাস্তুলে বসে দূরবীনে রকেট দেখে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল অন্য সৈন্যাধ্যক্ষদের। সেই সঙ্গে বেড়ে গেল জাহাজের বেগও।

ভোরে তিন দিক থেকে শুরু হল কলকাতার উপর আক্রমণ। তার প্রথম শহীদ লাইট হর্স বাহিনীর সেই উইলকিনস। সকালে দলছাড়া হয়ে দক্ষিণী হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল বেচারা। বালিগঞ্জ থেকে আসার পথে জেনারেল কম্পোকোস্কি প্রথম বাধা পেলেন পার্ক সার্কাসে। লা মার্টিন কলেজে ভলানটিয়ার কোর্ ছিল একটা। তারা এসে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু সুশিক্ষিত রুশ বাহিনীর সামনে ছেলে-ছোকরাদের এই প্রতিরোধ তৃণের চেয়েও তুচ্ছ।

কম্পাউণ্ডে দুটো কামানের গোলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিল তারা। প্রিন্সিপাল বন্দী হলেন। কম্পোকোস্কি ছিলেন রুশ সেনানায়কদের মধ্যে সবচেয়ে হিউম্যান। তিনি বললেন, "ছেলেদের কোন দোষ নেই। তাদের ধৃষ্টতা আমি ক্ষমা করছি। কিন্তু প্রিন্সিপালের বিচার হওয়া আবশ্যক। কারণ, এই তথাকথিত প্রতিরোধের জন্য মূলত তিনিই দায়ী।"

তক্ষুণি সামরিক কায়দায় বিচার হয়ে গেল প্রিন্সিপালের। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পিছন থেকে গুলী করা হল তাঁকে।

অতঃপর বিজয়গর্বে রুশবাহিনী চলল চৌরঙ্গীর দিকে। ইতিমধ্যে উইলকিনস-এর মুখে খবর পেয়ে জায়গায় জায়গায় অবশ্য ব্যূহ রচনা করে-ছিলেন মিঃ টমকিনেরা। কোথাও ট্রামগাড়ি, কোথাও মাংসের দোকানের ভারী ভারী টেবিলের প্রতিরোধ!

হাস্যাস্পদ মনে হলেও এই তখন কলকাতার সম্বল। লড়াই করার লোক কোথায়! একদিকে কেল্লার উপর চলেছে নদী থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ, অন্যদিকে শিয়ালদহ থেকে 'ক্লাফ গান' ছুঁড়ছেন মাউণ্টিনফ। এমন কামানের কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি কোনদিন। পাক্কা তিন হাজার গজ তার পাল্লা! যেখানটায় টিপ্, পড়বে এসে ঠিক সেখানে। মরতে মরতেও টমিরা সাবাস দেয় রাশিয়ানদের। মাথা বটে রাশিয়ার!

একে তিন দিক থেকে আক্রমণ, তায় এমনি নয়া নয়া হাতিয়ার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল, লজ্জিতভাবে দড়ি বেয়ে বেয়ে একটা সাদা পতাকা উঠছে ফোর্টের উপর দিকে। আত্মসমর্পণ করছে কলকাতার ইংরেজ সরকার। না করে উপায় নেই। ফোর্টে গাদা গাদা নারী আর শিশু। তাদের বাঁচাতে হবে।

যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন রুশ কর্তৃপক্ষ। অবশ্য যুদ্ধটা সরকারীভাবে ঘোষিতই হয়েছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। রুশ বাহিনীর নিরাপদে কলকাতায় নামবার পর। সাদা নিশানটা ফোর্টে স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ ফোর্ট-কর্তৃপক্ষকে জানালেন, "আমরা অস্ত্র সংবরণ করেছি। তোমরাও তাই কর। আমাদের পরম পরাক্রমশালী রুশসম্রাট কখনও অসহায় নারী এবং শিশুদের সঙ্গে লড়াই করেন না। কেননা, সেটা অটোক্রেসি। যদি আমরা তাতে মত্ত হই, তবে ঈশ্বরের কোপে রুশ সেনাবাহিনীর মহাসর্বনাশ হবে এবং রুশ জনসাধারণেরও অমঙ্গল হবে।"

ইংরেজরা এ মহাপাতকের অংশভাগী হতে রাজী হলেন না। তাঁরা আত্মসমর্পণ করাই স্থির করলেন। জেনারেল পোতুলফ ভেঁপু বাজিয়ে মিছিল করে চৌরঙ্গী গেট দিয়ে ঢুকলেন ফোর্টে। টাউন হল এবং হাইকোর্ট হাসপাতাল হল। বাড়ি দুটোর উপরে উড়ছে 'জেনেভা-ক্রস'। অর্থাৎ রেড্‌ক্রস। ময়দানের পশ্চিম কোণটা হল ইংরেজদের কেওড়াতলা। কেরোসিন আর পেট্রোলে সেখানে মরা সৈনিকদের পোড়াতে লাগল জ্যান্ত সৈনিকরা। দূর থেকে তাই দেখে হাসাহাসি করতে লাগল হিন্দু-মুসলমানরা। এমন তাজ্জব ঘটনা আর তারা দেখেনি কোনদিন!

সেদিন মাঝরাত্তিরেই বেলভেডিয়ার থেকে জেনারেল কম্পোকোস্কির মুখে

ঘোষিত হল মহামান্য সম্রাট জারের প্রক্লেমেশনঃ আজ থেকে বঙ্গদেশের সমগ্র নিম্ন-অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ বলে গণ্য হবে। এই প্রদেশের হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হল অত্র কলিকাতা নগরীতে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক শাসক নিযুক্ত হলেন জেনারেল কল্পোকোস্কি।

ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে এ খবর শহরময় রটিয়ে দেওয়ার জন্যে নাচতে নাচতে চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল ঢাকিরা।

হয়ত ভাবছেন, আজগুবি একটা গল্প ফেঁদেছি আমি। বিবরণটা সম্পূর্ণ আজগুবি হলেও পুরাকাল বিষয়ে আমাদের যা সাধারণত প্রধান নির্ভর, এটিও তার-ই ভিত্তিতে রচিত। এর প্রতিটি কথা একটি লিখিত এবং মুদ্রিত বই থেকে নেওয়া। সেই দুর্লভ উদ্ভট কল্পনার গ্রন্থটির নামঃ

The Bombardment & Capture of Fort William, Calcutta, by a Russian Fleet & Army, complied from the Diaries of Prince Serge Woronzoff and Genl. Yagodkin, translated from original Russian by Ivan Batiushka. প্রকাশকাল—১৮৯০। অর্থাৎ কলকাতার 'পতনের' দু-বছর আগেকার রচনা।

সেদিক থেকে এই ইতিহাসটি অবশ্য ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ নয়, সম্ভাবনার প্রাক্-কথন। ইতিহাসও কখনও কখনও স্বপ্ন দেখে। কলকাতার ইতিহাসের এও সেই স্বপ্ন দেখা। বইটির নামটিকে তাই বলতে পারেন স্বপ্নাদ্য-নাম।

তবে পণ্ডিতেরা বলেন, স্বপ্ন মাত্রেরই কিছু না কিছু বাস্তব ভিত্তি থাকে। কলকাতারও তা ছিল। ১৮৮৭ সনের ৯ই জুন তারিখের অমৃতবাজার কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন তা। তাতে লেখা আছে, প্রায় চার কুড়ি বছর ধরে ভারতের ইংরেজেরা রুশ আক্রমণের স্বপ্ন দেখছেন। এই আক্রমণ থেকে কলকাতাকে রক্ষার জন্যে অনেক বিধিব্যবস্থাও সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন তাঁরা।

সমসাময়িক ইংরেজী কাগজে এবং পুঁথি-পুস্তকে রাশি রাশি সমর্থন পাবেন এ ঘটনার। ১৮৩৫ থেকে ১৯০৫ অবধি সরকারী বে-সরকারী ইংরেজের একমাত্র চিন্তা ছিল রাশিয়া। বেণ্টিঙ্ক একবার খবর পেলেন, কুড়ি হাজার রুশ পদাতিক এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী নাকি এগিয়ে আসছে ভারতবর্ষের দিকে। স্বদেশে এক কোটি পাউণ্ড চেয়ে পাঠালেন তিনি সেই রুশ আক্রমণ ঠেকানোর খরচ বাবদ!

মিউটিনির পরে এ ভয় বেড়ে গেল আরও। জলাতঙ্কের মত রুশাতঙ্ক রোগে ধরল কলকাতাকে। সবাই বলে, আমাদের বসে থাকা উচিত নয়। একটা কিছু বিহিত করা আবশ্যক। কলকাতার রাজপুরুষেরা হাটুরে পরামর্শে কান দিলেন না। তাঁদের নজর কলকাতা থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। কলকাতায় রুশ আক্রমণ তাঁদের স্বপ্নেরও অতীত।

লাটসাহেবকে স্বপ্ন দেখানোর জন্যে তখন বের হল এক নতুন ধরনের তাবিজ। বই। কলকাতা যে সত্যিই নিরাপদ শহর নয়, সেটা প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। উপসংহারে লেখক জানিয়েছেন, তিনি নিজে সমর বিভাগের

একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী। তাঁর লেখা অনেক দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী পড়েছেন এবং তাঁরা এই বই-এর বিষয়বস্তুর সম্ভাব্যতা এবং বিবরণের টেকনিক্যাল যথার্থতা সম্পর্কে একমত। সুতরাং সাধু সাবধান!

ইতিহাসে সাবধানীরাও মরে। সে ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই বেঁচে নেই আজ। কিন্তু কলকাতা আছে। কারণ বেঁচে থেকে অনেক কিছু দেখবে বলেই না কলকাতা জন্মেছিল!

সেকালের থিয়েটার রোড
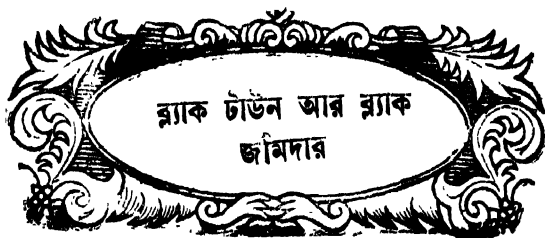
"সুদূর পশ্চিমের ক্যালিফর্নিয়া থেকে জাপানের পূর্ব উপকূলের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে মানুষের বিচারবুদ্ধি, সৌন্দর্যবোধ, রুচিজ্ঞান এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তা এমনভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে।"

কথাগুলো বলেছিলেন ম্যাকিনটস্ সাহেব ১৭৮০ সালে। কলকাতা সম্পর্কে এই লাইনটি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম। তবে ম্যাকিনটসের এই কলকাতা সাহেবের কলকাতা নয়, নেটিভের কলকাতা। কলকাতায় তখন দুই নগরী। সাহেবপাড়া আর ব্ল্যাক টাউন। ট্যাঙ্ক স্কোয়ার আর চৌরঙ্গী—সাহেবপাড়া। রাজপুরুষদের বাস এখানে। এখানকার চেহারা তাই ভিন্ন, জীবন ভিন্ন। নবাগত যে দেখে সেই তাকিয়ে থাকে। 'এমন বাহারের শহর আর হয় না। এশিয়ায় তো নেই-ই। পৃথিবীতেও অল্পই আছে।' চৌরঙ্গীর কলকাতা দেখে এমনি মন্তব্য করেছেন অনেকেই। ম্যাকলে থেকে লর্ড ভেলেনসিয়া।

কিন্তু ব্ল্যাক টাউনে উঁকি দিয়েই মত বদলাতে হয়েছে তাঁদের। অন্ধকার, তাকানো যায় না এমনি অন্ধকার এ শহরে। অজ্ঞতা অসভ্যতা অশালীনতার জমাট অন্ধকার। দেখে কিপলিং পর্যন্ত আঁৎকে উঠলেনঃ Palace, myre hovel—poverty and pride side side!

ডাঃ রোনাল্ড মার্টিন বলেছেনঃ "ভারতের সব শহরের সব ত্রুটিগুলো জড়ো হয়েছে এখানে!" "বাপ্ এ কি বিশৃঙ্খলা, এলোপাথাড়ি বাড়ি খানা ডোবা গলি—হৈ-হট্টগোল, কোন রীতি নেই, শৃঙ্খলা নেই। যেন স্থায়ী গৃহযুদ্ধ লেগে আছে এ শহরে।"—লিখেছিলেন প্রাইস্।

অথচ আজকের মতো ব্ল্যাক টাউনই তখনও শহর কলকাতা। আজ শুনি কলকাতার দশ ভাগের এক ভাগ জুড়ে আছে বস্তি! শহরের এক-চতুর্থাংশ লোকের বাস সেখানে। সেদিনও ছিল প্রায় তাই। ১৮২২ সালে কলকাতার বাড়ি গুনতি হয়েছিল একবার মাথা গুনতির মতো। তাতে দেখা গেলো শহরে বাড়ি আছে মোট ৬৭,৫১৯ খানা। তার মধ্যে ১৫৭৯২ খানা টালির বাড়ি, ৩৭,৪৯৭ খানা খড়ো ঘর। আর বাকীগুলো একতলা কিংবা দোতলা পাকা বাড়ি!

ব্ল্যাক টাউনেও পাকা বাড়ি ছিল। শহরের ব্রাউনেরা তাতে বাস করতেন। বিরাট এলাকা জুড়ে বিরাট বিরাট বাড়ি। অন্দর মহল,

বৈঠকখানা, খাজাঞ্চিখানা, তোষাখানা। সদর দরজা, খিড়কী দরজা।—কিন্তু অপরিচ্ছন্ন। তাদের প্রচুর টাকা, প্রবল বশ্যতা। তদুপরি উৎসবে ব্যসনে সাহেবদের খানা দেয়; সেলাম করে। সাহেবেরা এদের খাতির করে বলেন—'বাবু'। 'বাবুদের বাড়িগুলো বেশ ভালো'—অনেক সাহেব-ই প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু বাড়িগুলোকে স্থানান্তরিত করেননি, করতে দেননি। কারণ বাবু হলেও তারা ব্ল্যাক। ব্ল্যাকের জন্যে ব্ল্যাক টাউন। এশিয়া-আফ্রিকায় যেখানেই বসবাস করেছে ইংরেজরা সেখানে—তারা তৈরি করেছে এক নগরে দুই শহর। ব্ল্যাক আর হোয়াইট্ টাউন। সাদায় এবং কালোয়, রাজায় এবং প্রজায় ব্যবধানটুকু বজায় রাখতে—এ তাদেরই সৃষ্টি।

কলকাতার ব্ল্যাক-টাউন তাই বিস্ময় নয়। বিস্ময়—ব্ল্যাক-টাউনের জীবন। এ জীবন আজও প্রায় এক। অষ্টাদশ শতকের ব্ল্যাক-টাউনের বিবরণ শুনুন একটু, তারপর একবার তাকিয়ে দেখুন আজকের মহানগরীর দিকে; দেখবেন—খ্যাতিতে যত বেড়েছে মূল অর্থে ঠিক তত বদল হয়নি কলকাতার চরিত্র।

ব্ল্যাক-টাউনে পা দিন একবার। পা ছাড়া গতি নেই। গাড়ী ঘোড়া পাল্কী সবই আছে এ শহরে। কিন্তু এখানে এসব চলবে না। ১৮৪৫ সালে গভর্নর এক কমিটি বসিয়েছিলেন শহরের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে। তাঁরা জানিয়েছিলেন—ব্ল্যাক-টাউনে নাকে রুমাল গুঁজে (..rankest compound of villanous that ever offend nostrill) পায়ে হেঁটে চলতে হয়েছে তাদের। সরু সরু গলি, সরু সরু মানুষ। রাশি রাশি এলোপাথাড়ী বাড়ী আর জঞ্জাল। তারপর আছে অগুনতি ডোবা, গাছ-পালা। এদের বাড়ীঘর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলা দেশের সনাতন গৃহশিল্প এখানে এসে যেন সব ভুলে গেছে। কোনমতে একটুখানি ঠাঁই পেলেই এরা লেগে যাচ্ছে বাড়ী তৈরির কাজে। প্রথমেই জায়গাটার এককোণ থেকে মাটি কাটবে কিছুটা। সে মাটিতে তৈরি হবে বাড়ীর ভিত, আর গর্তটিতে পুকুর। তারপর এই মাটি আর আশপাশে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ঐ ভিতখানার চারদিকে খাড়া হবে বুক-উঁচু দেওয়াল। অবশেষে তার উপরে চাপানো হবে—একখানা ছাউনি, খড় পাতা টালি যা জুটে। বাড়ী হলো। প্রবল বর্ষায় পুকুরখানাও জলে থৈ থৈ। শুরু হলো গৃহস্থালী। ব্ল্যাক-টাউনের জীবন। ব্ল্যাক-টাউনের এই বাড়ী ঘরদোর দেখে কেউ কেউ লিখেছেন—দেখলে মনে হয়, যেন আয়র্ল্যাণ্ডের দরিদ্রতম শ্রেণীর কেবিন দেখছি। কেউ আবার বললেন, সুসভ্য আইরিশদের সঙ্গে এদের তুলনাই চলে না। মিসিসিপির তীরে যে অসভ্য কাঠুরিয়ারা বাস করে তাদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে বাঙালীদের তুলনা চলে না। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় এখানকার মতো দশ ভাগের ন' ভাগ লোক খোলা মেঝেয় ঘুমোয় না।

যেমন বাড়ী, তেমনি বাসিন্দা, তেমনি পরিবেশ। চারদিকে কাঁচা খোলা নর্দমা। নর্দমায় পড়ে পড়ে পচছে কুকুর, বেড়াল, জঞ্জাল মায় মানুষ। মানুষ শুনে চমকে উঠবেন না। নিজের চোখে দেখে লিখে গেছেন গ্রেণ্ডপি সাহেব। টেরেটি বাজারের বিপরীত দিকে একটা বাড়ীতে ছিল সাহেবের বাস। তিনি লিখেছেনঃ রোগে এবং এ্যাক্সিডেণ্টে বহু হতভাগা রাস্তায় মারা পড়ে।

আমার দরজার গোড়াতেই এমনি একটা মৃতদেহ পড়ে ছিল। শেয়ালেরা দু রাত্তির ধরে তাতেই ভোজ করলো।

ব্ল্যাক-টাউনে একটি মৃতদেহ নয়, মরা মানুষের ভীড়ের চাক্ষুষ বর্ণনা রেখে গেছেন—আর এক লেখক তাঁর স্মৃতিকথায়। তিনি হিকি। হিকি ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ দেখেছিলেন। তাতে ব্ল্যাক-টাউনে ১৫ই জুলাই থেকে ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নাকি লোক মরেছিল ছিয়াত্তর হাজার। তবে হিকি বলেছেন সৌভাগ্য এই ঃ শেয়াল শকুনেরও অস্বাভাবিক ভীড় হয়েছিল তখন। ("Fortunately an extraordinary folk of carnivorous birds, animals and vermin were allured from their fastness and their solitudes by the putrefaction of the scene.")

ব্ল্যাক-টাউনের মৃতের ভরসা শেয়াল আর শকুন, জীবিতের ভরসা—দারিদ্র্য! সারাদিন খেটে 'এক পেন্স কিংবা আধা পেন্সের' রোজগার নিয়ে সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফেরে ব্ল্যাক-টাউনের নাগরিক—তখন চারদিকে শুরু হয়েছে শেয়ালের চিৎকার আর মশার গুঞ্জন। সন্ধ্যায় আগুন পড়লো উনুনে উনুনে। অন্ধকার নগর আর এক প্রস্থ অন্ধকার জড়িয়ে নিল গায়ে। ধোঁয়ার অন্ধকার। একটু শান্ত হলো মশা। নয়ত অনাহারক্লিষ্ট শরীরটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যেত কিনা সকাল পর্যন্ত কে জানে? সাহেব স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা তাই নেটিভদের এই সন্ধ্যায় উনুন ধরানোর রীতিটার যারপরনাই প্রশংসা করেছেন। ("..It is indeed indebted to smoke raised in the public streets.. huts and sheds for any respite it enjoys from mosquitoes").

অদ্ভুত লোক এই ব্ল্যাক-টাউনের বাসিন্দারা। ধোঁয়া এদের মশার ওষুধ! তাবিজ এদের কলেরার ধন্বন্তরি! এদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই, ভালোমন্দ বোধ নেই। জুয়া ছাড়া খেলাধুলো জানে না—ঋণ ছাড়া উপার্জনের পথ জানে না। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ব্ল্যাক-টাউন সম্পর্কে সাহেবদের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অভিমত।

তাই বলে ব্ল্যাক-টাউন একেবারে ব্ল্যাক নয়। এখানে আলো জ্বলে, শত শত ঝাড় লণ্ঠনের আলো। শ্রাদ্ধ হচ্ছে মহারাজা নবকৃষ্ণের পুণ্যশ্লোকা মায়ের। ন' লাখ টাকা খরচ হবে। হবে না? সামান্য নিমু মল্লিক সে-ই মাতৃক্রিয়ায় খরচ করেছে তিন লাখ টাকা আর মহারাজা নবকৃষ্ণ করবে তার চেয়ে কম? অন্ত্যেষ্টি চলছে ব্ল্যাক-টাউনে দেওয়ান কাশী মিত্তিরের। চন্দন কাঠ, ধূপ-ধুনা। এলাহি ব্যাপার। এমনি প্রতিদিন কত এলাহি ব্যাপার হচ্ছে ব্ল্যাক-টাউনে। সাহেবপাড়াতেও এমনি হয় না। গভর্নমেণ্ট গেজেটে বের হলো বাবু রামদুলাল সরকার জানাচ্ছেন আগামী ৭ই এবং ১১ই ফাল্গুন তাঁর দুই পুত্রের শুভ-বিবাহ। এতদুপলক্ষে ১লা এবং ২রা ফাল্গুন ইউরোপীয় অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৩ই এবং ১৬ই ফাল্গুন যথাক্রমে হিন্দু এবং আরব-মোগল অতিথিদিগের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। ভোজদিনে তদীয় সিমলার বাড়ীতে নাচ এবং অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদাদির ব্যবস্থা থাকবে। ইত্যাদি। অন্য এক খবরে শোনা গেল, রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই ব্ল্যাক-টাউনেই ভূ-ভারত ঘেঁটে পণ্ডিতদের জমায়েত করা হয়েছে। যে সব দ্রব্যাদি উপহার দেওয়া হয়েছে

তার মধ্যে রৌপ্য এবং স্বর্ণপাত্রাদি অন্যতম। কয়েক লক্ষ দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন ও তৎসহ এক টাকা হিসাবে ভোজনদক্ষিণা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং ব্ল্যাক-টাউন একেবারে অথৈ অন্ধকার ছিল না। এখানে যাত্রা, কবিগান, বুলবুলির লড়াই, বেড়ালের বিয়ে, সংয়ের মিছিল ইত্যাদি ক্রীড়া-কৌতুকও ছিল। ছিল—অতিথিখানা, মন্দির, ঘাট তৈরি ইত্যাদি 'জনহিতকর' কাজও।

কি করে ব্ল্যাক-টাউনের ব্রাউনেরা এ সবের খরচ জোগাতেন তা একটা প্রশ্ন বটে। এ প্রশ্নের উত্তর—কি করে নয়! তবে এজন্যে কদাপি হোয়াইটদের পকেটে হাত দিতে হতো না তাদের। তারাও তো পয়সার সন্ধানেই এসেছে এখানে। ব্রাউনদেরও তাই লক্ষ্য ছিল ব্ল্যাকরাই! একটি মাত্র এমনি ব্রাউনের কাহিনী বলছি এখানে। ব্ল্যাক-টাউনের একটি ব্ল্যাক-জমিদারের কাহিনী। উদাহরণস্বরূপ তিনিই যথেষ্ট।

তাঁর নাম গোবিন্দরাম মিত্র। গোবিন্দরাম ছিলেন কোলকাতার ব্ল্যাক-জমিদার। ঠাট্টা করে দেওয়া নাম নয়, ওটাই ছিল তাঁর সরকারী পদবী। কোলকাতায় তখনও মিউনিসিপাল শাসন গড়ে ওঠেনি। কোম্পানীর রাজত্ব তখনও আধা স্বপ্ন, আধা বাস্তব। সেকালে শহর কোলকাতার শাসক ছিলেন মাত্র একজন লোক। তাঁকে বলা হতো জমিদার। কর্নওয়ালিশের জমিদার আর এ জমিদারের অনেক ফারাক! এ জমিদার ছিলেন রাজকর্মচারী এবং সাহেব. এবং তিনিই ছিলেন এ শহরের সর্বময় কর্তা। তাঁর হাত ছিল—শহরের লোকেদের উপর ট্যাক্স বসানো, ট্যাক্স আদায়, হিসাবপত্র রাখা, সুখ-শান্তি দেখাশুনা করা, বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বাড়ী জমি গাড়ী থেকে বিয়ের ক্রীতদাস ইত্যাদির উপর ট্যাক্স বসাতেন এবং আদায় করতেন। দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমার বিচারকও ছিলেন তিনি। লোককে জরিমানা করা, অন্যবিধ দৈহিক শাস্তি দেওয়া, জেলখাটানো—এমন কি ফাঁসি দেওয়ার পর্যন্ত অধিকার ছিল তাঁর। তবে ফাঁসি দিতে হলে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হতো এই যা। এই সাহেবের মাইনে ছিল ২০০০ টাকা! তবে তিনি কিছু কমিশনও নাকি পেতেন। যত আদায় হতো তার উপর শতকরা হিসাবে সামান্য কিছু। অবশ্য এ ছাড়া অন্যবিধ স্বাধীন ব্যবসা তো তাঁর ছিলই।

এহেন পদটির একটি মাত্র মুশকিল ছিল এই—পদটি কারও জন্যেই স্থায়ী ছিল না। কোম্পানীর কি মর্জি, বছর বছর লোক বদল করে. এমন কি কখনও কখনও বছরে দুবার। ফলে কোলকাতার শাসক হতেন নিত্য নতুন লোক। হয়ত এমন লোক এলেন যার কোন অভিজ্ঞতা নেই এদেশ সম্পর্কে, নেটিভদের বিষয়ে। অথচ কোলকাতা নেটিভেরই শহর। তার উপর আর এক মুশকিল—হিসেবপত্র রাখতে হবে সব দেশীয় ভাষায়! কি করে কাজ চলবে তাহলে? অনেক ভেবে চিন্তে কোম্পানী তাই নিয়োগ করতেন—একজন দেশীয় সহকারী, নেটিভ ডেপুটি। নাম হলো, তার ব্ল্যাক-জমিদার। ব্ল্যাক-জমিদার বছর বছর বদল হয় না। ফলে তিনিই হয়ে উঠতেন কার্যত শহরের মালিক।

১৭২০ সালে প্রথম জমিদার নিযুক্ত হলেন শহর কলকাতায়। সঙ্গে

সঙ্গে নিযুক্ত হলেন একজন ব্ল্যাক-ডেপুটি; বা ব্ল্যাক-জমিদার। তিনিই আমাদের গোবিন্দরাম। মাসে মাইনে তিরিশ টাকা। মুখ বুজে ঐ টাকাই ফতুয়ার পকেটে গুঁজে গোবিন্দরাম বাড়ী ফেরেন। আর মনে মনে হাসেন। তারপর ক' বছর বাদে কোম্পানীকে বললেন, মাইনটো একটু বাড়িয়ে দাও, নয়ত যা দিন পড়েছে, আর যে চলে না। কোম্পানীর দয়া হলো। গোবিন্দ-রামের মাইনে আরও ২০৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন তাঁরা। এবার সাকুল্যে দাঁড়াল মাসে পঞ্চাশ টাকা! কিন্তু এ উপলক্ষ্য মাত্র। কুড়িয়ে নিতে জানলে এ-পদে টাকার অভাব নেই। গোবিন্দরাম সেটা জানতেন। ফলে অচিরেই তাঁর সিন্দুক ভরে উঠলো। এবং ভরতে ভরতে তিরিশ বছর পরে গোবিন্দরামের খাজাঞ্চিখানা এমন চেহারা নিলে যে, কে বলবে তিনি পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকুরে!

কিন্তু সহসা গোবিন্দরামের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হলো জীবন্ত শনি। হলওয়েল (১৭৫২) জমিদার নিযুক্ত হলেন কলকাতার। গোবিন্দরামকে চেপে ধরলেন তিনি। কোম্পানীর কাছে তাঁর অর্থোপার্জনের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থিত করলেন তিনি সাক্ষ্য প্রমাণাদি সহ। গোবিন্দরাম বিপাকে পড়লেন। কিন্তু ঘাবড়ালেন না। কোম্পানীর কর্তাদেরও তিনি চিনতেন। দেখা গেল, ক্রমে তাঁরা দয়ালু হয়ে উঠেছেন। গোবিন্দরাম তাঁদের নরম করে ফেলেছেন। লোকে বলে এ তাঁর ব্ল্যাকমানির কাজ। তাঁরা তাঁকে জেলেও পুরলেন না, ফাঁসিও দিলেন না। বরখাস্ত করলেন। হলওয়েলের নাকের সামনে 'ছড়ি' ঘুরাতে ঘুরাতে বেরিয়ে এলেন গোবিন্দরাম।

এবার ধর্মকর্ম। ব্ল্যাক-টাউনের লোক অবাক হয়ে দেখলো—আকাশ-ছোঁয়া মন্দির উঠছে তাদের পাড়ায়। গোবিন্দরাম মন্দির গড়লেন চিৎপুরে। বিরাট মন্দির। ১৬৫ ফুট উঁচু। হলওয়েল মনুমেণ্টের চেয়ে অনেক, অনেক বড়। মাইল মাইল দূর থেকেও চিক্‌চিক করে মন্দিরের উপরকার সোনার কলস, ধ্বজা। নবরত্ন মন্দির। ধন্যি ধন্যি রব পড়ে গেল ব্ল্যাক-টাউনে।

চারদিকে ধন্য ধন্য রবের মধ্যেই একদিন বিগত হলেন গোবিন্দরাম। ক্রমে ১৭৩৭ সালের প্রবল ঝড়ে গুঁড়িয়ে গেল একদিন তাঁর নবরত্ন মন্দিরও। কিন্তু বেঁচে রইলো ব্ল্যাক-টাউন। বেঁচে রইলো ব্ল্যাক-জমিদাররাও। অবশ্য বে-সরকারীভাবে। সরকারীভাবে গোবিন্দরামই প্রথম এবং শেষ ব্ল্যাক-জমিদার। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা বোধহয় আজও আছে। কোলকাতা বোধহয় আজও ব্ল্যাক-টাউন-ই এবং সাহেবদের হারিয়ে বোধহয় পুরোপুরি ব্ল্যাক। কালো, অন্ধকার।
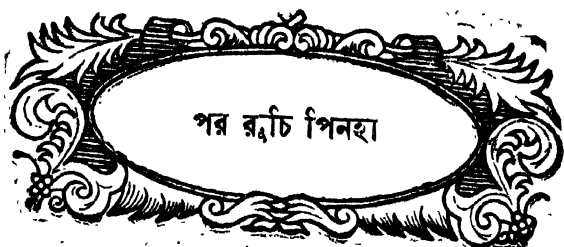
সময় : সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা। তার আগে আসবার কোন দরকার নেই। কারণ, যাঁদের দেখতে আসছেন আপনি তাঁরা তখনও সব গ্রীন রুমে। কেউ বাগবাজারের গলিতে জামা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—কতক্ষণে বৌমা কোটটায় বোতাম লাগানো শেষ করবেন তার-ই অপেক্ষায়, কেউ পার্কসার্কাসে ঝগড়া বাধিয়ে বসেছেন ধোপার সঙ্গে। কাল সন্ধেবেলায় ইস্ত্রি করতে দিয়ে গেছেন জামাটা অথচ এখনও নাকি হয়নি! তা রাগ হবার কথা কিনা বলুন! মুরারিপুকুরের খোলা-বাড়ির কেরানীবাবুটিও রেগেছেন। বুড়ো মা, নতুন বউ—সবাই তছনছ করে ফেলেছেন গোটা বাড়ি, কিন্তু কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না চিরুনিটা। এদিকে ন'টা বাজে!

তা বাজুক। আপনার তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই। ড্রপসিন উঠবে সেই সাড়ে ন'টায়। তার আগে নয়। ঠিক সাড়ে ন'টায় এসে পৌঁছবেন—বড়বাবু বা কিপলিং সাহেবের 'ডিপার্টমেণ্টাল ডেটি'টি। পৌনে দশটায় মেজোবাবুরা। দশটা বেজে দু' মিনিটে সদ্য চাকুরী-পাওয়া কনিষ্ঠ কেরানী-পঞ্চক। সোয়া দশটায় টাইপিস্ট মেয়েটি। সাড়ে দশটায়—ইউনিয়নের কর্মীরা।

তার পরেও অবশ্য আসবেন অনেকে। কিন্তু সে সওদাগরী হৌসে নয়, সরকারী আপিসে। সেখানে আপিস বসবেই এগারটার পরে। তার আগে যাঁরা আসেন, তাঁরা সব ক্লাস ফোর অফিসার। অর্থাৎ, বেয়ারা চাপরাশী লিফটম্যান প্রভৃতি। নচেৎ—ফাইল-নিউরেসিস কোন বৃদ্ধ কেরানী। ছোকরারা যাঁকে বলে 'দাদু'। আসল কেরানীরা আসতে শুরু করবে এগারটায়। এক্সপার্টরা আসবেন বারোটা থেকে একটায়। সুতরাং, এঁদের দেখতে হলে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে একবার সরেজমিনে টুর দেওয়াই ভাল। দেড়টার পরে গিয়ে কিন্তু লাভ নেই। কারণ, টিফিনের পরে ওঁদের আবার টুরে বেরুবার সময়।

অবশ্য এঁরা বেরিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই আপনার। সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটায় আপনি যা দেখবেন এঁরা তার চেয়ে বেশী কিছু আপনাকে দেখাতে পারবেন না। এঁদের ওয়ার্ডরোব-এ সত্যিই নূতন কিছু নেই। একমাত্র যা আছে সে—খদ্দরের প্যাণ্ট। উঁচু মহলে এ-জিনিসটি ইদানীং একটু খাতির পাচ্ছে বলেই গবেষকদের ধারণা। খদ্দরের প্যাণ্ট এবং হাওয়াইয়েন শার্ট—আমাদের পোশাকের ভাণ্ডারে ব্যুরোক্র্যাটদের একটা নতুন অবদান।

তাঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও পুরোপুরি অনারেবল মিনিস্টারকে অ্যাকোমডেট করতে পারেননি—তাঁরা অবশ্য এখনও নিম্নার্ধে ট্রপিক্যাল পরেন, ঊর্ধ্বাঙ্গে বাফ্‌তার হাওয়াই। [বাফ্‌তাও খাদি সন্দেহ নেই!]

মোট কথা—টুকরো হলেও বিশুদ্ধ খাদি। খাদির এই বর্তমান খাতির অবশ্যই লক্ষণীয়। এককালে আমাদের উপন্যাসের নায়কেরা জন্মদিনে নায়িকাকে খদ্দরের শাড়ি উপহার দিতেন, সিনেমার 'হিরো'রা প্রেমের উচ্চাদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন মাথায় গান্ধীটুপি পরে। এখন সেক্রেটারি ডাইরেক্টাররা সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করছেন—খদ্দরের হাওয়াইয়েন শার্টে! ইতিমধ্যে অনেকেই পেঁছে গেছেন খাদির টাই-এও।

সে যা হক, আপনি সময়মত দাঁড়িয়ে যান। সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা! বাঙালীর পোশাক দেখতে চান তো, এই ব্রাহ্মমুহূর্ত। ডালহৌসির যে-কোন কোণে দাঁড়িয়ে যান। এই সময়টায় আপনার পোশাক কি হবে তাও বলতে পারি। কিন্তু সে থাক্। এটা ত সবারই জানা কথা আপনি শুধু দেখতে আসছেন না, দেখাতেও আসছেন। তা দেখবার যারা তারা দেখুক। বোম্বাইর সিনেমা সেট থেকে উড়ে এসে এখানে পড়েছেন যদি ভাবে কেউ ভাবুক,—যদি কেউ ভাবে ফিজিদ্বীপের ট্যুরিস্ট, ভাবুক। ক্ষতি নেই। উপস্থিত আপনি দেখুন।

দেখবেন, আপনার সামনে চলেছে এক বিচিত্র ফ্যাশান প্যারেড। কিংবা বলতে পারি ফ্যান্সিবল। কারও পোশাকের সঙ্গে মিল নেই কারও। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, ইনডিভিজুয়াল। অবশ্য সমাজবিদ্যা বলে—জাতি মাত্রই নাকি তাই। ইনডিভিজুয়াল-এর সমষ্টি। কিন্তু বাঙালীর মত নিশ্চয় নয়। বড়বাবুকে দেখুন। পায়ে ব্রাউন রংএর গেলজকীডের পাম্‌শু, উরুর সঙ্গে গার্টার দিয়ে টানা দেওয়া হাফ্ মোজা। ন'গজ চুয়াল্লিশ ইঞ্চি মিহি ধুতি। কোঁচাটি জুতো থেকে আধ হাত উপরে। গায়ে গলাবদ্ধ সাদা কোট। বড় বড় পকেট, বড় বড় পিতলের বোতাম। মেজোবাবু জীবন্ত হবসন-জবসন। ইতিহাসের একটি আস্ত অধ্যায়। একাধারে তিনি ইংরেজ এবং বাঙালীর সার্থক সমন্বয়। পায়ে তাঁর মোজাহীন শু। ফিতোগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৌশলে গোছানো। জুতো পরতে বা খুলতে ওদের কোন ঝামেলা নেই। মেজোবাবুর ইংলিশ-কফ শার্টের আধখানা ধুতির নীচে নির্বাসিত। গলার শেষ বোতামখানা করছে টাইএর কাজ। অবশ্য মাফলারও আছে তাঁর। কিন্তু উপস্থিত সেটি কোটের পকেটে। অন্য পকেটে ব্যালান্স রাখছে বাজারের থলিটি। বাজারে যদি ওঁকে লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন, ইনি জামা এবং কোট থাকা সত্ত্বেও পয়সা বের করছেন কোমরে গুটোনো রুমাল থেকে। নোট যদি হয়, তবে খনিতে নামতে হবে ওঁকে। প্রথমে কোটের আস্তরণ পেরিয়ে পেঁছতে হবে শার্টে, তারপর শার্টের বোতাম খুলে নীচের বেনিয়ানে।—তাও হাতে বেনিয়ান ঠেকা মানে—টাকা পাওয়া নয়। টাকা থাকে তারও নীচে বেনিয়ানের উল্টো দিকের গুপ্ত পকেটে। মেজোবাবুর চামড়ার সঙ্গে মিশে, কলজে ঘেঁষে।

কেরানীদের মধ্যে এসব বনেদীয়ানা নেই। তাঁদের বৈশিষ্ট্য আট আনা চুলে-গোঁফে, হাঁটার ভঙ্গীতে এবং কথা বলার স্টাইলে, বাকী আট আনা

পোশাকে। তবুও অবহেলা করবেন না ওঁদের। কারণ, বঙ্গীয় ফ্যাশান জার্নাল-এর এ'রাই লেটেস্ট নাম্বার। সিনেমার নায়কদের সর্বশেষ হালচাল থেকে রোয়াক-এর মতিগতি একমাত্র ওঁদের পোশাকেই স্বল্পায়াসে লভ্য। ওঁরা পেশায় কেরানী বটে, কিন্তু জাতিতে কালচারাল। সুতরাং নিউকাট-এর চেয়ে কোলাপুরী কিংবা হাওয়াইয়েন ওঁদের বেশী পছন্দ। প্যাণ্টের পরেই ওঁরা পরতে ভালবাসেন—পা-জামা এবং অবশেষে ধুতি। ধুতি হলে—মিহি হওয়া চাই। পাঞ্জাবীটা রঙিন খদ্দর হ্যাণ্ডলুম হলেও চলবে, কিন্তু ধুতিখানা বাইশ টাকা জোড়ার কমে নয়। ইউনিয়নের তিনি অ্যাকটিভ মেম্বার কিনা, তা বুঝতে হলে লক্ষ্য করতে হবে জামাটায় শতকরা কয় ভাগ বোতাম কম এবং পাঞ্জাবী হওয়া সত্ত্বেও তাতে সোস্যালিস্টিক কোন টাচ্ আছে কিনা। অর্থাৎ যদি তাতে কোন বুক-পকেট না থাকে এবং যুগপৎ যদি পাঞ্জাবী হওয়া সত্ত্বেও তাতে একটি আধ ইঞ্চি বহরের কলার থাকে, তবে জানবেন তিনি যথার্থই আর পাঁচজন কেরানীর মত নন।

তিনি যে আর পাঁচজন বাঙালীর মত নন—একথা যাঁরা বুক ঠুকেই বলতে পারেন, তাঁরা বঙ্গদেশের ইনটেলেকচুয়্যাল-কুল। সাধারণভাবে এ'দের পোশাক ধুতি পাঞ্জাবী হলেও, তা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। কেউ কেউ লখনউ-কাট্ ফুলদার পাঞ্জাবী পরেন, কারও কারও আবার নিজস্ব কাট্ আছে। যথা, বোতামের ঘরগুলো চীনা কায়দায় হবে এবং বোতামগুলো হবে কাপড়ের। কেউ কেউ বোতামের বদলে সুতোর-বন্ধন পছন্দ করেন এবং প্লেন পাঞ্জাবীর চেয়ে গিলে করা।

দরবারী বাঙালী

অবশ্য এমন কথা মনে করার কারণ নেই যে, বঙ্গদেশে পোশাক সম্পর্কে উদাসীন কবি-সাহিত্যিক একেবারে নেই। নিশ্চয়ই আছেন। এখানে শুধু স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথাই বলা হয়েছে মাত্র। এ'দের বাদ দিলে,—কোট-প্যাণ্ট-টাই, পা-জামা পাঞ্জাবী, মাল-কোঁচা হাওয়াইয়েন শার্ট ইত্যাদি সবই আছে এদেশে। এমনকি—হাতের কাছে যা পাওয়া যায় এমন রেডিমেড ভক্তও।

সুতরাং, সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটায় ডালহৌসিতে দাঁড়িয়ে আপনি যা দেখেছেন—সন্ধ্যার কফি-হাউসে কিংবা খ্যাতনামাদের আড্ডায় উঁকি দিলেও তাই দেখবেন। সর্বত্র শুধু এক দৃশ্য-বৈচিত্র্য।

এই বৈচিত্র্য যে আকস্মিক নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। সত্য বটে, বাঙালীর ঘরে মুরগীর মত লুঙিগও সাম্প্রতিক ঘটনা এবং এটাও মিথ্যে নয় যে মহাযুদ্ধ, বস্ত্রাভাব ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণগুলো কমবেশী 'দো-নলা' ওরফে পা-জামার জনপ্রিয়তার কারণ। কিন্তু তার আগেও কি সত্যিকারের কোন ন্যাশনাল ড্রেস ছিল আমাদের?

বাঙালীর কোন ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী নেই। সুতরাং চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। পুরনো পরিবারগুলোতে যেসব ছবি আছে,

বলতে গেলে তা সব এক মডেলের। কুশাসনে নগ্নদেহ নাদুসনুদুস ভুঁড়িখানা গুছিয়ে মুদ্রিত নেত্রে বসে আছেন। সামনে তাঁর শঙ্খ, গঙ্গাজল, পত্র-পুষ্প, কোষাকুষি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এটা কোন ড্রেস নয়। এমনকি ডাইনে বাঁয়ে দুখানা তাকিয়া বসিয়ে হাতে একখানা গড়গড়ার নল জুড়ে দিলেও না!

অথচ, এই সনাতন বাঙালীকে বাদ দিলে আর যা আমাদের ভাণ্ডারে থাকে তা অফিসিয়াল ড্রেস মাত্র। সে পোশাকে দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব কিংবা রামমোহনের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া ভার। দেখলে মনে হয়, কনভোকেশন ড্রেসের মতই এগুলো যেন ইউনিফর্ম।

ইতিহাস বলে, এগুলো বাঙালীর পোশাক নয়, নবাবী বাংলার পোশাক। ঠিক তেমনি ঊনবিংশ শতকের কলকাতার বাবু যে পোশাকে আজ ঐতিহাসিক হয়েছেন সেটিও এক নয়া-নবাবীয়ানার পোশাক মাত্র। হুতোম প্যারীচাঁদ বা ভবানীচরণের কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই'এর লেখায় আপনারা অহরহ তাদের সে বেশ-বিলাস দেখেছেন। উপস্থিত আমি শুধু তাদের ধুতিটার কথাই বলব। আমার কথা নয়,--সমসাময়িক জনৈক ক্রিটিক-এর বর্ণনা। ক্রিটিক বাবুর পোশাক দেখে লিখছেন : 'সুপুরুষ হইতে মহা সাধ মনে ভাবেন বড়মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য না দেখাই তবে লোকে ছোটলোক কহিবেক—ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির আভরণ, অর্থাৎ দো-নরি তে-নরি পাঁচ-নরি হার বাজুবন্ধ উপলক্ষ্যে ইষ্টকবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা ও কালাপ্যেড়ে রাঙ্গাপ্যেড়ে শালপ্যেড়ে কাঁকড়াপ্যেড়ে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাইপ্যেড়ে ধুতি পরিধান করেন। এ সকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে।' ইত্যাদি।

এ পোশাকটি আজ দুর্লভ হলেও যে একেবারেই অচল এমন কথা বলা যায় না। কোথাও কোথাও কখনও কখনও এ-পোশাক আপনার চোখে পড়বে অবশ্যই, কিন্তু—'উড়ো কোঁচা' ধুতি কিংবা 'জামা নিমা কাবা কোরতা' ইত্যাদি হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদও বাঙালীর নিজস্ব পোশাক নয়। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বাঙালীর নিজের কোন পোশাক নেই। যখন যে পাত্রে রাখা হয়েছে তাকে তখন সে পাত্রেরই আকার ধরেছে সে।

পার্কগুলোকে একটা চক্কর দিয়ে আসুন, কাকে প্রতিনিধি বলবেন বাংলা দেশের? বটকৃষ্ণ পাল মশাই নিশ্চয় নয়। তা হলে আপনার শীতের পোশাকটাই মাটি হয়ে যাবে যে! গিরিশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বিদ্যাসাগর আজ আর মনে ধরবে না। বরং তার চেয়ে, একটু কেটে ছেঁটে নিলে দিব্যি চলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং আশুতোষেরা!

সত্যি কথা বললে—জিতেছেন এঁরাই। কনভারসন যে বেগে শুরু হয়েছে তাতে বাংলাদেশকে সাহেব সাজতে আর ক' বছর লাগবে, মিলওয়ালাদের সেটাই গবেষণার বিষয়। অবশ্য মাঝে মাঝে হাওয়াই, হনলুলু—মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করবে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ইংরেজেরাই জিতবে এ বিষয়ে মিত্রপক্ষ একমত।

শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এ বিজয়—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম, নয়। বেঁচে থাকার জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে র‍্যাঙ্কিনকে। দু' তরফা লড়াই। একদিকে সনাতন বঙ্গদেশ, অন্যদিকে বিজয়ী সরকার।

সনাতন বঙ্গদেশ ভ্রূকুটি করে খবরের কাগজে প্রশ্ন তুললেনঃ "ইংরেজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি, তাহা কিছু বুঝিতে পারি না, যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্ত বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানী পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙালীর নিমিত্ত উত্তম কোনমতে নহে। সে যাহা হউক যদি এ-পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল, তবে তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক, তবে বরাবরই পরিবেক। যখন মস্থ যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক, তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক, কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুক লোকের বাটীর ভিতর একজন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে!"

সুতরাং পত্রলেখক চ্যালেঞ্জ করলেন "যদি তাহারদিগের মতে (ইংরেজী পোশাকের) কিছু গুণ থাকে, তাহা লিখিয়া আমার থোথা মুখ ভোঁতা করিয়া দিবেন।"

কিন্তু কেউ এগিয়ে এলেন না তাঁর জবাব দিতে। কারণ জবাব দেওয়ার বাস্তবিকই কিছু নেই। বাংলাদেশ তখনও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হয়নি যে বলবে, কলে-কারখানার কাজে ইংরেজী পোশাকে সুবিধে। মধুসূদন গুপ্ত যে পোশাকে প্রথম শবচ্ছেদ করেছিলেন কলকাতায় সে পোশাক দেখবার পর কোন ডাক্তার বলতে পারেন না যে, ঐ বিশেষ বিদ্যাটি ইংরেজী পোশাক ছাড়া অচল। আবহাওয়ার কৈফিয়ত দেবেন? তারই বা সুবিধে কোথায়? কাউন্সিলের মেম্বাররা পর্যন্ত এদেশের জলের গুণে—মসলিনের বেনিয়ান শার্ট, লম্বা পা-জামা (লং ড্রয়ার) এবং কোঞ্জি টুপি ধরেছেন,—মেমসাহেবেরা ধরেছেন ঢিলে ফ্রক। এমতাবস্থায় বাঙালী কি করে জল-হাওয়ার কৈফিয়ত দেন?

হবসন-জবসন

কৈফিয়ত না থাকলেও, রাজার পোশাকে সাধ যায় সবারই। বাঙালীবাবুরাও তাই ইংরেজী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী পোশাক ধরলেন। শুধু নিজেরা নন, চাকর-বাকরদেরও সাজানো চাই ইংরেজী কায়দায়। কিন্তু মহামান্য কোম্পানি বাহাদুর বাদ সাধলেন। ১৭৮৬ সনের ৭ই এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়াম গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেক্রেটারিমশাই এক সার্কুলার জারী করে কলকাতা-বাসীকে জানালেন যে, 'মহামান্য গভর্নর বাহাদুর এবং তাঁর কৌন্সিল জানতে পেরেছেন যে, এই শহরের কিছু কিছু বেনিয়ান এবং ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্প্রতি তাদের ভৃত্যদের কোম্পানির সিপাই এবং লস্করদের মত করে সাজাবার একটি অভ্যাস ধীরে ধীরে ব্যাপ্তিলাভ করছে। এতদ্দ্বারা আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এটা বে-আইনী।'—ইত্যাদি।

আর একটা বে-আইনী ব্যাপার ছিল তখন সাহেবের সামনে জুতো পরা। লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ সনে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে কলকাতার চীনাদের

বাঁচালেন। [এবং ভবিষ্যতে চেক এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মার্কেট তৈরীতেও সাহায্য করলেন।] লাটভবনে প্রথম যেদিন ইংরাজী জুতায় বাঙালীবাবু দর্শন দিলেন সেদিন নাকি এক দেখবার মত দৃশ্য। বাঙালীর কাষ্ঠ-পাদুকায় অভ্যেস ছিল, বড় ঘরে তালতলার চটি এবং রকমারি লখনউকাট্-এর গতায়াতও ছিল কিছু কিছু। কিন্তু ইংরেজী জুতো? এমিলি ইডেন লিখেছেন—'সে এক দৃশ্য। নতুন আঁটোসাঁটো জুতোয় পা কেটে গেছে। তবুও খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাট বাহাদুরকে সেলাম জানাতে আসছেন একের পর এক জেণ্টু!'

বলা বাহুল্য, আজ আর আমরা খোঁড়াই না। এমনকি ছ' ইঞ্চি উঁচু হিল-এ আমাদের কেটি মিটারও গট গট করে চলে আজ।

প্রসঙ্গত কেটি মিটারদের বসন সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা দরকার। এজন্যে নয় যে, কেটি আজ সংখ্যায় কোটি কোটি। তার চেয়েও জরুরী ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমাদের যত রঙবেরঙএর রকমারী সাজ তার প্রধানতম কারণ ওরাই। কেননা, ওরা 'কাউ বয়' ভালবাসে বলেই আমরা গোপাল সাজি।

অবশ্য একথা বলে রাখা দরকার যে বাংলাদেশের মেয়েদের শাড়িটি সত্যি সত্যিই এদেশের নিজস্ব জিনিস। গবেষকরা আমাদের জানিয়েছেন—বাংলার শাড়ি সুতোয় বোনা বাংলার নদী মাত্র। দু' পাশের পাড় দুটি তার নদীর একূল ওকূল, বিস্তীর্ণ আঁচলটি মোহনা।

শাড়ি আজ সেই অর্থ হারিয়েছে এমন বলব না। তবে এলোপাথাড়ি সামাজিক ভূমিকম্পে গতিপথ পরিবর্তন করেছে অবশ্যই। সেকালে বাঙালী মেয়ে যে কৌশলে শাড়ি পরতেন, আজকের ঠাকুমারাও তা পরেন না। পরতে ভালবাসেন না। কারণ, ইতিমধ্যে নূরজাহানের যুগ যেমন পেরিয়ে গেছে, তেমনি ভিক্টরীয় তথা ব্রাহ্মসমাজী যুগও। এখন শাড়ি আর শুধু শাড়ি নয়, আরও গুটি কয় বস্ত্রখণ্ডের একটি মাত্র।

শাড়ির দ্বিতীয় পরিবর্তন যেটি ঘটেছে সেটি দৈর্ঘ্যে হাতখানেক বা বহরে ইঞ্চি কয়েক বৃদ্ধি নয়,—সেটি তার সূক্ষ্মতা। মসলিনের চেয়ে নাইলন সিফন হাল্কা নয় সত্য; কিন্তু প্রথমোক্তটি কোন কালেই সর্বজনের ভূষণ ছিল না এদেশে। শুনলে তাক লেগে যাবেন, মোটা সাটী থেকে চন্দ্রকোনার হাল্কা শাড়িতে আসতে বাংলা দেশকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে হয়েছে কমপক্ষে একশ' বার।

গোটা দেশে সে এক হৈ চৈ কাণ্ড। খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। ১৮৩৫ সনে খবরের কাগজে কস্যাচিৎ বিদেশিনঃ প্রশ্ন তুললেন : এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতি সূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্ন দেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়।

কিন্তু কর্তারা তখন দূতীবিলাসের যুগে পড়েছেন। সেখানে অনঙ্গ-মঞ্জুরী 'সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা যায়।'

১৮৫১ সন পর্যন্ত, প্রায় কুড়ি বছর ধরে দূতীবিলাস চলল বাংলা দেশে। ঢাকা, চন্দ্রকোনা, শান্তিপুর মিহি শাড়ি বুনে চলল বিপুল বেগে। সঙ্গে ততোধিক বেগে চলল তার বিরুদ্ধতা।

শুধু তাই নয়। বর্ধমানের মহারাজা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর রাজ্য থেকে মিহি শাড়ি নির্বাসনে পাঠালেন। প্রজাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হল যদি কেউ মিহি কাপড় পরে তবে তার দণ্ড হবে।

কঠিন প্রতিজ্ঞা। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, বর্ধমানাধিপের এই একুশে আইনের ফল কি হল? তবে তাকে উত্তরের জন্যে একবার তাকাতে বলব নিজের ঘরের আলনাটির দিকে, কিংবা একবার এসে দাঁড়াতে বলব সন্ধ্যার চৌরঙ্গীতে অথবা খাড়া দুপুরেই কোন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের শো-কেসটির মুখোমুখি।

করিম বক্স বাহাদুর

গৃহ-ভৃত্যরা যদি সাচ্চা প্রলেতারিয়েত হত, তাহলে বোধহয় দুনিয়ায় (অন্ততপক্ষে এশিয়ায়) প্রথম সোস্যালিস্ট স্টেট প্রতিষ্ঠিত হত আমাদের এই কলকাতায়। কারণ, কলকাতায় তখন যত গৃহ, তার চেয়ে অনেক বেশী ভৃত্য। প্রতি ইউনিটে বা ঘর-প্রতি তাদের গড়সংখ্যা তখন কমপক্ষে পঞ্চাশজন।

হিসেবটা মোটেই আমার মনগড়া নয়। এমেলি ইডেন নিজের মুখে স্বীকার করেছেন, লাটভবনে তখন সাকুল্যে ক'জন ভৃত্য ছিল তা তাঁর পক্ষে বলা মুশকিল। তবে তাঁর নিজের পায়ে পায়ে সব সময় ঘুরে বেড়াত পাঁচজন। এই একই কাজে, অর্থাৎ ঘুরে বেড়াবার কাজে জজের পিছনে ছিল পনেরজন। এবং শনিবারে শনিবারে তাঁরা যখন বেড়াতে যেতেন ব্যারাকপুরে তখন তাঁদের সঙ্গে যেত চারশজন।

চাঁদপাল ঘাটে এই চারশ' ভৃত্যের বাহিনী যখন সেলাম জানাল তাদের নতুন লাট বাহাদুরকে, কর্নওয়ালিশ তখন অবাক না হয়ে পারলেন না। কোম্পানি যে এখানে 'নাবব' বনে গেছে সে খবর তিনি রাখতেন। কিন্তু এতটা তাঁর স্বপ্নেও ছিল না। তিনি একান্তসচিব রবিনসনকে তলব করলেন। 'রবিনসন হে—এটা কী ব্যাপার হে?'

রবিনসন বললেন, 'আজ্ঞে, এরা আপনার ভৃত্য। আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'—হে!' ধমক দিয়ে উঠলেন কর্নওয়ালিশ। বলে রাখা ভাল, কথায় কথায় এই 'হে'টা ছিল কর্নওয়ালিশ-এর মুদ্রাদোষ। '—তা রবিনসন হে—ওরা কি-হে মাথায় করে নিয়ে যাবে আমাকে?—হে!'

রবিনসন বললেন, 'আজ্ঞে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আপনি পালকিতে যাবেন। ইচ্ছে হয়, ঘোড়ার গাড়িতেও যেতে পারেন।'

রেগে আগুন হয়ে উঠলেন কর্নওয়ালিশ। 'রবিনসন হে—তুমি কি বলতে চাও—হে, আমি খোঁড়া, হে?—আমি হেঁটে যাব,—হে!—ইউ ফলো মি হে, রবিনসন হে!' বলেই কোন দিকে না তাকিয়ে গ্যাট গ্যাট করে রাজভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন কর্নওয়ালিশ।

ভাববেন না—তার ফলে ভাত মারা গেল শ' চারেক লোকের। ওরা লাট-বাহাদুরের চাকর নয়। ওরা একটা রাজত্বের শোভা, ঐশ্বর্যের পতাকা। ফলে

ফুলবাগানে পাতাবাহারের মত বেঁচে রইল শুধু কর্নওয়ালিশ-এর রাজত্বে নয়, গোটা ইংরেজ রাজত্বে।

কর্নওয়ালিশ-এর পরে এলেন মিণ্টো। তাঁর জন্যেও রাজভবনের খাতায় ছিল বরাবরের সেই চারশ ভৃত্যের বরাদ্দ। কলকাতায় তাঁর প্রথম রাত্তিরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ রাত্তিরে শোবার ঘরে ঢুকেছি ত আমার পেছন পেছন এসে ঢুকল জনা চোদ্দ মানুষ। লম্বা মসলিনের গাউন তাদের গায়ে। হা কপাল! এদের দু' চারটে যদি মহিলা হত তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু একটু ভাল করে নজর করতেই দেখি—আমার চার পাশে যত-গুলো গাউন ঠিক ততগুলো পাগড়ি এবং ঠিক ততগুলো কালো দাড়িওয়ালা মুখ! (One might have hoped that some of these were ladies; but on finding that there were as many turbans and black beards as gowns......etc.) সুতরাং বাধ্য হয়েই এই দাড়িওয়ালা হাউস-মেড্‌দের (bearded house maid) বিদায় দিতে হল আমাকে। এ-ঘরটায় অন্তত একা থাকতে চাই আমি!

কিন্তু একা থাকবেন তার সুবিধে কোথায়? লাটভবনের কথা বাদই দিচ্ছি। সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস লাট ছিলেন না। তিনি ছিলেন লাট সাহেবের কাউন্সিলের একজন সদস্য মাত্র। তাঁর সেক্রেটারি ম্যাকবেরী সাহেব লিখেছেন তাঁদের চারজনের সংসারে ভৃত্য ছিল একশ দশজন। এবং এই শয়তানকুলের (ট্রাইবস অব ডেভিলস) তদারকির জন্যে রীতিমত কয়টি ডিপার্টমেণ্টই নাকি খুলতে হয়েছিল তাঁকে।

শুধু বড় ঘরেই নয়। ছোট-বড়-মাঝারি সব ঘরেই তখন এক অবস্থা। সর্বত্র ভৃত্যদের আস্ত আস্ত রেজিমেণ্ট! হিকি সাহেব ছিলেন একজন অ্যাটর্নী। মিথ্যে বলব না, রোজগার তাঁর ভালই ছিল। তা এক-হাজারী ব্যারিস্টার ত এখনও অনেক আছেন কলকাতায়। কিন্তু তেষট্টিজন ভৃত্য আছে কি তাঁদের কারও ঘরে? নেই। ঘরে কেন, স্বপ্নেও নেই। অথচ হিকি সাহেবের তাই ছিল। আটজন শুধু হাজির থাকত তাঁর খাবার টেবিলে।

বাদবাকীরা কী করত? সে একটা প্রশ্ন বটে। এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে আপনাকে একটা প্রমাণসাইজ আধুনিক গভর্নমেণ্টের কার্যপ্রণালী খুঁটিয়ে দেখতে হবে। নয়ত, মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে 'পার্কিনসন ল'। পড়লেই দেখতে পাবেন—এই গণ্ডা গণ্ডা ভৃত্যের কারণ মোটেই 'ডিভিশন অব লেবার' নয়। যে কারণে মন্ত্রিসভায় ডেপুটিদের সংখ্যা বাড়ে, কিংবা উপনিবেশ-এর সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে কলোনিয়াল আপিসের আকৃতি—এর পিছনের কারণও অনেকটা তাই। অর্থাৎ এটাও নেহাতই পার্কিনসন সাহেবের সেই কমিটিওলজি'রই ফল। বৃদ্ধিটা নিয়ম, সুতরাং বাড়ে।

কলকাতায় তখন ভৃত্যদেরই রাজত্ব। সুতরাং যে রাঁধবে, সে কিছুতেই চুল বাঁধবে না। 'আবদার' জল ঠাণ্ডা করবে, কিন্তু গরম করবে অন্যজন। সেই গরম জল সাহেব সমীপে বয়ে আনবে একজন, ঢালবে দ্বিতীয় জন। তৃতীয় জনের কাজ হবে ভিজে পা গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া। সব ব্যাপারেই তা-ই। চোবদার লাঠি ছাড়া মশাল ধরবে না। খিদমদগার খাওয়ার টেবিল

ছাড়বে না। হরকরা কখনও টেবিল ঘেঁষবে না। মালি বাগান সাজাবে, কিন্তু বাগানের ঘাস কাটবে ঘেস্‌ড়ে।

কারিমবক্স বাহাদুর

প্রত্যেকের কাজ আলাদা, বস্‌ আলাদা এবং ডিপার্টমেণ্টও আলাদা। সাহেব বা মেমসাহেবের নিজস্ব এণ্টারেজ ত ছিলই, এমনকি ছিল ঘোড়া কুকুর ইত্যাদি জন্তুজানোয়ারদের জন্যেও আলাদা আলাদা ভৃত্য-বহর। নবাগত এক সাহেব ত কাণ্ড দেখে অবাক। তিনি তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা ভাই, বেড়ালেরও কি কোন খিদমদগার আছে এখানে? যখন শোনা গেল তা নেই, তখন কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। যা হক, বন্ধুগৃহে তাহলে একটা স্বাধীন প্রাণী আছে এখনও!

কেউ কেউ ক্ষেপে যেতেন। জন লরেন্স নাকি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না তাঁর বেহারা হরকরাদের। প্রতি রোববার গীর্জা থেকে বের হয়েই তাঁর প্রথম কাজ হত, সামনে সারি করে দণ্ডায়মান ভৃত্যকুলের উপর কব্জির বল পরখ করা। আর এক মনিব অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গেই জানাচ্ছেন—A black rascal makes an oration by my bed

every morning. I wake and see him Salaaming with a hot coffee in his hand.

মাটিতে অষ্টাঙ্গ লুটিয়ে 'মাই লর্ড', আই অ্যাম ইওর স্লেভ' 'দাই স্লেভ নোজ নট হাউ টু প্লীজ ইউ' ইত্যাদি মুখস্থ করা বক্তৃতা দিনের পর দিন শুনতে কার-ই বা ভাল লাগে? কিন্তু বিছানায় এক কাপ গরম কফি পেলে খুশী হয় না এমন সাহেব বিলেতেও আছে কিনা সন্দেহ। শুধু কি তাই? শুধু মুখ ফুটে একটু আওয়াজ কর—'বয়!' দেখবে হুকুমটা গলা ছাড়তে না ছাড়তেই এসে হাজির হয়েছে তালিমদার। যেন এতক্ষণ সাহেবের গলাতেই শব্দ হয়ে মিশে ছিল আধবুড়ো বয়টা!

সুতরাং সব সাহেবেরই সয়ে যেত ওদের। কখনও কখনও চাকরদের তাঁরা সইতে পারতেন না বটে, কিন্তু বরখাস্তও করতে পারতেন না।

তার কারণ এই নয় যে চাকরদের তখন ইউনিয়ন ছিল। ইউনিয়ন ছিল বরং মালিকদের। 'কোরাম অব জমিনদারস' ১৭৫৯ সনে কড়া কড়া আইন লিখলেন তাঁদের খাতায়। চাকরেরা যদৃচ্ছ মাইনে আদায় করবে এবার থেকে আর তা চলবে না। বেয়ারা কত পাবে, খিদমদগার কত, সব লেখা হয়ে গেল। হেডকুক মাসে পাঁচ টাকা, খানসামা, খিদমদগার—ঐ, ধোপা পুরো ফ্যামেলির হলে—তিন টাকা, একজনের হলে তার অর্ধেক, নাপিত দেড় টাকা (শীতকালে তাকে আসতে হবে ৭টায়, গরমের সময় ৮টায়), দর্জি তিন টাকা। এবং এবম্বিধ।

প্রসঙ্গত, আজকের দর্জিরা শুনে সুখী হবেন যে সেকালে শুধু কোট বেনিয়ান বা গাউন সেলাই-ই তাদের কাজ ছিল না। বড় সাহেবেরা যখন শিকারে বের হতেন তখন দর্জিকেও সঙ্গে যেতে হত তাঁর। কারণ দর্জি তখন অন্যতম শল্যচিকিৎসক। বাঘের আঁচড়ে জখম হয়ে গেল হাতিটা। অমনি বেয়ারা ছুটল দর্জি ডাকতে। হাতি সেলাই করতে হবে।

যা হক, 'কোরাম অব জমিনদারস' দর্জি সমেত সকলের মাইনে বাঁধলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে হুকুম জারি হল, যে এই আইন অমান্য করবে তার ফাঁসি হবে। ফাঁসি অবশ্য তাঁরা বলেননি। তাঁদের কথাটা ছিল কর্পোর‍্যাল পানিশমেণ্ট। সেকালের লোক জানত এর অর্থ কমপক্ষে ফাঁসি।

শুধু ভৃত্যদের নয়, মালিকদেরও সাবধান করে দেওয়া হল। খবরদার! কেউ কখনও বেশী দিয়ে বস না যেন। যদি দাও, তবে 'কোর্ট অব জমিনদারস' কখনও দায়ী থাকবে না তার জন্যে। এবং তার চেয়েও বড় শাস্তি, যে বেশী দেবে সে একঘরে হবে। (and the protection of the establishment will be withdrawn from him.) বলা বাহুল্য, দূর বিদেশে, ছোট্ট সমাজে এই শাস্তিটা কোন রুশ প্রজার নাগরিক অধিকার হারাবার চেয়েও মারাত্মক।

তবুও মোটেই ঘাবড়াল না কলকাতার ভৃত্য-কুল। তারা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল।

মিসেস ফে বললেন,—'বেয়ারা, ইধর আও! ঐ ছোট্ট টেবিলটা আমার সামনে এনে দাও ত।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা গলা ছেড়ে বাড়ির যেখানে যত চাকর ছিল তাদের ডাকতে শুরু করলে। কাণ্ড দেখে নিজেই উঠলেন ভদ্রমহিলা। টেবিলটার

একদিকে ধরে বললেন, 'তুমি ওদের ডাকছ কেন? এইটুকুন টেবিল, এ ত আমি নিজেই বইতে পারি!'

মিসেস ফে লিখছেনঃ উত্তরে কি বলল লোকটা জান!

—Oh! I no English, I bengalman. I no estrong like English, One-two-three bengalman cannot do like a Englishman! অর্থাৎ,—মেম সাহেব, আপনি অ্যাংরেজ, আমরা বাঙালী। আমাদের গায়ে বল কম! ইত্যাদি।

এটা ঠিক 'কোরাম অব জমিনদারস'দের উপর প্রতিশোধ নয়। ভৃত্য-ব্যুরোক্রাসির একটু নমুনা মাত্র। কম মাইনের জবাবও তারা দিল বটে, কিন্তু সে অন্যভাবে। এই মহিলাই লিখছেনঃ 'চারদিকে আমার খালি চোর! খানসামা এইমাত্র এক গ্যালন দুধ এবং তেরটা ডিম এনেছে—কিন্তু তাতে যদি দেড় পাঁইট কাস্টর্ড হয়! আমি তাকে কথাটা বলা মাত্র সে ধমক দিয়ে উঠল—নোকরি নেহি করেগা। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদেয় করে দিলাম ওকে। এবার অন্যজন এল। আমি তাকে বললাম, দেখ, বাজারে কোন্ জিনিসের কী দর আমি কিন্তু তা জানি। সুতরাং একটু সাবধানে। উত্তরে সে কী বললে জান? তা হলে নাকি তার ডবল মাইনে চাই!'

তা-ই দিতে হল। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৯ সনে কলকাতার সব ভৃত্যেরই দ্বিগুণ হয়ে গেল মাইনে। এবং তৎসত্ত্বেও বাজারের হিসেবে মাথাপিছু দৈনিক মাখনের বরাদ্দ ধরে চলল তারা বারো আউন্স করে!

সুতরাং 'কোরাম অব জমিনদারস' হার মানলেন। কেউ মানল না তাঁদের আইন। এমনকি, ১৭৬৩ সনে চাকর-বাকরদের নামধাম লেখবার জন্যে তাঁরা খাতা খুলেছিলেন একটা। কোন মনিব এক ছত্রও লিখলেন না তাতে। বরং জমিদাররা অবাক হয়ে দেখলেন, হিকি সাহেব গম্ভীরভাবে ভাবছেন এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে চাকরদের একটা পেনশনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তারই কথা। হিকি নিজে লিখেছেনঃ তাঁর ভৃত্য-সমুদয়কে পেনশন না দিতে পারার জন্যে সত্যিই তিনি আন্তরিক দুঃখিত।

তবে মনের এই খেদও তিনি মিটিয়েছিলেন বই কি! সে আমাদের মুন্নোকে উইলিয়াম মুন্নিউ বানিয়ে। অবশ্য, এটা ঠিক যে এ প্রলেতারিয়েত থেকে বুর্জোয়া হওয়া নয়,—করা। স্বগুণে যিনি এতদ্দেশে প্রথম তা হয়েছিলেন তিনি হিকির মুন্নো নহ, মেজর কির্কপেট্রিক-এর হুঁকোবরদার। লোকটা নাকি একদিন মেজর সাহেবের হুঁকো-নল সব নিয়ে ভেগে পড়ে সোজা বিলেতে। সেখানে গিয়ে বলে বেড়াতে শুরু করল যে, সে সিলেটের রাজকুমার, প্রিন্স অব সিলেট। সিলেট তখনও ভাল করে কোম্পানির ভূগোলে ওঠেনি। সুতরাং স-হুঁকা রাজপুত্তুরকে নিয়ে দেখতে দেখতে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী পিট ছুটে এলেন তাকে সম্মান জানাতে, ডিউক অব ইয়র্ক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন তাকে। এমনকি সম্রাট পর্যন্ত দর্শন দিলেন মহামান্য সিলেটকুমারকে।

মুন্নো ঠিক এ ধরনের করিতকর্মা ভৃত্য নয়। সে ছিল হিকির তেষট্টি ভৃত্যের সেরা জনৈক বঙ্গ-রত্ন। হিকি যাওয়ার সময় কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারলেন না তাকে। মুন্নো তাঁর সঙ্গে বিলেতে এল। প্রথমে লণ্ডনে।

তারপর সেখান থেকে বেকনস্‌ফিল্ড-এ। এখানে এসে হিকি ব্যাপ্টাইজ করলেন তাঁকে। মুন্নোর নাম হল এবার—উইলিয়াম মিন্নাউ।

মেম সাহেব ফর্দ লিখছেন

বলতে পারেন এগুলো গল্পকথা। কিন্তু কলকাতার ছকু খানসামা লেন ত আর গল্প নয়। প্রিয় খানসামা লেন আজও আছে স্ট্রীট ডাইরেক্টরীতে। পৃথিবীর আর কোন শহরে তা আছে কি? না, নেই। লেনিনগ্রাড, পিকিং, মস্কো কোথায়ও না। কোথায়ও, কোন দেশের কোন মিউজিয়ামে মিলবে না—'বড়া খানসামার' কোন তৈলচিত্র। কিন্তু কলকাতায় তাও আছে। রাজভবনে খোঁজ নিন একবার। দেখবেন, সেখানে আজও ঝুলছে ইয়া বড় এক তৈলচিত্র। নীচে নাম লেখা করিমবক্স। করিমবক্স কে? হায়দরাবাদের নবাবজাদা নয়, সিলেটের রাজকুমার নয়, কলকাতার খানসামা। 'বড়া খানসামা'। ডালহৌসি থেকে লর্ড লিটন (১৮৪৮—৭৭) অবধি সাত সাতজন লাট বাহাদুরের বড়া খানসামা ছিল সে।

গুপ্ত-শিক্ষক

শুনেছি এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা রচনার বিষয়বস্তু ছিল—'শিক্ষায় গৃহশিক্ষকের দান।' বিষয়টি অভিনব। অন্তত ছাত্রদের পক্ষে। কারণ কোন 'সাজেশন' বা 'সিওর সাক্‌সেস'এ এর উল্লেখ নেই। দুচারটে রজত এবং সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ রচনা বই উল্টে দেখেছি, এই মহামহিম পুরুষ তাতেও অনুপস্থিত। সুতরাং স্বভাবতই আশা করেছিলাম কোন বুদ্ধিমান বা বিদুষী ছাত্রী এতে হাত দেবেন না। কিন্তু জনৈক পরীক্ষক বন্ধু সম্প্রতি সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন আমার। তিনি গত রোববার সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি চায়ের দোকানে অত্যন্ত উদারতার সংগে তাঁর ব্যাগস্থ খাতার বাণ্ডিল থেকে একটি খাতা আমায় দেখিয়েছেন যার দুঃসাহসী লেখক উক্ত রচনাটিতে হাত দিতে ইতস্তত করেননি। রচনাটি খাতার উপসংহারে বা একেবারে শেষ পাতায় লিখিত। হাতের লেখার পরিণতি দেখে মনে হয়, ঘণ্টা পড়ার শেষ ক'মিনিটে লেখা। বোধহয় তার ইচ্ছে ছিল আর সব প্রশ্নের মামলা চুকিয়ে ধীরেসুস্থে এতে হাত দেবে। কিন্তু সময়াভাবে তা আর হয়নি।

যা হোক, উক্ত রচনার কপিরাইট সেই নাম-না-জানা লেখকের হলেও আমার পূর্বোল্লিখিত বন্ধুর প্রতি প্রকাশ্যে সৌজন্য স্বীকার করে আমি হুবহু সেটি উপস্থিত করছি এখানে।

সংজ্ঞাঃ

গৃহশিক্ষক এক ধরনের শিক্ষক। ইঁহারা কাহারও গৃহে থাকিয়া বা যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা দেন। শিক্ষাদান ইঁহাদের কর্তব্য।

ইতিহাসঃ

এতদ্দেশে গৃহশিক্ষকেরা কবে কোথা হইতে আসিয়াছেন তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন—প্রাচীনকালে ঋষিগণ যখন আশ্রম হইতে বিতাড়িত হন, তখন তাঁহারা লোকালয়ে ছড়াইয়া পড়েন এবং তখন হইতেই ছাত্রগণ গুরুগৃহে যাইয়া পড়াশুনা করিবার পরিবর্তে গুরুগণ ছাত্রগৃহে অধিষ্ঠিত হন।

আকৃতি ও প্রকৃতিঃ

গৃহশিক্ষকেরা দেখিতে অন্যান্য শিক্ষকদের মতই। সকলের চেহারা একরূপ নহে, পোষাকও বিভিন্ন। কেহ ভীষণ নোংরা জামা কাপড় পরিধান করেন, কেহ আবার খুব বাবু। অনেকে আবার প্যাণ্ট পরেন।

তবে প্রকৃতিতে ইঁহারা সকলেই সমান শান্ত ও বিনয়ী। স্কুলকলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে এখানেই ইঁহাদের পার্থক্য।

উপকারিতা ঃ

গৃহশিক্ষক খুব উপকারী। কোন কিছুতে ঠেকিয়া গেলে উঁহারা তাহা দেখাইয়া দেন। তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের উপকার হয়।

অপকারিতা ঃ

গৃহশিক্ষকের অপকারিতা এই তাঁহারা অনেক দিন থাকিলে আস্কারা পাইয়া যান। তখন ইঁহারা 'গার্জেন' হইয়া উঠিতেও চেষ্টা করেন।

উপসংহার ঃ

মোট কথা গৃহশিক্ষক বাংলার অন্যতম কুটিরশিল্প। সরকার এবং জনসাধারণের উচিত, অবিলম্বে ইঁহাদের প্রতি সমুচিত মনোযোগ প্রদান করা।

এ রচনার দাম হিসাবে ছেলেটি কি পরিমাণ নম্বর শেষ পর্যন্ত পাবে আমি জানি না। কিন্তু লেখক হিসাবে যে সে যারপরনাই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার। বস্তুত, রচনাটি পড়া অবধি এদেশের ছাত্রদের সম্পর্কে নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছি আমি। সন্দেহ নেই, এমন ছেলে যদি বছরে শতকরা দুটি করেও কোন মতে একবার বেরিয়ে আসতে পারে ইউনিভারসিটির ফোকর দিয়ে—তবে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। পি. এস. সি'র মুখে ছাই দিয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকব আমরা।

রচনাটির মধ্যে ভাবগত বা মূলগত কোন ত্রুটি নেই বলেই আমার ধারণা। তবে তাড়াহুড়ার জন্যেই হোক, কিংবা রেফারেন্সের অভাবেই হোক, বিষয় অনুসারে বক্তব্য একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে হতে পারে অনেকের। সেটা যাতে না হয়, তাই আমার নিম্নোক্ত পাদটীকা। কষ্ট করে এগুলো জোগাড় করতে হল এজন্য, নয়ত এমন চমৎকার রচনাটি অসম্পূর্ণতার কারণে মারা যেতে পারে। তাতে আমার আপত্তি এবং দুঃখ। কারণ, প্রাইভেট টিউটার সম্পর্কে ভবিষ্যতে এর চেয়ে স্পষ্ট এবং উৎকৃষ্ট রচনা বাংলা সাহিত্যে হবে এমন আশা আমার নেই।

যা হোক, প্রসঙ্গকথা বাদ দিয়ে এবার আসল কথায় আসি। ছেলেটি প্রথম একটু ভুল করেছে সংজ্ঞায়। অবশ্য সেটা নিতান্তই টেকনিক্যাল। তাছাড়া এ ভুলের জন্যে দায়ী প্রশ্নকর্তা। তিনি যদি গৃহশিক্ষক না লিখে প্রাইভেট টিউটার লিখতেন, তবে দেখতেন এ ছেলে তার বাংলা করেছে—গুপ্ত-শিক্ষক। কারণ, প্রাইভেট টক্ যদি গোপন কথা হয়, তবে ওর পক্ষে প্রাইভেট টিউটারকে গুপ্ত-শিক্ষক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে গোপনে সংঘবদ্ধ কোম্পানি বলাই হয় ছাত্রোচিত। তাছাড়া, প্রাইভেট টিউটারের পক্ষে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা! কেন, সে কথা পরে বলছি। তার আগে সংজ্ঞার কথা শেষ হোক। ছেলেটি লিখছে, শিক্ষাদান ইঁহাদের কর্তব্য। শিক্ষাদান ছাড়াও যে গুপ্ত-শিক্ষকদের অন্য কর্তব্য বা কর্মসূচী আছে, সে তা বুঝে উঠতে পারেনি। অবশ্য বুঝতে পারা উচিত ছিল। কারণ, তার চেয়ে অল্পবুদ্ধি বালক-বালিকারাও শরৎচন্দ্রের বড়দি পড়ে কাঁদে, নীলাঙ্গুরীয় পড়ে মজা করে। তবে, পরীক্ষার খাতায় তা না করে ইনি বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন বলতে হবে।

ইনি আরও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন শিক্ষককে তাঁর কর্তব্যের ফরমুলায় ফেলে দিয়ে। বাবার কর্তব্য যেমন খাওয়ানো পড়ানো, মার সিনেমার পয়সা জোগানো, তেমনি শিক্ষকের পড়ানো। সহজ যুক্তি এবং ভদ্র সিদ্ধান্ত। ছেলেটি অনায়াসে বলতে পারতো গৃহশিক্ষক এক ধরনের শ্রমজীবী কিংবা ব্যবসায়ী। তিনি অর্থের বিনিময়ে নিয়মিতভাবে অন্যের গৃহে আসার শ্রম স্বীকার করেন অথবা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বিদ্যা বিক্রয় করেন। কারণ কলেজ অবধি আসতে নিঃসন্দেহে সে বার কয় বাবাকে দিয়ে বাজেটে শিক্ষক ঢুকিয়েছে এবং নিজের হাতে মাস্টার মশাইয়ের হাতে পয়সা তুলে দিয়েছে। তাছাড়া বেচারা ভুলে গিয়েছে যে, ওর দিদিকে যিনি সপ্তাহে দুদিন গান শেখাতে আসেন তিনিও গৃহশিক্ষক বা গুপ্ত-শিক্ষক। এমনকি মাড়োয়ারী ধনপতির অন্দরে পার্ক স্ট্রীটবাসিনী যে আধুনিকা এটিকেট শেখান তিনি এবং তার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা যে গভর্নেস ওরফে দ্রাবিড়বাসিনী অনার্যা রমণীটির তত্ত্বাবধানে থাকে তারা সবাই গুপ্ত-শিক্ষক।

সংজ্ঞায় এই ভুলের জন্যেই শিক্ষকদের আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনায়ও ভ্রান্তি ঘটে গেছে লেখকের। গৃহশিক্ষকেরা দেখতে অন্য শিক্ষক কেন, অন্য মানুষের মত কিনা তাতেই সন্দেহ আছে আমার। এক ট্রাম মানুষ থেকে নিমেষে আমি তরুণ গানের মাস্টারটিকে বের করে দিতে পারি। ফুটফুটে চেহারা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী (রেডিওর লিস্টে নাম থাকলে হাতাগুলো গিলে করা),
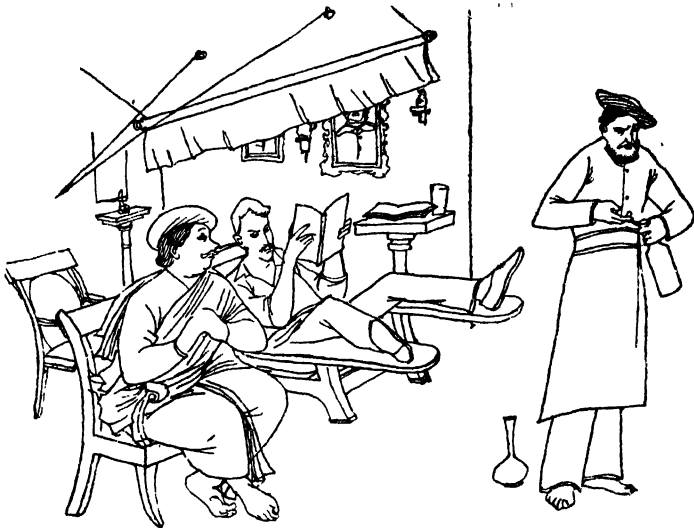
দেশী গুরু ও বিদেশী ছাত্র

হাতে পাথর বসানো ইয়া আংটি। তার সঙ্গে সহাবস্থান করছে আর একটি অকুলীন তারের আংটি। তারযন্ত্রের চাবি এটি।

সমগ্র শিক্ষককূলে সবচেয়ে বনেদি এঁরা। চলেন সাধারণত ট্যাক্সিতে, কথা

বলেন গানের সুরে। গোটা শহরটাই যেন যমুনা পুলিন, কিংবা অষ্টাদশ শতকী লক্ষ্ণৌর কোন দরবার। ট্রামে গেলে কান পাতবেন। শুনবেন—তেরো আনা কথাই তাঁদের—'ছাত্রী', 'প্রোগ্রাম' নয়ত 'ফাংশানে' ভরা। একজন গানাদারকে জানতাম আমি তিনি গান শেখাতেন না, দেখাতেন।

ভদ্রলোক খুব ঘটা করে একদিন ছাত্রীর হাতে লাল একগাছি সুতো বাঁধলেন। দু বছরে সে সরু সুতো তো ছিঁড়লই না বরং ক্রমে ফস্কা গেরো পরিণত হলো বজ্র আঁটুনিতে। সেদিনও ও বাড়ীতে ঘটা করেই অনুষ্ঠান হল। প্রথমবারের মতো নিজেরাই নয়, এবার নেমন্তন্ন পেলেন আত্মীয়-বন্ধুরাও। আমিও। মাস্টার বরযাত্রীর ফর্দে ঢুকিয়েছিল আমাকে। দোষটা ওর, না ওর গানের কিংবা প্রজাপতির তা আজও ঠাহর করে উঠতে পারিনি আমি।

গানের মতো ডেলিকেট্ বিষয় যাঁরা শেখান তাঁদের কথা স্বতন্ত্র—এমন ভাববার কোন কারণ নেই। কেন, সে কথা পরে বলছি। শিক্ষকদের আকৃতি বর্ণনা আগে শেষ হোক। প্রকৃতি পর্যায়ে ওসব আলোচনা করা যাবে।

সাধারণত এ নগরের প্রাইভেট টিউটারদের, টিউটারী পেশা সেকেন্ডারি। শিক্ষকতা ওঁদের প্রাইভেট বিজিনেস। এমনি হয়ত আপিসে কাজ করেন। সকাল সন্ধ্যায় করেন—ইনসিওরেন্সের দালালীর বদলে টিউটারী। তাই অফিসফেরত প্যান্টেই দেখা যায় ওঁদের। স্কুল-কলেজ ফেরত ছাত্রদের দেখা যায়—খেলার বুট পায়ে কিংবা বই বগলে। যাঁরা প্রকৃত শিক্ষক তাঁদের এভাবে দেখতে পাবেন না। রাজনারায়ণ বসু একজন শিক্ষক দেখেছিলেন কোলকাতায়—পায়ে তাঁর ভেলভেটের জুতো, পরনে বিছা-পেড়ে ঢাকাই ধুতি, গায়ে বেনারসী শাল, হাতের পাঁচ আঙুলে চারটে আংটি! তার মধ্যে তিনটে হীরের।

আমি এতটা দেখিনি। তবে এক মফঃস্বল শহরে জনৈক গৃহশিক্ষককে দেখেছি যিনি—পাঁচ মিনিটের পথও যাতায়াত করতেন ঘোড়ার গাড়ীতে। গেলসকিডের জুতো, সিল্কের জামা আর শান্তিপুরী ধুতি ছিল তাঁর নিত্য পোষাক। বারো ঘর পড়িয়ে যাঁরা সংসার চালান তাঁদের এ পোষাক নেই। কারণ তাঁরা লক্ষ্মীপুজোর নিয়মে পড়ান বলেই, দক্ষিণাটাও আসে সেই হারেই।

আজকের ভাগ্যবান গৃহশিক্ষক—স্কুল-শিক্ষকেরা। যাঁর স্কুল যত বনেদী তাঁর তত খাতির। খোকনদের উপস্থিত পরীক্ষাদির ঝামেলা তাতে যেমন কমে—পরবর্তীগুলোর ভবিষ্যতের ভাবনাও তত দূর হয়। ঘরে মাস্টার মশায় পুষেছি যখন, তখন ভর্তির হাঙ্গামাটা আর পোয়াতে হবে না। বড় ঘরে ঠাকুর চাকরের মতো মাস্টার পোষাও আজ তাই স্বভাব। এতে ফ্যামিলিটা যেমনি একটু খোলতাই হয় তেমনি—ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হয় না। কর্তা-গিন্নি টাকার দামে দিব্যি চুকিয়ে দিতে পারেন দায়িত্ব। তাই আমার বিজ্ঞ ভূমিকাকার বলেছেন—শিক্ষাদান করা শিক্ষকের কর্তব্য। বোধহয় পিতামাতার তা নয় বলেই তাঁর ধারণা।

কি করে এই ধারণা এল আমাদের সমাজে তার একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য করেছেন তিনি। তাঁর উল্লেখিত প্রাচীনকালে যাওয়ার সাহস আমার নেই। কারণ আশ্রমে গিয়ে সেকেলে কিছু কিছু ছাত্র লেখাপড়ার

সঙ্গে কি করত তার কিছু কিছু সংবাদ যেমন আমি জানি, তেমনি জানি দ্রোণাচার্য প্রমুখ মাস্টারদের--কি রেট ছিল তাও। সুতরাং লোকনিন্দার ভয়ে ওদিকে যেতে চাই না আমি। তার চেয়ে এই কলকাতা শহরই ভাল।

কলকাতার বয়স কম। কিন্তু গৃহশিক্ষক এ শহরে তিনটে ঘর বসার পর থেকেই আছে বলে ইতিহাসের বক্তব্য। 'আলালের ঘরের দুলালে'র বাবুরাম বাবু বলছেন, "দেখ, মতিলালের বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হইয়াছে, ছেলেটিকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; সম্প্রতি ইংরেজি পড়াইতে বাঞ্ছা করি—অল্পসল্প মাহিনাতে একজন মাস্টার দিতে পার?

বেণীরামবাবু। মাস্টার অনেক আছে, কিন্তু ২০।২৫ টাকা মাসে দিলে একজন মাঝারি গোছের লোক পাওয়া যায়।

বাবুরামবাবু। কত? ২৫ টাকা!! যদি এত টাকা দিব তবে তোমার নিকট নৌকা ভাড়া করিয়া কেন এলাম?

এই বলিয়া বেণীবাবুর গায়ে হাত দিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।"

কলকাতায় তখন 'মাঝারি গোচের' একজন মাস্টারের মাইনে ২০।২৫ টাকা! অথচ স্কুলের মাইনে বছরে দুটাকা। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কোন মাইনে ছিল না। ছিল না হিন্দু কলেজেরও। সুতরাং বেণীরামবাবু বাড়ী ফিরে ছেলের শিক্ষার ভার দিলেন—বাড়ির সরকারের ওপর। "পরে বাবুরাম-বাবু বিবেচনা করিলেন, ব্যাকরণাদি ও কিঞ্চিৎ পারসী শিক্ষা করান আবশ্যক। এই স্থির করিয়া বাটির পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন হে, তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়া আছে?' পূজারী ব্রাহ্মণ গণ্ডমূর্খ মনে করিল, যে চাউল কলা পাই তাতে কিছুই আঁটে না—এতদিন পরে বুঝি কিছু প্রাপ্তির পন্থা হইল। এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ!' বাবুরামবাবু বলিলেন—'তুমি অদ্যাবধি আমার পুত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা করাও'।"

হিন্দু কলেজের পরে এমনি শিক্ষকদের খাতির বেড়ে গেল আরও। কারণ তখন পড়ুয়া অনেক, শিক্ষক কম। সুতরাং পূজারী বামুন ছাড়া আর গতি কি! আজকের মতই কলকাতার বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা তখন এদের মূলধনে স্কুল খুলে বসতেন শহরে। সমসাময়িক একটি খবর শুনলেই বুঝতে পারবেন পরিস্থিতিটা।

"গুণাকরবাবু কহিলেন, এ বড় নূতন কথা কি প্রকার কহ দেখি। শুন বলি। একজন বিষয়ী লোক আপন বাসার এক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ওহে ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্বকালে অধ্যাপক এত ছিল না বিদায়ও এত পাইতেন না, এইক্ষণে দেখিলাম বিষয়কর্মে কোন লাভ নাই যাহারা যাহারা টোল করিয়াছেন এক এক নিমন্ত্রণ হইলে দুইশ টাকা প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম ও কনিষ্ঠও পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড়ু পাওয়া যায়, আইস আমি তোমায় এক টোল করিয়া দিই, কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহা সকল আমি লইব। তুমি ১০ টাকা হিসাবে মাহিয়ানা পাইবা আর বাসা খরচ ও ভোগ্যের কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞা আমার এই যথেষ্ট।"

ঠিক আজকের স্কুলগুলোর রীতি। লক্ষণীয় এই: মাস্টার মশায়দের

সম্মতিটিও সনাতন। প্রাইভেট স্কুল এবং কোচিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা-কাম-সেক্রেটারী-কাম-প্রধানশিক্ষকদের সঙ্গে কখনও বখরা নিয়ে বিবাদে মাতেন না তাঁরা।

যা হোক, টোল তো হল,--কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ পড়ায় কি করে? তিনি "জনৈক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ পড়ো উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো ভাগিনেয়কে রাখেন, লোকত জানান যে তাহারা আমার পড়ো। তাঁহারা কখন কখন একবার পুঁথি খুলিয়া বসেন এইমাত্র।"

এগুলো কোলকাতার নেটিভ পাড়ায় টিউটারদের সংবাদ। সাহেব পাড়ায়ও তখন বাজার ছিল তাদের। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সালে। তার আগে মুন্সির খোঁজে সাহেবেরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন নেটিভ পাড়ায়। ডাইরেক্টারদের কড়া হুকুম, নেটিভদের ভাষা শিখতে হবে। (so as to transact business with the natives.) নিয়ম হল, যারা হিন্দুস্তানী ভাষা শিখতে পারবে, তারা কুড়ি পাউন্ড গ্রাচ্যুইটি পাবে। এসব ১৬৭১ সালের কথা।

তখনকার সময়ের ছাত্র সহ জনৈক মুন্সীর একটা ছবি দেখেছি আমি। ছাত্র অর্থাৎ রাইটার সাহেব টেবিলের ওপর জুতোসুদ্ধ পা দুখানি তুলে কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। টেবিলে লাল জলের গ্লাস। হাতে হুকোর নল। মাথার ওপর টানা পাখা। সামনে একটা বই নিয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মুন্সি। নীচে লেখা না থাকলে ওঁকে মনে হবে খিদমদকার।

তার প্রায় একশ বছর পরে (১৭৫০) তরুণ রাইটার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মুন্সী নিযুক্ত হন নবকিষণ বা নবকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণ কোলকাতার সবচেয়ে সফল গৃহশিক্ষক। নিয়োগের সময় মাসে মাইনে ছিল তাঁর ষাট টাকা। বছর তিনেক কোলকাতায় কাটিয়ে হেস্টিংস যখন কাশিমবাজার চললেন—তখন এখনকার বড় মানুষদের মত মুন্সী নবকৃষ্ণকেও পার্শ্বচর হিসেবে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিনি। কোম্পানীর সঙ্গ আর কোন দিন ছাড়েন নি নবকৃষ্ণ। কিছুদিন পরে—কোম্পানীর রাজনৈতিক দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। শুরু হল শিক্ষক নবকৃষ্ণের দিগ্বিজয়ের পালা খেলা। ক্লাইভ তাঁকে 'রাজা' করে দিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ অতঃপর পরিচিত হলেন—রাজা নবকৃষ্ণ হিসাবে। শোনা যায়, হেস্টিংস সাহেবকে তিন লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন তিনি। হেস্টিংস ধারের টাকা বড় একটা ফিরিয়ে দিতেন না। নবকৃষ্ণকেও দেননি বলেই জনশ্রুতি। তাতে যে কিছু যায়-আসে না নবকৃষ্ণ সেটা প্রমাণ করলেন তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে। নয় লাখ টাকা খরচ করেছিলেন তিনি সে মহোৎসবে।

কোলকাতার আজকের গৃহশিক্ষকদের কাছে এ অবশ্যই স্বপ্নের মত খবর। ছাত্রের মা বাবাকে বড়জোর ক্ষেত্রবিশেষে তারা মাইনে ছেড়ে দিতে পারে, 'ভাল' ছাত্রী হলে, সম্পন্ন শিক্ষক জন্মদিনে উপহারও দিতে পারেন এক আধখানা প্যাকেট, কিন্তু নগদ ধার? সে শুধু ক্ষমতার নয়, স্বপ্নেরও বাইরে। উল্টো দিকেরও একই অবস্থা। মাতৃশ্রাদ্ধের অজুহাতেও দশটা টাকা এ্যাডভান্স গলিয়ে আনা যায় না সেখান থেকে।

যা হোক, ক্রমে সাহেব পাড়ায় এসে হাজির হলেন সাহেব শিক্ষকও। এখন

হিন্দুস্তানী ভাষার চেয়ে ইংরেজি বেশি দরকারী ভাষা। কোম্পানী এখন ব্যবসায়ী নয়, রাজা। ইংরেজি রাজভাষা। ইংরেজেরা যে ইংরেজি জানে না তা নয়। কিন্তু জম্বুদ্বীপেও একশ দেড়শ বছরে বহু ইংরেজ জন্মে গেছে। তারা কেউ পুরো, কেউ বা আধা সাহেব। আয়ার শিক্ষাগুণে তারা—দু'চার কলি হিন্দুস্তানী গান আওড়াতে পারে। এদেশী গালিগালাজ, অশ্লীল বুলি সব তাদের মুখস্থ। এমন কি মিথ্যে বলা, লোক-ঠকানো, চুরিজুচ্চরি সবই জানে তারা, কিন্তু ইংরেজি বিদ্যাটি বাদ দিয়ে। অথচ সরকারী বিজ্ঞাপন জানাচ্ছে —"Wanted Writers. One need not apply whose handwriting is bad and who cannot write swift."

সুতরাং অনেক বিলেতী গোরা মাস্টার সাজলেন। তার বর্ণনা দিয়েছেন একজন সাহেব। তিনি লিখছেনঃ

মাস্টার মশাই একটা সাবেকি চেয়ারে বসে আছেন। পা দুটো তাঁর ছড়ানো একটা বেতের মোড়ায়। গায়ে ঢিলে পাজামা আর বেনিয়ান। বেনিয়ানটার দুটো কাজ। গরমে শরীরটাকে ঠান্ডা রাখা, আর সমাজে পজিশন রাখা। হাতে তাঁর বেত। এটাই তাঁর শাসনদন্ড। এই মহামহিমের সামনে ছেলেরা ঢুলে বসে আছে। "They have already read three chapters of the Bible, and have got over the proper names without much spelling." ইত্যাদি!

খালি হাতের লেখায় চাকরী হয় সত্য, কিন্তু অঙ্কও চাই কিছু। বিজ্ঞাপনে না হলেও, মার্চেন্ট হাউস-এ কাজে লাগে। সুতরাং জনৈক "W. Gaynard, Accountant, begs to inform the public that he intends to open an Academy at his house, No. 11 Merediths Buildings...." সেখানে তিনি দশমিক প্রথা শেখাবেন এবং ইটালিয়ান কায়দার বুককিপিং! ছেলেদের মাইনে মাসে মাত্র—পঁচিশ টাকা, মেয়েদের—তিরিশ টাকা!

মেয়েদের মাইনে পাঁচ টাকা বেশি কেন সে কৈফিয়ত তিনি দেননি, কিন্তু কারণটি আমরা জানি। ওঁরা সেকালে বিশ্বাস করতেন মেয়েদের পড়ানোর পরিশ্রম বেশি। কারণ ওদের মাথায় নাকি আমাদের চেয়েও গোবর বেশি। সুতরাং মাইনেও একটু বেশি।

তবে মেয়েদের পড়াতে পারলে যে অন্যদিক থেকে আনন্দ তা প্রমাণ করলেন জনৈক জন মিচেল। তিনি বলতেন আমি পাদ্রী। সবাই বললেন, পাদ্রী তো এখন আমাদের অনেক আছে, আপনি বরং আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়ান। ভদ্রলোক রাজী হলেন। কিন্তু সে শেয়ালের মাস্টারী! প্রথমে মিচেল ধরলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হাউএর মেয়েকে। তারপর ক্রমে অন্যদের। সাহেবরা চিঠি লিখলেন ওকে শিগগির ফিরিয়ে নাও এখান থেকে। কারণ "He is guilty of many irregularities, and scandalous actions, altogether unbecoming the profession he pretends to do." মহাবিপদ, লোকটাকে মেরে তাড়িয়েও তো দেওয়া যায় না! একে পাদ্রী তার উপর শিক্ষক। নেটিভেরা হেসে খুন হয়ে যাবে যে তাহলে!

লক্ষণীয় বিষয় এই, এদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা কিন্তু তখনও পর্দানশীন।

সুতরাং আমাদের ঘরের মেয়েরা তখন দেওয়াল-নশীন। অন্দরমহলের চার দেওয়ালের বাইরে পা ফেলবার উপায় ছিল না তাদের। ফলে এই কোলকাতা শহরে মেয়েদের স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সভ্যভব্য বাবুদের অন্তরে তা অনুমান করা কষ্টকর নয়। ঈশ্বর গুপ্ত মশায় সেদিন ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেনঃ—

"কপালে যা লেখা আছে,
তার ফল তো হবেই হবে!
(এরা) এ বি পড়ে বিবি সেজে,
বিলিতী বোল কবেই কবে!
(এরা) পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে,
সেজেগুজে সভায় যাবে!
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বলে,
বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্ডি খাবে!
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে,
সবাই দেখতে পাবেই পাবে!
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

'প্রভাকর' এবং 'চন্দ্রিকা' কাগজ সেদিন রুচির সমস্ত প্রশ্ন ভুলে লিখতে ইতস্তত করেননি—"যদি কোন কোন বাবু আপন বিবিদিগকে গুণবতীকরনের নিমিত্ত গুরুমহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করিনা। বরঞ্চ আমরা এমত স্বীকার করি যে, যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।"

(২৩শে জুলাই, ১৮৩১)

এসব তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে 'সমাচার দর্পণ' অগত্যা স্মরণ নিতে বাধ্য হলেন আমাদের সনাতন প্রাইভেট টিউটারকে। তাঁরা লিখলেনঃ ভদ্র এবং সজ্জনদের উচিত—"আপন আপন পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজ বাটীতে রাখিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান। যাহারা নির্ধন—তাহাদিগের যাবৎ বয়ঃস্থা না হয়—তাবৎ পাঠশালায় পাঠান যেহেতু বাল্যকালে কোনরূপ কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ফলে এই বিজ্ঞানে ভর করে গৃহশিক্ষক উঠে এলেন ঘরে। নারীমুক্তির ইতিহাসে বোধহয় অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা এটা। লোকে বলে মেয়েদের স্বাধীনতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দান—বাই-সাইকেল এবং টাইপরাইটারের! ইদানিং মোটরগাড়ী এবং টেলিফোনের। কিন্তু রসিক ঐতিহাসিকরা বলেন— কলকাতায় এই অবিস্মরণীয় ঘটনার ষোলআনা কৃতিত্ব প্রাইভেট টিউটারের বা গুপ্ত শিক্ষকের। সাহেবপাড়া এবং বাঙালীপাড়া দু-পাড়ার মেয়েরাই তাদের মন্ত্রে শুনেছে জীবনের নতুন অর্থ। যে অর্থ স্কুল বা কলেজের হৈ-হৈ জীবনে নেই, নেই খুব নরম ধাচে লেখা হলেও 'পয়েটিক্যাল সিলেকসানের'

মরা পাতায়। নির্জন পড়ার ঘরে, শান্ত সন্ধ্যায় দেড়হাত টেবিলটার ওপাশে —ছাব্বিশ বছরের ব্রিলিয়েণ্ট ছেলেটি আবেগমথিত অথচ টেলিপাথিক কোডের মত গলায় যখন বায়রণ পড়ায় তখনই তার অর্থ। তখন সে কবিতার স্বাদ স্বতন্ত্র। ছেলেটির দিকে তাকালে তখন মনে হবে—কোন ইতালীয়ান রোমাণ্টিক, কিংবা ফরাসী বিপ্লবী। উপস্থিত যে সাধনায় সে রত, তাতে অনায়াসে শহীদ হতে পারে! একবারও কাঁদবে না, একবারও কাঁপবে না।

তবে হ্যাঁ, সাহেবপাড়ায় এসব জন মিচেলদের চেয়ে—সুন্দর সুন্দর চেহারার জোয়ান স্কেটিং টিউটাররা বেশি মেয়েদের স্বাধীন করেছে বলে জনশ্রুতি। ("The skating ring emancipated them as father could not go skating with them and there were a lot of good looking instructors. So they were able to ride away from mother and never rode back!") সেই যে সাইকেল শিখতে শিখতে মাস্টারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল চৌরঙ্গীপাড়ার মেয়েরা আর ফিরল না। সেই যে অঙ্কের মাস্টারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল বাঙ্গালীটোলার মেয়েটি—এখনও ফিরল না। আজও বছর বছর শত শত মেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফিরছে না। তাই বলছিলাম,— প্রাইভেট টিউটার মানে গৃহশিক্ষক নয়, গুপ্ত-শিক্ষক!

এবার উপসংহার। আমার ভূমিকাকার বন্ধু লিখেছেনঃ "গৃহশিক্ষক বাংলার অন্যতম কুটিরশিল্প।" তিনি শুধু 'শিল্প' বলেননি কারণ কথাটার মধ্যে একটা 'গৃহ' আছে। তিনি বোধ হয় জানেন না, গৃহে গৃহে হলেও সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি শিল্প একটা বৃহৎ শিল্প, মাদুর বা বোতামের মত কুটিরশিল্প নয়। আমার মনে হয়, গৃহশিক্ষকতাও তাই। এটি আমাদের দেশের, অন্ততঃ এই কোলকাতা শহরের একটি প্রধান শিল্প। অর্থাৎ ইনডাস্ট্রি! যে কোন একদিন (রোববার হলে তো কথাই নেই) একটা বাংলা কাগজ খুলুন দেখবেন কোলকাতা শহরের অধিকাংশ লোকই শিক্ষক। কেউ দুবেলা আহারের পরিবর্তে ছোট ছোট ভাই বোনদের পড়াতে চান, আবার কেউ চতুর্থ বর্ষে পড়তে পড়তে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র খোঁজেন। আবার এমন বেপরোয়ারও অভাব নেই যিনি মাসিক পঁচিশ টাকায় ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে 'বা অন্য যে কোন কাজ' চান। পড়ানোটা যেন অন্য যে কোন কাজ, যথা বাজারসরকারী, বেয়ারাগিরি, বা দোকানদারী যা খুশি তার সঙ্গে অদল বদল করার মতোই কাজ! বস্তুত কোলকাতায় সর্বশ্রেণীর বেকারদের বোধহয় তাই ধারণা।

প্রতি বছরে গড় দুটি হিসেবে দশ বছরে মোট কুড়িটি শিক্ষকের ঠেকায় পরীক্ষারূপ ভূমিকম্পে কোনমতে টিকে রয়েছেন স্কুল ফাইন্যাল ছাত্র। নিজের অসাফল্যসূচক খবরটিকে প্রতিবারই তাঁর মনে হয় ছাপার ভুল! তিনিও পড়ুয়া খোঁজেন এ শহরে!

খোঁজাখুজির শেষে যে পানও তা নিশ্চয় জানেন আপনারা। আপনার বাড়িতে ছাত্র থাকলে মাস্টারও আছে নিশ্চয়। সব বাড়িতে আছে। এ শহরে ঘরে ঘরে ছাত্র, ঘরে ঘরে শিক্ষক। গুপ্ত শিক্ষক। এই প্রফেসনটা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গ্রাহ্য নয়, রেকর্ড নেই এর ইনকামট্যাক্স অফিসে, সুতরাং কত লোক এই শিল্পে নিযুক্ত, কি তাদের আয় সেটা বলতে পারব না আমি। তবে

উৎপাদন বণ্টন এবং বিলি ব্যবস্থার ব্যাপকতা দেখে অনুমান করতে পারি এটি কোলকাতার অন্যতম শিল্প। এ. জি. বেঙ্গল বা সিভিল সাপ্লায়ের চেয়েও বেশি শ্রমিক এখানে।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, 'সরকার এবং জনসাধারণের উচিত এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া।' তবে শুনতে পাচ্ছি, সরকারী মনোযোগে গুপ্ত শিক্ষকেরা আজ ক্ষিপ্ত। ক্রমাগত স্কুল-কলেজের নিশান নিয়ে মিছিল বার করছেন তাঁরা। দেখে শুনে মনে হয়, টিউশনী না থাকলে সভ্যতা থাকবে কিনা সে বিষয়ে ওঁদের সন্দেহ! অবশ্য, নেপথ্যে রুটির সমস্যাটাও সর্বস্বীকৃত।

এককালে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মশাইরাও পড়েছিলেন এমনি সমস্যায়। মেকলে যখন সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন তখন মিছিলের এমন রেওয়াজ হয়নি। ক্ষুব্ধ পণ্ডিতমশাইরা তখন শ্লোকে প্রকাশ করেন তাঁদের ক্রোধ।

> "গোল শ্রী দীর্ঘকায়া বহু বিটপিতটে কলিকাতানগর্যাং
> নিঃসঙ্গে বর্ততে সংস্কৃত পঠন গৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশঙ্গ।
> হন্তুং তং ভীতচিত্তঃ বিধৃতখরসরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ।
> সাশ্রু ব্রুতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ॥

অর্থাৎ "কলিকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপিশোভিত তটদেশে সংস্কৃত-পঠন গৃহ নামে একটি কুরঙ্গ নিঃসঙ্গভাবে বর্তমান রহিয়াছে। সম্প্রতি মেকলে নামক ব্যাধরাজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করিয়া, ভীতচিত্তে সেই কুরঙ্গকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সেই কুরঙ্গ সাশ্রু নয়নে বলিতেছে ভো ভো মহাভাগ উইলসন আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

পণ্ডিত মশাইরা তখন তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় পড়াতেন। টিউশনীর উপরি আয় ছিল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। সুতরাং কলেজ উঠে গেলে তাঁদের অন্নাভাবের আশঙ্কা। আজকের মাস্টার মশাইদেরও আশঙ্কা তাই। স্কুল-কলেজের মাইনে তাঁদের সংসারে নিমিত্তমাত্র। আসল নির্ভর—টিউশনী। —সেটি যদি উঠে যায়!

ওঁদের ভাত-কাপড়ের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে ভাববার লোক অনেক আছেন। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি উদ্বেগহীন। কেননা, কলকাতার সামাজিক ইতিহাসে এঁদের অবদানের কথা আমি জানি। এবং জানি এঁদের সম্পর্কে ইতিহাসের রায়টিও। উইলসন সাহেব তা আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন। পণ্ডিতদের কাতর আহ্বানে উইলসন সংস্কৃতেই সেদিন পাঠিয়েছিলেন কোলকাতার গুরুকুলের পক্ষে এই শাশ্বত বাণীটি যার মর্মার্থ 'নিরন্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, সূর্য কর্তৃক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ কিরণসমূহের দ্বারা সন্তপ্ত, সতত ছাগ কর্তৃক ভক্ষিত এবং কোদাল দ্বারা পরাসৃষ্ট হইয়াও কৃশকায়া দূর্বা মরে না।'

অর্থাৎ, মাঝে মাঝে পরীক্ষার ফল দেখে গার্জেনরা বিরক্ত হবেন আপনাদের ওপর, প্রবল প্রতাপ সরকার বাহাদুর মাঝে মাঝে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ প্রস্তাবাদিও নেবেন আপনাদের সম্পর্কে, কখনও কখনও উত্তম স্কুল এবং স্কুল-মাস্টাররা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের আসন গ্রাস করবেন এবং কখনও বা ছাত্রীর

উত্তেজিত পিতা কোদালি হস্তে তেড়ে আসবেন আপনাদের দিকে। কিন্তু মাভৈঃ হে গুপ্ত-শিক্ষক, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এ শহরের বহু আকাঙ্ক্ষিত দূর্বাদল। কোলকাতার রক্তে তোমার জন্ম।

আয়ার সহিত ভ্রমণরত সাহেবশিশু

বেকার জিন্দাবাদ

"মহামহিমবর শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু—আমরা কয়েকজন বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, হিন্দুস্থানে বাঙ্গালীদিগের প্রধান কর্মাদি প্রাণপণে তদ্দেশস্থ লোক কহে যে পূর্বকার বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেননা সাহেব লোক প্রায় বাঙ্গালি দিগের প্রধান কর্ম দেননা যাহার দিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না কারণ আপন ২ এলাকার কমিস্যনর সাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শত ২ হিন্দুস্থানী লোক বাঙ্গলা ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতে ও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান ২ কর্ম করিতেছেন বাঙ্গালি দিগের কি দুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয় তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃ সুদুর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইংগরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি কোন সরকারী অফীসে কর্মখালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে ঐ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম পায় যাহা হউক রাজা ও ঈশ্বর প্রায় তুল্য এবং সর্বজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমাদিগকে কি কারণে এমত অসহিষ্ণু অপমান করেন যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে আমাদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল
তারিখ ২৫শে অগ্রহায়ণ।
শ্রীকমলাপ্রসাদ রায়
শ্রীহরিপ্রসাদ গঙ্গোঃ
শ্রীচন্দ্রকান্ত চট্টোঃ
শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
মোং কলিকাতা॥"

এই চিঠিখানা ছাপা হয়েছিল "সমাচার দর্পণ" কাগজে ১৮৩৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে। তখন কোলকাতায় আজকের মতো বেকার নেই, উদ্বাস্তু নেই; কি-খাবো কি-খাবো কান্না নেই। তার ওপর মাত্র ক'মাস আগে পার্লামেণ্ট স্থির করেছেন বিচার বিভাগের বড় বড় পদে অতঃপর বাঙ্গালীদের নিয়োগ করা হবে। সিদ্ধান্ত মতো কাজও হয়েছে। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর,

রাধাকান্ত দেব "ম্যাজিস্ট্রেট সম্ভ্রম্মার্থ" বা অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত, আশুতোষ দেব ওরফে ছাতু বাবু প্রমুখ 'বঙ্গ-গৌরব'দের নিয়ে নতুন করে 'গ্রান্দ জুরীও' গঠিত হয়েছে। সুতরাং কোলকাতার বাঙগালীর তখন সুসময়।

কারণ, এর আগের চল্লিশটি বছর নাকি কোম্পানী এতদ্দেশীয় লোকদিগকে 'গবর্ণমেণ্টের কার্য স্পর্শও করিতে' দেননি। তার আগেকার পরিস্থিতি অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্য। কোম্পানীর রাজত্বের তখন সবে মাত্র শুরু। নতুন দেওয়ানী লাভ করেছেন তারা। সমাচার দর্পণের মতে বাঙগালীরা তখন অতি প্রিয় প্রজা "ইঙগলণ্ডীয়দের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকদিগকে যেরূপ পরাক্রম ও বেতন প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। দেশীয় মুখ্য শাসন কর্ম কেন্সৌলি সাহেবদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ পরাক্রম অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকের হস্তেই অর্পণ হইল। এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কর্মকারক সাম্বৎসরিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবরণর জেনারেলের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।"

তারপর কি জানি কি হলো, সহসা একদিন থেমে গেলো বাঙগালীর ভাগ্যের রথ। "কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে ঐ নিয়মের সমূল পরিবর্তন হইল এবং গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্বে এতদ্দেশীয় লোকেদের হস্তে তাবৎ পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্য ও ঝুঁকি সমুদায় কর্ম হইতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় লোক দিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন। অসীম দান শৌণ্ডতার পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অতি সঙ্কুচিত কার্পণ্য বর্ত্মাবলম্বী হইয়া সম্ভ্রম ও লাভজনক সমগ্র কর্ম হইতে দেশীয় লোকদিগকে চ্যুত করিলেন।" (সমাচার দর্পণ, সম্পাদকীয়, ২রা মার্চ, ১৮৩৩) এই স্বর্গ-চ্যুতির দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর ছাতুবাবুরা আবার 'গ্রান্দ জুরী' হলেন, রাধাকান্তরা পেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সম্ভ্রমার্থের সম্মানী পদ। সুতরাং বাঙগালীর তখন ভেঁপু বাজিয়ে আনন্দ করার কথা। কিন্তু তার বদলে কোলকাতার নাগরিক চতুষ্টয় বসে বসে লিখলেন কান্নার চিঠি। বাঙগালীর চাকরী নেই। বাংলা দেশে কর্মখালি হলেও বাঙগালীর ভাগ্যে সে কর্ম জুটে না। হয় হিন্দুস্থানী, না হয় ফিরিঙগী —বাংলাদেশের চাকরী সব অবাঙগালীর নামে

সেকালের জমাদার

লেখা। কেন? 'অকারণে আমাদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয়?'

ইতিহাসের পাতার দিকে একটু নজর দিলেই দেখা যাবে এই চারজন নাগরিকের মুখে—গোটা কোলকাতা, সারা বাংলাদেশের বাঙ্গালীর প্রশ্ন এটি। রাধাকান্ত দ্বারকানাথ কিংবা ছাতুবাবুরা কোলকাতার সমস্যা নয়। দু'চার জন লাট পোষার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। ছিল না ম্যাজিস্ট্রেটগিরি, দেওয়ানি, ছিল না সরকারী সম্মান। কোম্পানী ঘটা করে তাঁদের তাই দিয়েছেন মাত্র। তাতে কোলকাতার বেকারের সান্ত্বনা কোথায়?

মোকাম কলিকাতায় বাঙ্গালীর কোনদিন চাকরী ছিল না, আজও নেই। কোলকাতার বাঙ্গালী চিরদিনই বেকার। তার মধ্যে চল্লিশ বছরের সুসময় বা দুঃসময়ের হিসেব যাঁরা করেন তাঁরা 'ম্যাজিস্ট্রেট সম্ভ্রমার্থ', এ সহরের তাঁরা মাথা বা মস্তক শোভা। কোলকাতায় নিবাস হলেও এঁরা কোলকাতা সহর নয়, কোনকালেই এঁরা বেকার নন, এমন কি আজও না। অথচ কোলকাতা চিরকালেই বেকারের সহর।

কোলকাতা আর বেকার—মা আর ছেলে। গাদাগাদা বেকার পেটে ধরেই মহানগরী হয়েছিল সুতানুটি গোবিন্দপুরের আটপৌরে জননী। বেকারদের সঙ্গে কোলকাতার তাই চিরকালের সম্বন্ধ। এ মহানগরীরই সন্তান তারা। অবশ্য কিছু নিজের, বাদবাকী সব পোষ্য নেওয়া। মার থেকে কখনও কখনও মাসির দরদ বেশি হয়! তাই হয়ত সুতানুটি গোবিন্দপুরের বাছাদের চেয়ে মাদ্রাজ বিহার কিংবা কচ্ছ-কাম্বের খাতির কখনও কখনও বেশী মনে হয়। কিন্তু সে কোলকাতার দোষ নয়। এ তার চিরকালের স্বভাব।

চারনক সাহেব যখন নিমতলায় বসে হুঁকো ফুঁকছেন সে দিনটিকে একটু স্মরণ করুন। ঘাটে বাঁধা তাঁর বিরাট বজরাখানা থেকে ভেসে আসছে পাটনাই গলার গান,—'রামা হো'। অদূরেই পাল্কীর হাতল ধরে দণ্ডায়মান গৌর-কান্তি বেহারা চারজন—গৌড়জন নয়, উৎকলবাসী। যার সঙ্গে বসে কথা বলছেন তিনি আরও দূর দেশের মানুষ, আরমেনিয়ান। সুতানুটির হাড্ডিসার জোয়ান ছোকরা তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'প্যালা' গানের কলি আওড়াচ্ছে আর সাহেবের তামাক খাওয়া দেখছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো কিন্তু ছোকরার নড়ন-চড়ন নেই। সে নিজেও জানে না যে সে বেকার। নয়ত এতক্ষণ তামাসা দেখার সময় হতো না তার।

সে খেয়াল যখন হলো তখন সুতানুটি অন্ধকার করে রাত্রি নেমেছে। কোলকাতায় সওদাগরী জাহাজ যাচ্ছে সংবাদ পেয়ে করমণ্ডল উপকূল ছেঁকে পায়ে হাঁটা মানুষের দল জাহাজের আগেই পৌঁছে গেছে কোলকাতার চাঁদপাল ঘাটে। সাহেবরা যখন আসছে, বিবিরাও তখন আসবেন। মোগলরা জানে রাজার জাত ছেলে কোলে করে বসে থাকে না। একাজে তাদের লোক চাই। সুতরাং—

> Sleep make baby.
> Sleep make......
> From Kabul the Mougul woman comes
> To make my master sleep.

কাবুল থেকে এলো মোগল 'আয়া', লাক্ষ্ণৌ থেকে মোগলাই বাবুর্চি, উড়িষ্যা

থেকে পাল্কী-বেহারা, আর দিল্লী থেকে সিপাহী। সুতানুটির ঘাট লোকে লোকারণ্য। এক জাহাজ কাজের জন্যে তিন জাহাজ লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। যে দেশে মানুষ কিনতে পাওয়া যায়, সে দেশে মাইনে করা লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়।

অগত্যা গোবিন্দপুরের ছেলেরা—পায়ে হেঁটে চললো ভাটিয়াল দিকে। কোলকাতায় নোঙগর করার আগেই জাহাজ ধরা চাই। কোলকাতা থেকে দশ মাইল পনের মাইল দক্ষিণে চলে যেত তখন তারা—কাজের খোঁজে! হুঁকো-বরদার, ঘেসুড়ে কিংবা মশালচীর কাজ চাই তাদের!

তারও কি হাঙগামা কম? হোটেল ট্যাভার্ণে কান খাড়া করে ঘোরাঘুরি করতে হয়, কবে জাহাজ আসবে তারই খবরের জন্য। খবরটা কোন মতে একবার কানে এসে পেঁাছালে হয়। ভিখারী সেজে দোরে বসে থাকে। সাহেবরা রেগে আগুন হয়ে যায়। একজন লিখেছেন : At the inn I was tormented to death by the inpertinent persevering of the Black people, for every one is a beggar, as long as you are reckoned a griffin or a new commer. সবাই ভিখারী, সকলেরই কাজ চাই, কাজ না হলে বক্‌শিস্‌ চাই।

কাজ যে কেউ পেত না তা নয়। নকু ধর পেয়েছিলেন। "ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহাবল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে ২ গঙ্গার পূর্ব কূলে আসিল, নকু ধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটিতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ঐ গোরা বহুদিন নকু ধরের বাটিতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকু ধর ইংরেজী ভাষার কিঞ্চিত শিক্ষা করেন, সেই ইংরেজীতে ইংরেজেরা নকু ধরকে দোভাষী করিলেন।" (সম্বাদ ভাস্কর) রতু সরকারও প্রায় এমনি অলৌকিক কারণে 'দোভাষী' হয়েছিলেন।
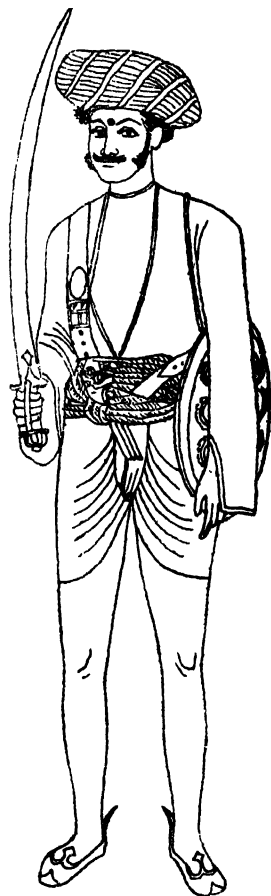
সেকালের বরকন্দাজ

ঈশ্বরানুগ্রহে এমনি আশ্চর্য কারণে যাঁরা অপ্রত্যাশিত ভাবে চাকরী পেয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া আর একদল চাকুরে বাঙালী ছিলেন তখনকার কোলকাতায়। তাঁরা ভলাণ্টিয়ার চাকুরে, অর্থাৎ স্বেচ্ছা নিযুক্ত। জনৈক ফৌজী সাহেব লিখেছেন ঃ জাহাজখানা নোঙর করেছে কি না করেছে, কখানা পানসী এসে লাগলো তার গায়ে। সুদর্শন নেটিভেরা এগিয়ে এলেন। তারপর পরিষ্কার ইংরেজিতে বলেন ঃ মি লর্ড, ইওর বোট ইজ রেডি! বললাম—য়ুআর রং, আই এম নো লর্ড, আই এম—!

—ইয়েস মাই লর্ড ফলো মি!

নৌকো গিয়ে ডাংগায় ঠেকলো। হাত ধরে তিনি আমায় তীরে তুললেন। সেখানে পাল্কী, ঘোড়া সব রেডী। তারই একটায় তিনি বসিয়ে দিলেন আমায়। তার লোকজনই মালপত্র সব বোঝাই করলো। তারপর বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

—ক্যারিইং এনি লেটার?

—নো।

—উইস টু লিভ্ এ্যানি ট্যাভার্ণ?

—নো।

—দেন লেট আস স্টার্ট টু ইওর কুঠি।

গাড়ী চলল। সত্যি সত্যিই একটা বিরাট বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম আমরা।

—সি লর্ড, দিস ইজ ইওর বাংলো।

তারপর চারপাশের লোকগুলোকে দেখিয়ে বলল—দে আর ইওর স্লেভস, ইওর সারভেণ্ট! আই অ্যাম অল্‌সো ইওর স্লেভ মাই লর্ড!

তারপর বাবু ফিরিস্তি দিলেন—কার কি কাজ, আর সে বাবদে কার কতো মাইনে।

—কিন্তু তোমার মাইনে বাবু? সেটি তো বললে না। হাউ মাচ?

—মি লর্ড, আই নিড নো সেলারী! অন্‌লি দস্তুরী উইল ডু মি!

দস্তুরী মানে—দালালী। সাহেব-কুঠিতে যত খরচ হবে এ বাবু তার হিসেব রাখবেন, চাকর বাকরদের খাটাবেন। তার জন্যে তাঁর মাইনে চাই না। সাকুল্য খরচের ওপর টাকায় দু' পয়সা দস্তুরী দিলেই চলবে। তিনি সাহেব কুঠির সরকার।

এ চাকরী বাঙালীর প্রায় এক চেটিয়াই ছিল। কিন্তু তার ওপর কিংবা নীচের দিকে হলেই বিপদ। মুৎসুদ্দির চাকরী খুবই ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অনেক টাকা চাই। ডিপজিট রাখতে হয়, কখন কখনও সেলামীও দিতে হয়। তার ওপর ধরাধরি আছে, সই সুপারিশ আছে। শেষেরগুলোর জন্যে তবুও চেষ্টা করা চলে, কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা সেলামী! সাধারণ বেকারের কাজ করে সোনার ঠাকুর গড়লেন, রমজান ওস্তাগর বেনিয়ান সেলাই করতে করতে বেনিয়ান হলেন। পদ্মলোচন দত্তের ভাগ্যের কথা স্বতন্ত্র। পদ্মলোচন দত্ত ছিলেন 'মেকার' বা ভালো লুচির কারিগর। হুতোম তাঁর কেরিয়ার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"ক্রমে অষ্টপ্রহর গরুড়ের মত উমেদারীতে এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজিরের পর দুই-চারখানা সই সুপারিশও হস্তগত হলো—শেষে এক সদয়হৃদয়

মুচ্ছুদ্দী আপনার হাউসে ওজন-সরকারী কর্ম দিলেন...ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফলতে আরম্ভ হলো, মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে শিপ সরকারী কর্ম দিলেন। সাহেবরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুসিয়ারীতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সাহেবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন...ক্রমে সায়েবরা পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; এদিকে হাউসের সদরমেট কর্মে জবাব দিলে সায়েবেরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্মে ভর্তি কল্লেন!...ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম ছেড়ে দিলেন সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা ডিপসিটে মুচ্ছুদ্দী হলেন।"

মুৎসুদ্দির সিঁড়ি এমনি পেঁচালো। বেনিয়ানগিরি আরও কঠিন। বেনিয়ান মানে ব্যাঙ্ক। ট্যাঁকে যাদের ব্যাঙ্ক আছে তাঁরাই বেনিয়ান হতে পারেন। অন্যদের তা ভাবাও বাতুলতা।

সুতরাং কোলকাতার কাজের বাজার তখন অত্যন্ত খারাপ। সরকারী চাকুরীর কথা আগেই বলেছি। সওদাগরী আপিসের কথাও বলা হলো। হেয়ার সায়েবের সুপারিশেও তখন কেরানীগিরি পাওয়া কষ্টকর।

কোলকাতার সন্তানেরা তাই ব্যবসার পথ ধরলেন। কেউ ইমারতি কর্মে, কেউ বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্মে রুটি খুঁজতে বেরুলেন। কেউ নৌকো ধরলেন, কেউ বসলেন বেনিয়ান পা-জামা সেলাইয়ে, কেউ সোনারূপার কাজে। অনেকে সিদ্ধও হলেন। সুলতান আজউদ্দীন চাঁদ মিস্ত্রী রাজমিস্ত্রী থেকে রাজা হলেন, বাড়ুই মিস্ত্রীর কর্মে পালেরা ঐশ্বর্যবান হলেন, শিব মিস্ত্রী সোনার কাজ করে সোনার ঠাকুর গড়লেন, রমজান ওস্তাগর বেনিয়ান সেলাই করতে করতে বেনিয়ান হলেন।

কিন্তু তাও দু'দিনের জন্যে। অচিরেই 'বুরুস স্মাইল বরণ করি' এসে ইমারতের দায়িত্ব নিলেন। "অভাগা বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা কর্ণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বান্ধিয়া ছিল তাহা গিয়া কোদালি হস্তে লইল।" রোল্ট কোম্পানীর দাপটে বাড়ুই মিস্ত্রী "রামতনু ঘোষ প্রভৃতি সকলে গজ ফেলিয়া বাইশ হাতে

সেকালের বেনিয়ান

লইল (এবং) ইহাতে উদরান্নের অনাটন হইয়াছে।” হ্যামিলটন স্বর্ণকার সাজলেন ফলে এদেশীয় স্বর্ণকারদের 'ভক্ষ্যাভাব' হলো এবং “মিং গিবসন কোম্পানী প্রভৃতির আগমনে সূচী ব্যবসায়ীরা এক্ষণে সূচাগ্র ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।”

এভাবেই বেকার বাঙ্গালীর সঙ্গে যুক্ত হলো—ক্রমে ব্যর্থ ব্যবসায়ী বাঙ্গালী। ফলে কোলকাতা আবার পুরো বেকার হলো।

এদিকে সায়েবপাড়ার অবস্থাও গেল সম্পূর্ণ পাল্টে। আগে জাহাজ জাহাজ কাজ নিয়ে নাবতেন তাঁরা কোলকাতায়। এখন তাঁরা আমদানী করেন জাহাজ-ভর্তি বেকার।

রতু সরকার মশাইদের ভাত মেরে বিলেত থেকে সার্ক্যুলার এলোঃ

Wee are sorry to heare that wee have not any one of our servants that can speak the language. Wee now purposely send you some youngman, which wee would have instructed therein, as also to write it that wee may not depend on accidentall persons.

বিধি বাম হলেন। 'এ্যাক্সিডেণ্টাল পারসনস' বা নকু ধরেরা গেলেন খারিজ হয়ে। কোম্পানীর নিজস্ব দো-ভাষী এলেন তাদের জায়গায়। এমন কি কিছুদিন বাদেই দেখা গেল ইউরোপীয়ান ভাষাবিদের প্রাচুর্য ঘটে গেছে সহরে। রতু সরকাররা কপালে হাত দিয়ে গেজেটে পড়লেন—

A GENTLEMAN IN SEARCH OF EMPLOYMENT

If any single or family gentleman wishes a clerk, who understands several accounts, writes and reads English, French, Portuguse and can translate; he likewise reads Latin and speaks good Moor and Bengal Languages; he is willing to be employed in the settlement or go up the country or to either the Malabar and Coromandel coasts, if a suitable salary be allowed him.

ছয় ছয়টি ভাষায় বিশারদ কেরানীর পদপ্রার্থী। তাও ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই—যেখানে যেতে তার আপত্তি। 'ইয়েস' 'নো'—বাঙ্গালী বাবুর সেখানে নিজের হোম-সিটিতে আশা কোথায়?

বাঙ্গালী তো পরে, আদুরে ফিরিঙ্গিও আজ কাজ পায় না। সাহেবদের পরেই কোম্পানীতে তাদের খাতির। কিন্তু তাদের দেওয়ার মতো কেরানীগিরিও কোম্পানীর আজ নেই। শুভানুধ্যায়ীরা তাই সভা বসালেন। ১৮২৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী টাউন হলে সভা হলো। খবরের কাগজে তার সংবাদ বের হলোঃ

> ইউরোপীয় লোকদের হইতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীর গর্ভে জাত লোকেরা, পূর্বাবধি কেরানীগিরি প্রভৃতি লেখাপড়ার কর্মে প্রতিপালিত হইতে-ছিল কিন্তু দিনে ২ তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে তৎকর্মে তাহাদের সকলের প্রতিপালন হওয়া কঠিন বোধ হইতেছে পরে আরও হইবেক যেহেতুক লোকবৃদ্ধ্যানুসারে কর্ম বৃদ্ধি নাই। কলিকাতাস্থ

সাহেবেরা এই বিবেচনা করিয়া তাহাদের শিল্পকলা শিক্ষার্থে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিতে কল্পনা করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য চাঁদার খাতা ছাপা হলো। সাহেবরাই বের হলেন খাতা হাতে। ৯৫৭৫৲ টাকা মিলেও গেল। কিন্তু এ্যাংলো ইন্ডিয়ানের চাকরী আর হলো না। তারা আজও বেকার।

এমন কি কারিগর হলেই যে রোজগার হতো না তখনকার সময়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নীচের বিজ্ঞাপনটি থেকে

WANTS EMPLOYMENT

An European, upwards of twenty years in India, in the capacity of steward and hairdresser, who understands watch making, can tune pianofortes etc......

টৌরিটি বাজার থেকে এ্যানা ডি' সিলভা জানালেন, তিনি কোথায়ও একটু ঠাঁই চান (wants a place)! কোলকাতা জোয়ান টমিকে সৈনিক থেকে ছেঁটে কবি বানিয়ে দিলে। সে এখন গড়ের মাঠে বসে গান গায়ঃ

"I am a younger son of Mars and
Spends my time in carving
A thousand different ways and means
To keep myself from starving."

ইত্যাদি :

হাজার পথের সন্ধান করতে করতে অবশেষে বেকার মিঃ রিচার্ড নোল্যান্ড—বাংলাদেশেই সন্ধান পেলেন এক নতুন আশ্চর্য সুন্দর ভূমির। কোলকাতার বাঙ্গালীরাই যেন কানে কানে বলে দিল তাঁকে—সাহেব চেষ্টা করো যদি মিলে যায়—এমন পথ আর দ্বিতীয়টি হয় না। অগত্যা রুটিরোজগারহীন সাহেব বংশপরিচয়কে মূলধন করেই আসরে নামলেন। ডাবলিনের মিঃ আন নোন-এর অধস্তন পুরুষ মিঃ নোল্যান্ড বিবাহ মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। তিনি কোন সম্পন্ন ভদ্রলোকের কন্যার পাণিপ্রার্থী।

শেষ পর্যন্ত নোল্যান্ড ঝড়ের সমুদ্রে পেয়ে গেলেন দ্বীপের সন্ধান। তবে কোলকাতায় নয়, মাদ্রাজে। কোলকাতার কাগজে ছাপা হলো সে শুভ সংবাদ।

Married at Madras.

Mr. Richard Nowland to Miss. Cuthbert of the same place with a fortune of 5,000 star pagodas (Rs. 30,000|-) and Mr. Cuthbert's friendship who intends giving him the rice contract which Mr. Ferguson Lauty had.

সুন্দরী কন্যা, তিরিশ হাজার টাকা নগদ, তদুপরি চাউলের কনট্রাক্ট!

কোলকাতার দুর্ভাগ্য, তার সন্তানদের মধ্যে নোল্যান্ডের মতো জামাতার অভাব না থাকলেও মিঃ কাথবার্টের মতো শ্বশুর অত্যন্ত কম। ফলে, আজও তার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে লাইন হয়, তিনটে পদের জন্য তিন হাজার দরখাস্ত পড়ে। উমেদারী আজও তাই এ সহরে রীতি, দালালী ব্যবসা।

তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক, বেকার আছে বলেই কোলকাতা আছে। ভেবে দেখুন,

বেকার বাদ দিলে কোলকাতা মানে দাঁড়ায়—ডালহৌসির খানকয় কেরানীশালা আর বড়বাজারের গুটিকয় গুদাম। এ সহর হাড্ডিসার হয়ে যায়। ইঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কর্মহীন ছেলেগুলোই জন্ম থেকে এ সহরের মাংস মজ্জা। তারাই কোলকাতার রং, কোলকাতার জীবন। রোয়াকে রোয়াকে পাতাবাহার সেজে তারাই এ সহরকে সাজায়, গল্প কবিতা লিখে তারাই মজায় এ সহরকে। আলো জ্বালানো বাল্বে সোনা গলানো এ,,সিডের ঢিল কিংবা শেরী স্যাম্পেন ছাড়াও সোডার বোতলের ব্যবহার তাদেরই আবিষ্কার। তারা আছে বলেই বাঁদরনাচে ভীড় হয়, গণতন্ত্রের ভোট হয়, বিপ্লবের মিছিল হয়। কোলকাতার বারোয়ারী তাদেরই দান, জলসা সাহিত্যসভা তাদেরই কৃতিত্ব।

এক কথায় কোলকাতার বৈচিত্র্যের মূলে কোলকাতার বেকার। তারাই এ সহরের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং—বেকার জিন্দাবাদ।
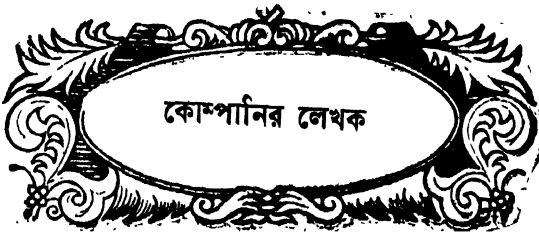
জনৈক ব্রিটিশ এম পি এসেছেন ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ কোম্পানির রাজত্ব। এদেশের নামডাক তিনি শুনেছেন। তদুপরি এ দেশের রহস্যময় প্রকৃতি, এ দেশের বিচিত্র মানুষের বিস্ময়কর রীতিনীতির কথা কিছু কিছু তিনি পড়েছেনও। ভারতবর্ষকে তাই দেখতে চান তিনি নিজের চোখে। শুধু দেখা নয়, ভারতবর্ষের অন্তরকে অন্তর দিয়ে জানতে চান তিনি।

"উত্তম কথা। কিন্তু হায়! 'ফৌজদারি' কাকে বলে, কার নাম 'বন্দোবস্ত', বাঙালী বাবু আর পাঠানে কি ফারাক—কিছুই তিনি জানেন না। তা হলেও যাকে পান তাকেই ধরে ভারতবর্ষ নিয়ে আলোচনা জুড়ে বসেন। খুব গা বাঁচিয়ে না চললে তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার জো নেই কারও। তিনি যে একজন ভারতবিদ্, প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্!

"হপ্তাখানেক যেতে-না-যেতেই ভদ্রলোক বসে পড়লেন হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে একখানা প্রমাণ-সাইজের বই লিখতে। এবার তিনি লিখতে পারেন বইকি। ভারতবর্ষকে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। এখনও দেখছেন। ঐ তো ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে। মন দিয়ে ফরবেসের 'হিন্দুস্থানী ম্যানুয়েল' পড়ছেন। অবশ্যই এখন তিনি আর্যদের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যায়টি লিখছেন।"

ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত ইংরেজ লেখক স্যর্ আলীবাবা, ওরফে G. Aberigh Mackay তাঁর 'টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ ইন ইণ্ডিয়া' বইয়ে ভারত-বিশেষজ্ঞদের এই চিত্রটি এঁকেছিলেন।

বলা বাহুল্য, স্যর্ উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক কিংবা প্রিন্সেপ সাহেবের মত মানুষ এ ব্যঙ্গের লক্ষ্য নয়। মুষ্টিমেয় ভারত-সন্ধানীদের বাদ দিলে যে অসংখ্য তথাকথিত ভারতবিশারদ্ আবির্ভূত হয়েছিলেন কোম্পানির আমলে তাঁদেরই পরিচিত করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছে।

ভারতবর্ষে সব ইংরেজই ভারত-বিশেষজ্ঞ। সবাই এখানে লেখক। যিনিই আসছেন, তিনিই কিছু-না-কিছু লিখছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, হাতী-চড়া, বাঘ-শিকারের মত লেখাও এখানে অতি সহজ ব্যাপার, স্বাভাবিক ঘটনা। ঐ এম-পি-র মত পণ্ডিতদের কথা বাদই দিচ্ছি। ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ছাড়া অন্যবিধ রচনাই কি কম? লেফটেন্যান্ট-গভর্নর থেকে সাব-অলটার্ন-গিন্নী কেউ বাদ নেই। গবেষণামূলক রচনা সম্ভব না হয়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, বেলে-লেটার—নিদেনপক্ষে খান কয় লম্বা চিঠি, নয়ত একখানা জার্নাল অন্তত

লেখা চাই-ই চাই। গোরা সৈন্যের যুদ্ধসজ্জার মত, এও যেন লেখার প্যারেড্, লেখকের কুচকাওয়াজ। বিরামহীন—চলেছে ত চলেছেই। দুশো বছরে তার যোগফলের অঙ্কটা বোধহয় আমাদের অনেক আঞ্চলিক সাহিত্যের চেয়েই হিসাবে বড়। ইংরেজী সাহিত্যেও এ একটা স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা, ভিন্ন জমির ফসল। বুনোফুল হলেও—বৈচিত্র্যের কারণে ঘরে ঠাঁই পেয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের খাস বৈঠকখানায় ভারতবর্ষের এই লেখককুলের ভাগ্যে কোন স্থান জোটেনি। দু-একজনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এদিকে ভারতবর্ষের মনেও যে তাঁদের জন্যে ফুলকাটা কাশ্মীরী আসন বিছানো এমন নয়। তাঁরা নিজেরাই এই অনাদর ডেকে এনেছিলেন। তবুও দেশে এবং বিদেশে এই পরিণামের কথা চিন্তা না করেই তাঁরা লিখেছেন। এদেশের জমিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলম হাতে তুলে নিয়েছেন, এদেশ ছেড়ে গিয়েও তাঁরা আজও তা হাতেই রেখেছেন।

বোধহয় না লিখে উপায় ছিল না বলেই ভারতবর্ষের ইংরেজেরা এমন বেপরোয়াভাবে লিখেছেন। নির্বাসনের যাতনা এ রচনার প্রথম উৎস। গুটিকয়েক অস্থিরমতি স্পেকুলেটর ব্যবসায়ী আর একটা ঠুনকো গভর্নমেণ্টের ছত্রচ্ছায়ায় এই বিরাট দেশের অসহ্য দহন, অফুরন্ত আনন্দ সহ্য করা যায় না. ভোগ করা যায় না। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান, 'হোম'—দেশ--কাঁটা হয়ে অন্তরে নিয়ত খোঁচা দেয়। ভারতবর্ষকে মুঠোয় পেয়েও দেশকে ভোলা যায় না।

তার উপর অবসর। অফুরন্ত অবসর এখানে। দুপুর এখানে বড় মন্থর, কাটে না। রাত্রি বড় দীর্ঘ। জীবন অলস। সুতরাং লেখা যায়। লিখে দেশের লোককে দুঃখের কথা জানানো যায়। নিজের মনের কথা—খুলে বলা যায়। আপ্‌কাণ্ট্রির কোন হিলস্টেশনের পাশে বাংলোর ঘরে মশালের আলোয় বসে সিবিলিয়ান তাই হাঁকেন—, "জোসেপ! কলম লে আও! দোয়াত লে আও!" শুধু দোয়াত-কলমে লেখা হবে না।—

Good! A fresh chillum; saturate tatties with goolaub, scatter little mountains of roses, chumpah and baubul blossoms about the room; bring me a vast serai of iced sherbet, pure juice of pomegranate.—you understand!

তারপর শুরু হল 'ওরিয়েণ্টাল টেলস'!—বিষয়বস্তুর অভাব কী? যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, নবাব-বাদশা রাজা-উজিরদের দরবার অন্দর আছে, সাপ-বাঘ-জঙ্গল, নাচ-গান-কেলেঙ্কারি কেচ্ছা কোন্‌টির অভাব ভারতবর্ষে! ভারতবর্ষে যা আছে ত আছেই—নিজেরা সঙ্গে করে এনেছেনও কম নয়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে বৈপরীত্যের অভাব নেই। বৈচিত্র্যও প্রচুর। সুতরাং লেখ। ব্যঙ্গ কর, বিদ্রূপ কর,—নিজেকে, নিজের ভাগ্যকে, প্রতিবেশীর সৌভাগ্যকে. উপরওয়ালার মাহাত্ম্যকে। স্থানাভাব নেই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাপ্তাহিক মাসিক কাগজগুলো আছে। কবিদের জন্যে সেখানে আছে 'পোয়েট কর্নার' কোন মতে ছন্দ মিলিয়ে যা খুশী লেখ। অ্যাডুইন আর্নল্ড বা রিচার্ডসন হওয়ার দরকার নেই। কোন মেয়ের পোশাক, কোন রাইটারের কেচ্ছা, যা খুশী বিষয়বস্তু হতে পারে। উপন্যাস, কাহিনীর পাঠকও কম নয়। হাজার

হাজার মাইল দূরে—বহু সাগর পেরিয়ে স্বদেশে হাজার হাজার মানুষ সাগ্রহে বসে আছে এদেশের কাহিনী শোনবার জন্যে। তাঁরা এর আগেও ভারতের কথা শুনেছেন। বায়রন সকলকে চমকে দিয়ে একদিন ঘোষণা করেছিলেন—

Look to the East, where Ganges' Swarthy race
Shall shake your tyrant empire to its base
Lo! there Rebellion rears her ghastly head,
And glares the Nemesis of Native dead;

(Curse of Minerva)

সিপাহী-বিদ্রোহের আগেকার কথা। বায়রন ভারতবর্ষে যাননি কোনদিন। কোথায় পেলেন তিনি এ অমঙ্গলের সংবাদ? ভারতবর্ষে যাননি এমন লেখক আছেন ইংলণ্ডে। জনসন্ ভারতবর্ষ নিয়ে লিখেছেন। লিখেছেন সার্ ওয়াল্টার স্কট এবং অন্যরাও। ডিকেন্সের লেখায়ও ভারতবর্ষের কিছু কিছু কথা আছে। কিন্তু এঁরা লেখক। এঁদের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা কল্পনা বোঝা কঠিন। ইংলণ্ডের লোক প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা চায়। তাদের চোখে-দেখা সাক্ষ্যে এঁদের লেখা মিলিয়ে নিতে চায়। তা ছাড়া যত নগণ্য লোকের রচনাই হোক, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মজা তুলনাহীন।

সুতরাং দু হাতে শুরু হল লেখা। একদিকে ভারতবর্ষের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো, অন্যদিকে ইংলণ্ডের দুঃসাহসী প্রকাশকরা—দুয়ে মিলে লালন করে চললেন ভারতের বেপরোয়া লেখককুলকে। তাঁদের সাকুল্য পরিচয় এখানে অসম্ভব। শুধু নামোল্লেখেই এ প্রবন্ধের পরিধির ধৈর্যসীমা পেরিয়ে যাবে। আমরা তাই শুধু অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য কটি উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিকের কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করছি এখানে।

কালের দিক থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজের লেখা উপন্যাসকে ভাগ করা যায় চার ভাগে। ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকে সিপাহী-বিদ্রোহ অবধি প্রথম অধ্যায়ের কালসীমা। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা—কোম্পানির রাজত্বের অবসানে, এবং শেষ—মহারানীর মৃত্যু তথা ১৯০৫ সনে কিপলিংয়ের 'কিম্'এর প্রকাশে। ১৯৩৭ সনে এডোয়ার্ড টমসনের 'ফেয়ারওয়েল টু ইণ্ডিয়া'র প্রকাশে তৃতীয় পর্যায়ের শেষ। তারপর থেকে জন মাস্টারস্,—অর্থাৎ অদ্যাবধি চলেছে নতুন যুগ। প্রথম যুগের খ্যাতিমান লেখক হক্‌লে এবং মিয়েডোস্ টেলর, দ্বিতীয় যুগের রাডিয়ার্ড কিপলিং, তৃতীয় যুগে ই এম ফর্স্টার এবং এডোয়ার্ড টমসন। বর্তমান যুগে নিঃসন্দেহে জন মাস্টারস্। প্রথম তিন যুগে—আরও এমন লেখক আছেন যাঁরা কারও কারও বিচারে উল্লিখিত জনদের তুল্য সম্মানলাভের অধিকারী। ডব্লিউ ডি আরনল্ড, সার্ হেনরি কানিংহাম, এডমণ্ড ক্যাণ্ডলার প্রমুখ ক'জন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এ দাবি যৌক্তিকতাপূর্ণ।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইঙ্গ-ভারতীয় উপন্যাসের সূচনা বলা চলে ডব্লিউ বি হক্‌লের হাতে। তাঁর 'পাণ্ডুরাং হরি' (১৮২৬) যোগ্যার্থে এই বিচিত্র সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এর আগে সোফিয়া গোল্ডব্যোনের 'হার্টলি হাউস', মিস্ সিডনী ওয়েনসনের 'দি মিশনারি', 'দি ইংলিশ হোমস ইন ইণ্ডিয়া' এমনি

কয়টি বর্ণনামূলক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের উপন্যাস বলা চলে না। একটা ক্ষীণ কাহিনীর বাঁধন থাকলেও এগুলো ভ্রমণবিবরণ-বিশেষ। অবশ্য হক্‌লের বইটিও অনেকের মতে নিছক অনুবাদ মাত্র। দক্ষিণের জনৈক হিন্দু এ দেশের ভাষায় লিখিত বইটি নাকি তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে।

তা হলেও হক্‌লের যে লেখবার ক্ষমতা ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ এর পরও তিনি 'টেলস্‌ অব এ জেনানা' এবং 'দি ফেটাল জুয়েলস্‌' নামে দুখানা জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

হক্‌লের পর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে খ্যাতির ব্যাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য মেডোস-টেলার। ক্ষমতায় এবং কর্মপ্রতিভায় তিনি হক্‌লের চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। এমন কি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি বোধহয় আজও সার্থকতম ঔপন্যাসিক। টেলার ভারতে কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে অবতরণ করেন ১৮২৪ সনে, আর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কন্‌ফেসনস্‌ অব এ ঠগ' প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ সনে। সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় মামুলী লেখকদের মত ছিল না বলা চলে। 'স্টোরি অব মাই লাইফ' নামে তাঁর একখানা আত্মজীবনীও আছে। ১৮৪০-৫৩ সন অবধি তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে 'টাইমস'-এর প্রতিনিধিও। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্পর্কে টেলার ছিলেন তাঁর পূর্বতন লেখকদের চেয়ে অনেক বেশী সহানুভূতিশীল। এদেশের নারী-পুরুষের অন্তরেও সৎপ্রবৃত্তি, মহত্ত্ব কিংবা মানবতাবোধ আছে তর উপন্যাসে তা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। পূর্বসূরীদের থেকে তাঁর ভারত-পরিচিতির এই ভিন্নতাকে অনেক ইংরেজ সমালোচক টেলারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে টেলার ভারতীয় পাত্রপাত্রী নিয়ে লিখলেও তাঁর মনে ছিল ইউরোপীয় আদর্শে তৈরী নরনারী। তারাই তাঁর 'সীতা'-'তারা'র পোশাক পরে বইয়ের পাতায় নেমে এসেছে। বলা বাহুল্য, ভারতবাসীর কাছে এই যুক্তিটা সত্য বলে মনে হবে না। টেলর ভারতবর্ষকে অপেক্ষাকৃত সত্যরূপে চিত্রিত করেছেন—এই ধারণাই এদেশে টেলারের জনপ্রীতির কারণ।

মেডোস-টেলারের জনপ্রিয় বই—'কন্‌ফেশনস্‌ অব এ ঠগ' বা জনৈক ঠগের আত্মস্বীকৃতি। ঠগী দস্যুদের এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী তৎকালে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এদেশে এবং ইংলণ্ডে। রাশি রাশি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের একক কৃতিত্ব এই বইখানারই প্রাপ্য। ভবানী-শিষ্য জনৈক আমীর আলী এ বইয়ের নায়ক। নিজের জবানীতে সে তার এবং তাদের দলের লোমহর্ষক কাহিনী বিবৃত করছে। গলায় রুমাল জড়িয়ে সাত শ লোককে আমীর আলী হত্যা করেছে নিজের হাতে। তার দুঃখ—হাজারে নিয়ে তুলতে পারল না অঙ্কটাকে।

টেলারের অন্যান্য বই : 'টিপু সুলতান', 'এ নোব্‌ল্‌ কুইন', 'তারা', 'রালফ ডারনেল' এবং 'সীতা'।

তার মধ্যে 'তারা', 'রালফ ডারনেল' এবং 'সীতা' বই তিনটি—তিনটে শতকের কাহিনী। প্রতিটি উপন্যাসই আকারে বিরাট এবং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। 'তারা'র পটভূমি দক্ষিণ-ভারত। ১৬৫৭ সনে বিজাপুরের যুদ্ধে

শিবাজীর জয় এবং দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠা এ কাহিনীর অন্তর্ভূমি। 'রালফ ডারলেন'এর কাহিনী ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের বিজয় এবং দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রভুত্ব উচ্ছেদের অধ্যায়কে কেন্দ্র করে, আর 'সীতা'র উপজীব্য ১৮৫৭ সনের সিপাহী-বিদ্রোহ।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। সিপাহী-বিদ্রোহের মত ইংরেজ আমলের অন্যান্য কোন ঘটনাই ইঙ্গ-ভারতীয় উপন্যাসের তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। বস্তুত, এঁদের উপন্যাসের বৃহত্তম অংশই তাদের কেন্দ্র করে। সামাজিক উপন্যাস বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা নিতান্তই কম। যা আছে তাও সত্য ঘটনার 'যথাযথ চিত্রণে'র চেষ্টার ফলে পীড়িত। ঘটনার বিবরণই মুখ্য। এমন কি, এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি যেন কিছুতেই মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না ইংরেজ লেখক-লেখিকাদের পক্ষে। সিপাহী-বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়-গ্রন্থাগারে যে পুস্তক-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, তাতে প্রদর্শিত হয়েছিল প্রায় পনেরটি ছোট-বড় উপন্যাস—বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী। তার মধ্যে প্রথমটির রচনাকাল ১৮৫৯, আর শেষটি একশ বছর পরে ১৯৫৭ সনে।

প্রথমটির নাম 'দি ওয়াইফ অ্যান্ড দি ওয়ার্ড' অথবা 'এ লাইফস এরর' (১৮৫৯) আর শেষটি মেরী মার্গারেট কেয়ীর 'স্যাডো অব দি মুন' (১৯৫৭)।

এগুলো উপন্যাস বলে কথিত হলেও বস্তুত ইতিহাসপদবাচ্য। এর মধ্যে তৎকালে সর্বাধিক খ্যাতি ছিল টেলারের সুবৃহৎ উপন্যাস 'সীতা'র। কিন্তু 'সমসাময়িক কালের একটা মোটামুটি পরিচয়' দিতে গিয়ে লেখক তাকে যে পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন আধুনিক কালের পাঠক তাকে সুখপাঠ্য ইতিহাস বলে যদি ভুল করেন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না। টেলারের পরেই সিপাহী-বিদ্রোহের উপন্যাস হিসাবে খ্যাত ফ্লোরা অ্যানি স্টীল-এর 'অন দি ফেস অব দি ওয়াটারস' (১৮৯৭) নামক বইখানার। কিন্তু পড়লে মনে হয় লেখিকার খ্যাতির কারণ অন্যত্র।

শুধু সিপাহী-বিদ্রোহ নয়, সতীদাহ, ঠগীদের অত্যাচার, বঙ্গভঙ্গ ও বাংলার সন্ত্রাসবাদ, নীলকর ইত্যাদি আরও আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে একাধিক লেখক গ্রহণ করেছেন তাঁদের উপন্যাসের উপাদান তথা পটভূমি হিসেবে। এর মধ্যে ক্রিসাইন ওয়েস্টেনের 'ইন্ডিগো' (১৯২৪), সিসিল লেসলির 'দি ব্লু ডেভিল' (১৯৫১), লেসলি বেরেসফোর্ডের 'দি সেকেন্ড রাইজিং' (১৯১০), এডমন্ড কেন্ডলারের 'শ্রীরাম্, দি রিভলিউশনারি' (১৯১২) সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

যা হোক, প্রথম যুগের শেষে আবির্ভূত হলেন কিপলিং। কিপলিং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা ত বটেই, তিনি নিজেই একটি সম্পূর্ণ যুগ। তাঁর 'কিম্' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহিত্যে সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং এ বইয়ের লেখক কিপলিং ভারতবর্ষের ইংরেজ লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভা, সমস্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে রাডিয়ার্ড কিপলিং স্বতন্ত্র আলোচ্য। এখানে তার সুযোগ নেই। শুধু এটুকু উল্লেখ করলেই চলবে যে, কিপলিং প্রথমবারের মত ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যে স্পষ্টত দুটো সমস্যার আমদানি করলেন। প্রথমটি, ইংরেজ এবং ভারতীয়ের সম্পর্ক;

দ্বিতীয়টি, ইংরেজ এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রথম সমস্যাটি ইতিপূর্বে অস্পষ্টভাবে হলেও ছিল। কোন লেখক ভারতীয়দের প্রতি কর্কশ হয়েছেন, অবিচার করেছেন; কেউ হয়ত অপেক্ষাকৃত উদারতারও (?) পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু কিপলিং যখন সমস্ত সঙ্গত কারণ এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও 'কিমে'র হরিচন্দর মুখার্জিকে উপন্যাসের দ্বিতীয় ব্যক্তিতে পরিণত করলেন, তখন শাসক এবং শাসিতের পার্থক্য স্পষ্টত সাহিত্যেও আত্মপ্রকাশ করে বসল। সাম্রাজ্যবাদী গর্বে উদ্ধত কিপলিং শ্বেতচর্মের 'প্রভুত্ব'কে সঙ্গত এবং স্থায়ী বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। আর এদিকে ভারতবর্ষে জন্মানোর অপরাধে পাছে তাঁর সেই শ্বেতমাহাত্ম্যে খর্বতা দেখা দেয়, এই ভয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজকে ঠেলে দিলেন নিজে থেকে দূরে। ভারতে জন্মালেই লোক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয় না; যদি তার পিতামাতা দুই-ই থাকেন ইউরোপীয়ান, তবে সন্তানও ইউরোপীয়ান। রাডিয়ার্ড কিপলিং ইউরোপীয়ান। তিনি ভারতবর্ষের প্রভুকুলে জাত এবং তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কুল থেকে স্বতন্ত্র।

কিপলিংয়ের এই জীবনদর্শন এবং উপন্যাস হিসেবে 'কিম'-এর সাফল্যের উত্তর-ফল হিসেবে একদিকে দেখা গেল—অনাবশ্যক জাতিদ্বেষের পীড়নে পড়েছেন এদেশের ইংরেজ লেখক-লেখিকারা, অন্য দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে চলেছে উপন্যাস রচনার উদ্যোগ। আরও একটি কাজ করেছিলেন কিপলিং। সেটি ভারতীয়দের মনে ইংরেজী উপন্যাস সম্পর্কে বিরাগের সৃষ্টি।

এ-বিরাগ সর্বপ্রথম কাটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন যিনি, তিনি ই এম ফর্স্টার। তাঁর 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' (১৯২৪) এবং এডোয়ার্ড টমসনের 'অ্যান ইণ্ডিয়ান ডে' (১৯২৭) এবং 'ফেয়ারওয়েল টু ইণ্ডিয়া' (১৯৩৭) নবযুগের নূতন উপন্যাস। টমসন কুড়ি বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার, স্বাধীনতার আন্দোলন, সত্যাগ্রহ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের সত্য-চিত্র উপস্থিত করেছেন তাতে। 'কিম'এর হরিচন্দরের পিছনে যদি থেকে থাকে শরৎচন্দ্র দাসের প্রেরণা, তবে 'ফেয়ারওয়েল টু ইণ্ডিয়া'য় ছিল শ্রীঅরবিন্দের ধারণা। কিন্তু ভারতীয় পাঠক যেমন 'কিম' পড়ে ব্যথিত হন অন্তরে, টমসনের রচনায় সে ব্যথার কারণ নেই। ইংরেজী উপন্যাসের কুসংস্কার কাটিয়ে তুলেছিলেন টমসন এবং ফর্স্টার। এখানেই তাঁদের বিশেষ সার্থকতা।

৩৭-এর পরের বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস: 'রিভার'-এর লেখিকা কিউমার গডেনের 'ব্ল্যাক নার্সিসাস' (১৯৩৯), হিলডা সেলিম্যানের 'হোয়েন পিকক্স কলড্' (১৯৪০), হিলডা ওয়েবনারের 'দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি ওয়াল' (১৯৪৭), ইথেল মানিনের 'অ্যাট সানডাউন দি টাইগার' (১৯৫১) এবং জন মাস্টারস-এর বইগুলো।

এদের মধ্যে জন মাস্টারস-এর পাঠক-পরিধি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিস্তৃততর। এদেশেও তিনি জনপ্রিয় লেখক। 'ভবানী-জংশন'-এর লেখক হিসেবেই সর্বাধিক খ্যাত হলেও 'ভবানী-জংশন' মাস্টারস-এর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়। মাস্টারস আধুনিক লেখক। তাঁর লেখার শুরু ১৯৫১ সনে। ইতিমধ্যে ছখানা বই-এর গ্রন্থকার তিনি। তাঁর পরিকল্পনা, ভারতের সঙ্গে ইংরেজের তিন শো পঞ্চাশ

বছরের যোগাযোগ নিয়ে ৩৫ খানা বই লেখা। প্রতি এক শো বছরের জন্য দশখানা বই। পরিকল্পনাটি অনেকটা টেলারের মত। ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছে কয়েকখানা: 'করমণ্ডল', 'দি ডিসিভারস্', 'নাইট রানারস অব বেঙ্গল', 'দি লোটাস অ্যাণ্ড দি উইণ্ড', 'ভবানী-জংশন' এবং ইত্যাদি।

'করমণ্ডলে'র পটভূমি ভারতে ইংরেজের পদার্পণ, 'ডিসিভারস' অর্থাৎ ঠগ দস্যু। 'নাইট রানারস অব বেঙ্গল'—সিপাহী-বিদ্রোহ, 'লোটাস অ্যাণ্ড দি উইণ্ড'—১৮৭৯-৮১ সনে আশঙ্কিত রুশ-আক্রমণের পটভূমিতে রচিত এবং 'ভবানী-জংশন'এর বিষয়বস্তু এবং কাল দুই-ই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান (১৯৪৭)।

এই সব উপন্যাস ছাড়াও মাস্টারসের আরও একখানি বই আছে—'বিউগলস্ অ্যাণ্ড এ টাইগার'। এটি তাঁর আত্মজীবনী।

মাস্টারসের জন্মও কিপলিং-এর মত ভারতবর্ষে, ১৯১৪ সনে কলকাতায়। ভারতবর্ষে তাঁর পরিবারের বাস সুদূর ১৮০৫ সন থেকে। পিতার ঠাকুরদা ছিলেন প্রথমে কলকাতার লা মার্টিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তারপর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক। মাস্টারস্ নিজে ছিলেন সৈন্যবিভাগে।

সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় পুরুষানুক্রমিক। তবুও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর মাস্টারস্ ভারত ত্যাগ করেছেন। 'ভবানী-জংশন'এর নায়কের মত তার লেখকও আজ ভারতের বাইরে, নিজের দেশের বাসিন্দা। এদেশে তিনি পরবাসী।

"And a foreigner was a man who did not guard the past, and foster the future; above all who did not love."

কিন্তু মাস্টারস্ ভারতবর্ষকে ভালবাসেন। কিপলিংকে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে স্বীকার করেও তাঁর তথাকথিত আভিজাত্য তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। 'ভারতপ্রেমিক' হিসেবে তিনি কিপলিংয়ের রচনায় ব্যথিত বলে আত্মজীবনীতে বলেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে একটা দেশ—এমন দেশ, যেখানে ভাল এবং মন্দ দুই-ই আছে, যেমন পৃথিবীর সর্বত্রই থাকে। ফ্লোরেন্স মারিয়াট-এর মতো ভারতবর্ষ 'নার্সারি অব বিগট্রি প্রেজুডিস অ্যাণ্ড স্মল-মাইণ্ডেডনেস' বা ভারতবর্ষ 'দি জগরনাথ অব ইংলিশ ডোমেস্টিক লাইফ' নয় মাস্টারসের কাছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড-আমেরিকার মতই দেশ।

"I have never had the attitude of the average civilian tourist, so I do not think India as quaint, picturesque, exploited, inscrutable or otherworldly I thought India was ugly, beautiful, smelly, predictable, and as material as the West. It was inhabited not by yogis and saints, but by people—knaves, giants and dwarfs and plain people."

জন মাস্টারস্এর রচনা পড়লে এ ভাষণের সত্যতা সবাই হয়ত সমান পরিমাণে খুঁজে পাবেন না, কিন্তু মাস্টারস্ যে একালের ইঙ্গ-ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম, এ বিষয়েও কারও দ্বিমত থাকবে না।
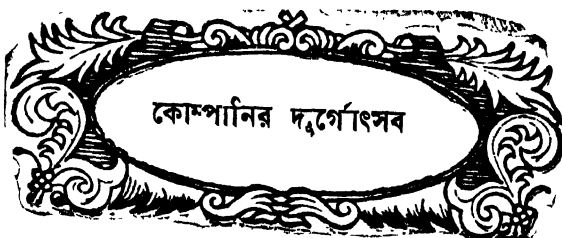
The church, the mart, the court of law,
The—, everywhere is deserted;
The very crows have ceased to caw.
And Echo's broken-hearted;
The Palaced town in silence stands
For none are left in it to jaw;
All creeds, or as we say, all hands
Being off for the DOORGA-PUJA."

ইংরেজ কবির লেখা ইংরেজী পদ্য। উপলক্ষ্য : দুর্গোৎসব। কলকাতার জেন্টুদের ঐতিহাসিক ভোজোৎসব। কিন্তু এ কবিতায় তার সমাচার নেই। এ কবির সুর যেন ভিন্ন। তর্জমা করে বললে তাঁর পদ্যাংশটির মোটামুটি মানে দাঁড়ায় : গির্জায় লোক নেই. কোর্টে লোক নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। দোকান বাজার সব খাঁ খাঁ! কোথায়ও কোন জনমানবের সাড়া নেই। এমন কি কাকপক্ষীটির পর্যন্ত রা নেই। কেননা—কলকাতায় এখন দুর্গোৎসব!

দুর্গোৎসবের কলকাতার এই চেহারাটা আদি চেহারা নয়, আধুনিক কালেরও নয়। পুজোয় দিনকয় ছুটির সুযোগে সাহেবেরা এবং তাদের পিছু পিছু এদেশের বড়মানুষেরা সবে যখন শহর খালি করে সিমলা-দার্জিলিং যাতায়াত শুরু করেছেন এই বিষাদ-সংগীতটি সেকালেরই রচনা। অর্থাৎ. এটি ঊনবিংশ শতকের শেষ দিককার ঘটনা। তার আগে—অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৮৪০ সনের বিখ্যাত দশ নম্বরী আইন পাস হওয়া পর্যন্ত দুর্গোৎসব ছিল রাজাপ্রজানির্বিশেষে কলকাতার শ্রেষ্ঠতম সামাজিক উৎসব। এ উৎসবে নেটিভদের তখন যত আনন্দ, তার চেয়ে বেশী যেন কোম্পানির। এসপ্লানেড থেকে এণ্টালী—লাটবাহাদুর থেকে সাব-অল্টার্ন—স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারতেন না তখন পুজোয় কলকাতা ছাড়বার কথা। বিবি বাচ্চা সহ সেজেগুজে তাঁরা বসে থাকতেন কবে চিৎপুরের নেমন্তন্ন আসবে তারই অপেক্ষায়।

নেমন্তন্নেও ত্রুটি ঘটত না কখনও। মাথালো মাথালো বাড়িতে 'টিকিট' যেত।—অর্থাৎ কার্ড। আর বাবুর সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ বা ব্যবসায়িক পরিচয় নেই তাদের জন্যে ছাপা হত উদার বিজ্ঞাপন। সে বিজ্ঞাপনে আয়োজনের

তালিকাটি যেমন আকর্ষণীয়, আহ্বানটিও তেমনি আন্তরিক। কারণ, বাবুরা জানতেন, উপলক্ষ্য দুর্গা হলেও এ উৎসব আসলে কোম্পানির-ই উৎসব। এর আদিতে যেমন কোম্পানিরই দেওয়া ধন, অন্তেও তেমনি একমাত্র বাসনা কোম্পানির প্রসাদ অর্জন।

কথাটার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি নেই। এটি ইতিহাসেরই সত্য। কোম্পানির আমলের আগেও দুর্গাপুজো অবশ্যই হত বাংলাদেশে। এমনকি হত মুসলমান আমলেও। "যবনাধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল এ প্রদেশে বহুতর হিন্দু জমিদার আর রাজাই বা কহ ইঁহারা থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাটোর বর্দ্ধমান এই তিন চারিজন রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ বিভক্ত ইঁহারদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাঁহারদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই করিবা।" ইত্যাদি (সমাচার চন্দ্রিকা, ২ নবেম্বর, ১৮৩৩)।

সুতরাং বাংলা দেশে পূজো হত। কারণ, অর্থাভাবে কেউ অপারগ হলে রাজারা তাদের অর্থ দিতেন কিংবা জমি। কিন্তু সে সব পুজো আর কলকাতার পুজোর মধ্যে রাত আর দিন ফারাক। প্রাক-কোম্পানি যুগের পুজো ছিল 'সর্বত্র প্রতিমা না হউক ঘটপটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদির' পুজো। আর কলকাতার বাবুদের পুজো ছিল—ঘটের বদলে ঘড়া ঘড়া টাকার পুজো। তার আদর্শ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমত এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে ২ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন। (সমাচার দর্পণ, ১৭ অক্টোবর, ১৮২৯)।"

অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র পথ দেখালেন আর তারই ফলে কলকাতায় কোম্পানি ঘট হলেন। এবং নবকিষণের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে চললেন লর্ড ক্লাইভ।

তাছাড়া হিদেনদের পুজো রাতারাতি কোম্পানির পুজোয় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পেছনে আরও একটা কারণ ছিল তখন। মনে রাখতে হবে, কোম্পানি তখনও এদেশের পুরো রাজা নয়, হবু রাজা মাত্র। সুতরাং ভোটের আগে মন্ত্রীদের মত শাসকের চেয়ে সেবায়েতের ভূমিকাটাই তখনও তাদের নজরে বেশী জরুরী। ফলে আধা-শাসক হলেও তারা তখন এদেশের যাবতীয় ধর্মাচারের পুরো-পৃষ্ঠপোষক। নেটিভদের পুজোয় বা আনন্দভোজে যোগ দেওয়া ত সাধারণ শিষ্টাচার। কোম্পানি তখন সরকারীভাবে হিন্দুদের মন্দির তদারকি করতেন, ভক্তদের প্রণামী সংগ্রহ করতেন। কমিশনে লোক লাগিয়ে দূর দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রী টেনে এনে মন্দিরের আয় বাড়াতেন। প্রতিদিন ঠিকমত পূজা ধুনো দেওয়া হচ্ছে কিনা সাহেব কর্মচারীদের কর্তব্য ছিল সেসব খবরদারি করা।

এসব ছাড়াও আরও কিছু কিছু সরকারী কর্তব্য ছিল সেকালে। যেমন, ১৮১৭ সনের আইন অনুযায়ী নেটিভদের বিশেষ বিশেষ পর্বের দিনে দেবতার সম্মানার্থে কোম্পানির ফৌজকে এসে সামরিক কায়দায় সেলাম জানাতে হত,

কামান দাগতে হত। কখনও কখনও বিগ্রহের পিছু পিছু মার্চ করতে হত মাইলের পর মাইল।

মাঝে মাঝে মন্দিরে বড় বড় রাজপুরুষেরা আসতেন। বিশেষ, কোম্পানির পক্ষে কোন সংকটকালে। এসে পুজো দিতেন, প্রতিমার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। ডালি উপহার দিতেন। এমনকি আমাদের এই কালীঘাটেও ছিল এসব নৈমিত্তিক ঘটনা। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন : "আমি এমন বিবরণ পেয়েছি যে ইউরোপীয়ানরা নিয়মিতভাবে কালীঘাটে গিয়ে থাকেন এবং দশ হাজার টাকা অবধি তাঁরা সেখানে পুজো অর্চনায় খরচ করেন। হালেই অনারএবল্ কোম্পানির একজন কর্মচারী মোকদ্দমা জিতে কালীঘাটে তিন হাজার টাকা পুজো দিয়ে এসেছে।"

শুধু কালীঘাটে পুজো নয়, কোম্পানির আর এক কর্মচারী দুর্গোৎসব-ই করতেন নিজে টাকায়। তিনি হাণ্টারের 'Annals of Rural Bengal'-এর সেই বিখ্যাত ম্যানুফ্যাকচারার জন চিপস। বীরভূমের জনপ্রিয় শ্রীযুত চিকবাহাদুর। চিপস যখন ১৭৮২ সনে কোম্পানির রাইটার হিসেবে কলকাতায় পা দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। ক' বছর যেতে না যেতেই শোনা গেল তিনি কোম্পানির অডিটার জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। ক্রমে (১৭৮৭) তিনি নিযুক্ত হলেন বীরভূমে কোম্পানির প্রথম কমার্শিয়াল এজেণ্ট। কোম্পানির তখন সেখানে তুলা, রেশম, লাক্ষা, রঙ ইত্যাদির জমজমাটি কারবার। চিপস তার সঙ্গে জুড়লেন—ব্যক্তিগত ব্যবসা। কোম্পানির আপিস ছিল—সোনামুখীতে, আর চিপসএর আবাস—শান্তি-নিকেতনের কাছাকাছি সুরুলে। রায়পুরের লর্ড সিংহদের বংশের শ্যামকিশোর ছিলেন চিপসএর দেওয়ান।

দিন যায়। কিন্তু চিপসএর ব্যবসা আর কিছুতেই জমে না। সাহেবের মনে তাই বড় দুঃখ। শ্যামকিশোর পরামর্শ দিলেন—ঘাবড়ানোর কি আছে সাহেব? তুমি এক কাজ কর, দুর্গোৎসব কর।—আমার দৃঢ়বিশ্বাস মায়ের কৃপায় তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।

দুর্গোৎসবের দিকে কোম্পানির অফিসিয়াল মেজাজের কথা চিপস জানতেন। তিনি সানন্দে শ্যামকিশোরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। সুরুলে কোম্পানির কুঠিতে ধুমধাম করে পুজো হল। দেখতে দেখতে চিপসএর ভাগ্যও নাকি গেল ফিরে। তারপর থেকে ফি বছর-ই পুজো করতেন তিনি। অবশ্য মহারাজা নবকৃষ্ণ বা সুখময়ের পুজো নয়। চিপস সাহেবের এই বাবদে বছরে খরচ হত মাত্র পঞ্চাশ টাকা। পুজোর খরচ মাত্র সতের টাকা। বাকী টাকায় গাঁয়ের লোকেরা নতুন কাপড় পেত, আর মহাষ্টমীর দিন ভরপেট ভোজ।

চিপস মারা যান ১৮২৮ সনে। কলকাতায় পুজোর সেটা পড়তি কাল। চিৎপুর জোড়াসাঁকোর সুবর্ণযুগে তখন তামাটে রঙ ধরে এসেছে। সে পরিণতি দেখবার আগে—সেই সোনালী দিনের কলকাতার পুজোকে একবার দেখে নেওয়া যাক।

আগেই বলেছি, কলকাতার পুজো মানে তখন ওরফে কোম্পানির-ই পুজো। পুজোর মরসুম পড়তেই তাই ইংরেজি কাগজে কলামের পর কলাম

জুড়ে বের হত কোথায় কি প্রস্তুতি হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ। ১৮১৯ সনের ক্যালকাটা জার্নাল থেকে তার নমুনা দিচ্ছি একটু :

"পুজো আসছে। মহারাজা রামচন্দর রায় এবং বাবু বোষ্টম ডস্ মুল্লিকের বন্ধুরা may indulge in an anticipation of the highest gratification from the arrangements which these gentlemen have respectively made, to render their mansions the scene of jocund festivity and varied amusements. এই প্রেসিডেন্সিতে ইতিপূর্বে কেউ কখনও দেখেনি এমনি সব সুগায়িকাদের বিপুল অর্থব্যয়ে আনা হচ্ছে। নিকি নাচবে।...পূর্বদেশীয় আর একটি লিয়াস আসছে। সে মনোহারিণী নূরবক্স!...ঘরবাড়ি যেভাবে সাজানো হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।...ইত্যাদি।"

পুজোর পরেই আবার রিপোর্ট বের হল। এবার রিভিউ। গৃহকর্তারা নিশ্চয় ওৎ পেতে বসে থাকতেন ছাপার হরফে ইংরেজী কাগজে কবে সেই সার্টিফিকেটটি বের হবে তার জন্যে। যে প্রতিযোগিতার মধ্যে আয়োজনাদি হত তাতে এসব কাগজের কাটিং নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে বাকযুদ্ধাদিও হত নিশ্চয়। যা হক, ক্যালকাটা গেজেট যথাসময়ে জানালেন—"আমরা শুধু এটুকুই বলব যে their endeavor to please, kept pace with their intentions। যে ঘরগুলোতে ইউরোপীয়ানদের অভ্যর্থনা করা হয়েছিল সেগুলো সত্যিই সুপার্বলি ডেকরেটেড্। প্রাচ্যের জাঁকজমকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউরোপীয়ান রুচি।...ইত্যাদি।" আর নাচ? "রামচন্দরের বাড়িতে যেমন নিকি নেচেছে, তেমনি রূপচাঁদ রায়ের বাড়িতে নেচেছে—বুনু। জনৈকা কাশ্মিরী সুন্দরী।"
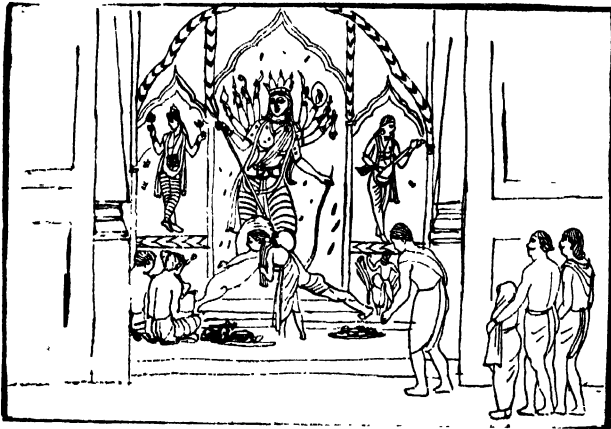
পুজো নিমিত্ত, উৎসব প্রধান

শুধু কাশ্মীর নয়, নর্তকীদের আরও দূর দূর দেশ থেকেও আনা হত তখন। ১৮২৬ সনের গভর্নমেণ্ট গেজেটে লিখেছেন—"গোপীমোহন দেবের

বাড়িতে নাচবার জন্যে সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে একদল সুন্দরী এবং সুগায়িকা নর্তকী আনা হয়েছে।" নাচের সঙ্গে পূজায় আর একটি উপচার ছিল সং। তারা কখনও রণ-পা চড়ে নেচে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত, কখনও বা বসে বসে কাচের বোতল খেত। কোন কোন সাহেব সন্দেহ করেছেন—তাঁরা চলে আসার পর নাটমন্দিরের দরজা বন্ধ করে এই সব সংয়েরা নিশ্চয় তাঁদের এবং তাঁদের বিবিদের ভাবভঙ্গী নকল করে বাবুদের মজা দিত!

নাচ-গান, খানাপিনা ছাড়া পূজায় আর একটি বড়মানুষি ছিল ঋণের দায়ে আটক কয়েদীদের মুক্ত করা। সেকালে ঋণের টাকা মিটিয়ে দিলেই কয়েদীরা ছাড়া পেত। কোন কোন বাবু পুজোয় সাধ্যমত তাদের মুক্ত করতেন। বিশেষ করে ইংরেজ কয়েদীদের। ফলে পুজোর মরসুমে নাকি স্মল-কজেস-কোর্টে অধমর্ণদের ভীড় লেগে যেত। তারা এক্ষুনি জেলে যেতে চায়—পুজোর আগে। কারণ, তাতে অচিরেই মুক্তির আশা। অনেক বাবু তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের মনোবাসনা গোপন রাখতেন। কেননা, নয়ত ট্যাঁকে টান পড়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু তবুও শেষরক্ষা করা গেল না। পুরোপুরি দু'পুরুষও ট্রাডিশন বাঁচিয়ে চলতে পারল না কলকাতা। ক'বছরের মধ্যেই শোনা গেল, মন্দার খবর। ১৮২৯ সনে কাগজে লেখে, "পূর্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহ নৃত্যগীতাদি এক্ষণে বৎসর ২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্বে ইহার পাঁচগুণ ঘটা হইত এমত আমাদের স্মরণে আইসে।"

'বঙ্গদূত'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তবুও সে বছর, "৪।৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনারেল লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কাম্বরমীর ও প্রধান ২ সাহেব লোক আগমন করিয়াছিলেন। ...অন্যত্র অত্যল্প।" তবে সেবারে অন্য একটি নতুন দর্শনীয় বস্তুও ছিল। সেটি "সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পূজার চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরাস্থ্র পথে এক গেট" নির্মাণ।

তিন বছর পরে, ১৮৩২ সনের খবর আরও পড়তি দিকে। কলকাতার পূজার সমারোহ কমতে কমতে সেবারে গোটা তিন পড়ন্ত বাড়ির দালানে এসে ঠেকল। সমাচার চন্দ্রিকার মত রক্ষণশীল কাগজকেও স্বীকার করতে হল—"শ্রীশ্রীপূজার সময়ে যে প্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজা সুখময় রায়বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন ভার ছিল যেহেতুক ইংগরেজ প্রভৃতির লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুল বাহুল্যে পথ রোধ হইত।"

সুতরাং যেসব বাড়িতে আগে সাধারণের ছাড়পত্র ছিল না এবং রবাহূতরা বাবুদের উদ্যোগ দেখতে গিয়ে—দারোয়ানের হাতে উত্তমমধ্যম খেয়ে ঘরে ফিরত 'জ্ঞানান্বেষণ' জানালেন, "(এবার) সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং

বাইজীরা গলি গলি বেড়াইতেছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই... এবং যাহারদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তরফা বাই থাকিত এ বৎসর সেই বাড়ীতে বৈঠকিগানের তালেই মান রহিয়াছে।" (জ্ঞানান্বেষণ, ১৩ অক্টোবর, ১৮৩২)

'৩২ সনে আরও একটা মন্দার খবর ছিল। সেটি কুমারটুলীর। বরাবরের মত পূজা না হওয়ায় সে বছর প্রতিমাও তেমনি বিক্রি হয়নি। এ বিভ্রাটের ফলে সে বছর কলকাতায় উৎপত্তি হল এক নতুন রেওয়াজের। রাতে রাতে পাড়ার ছেলেরা সে সব প্রতিমা পাচার করে দিতে লাগলেন—গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি। বাধ্য হয়ে কেউ কেউ অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে প্রতিমার সম্মান রক্ষা করলেন, আবার কেউ কেউ "সেই প্রতিমার পূজা না করিয়া তাহাতে যে সরস্বতীর মূর্তি ছিল তাহাই খুলিয়া রাখিলেন। কারণ, শ্রীপঞ্চমীতে উপকার দর্শাইবে।" বেলঘরিয়ায় এক ভদ্রলোক সে উপকারটুকুও চাইলেন না। তিনি প্রতিমাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—পুকুরে। একদল বললেন—উচিত কাজ হল। অন্য দল বললেন—না, এ মহাপাতকের কাজ। তাই নিয়ে দুই দলে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল একটা।

দুর্গোৎসবে নাচের আসর

এবং অবশেষে শুরু হল সেকালের নিয়মে খবরের কাগজে কাগজে কলম-যুদ্ধও। 'সমাচার দর্পণ' লিখলেন শুধু কৃপণদেরই এভাবে সাজা দেওয়া হয় তাঁরা তা মনে করেন না। "কখন ২ অতি পরিমিতব্যয়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় যোত্র বুঝিয়া সাধারণ কর্ম্মে ব্যয় করেন ইদৃশ ব্যক্তির উপরও কতকগুলো পাগল বালকেরা এইরূপ ভার দিয়া ক্লেশ দেয়।" সুতরাং দর্পণ মনে করে বাংলাদেশে যত শারদীয় পূজা হয় তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই "বলপূর্বক হয়।"

রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র চন্দ্রিকা তাই শুনে ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা লিখলেন—"(এভাবে) পূজা করিয়া একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত

কখন শুনা যায় নাই।" সুতরাং দুর্গোৎসব বন্ধ করার চেষ্টা করে হাস্যাস্পদ না হয়ে দর্পণ "বরঞ্চ রাস্তায় ২ ঘর করিয়া বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের সর্বনাশ করিতেছেন তাহারদিগকে দেশ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করুন।...বাটীতে প্রতিমা রাখিয়া গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০।৬০ টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল পরকাল ভাল হয়" ইত্যাদি।

কিন্তু চন্দ্রিকার এই যুক্তির বাঁধ যুগের বেগে বালির বাঁধের মত হারিয়ে গেল। দেখতে দেখতে কোম্পানির মত কলকাতার চেহারা হয়ে উঠল ভিন্নতর। ১৮৩৯-এ 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজ জানালেন: "বর্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খ্রিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আর যখন সর্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরও অধিক সন্তুষ্ট হইব।"

এই হাওয়া-বদলের কারণগুলো যে সেকালে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। তৎকালের কোন কোন কাগজেই সুন্দর ব্যাখ্যা আছে তার। 'জন বুল' কাগজের মতে, "পূজায় এই ভাটার কারণ ১) এক্ষণে সাহেব লোকেরা বড় তামাশার বিষয়ে আমোদ করেন না। ২) কাহার ২ তাদৃক ধন এখন নাই...কলিকাতাস্থ অনেক বড় ২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাঁহারা ইহার পূর্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই এখন নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করণে নিঃস্ব হইয়াছেন ...কেহবা অধিকারের যে অংশ করণেতে বাঙ্গালিরা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হন তাহাতে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন।...(তদুপরি) ৩) উৎসবের হ্রাস হওনের আর এক কারণ জ্ঞান বৃদ্ধি।"

উদাহরণ দিয়ে যুক্তিগুলোকে প্রমাণিত করার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এখানে দুর্গোৎসবে ইংরেজদের উৎসাহহীনতার কারণগুলোই সংক্ষেপে বলব। হিন্দুদের উৎসবে খৃষ্টানদের যোগ দেওয়া সঙ্গত কিনা কলকাতার ইংরেজদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক একটা আগাগোড়াই ছিল। ১৭৯২ সনে 'ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল' রায় দিয়েছিলেন—Call it diversion and the pill goes down. কিন্তু ১৮২৬ সনে 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পক্ষে এই ঔদার্য দেখান সম্ভব হল না। তাঁরা ক্রিটিকাল হয়ে উঠলেন। কেননা তাঁদের মতে দুর্গোৎসব a very heterogeneous sort of business. 'এতে মুসলমানেরা নাচে, বাদ্যি বাজায়,—সাহেবেরা কোল্ড বিফ্ বিয়ার খায়।' তিন বছর পরে তাঁরা জানালেন—নিছক দর্শক হিসেবে যদি কোন খৃষ্টান এতে যেতে চান তবে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে এভাবে যদৃচ্ছ টাকা ওড়ানো কি ঠিক?

হিন্দুদের মধ্যেও এ প্রশ্ন উঠল। ১৮৩১ সনে 'সমাচার দর্পণে'ই এক দর্শক পত্রাঘাত করলেন—"গোমাংসের নাম শ্রবণে পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুর দিগকে দেখিয়াছি তবে কি নিমিত্ত তাহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ও বৎস মাংস ও ব্রান্ডি সাম্পেন সেরি ইত্যাদি নানাপ্রকার মদিরা আনয়ন করেন।"

এই দুই শ্রেণীর সমালোচকদের ওপর ছিলেন আবার মিশনারি সাহেবেরা।

তাঁরা আন্দোলন শুরু করলেন। কেউ কেউ কুৎসার পথও ধরলেন। তাঁরা রটালেন খৃষ্টান অফিসারদের পৌত্তলিকতা প্রীতির পেছনে রয়েছে নেটিভ স্ত্রীলোকদের প্রেরণা। রেঃ পেগ নামে এক পাদ্রী সাহেব এসেছিলেন কলকাতায় ১৮২১ সনে। '২৬ সনে দেশে ফিরে জোর আন্দোলন শুরু করলেন তিনি। "India cries to British Humanity" নামে একখানা মুদ্রিত আবেদনও তিনি প্রচার করলেন বিলেতে।

এসব আন্দোলন এবং সেই 'জ্ঞান বৃদ্ধির' কারণে—ক্রমে কলকাতার দুর্গোৎসব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো। ১৮৩৩ সনে ইয়ং বেঙ্গল সোজাসুজি জানতে চাইলেন—"একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি...যে সকল ভারি ২ বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওয়া আবশ্যক সে সকল বিষয়ে মনযোগ না করিয়া নাচ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্বসাধারণের উপকারযোগ্য কোন বিষয় দেখিতে পান না?" তাহারা কলকাতার বড়মানুষদের সামনে 'কি কি বিষয়ে খরচ করিতে হয়' সে বিষয়ে একটা ফর্দ্দ উত্থাপন করলেন। তার মধ্যে আছে 'বিলাতে গমনোপযুক্ত জাহাজ নির্মাণ', 'নানাবিধ শিল্প যন্ত্র স্থাপন' এবং 'চাষ বৃদ্ধি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে-বছরই বের হল কোম্পানির বিখ্যাত ঘোষণা। হিন্দুদের মন্দিরাদি থেকে সরকারীভাবে হাত উঠিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা। কবছরের মধ্যেই ১৮৩৭ সনে বন্ধ হয়ে গেল—হিন্দুর উৎসবে তোপ দাগান। এবং অবশেষে '৪০ সনে এল বিখ্যাত দশ নম্বরী আইন। সে আইনের মর্মঃ নেটিভরা প্রজা আমরা রাজা। তাদের ধর্ম তাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের।

সুতরাং কোম্পানির দেওয়া প্রাণবায়ু হারিয়ে কলকাতার পুজার ফানুসটি চুপসে আবার যে-কে-সেই হয়ে গেল। এবং তাই নিয়ে শুরু হল একালের পুজা। বারোয়ারীর পালা।
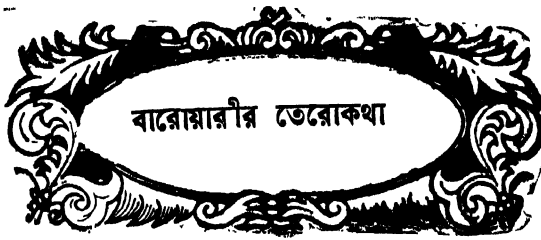
১৮৪০ সনের কথা। কলকাতা থেকে একখানা পাল্কী চলেছে বেহালার দিকে। সুন্দর দামী পাল্কী। চার পাশে ভেলভেটের ঘেরাটোপ। নীচে রেশমী ঝালর। হে'ইয়া—হো, হে'ইয়া হো—করতে করতে ছুটে চলেছে চারটে জোয়ান বেহারা। যেন, চারটে ঘোড়া। কালীঘাট পেছনে পড়ল, আলীপুরও চলে গেল। দেখতে দেখতে পাল্কী এসে পৌঁছল বেহালা। সাবর্ণ চৌধুরীদের বিরাট বাড়িটা ডাইনে রেখে বেহারারা বাঁয়ের পথ ধরল। বাঁয়ে—বারোয়ারীতলা।

বারোয়ারীতলাতে যেমনি পা দেওয়া অমনি—পেছন থেকে হুকুম এল—থামাও পাল্কী। হুকুমের প্রকৃতিটা এমন যে, স্পষ্ট বোঝা যায় তাকে অমান্য করার অর্থ—অনর্থ। বেহারাদের পা থেমে গেল। ঘাড় থেকে পাল্কী নামিয়ে কপালের ঘাম মুছল তারা। সমস্ত কাজটা এমনভাবে করল যেন জানা কথা এটা করতে হবে।

হুকুমদারেরা ততক্ষণে হা-হা হি-হি করতে করতে এসে হাজির।—'যা বলেছিলাম মাইরি, দেখছিস না, ব্যাটাছেলে কেউ নেই'—এই ভেতরে কে রে? কোন লক্ষ্মী মাঈ বুঝি?—মাইজীকো বোলাও রুপেয়া নিকালনেকি।'

'বেহারা কহিল, তাহারদিগের সঙ্গে কর্তাপক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কূলবধূকে লইয়া যাইতেছে তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাঁহার সঙ্গে টাকা-পয়সাও নাই তবে তাহারা টাকা কোথায় পাইবে।'

আবার হো-হো করে হেসে উঠল যুবক দল। এসব কৈফিয়ত বেহালার বারোয়ারীতলায় অচল। সাবর্ণ চৌধুরীরা ক'বছর আগেও ছিলেন কলকাতার মালিক। খোদ কোম্পানী তাঁদের কথা অমান্য করার আগে তিনবার ভাবত। —'জানিস তো আমরা চৌধুরী বাড়ির ছেলে। বেহালার চৌধুরী বাড়ি। তোদের মাঈজী কো বল—চৌধুরী বাড়ির ছেলেরা যখন ধরেছে তখন কিছু না দিলে ছাড়ান নেই। আঁচলের গিটখানা খুলে নিতে হ'লেও তারা নেবে।'

বেহারা ইতস্তত করছে দেখে বাবুরা আবার অট্টহাসি হেসে উঠলেন। তারপর শাসালো গলায় হুকুম দিলেন 'তোদের বধূকে বাহির কর তাঁহার সঙ্গে টাকাপয়সা আছে কিনা আমরা দেখিব।'

"বেহারা কহিল, তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না, তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া বধূর মুখ দেখ।"

এ সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল যেন ছেলেগুলো। একসঙ্গে চারদিক থেকে

ঘেরাটোপে তাদের নির্লজ্জ উদ্ধত হাত পড়ল। মান্য বংশের ছেলে যে!—কিন্তু এ কি? যেন কাল কেউটের গর্তে ভুল করে হাত দিয়ে বসছে ছেলের দল! ভেলভেটের আবরণখানা উঠতেই চোখের বাতিগুলো যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল ওদের। পাল্কীতে শাড়ি-পরা বউটির মুখের দিকে তাকিয়ে কারও চিনতে অসুবিধে হল না যে ইনি দুর্ধর্ষ পেটন সাহেব। চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেটন।

"তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃদকম্প হইল এবং কে কোন দিকে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না। তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া বিচারকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

বেহালার বারোয়ারীতলায় ছদ্মবেশে পেটন সাহেবের এই অভিযানের কারণ একটা পুরানো অভিযোগকে নিজের চোখে পরখ করে দেখা। 'সমাচার দর্পণে' অনেক দিন ধরেই লেখালেখি হচ্ছিল যে, বারোয়ারীর পাণ্ডাদের উপদ্রবে বেহালার পথ দিয়ে চলা ভার হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ, "মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন......স্ত্রীলোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টি মাত্রই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহাদিগের ইচ্ছা-মত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া বেহালানিবাসী যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন।"

পেটন সাহেবের নারীবেশে অভিযান এই সাহসকেই একটু যাচাই করে দেখার জন্যে। বলা বাহুল্য, অতঃপর বেহালার যুবকদের আর সে সাহসের কথা শোনা যায় নি। সাবর্ণ চৌধুরীদের মত, তাদের উত্তরপুরুষদের এই বীরত্ব কাহিনীটিও ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজেপেতে শোনা।

এবার আসুন কলকাতায়।

"সিঙ্গিবাবু সে সময় অফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষেরা চার পাঁচজন তাঁহাকে ঘিরে ধরে 'ধরেছি, ধরেছি বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গেল, সিঙ্গিবাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি—তখন একজন অধ্যক্ষ বললেন, 'মশায়! আমাদের ওমুক জায়গায় বারোয়ারী পূজোয় মা ভগবতী সিঙ্গির উপর চ'ড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন, পথে সিঙ্গির পা ভেঙে গেছে; সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্ছেন না, সেইখানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে, যদি আর কোন সিঙ্গির যোগাড় করতে পার, তাহলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ একমাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথায়ও আর সিঙ্গির দেখা পেলাম না; আজ আপনার দেখা পেয়েছি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না...।"

সিঙ্গিবাবু খুশী হয়ে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য করলেন।

কলকাতার আদায় জবরদস্তির আদায় নয়, কৌশলের আদায়। কোথায়ও জুলুম, কোথায়ও কৌশল। নানা রকমের কৌশল। একটি শুনুন।

"কলকাতার পশ্চিমে শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজায় তাবদ্দ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে সুর্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট একটাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে। যাহার নামে প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।" (সমাচার দর্পণ, ১৮২২)।

বারোয়ারী মানে বারো রকমের কল। পাড়ার কল, ক্লাবের কল, সাহিত্য সংস্কৃতির কল, নাচের কল, পলিটিকসের তথা ইলেকসনের কল। বারোয়ারীর—বারো কল। হুতোম তাই বলতেন—'বারো-ইয়ারি'; সমাচার দর্পণের সম্পাদকরা লিখতেন বার-এয়ারি; আমরা বলি—বারোয়ারী। বলি, 'বারোয়ারী' কিন্তু গলির মোড়ে মোড়ে ফেস্টুন লিখি 'সর্বজনীন'। অর্থাৎ, পুজোটা আসলে বারোজনের ব্যাপার হলেও, কাগজে-কলমে সর্বজনের বলে ঘোষণা করাটাই সঙ্গত মনে করি আমরা। কারণ, যুগটা সর্বজনের। গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের যুগ বলেই চাঁদাটা জনগণকে দিতে হয়, মায় তিরিশ টাকা মাইনের দোকান কর্মচারীকে এবং কমপক্ষে তিন জায়গায়, যদিচ আদায় ওয়াশীল খরচা—বারোজনেরই দায়িত্ব। সে মহাদায়িত্ব বহনের জন্যেই পাড়ায় দ্বাদশ ছেলের ঘাড় এমন বাঁকা। তাঁরা গণতন্ত্রের বাহন। অন্তত, তাঁরা তাই বলেন।—আমরা বলি—বাহন আমরা, আরোহী তারা। তর্ক করলে হয়ত সেই রথ এবং পথের গোল বেধে যাবে। সুতরাং এটা ধরে নেওয়াই ভাল,—আমাদের বিবাদ দেখে গণতন্ত্রের অন্তর্যামী হাসছেন। বারোয়ারী লীলায় তিনি না হেসে পারেন না।

দু' চারটে মাত্র শুনাচ্ছি। এটি চুঁচুড়ার খবর। ১৮৩৭ সনে জনৈক সংবাদাতা লিখছেন, "আমি কলিকাতা ছাড়িয়া চুঁচুড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুর্ভুজা দুর্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন..."। দুর্গার এই দুর্দশার কারণ পূজারীদের মধ্যে দল ছিল দুটো। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী নয়, বৈষ্ণব আর শাক্ত। বৈষ্ণবেরা অহিংস। তারা পুজোয় বলি দিতে দেবে না। শাক্তরা বলি না দিতে দিলে আবার পুজোই করবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বিচার গেল। তিনি বললেন, আগে বৈষ্ণবেরা নিজেদের মত করে পুজো করুক, তারপর শাক্তরা করবে। তাই হল। কিন্তু "এক্ষণে বিসর্জনের বিষয়ে মহা গোল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁতীরা কহে তাহারা অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে। শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারোয়ারী পূজা করিয়াছে—তবে তাহারা এক দলে কেন বিসর্জনের খরচ দিবে।" অতঃপর সংবাদদাতা লিখছেনঃ "এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে।"

দাঙ্গা হবে না, হয়ে গেল। তবে চুঁচুড়ায় নয়, জয়নগর শ্যামপুরে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক বারোয়ারী পূজায় এক অসমন্বিত তাঁতীকে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করায় "জয়নগরস্থ তাবৎলোক এক পরামর্শ হইয়া সে তাঁতীর সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয়পক্ষীয় লোকেরা পরস্পর রাগান্ধ হইয়া লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস খণ্ডপ্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল, তাহাতে অন্য বলিদান ও রক্তপাতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারী পূজাতে বারএয়ারী মারামারি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"

এই প্রসিদ্ধি বোধ হয় আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। বারোয়ারীর সঙ্গে মারামারি দুর্গার সঙ্গে অসুরের মতোই গায়ে গায়ে আসে। তবে উপলক্ষ্য এবং উপচারের একটু রকমফের হয়েছে এই যা। এখন বৈষ্ণব আর শাক্তের বিবাদের স্থানে এসেছে এ পাড়া আর ও পাড়ার বিবাদ, কিংবা এ-ক্লাব আর ও-ক্লাবের রেষারেষি। এবং লাঠির জায়গায় এসেছে সোডার বোতল ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপচার ইত্যাদি।

বারোয়ারী গণতান্ত্রিক ব্যাপার। গণতন্ত্রে যদি দলাদলি চলে, তবে বারোয়ারীতে তা না চলার কোন কারণ নেই। দলাদলি তাই এই সুপ্রাচীন দেশে বারোয়ারীর মতই প্রাচীন। ১৮১৯ সনের খবর শুনুন ঃ "উলাগ্রামে উলাইচণ্ডীতলা নামে এক স্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক দক্ষিণ পাড়ায় মহিষ-মর্দিনী পূজা ও মধ্যপাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তরপাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন আপন পাড়ার পূজা ঘটা করিতে সাধ্য পর্যন্ত কেহই কসুর করে না।"

তবে ঘটায় শান্তিপুরের সঙ্গে কেউ নয়। হুতোম লিখেছেন ঃ "একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারো-ইয়ারি পুজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল। শেষ বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন করতে হয়েছিল, তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মা'র অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষ্যে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোয়ারী পুজো করেন তাহাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।"

চুঁচুড়ার বারোয়ারী দেখতে "লোকের এত জনতা হত যে, কলাপাত টাকায় একখানি বিক্রি হত, চোরেরা আণ্ডিল হয়ে যেত, কিন্তু গরীব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়ত না।"

কিন্তু বনেদীয়ানায় চুঁচুড়া থেকে গুপ্তিপাড়ার খ্যাতি বেশি। কারণ, গুপ্তিপাড়া বারোয়ারীর জন্মস্থান। ১৮২০ সনেরও তিরিশ বছর আগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এখানেই জন্ম নিয়েছিল—বারোয়ারীর গণতন্ত্র। বোধ হয় কলকাতার পাকা ভিতে দাঁত ফুটানো অসম্ভব বিবেচনা করেই গুপ্তিপাড়ার নরম মাটি ফুটে বের হয়েছিল গণতন্ত্রের ধ্বজা। তার গায়ে বারো জনের নাম। এই বারো জন ব্রাহ্মণ হলেও নির্বাচিত প্রধান। গোটা গুপ্তিপাড়ার মুখপাত্র তাঁরা। তাঁদের সহি নিয়ে চাঁদার খাতা হাতে দেশ-দেশান্তরে লোক ছুটলো চাঁদা কুড়াতে। কেউ ফিরল, কেউ ফিরল না। কারও কারও খাতা গেল আবার হারিয়ে। তা হলেও আদায় মন্দ হল না একেবারে। সাত হাজার টাকা। এ টাকায় দশাসই প্রতিমা তো একখানি হলই, গান-বাজনার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। বাংলাদেশের নামিডাকি গানাদার যাঁরা ছিলেন তাঁরা এলেন। এলেন বাঈজীরাও!

চারদিকে গুপ্তিপাড়ার খ্যাতি। বারোয়ারীর জয়ধ্বনি। গুপ্তিপাড়া থেকে বারোয়ারী এল বল্লভপুর, কোন্নগর, উলো, চাকন্দা এবং শ্রীপুর। অবশেষে কলকাতা। কলকাতা এখন বারোয়ারীর মহাপীঠ। এ মহানগরীতে এক-কালে জয়ঢাক বাজত গুটিকয় বনেদী বাড়ির পূজামণ্ডপে, আজ সেখানে চামচিকে আর কবুতরের বাসা। পূজার দায়িত্ব এখন গলিতে গলিতে প্রতি-

জনের। কারণ, কলকাতার পুজো আজ সর্বজনের। এই গলি-ঢালা জনতার আমরাও—এক এক জন। সুতরাং, গণতন্ত্রের নামে কুৎসা রটানোটা আমাদের পক্ষে অনুচিত। তবুও একটা কথা না বলে পারছি না। কথাটা আমার নয়, আমার গলির তেরো নম্বর থেকে তেত্রিশ শ' মানুষের একজনের কথা। সেবার বারোয়ারীর গেটের একপাশে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে জিনিসটা সেটি প্রতিমা নয়—ভলাণ্টিয়ার। ভলাণ্টিয়ার এবং তাদের ক্যাপ্টেন কমাণ্ডাররা তার কাছে যেন প্রতিমার চেয়েও অদ্ভুত! ওদের ওপর চোখ রেখেই সে বলছিল—বাবুদের বাড়ি যখন পুজো হত, তখন দায়িত্বটা ছিল একজনের, আনন্দ সর্বজনের। এখন পয়সার দায়িত্ব সর্বজনের, কিন্তু আনন্দটা বারোজনের নয় কি?

লোকটা জানে না যে, গণতন্ত্রে এটাই রীতি। জানে না, একজনের হাত থেকে মার এই বারোজনের হাতে আসাটা ঘটনা হিসেবে কত ঐতিহাসিক!

পালকী থেকে ট্রাম

"জানিস, ফার্স্ট ক্লাসে তুই যেই উঠলি ওমনি কোম্পানির সব খরচা উঠে গেল কণ্ডাক্টারদের মাইনে সব। তারপর একজন লোক উঠলেও কোম্পানির লাভ।"

"আর সেকেণ্ড ক্লাস?"

"সেকেণ্ড ক্লাস কিচ্ছু না। সেকেণ্ড ক্লাস বোগাস! ওটা ফাঁকা গেলেও কোম্পানির লাভ।"

ট্রাম-ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে বার বছরের এক স্কুল-বয় তার ন' বছরের সঙ্গীকে ট্রাম-কোম্পানি বোঝাচ্ছে। তখনও ধর্মঘট হয়নি। এটা ক মাস আগের কথা।

কিন্তু সেদিনই বুঝেছিলাম ট্রাম বন্ধ হবে। ট্রাম-কোম্পানির লাভ-লোকসান সম্পর্কে বার বছরের ছেলের যা ধারণা, তাতে কণ্ডাক্টাররা না চাইলেও এ শহরে ট্রাম চলবে না। চললেও মাঝে মাঝে থেমে চলবে না। এবং যেখানে 'আবশ্যক হইলে থামিবেক' কথা মাঝে মাঝে সেখানে আবশ্যক না হলেও থামবে।

এবার ঠিক জায়গা মত থামল কিনা তা নিয়ে পাসেঞ্জার কণ্ডাক্টার তর্ক করুন, আপাতত এটা ঠিক যে শহরে ট্রাম নেই। চার শ আটান্নখানা ট্রামের একখানাও নেই রাস্তায়। বিয়াল্লিশ মাইল পথ একেবারে পতিত। কোথাও ঘড় ঘড় নেই, টংটং নেই।

ট্রাম নেই, কিন্তু কলকাতা শহর আছে। কারণ ট্রামের দায়িত্ব এ শহরে যত গুরুতর বলে মনে হয়, আসলে ঠিক ততখানি নয়। কজন লোক ট্রামে চড়ে এ শহর? সেই স্কুলের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে বলবে হয়ত, কয়েক কোটি! সকলের স্কুল-বয় হওয়া ঠিক নয়। কোম্পানির কথাই মেনে নিন। তাঁরা বলেন, ডেলি প্যাসেঞ্জার তাঁদের এক মিলিয়ন।—অর্থাৎ দশ লাখ!

অর্থাৎ যদি ধরে নিই কলকাতা শহরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক আছে এবং যদি মনে করি ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়—তবে তাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ট্রামের উমেদার!

ট্রাম না চললেও তাই শহর চলে। কলকাতা শহর একা ট্রামের পায়ে চলে না। বাস আছে, ট্যাক্সি আছে, ঘোড়া-গাড়ি আছে, রিকশা আছে—তার উপর আছে আমাদের এই সনাতন পদযুগল। সুতরাং ট্রামের সাধ্য কী আমাদের থামায়!

তবুও বাসকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে হতভাগা ট্রামের জন্যে মনটা কেমন করে। সঙ্কল্প করেছি বটে ট্রামের চাকায় জং ধরিয়ে পায়ের কব্জি-গুলোকে লুব্রিকেটেড করব; কিন্তু মনের নজর আমার অন্যদিকে। চোখ তার বাঁধা পড়ে আছে এসপ্লানেডের গুমটিতে। তারে-বোনা সতর্ক মাকড়শার জালখানা একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের মত অষ্টপ্রহর ওত পেতে আছে সেখানে। গুবরে পোকার মত ট্রামগুলো গুটিগুটি নিজে থেকে এসে কবে ধরা দেবে তারই অপেক্ষায়। নিঃঝুম রাত্রির অস্পষ্ট আলোতে চিকচিক করে ইস্পাতের লাইনগুলো। চোখের কোণের জলের মত চিকচিকে লাইন।

বাসের মত ট্রাম ডাঙার পাখি নয়। পথে পথে এর উড়ে চলার ইতিহাসটা —লিখিত ইতিহাস। ইস্পাতে লেখা। টায়ারের প্যাটি-বোনা ছাপ পায়ে পায়ে মুছে যায়, করপোরেশনের জলের তোড়ে ধুয়ে যায় আমাদের মত নাগরিকের ক্লান্ত পায়ের স্বাক্ষরও। কিন্তু ট্রাম থাকে। চোখের সামনে না থাকলেও— মনে থাকে। এ শহরের মনের মাটিতে এর চাকার দাগ—পাকা দাগ। অনেক-দিনের পুরনো, অনেকখানি গভীর।

ঘোড়ার গাড়ির পরেই ট্রাম কলকাতার বনেদী বাহন। এরা দুজনে এক বংশেরই সন্তান। অবশ্য পৃথগান্ন এবং দ্বিতীয়জন অধিকতর সম্পন্ন। ঘোড়ার গাড়ি আর ট্রামে পার্থক্য এই, ট্রামের ঘোড়াগুলো কনডেন্সড্ ঘোড়া। অশরীরী হয়ে তারা লোহার তার হয়ে গিয়েছে। হর্সপাওয়ারে তাদের হিসেব, —আর ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়াগুলো ন্যাচারেলই থেকে গিয়েছে, তাদের হিসেব আজও দানা-পানিতে।

ট্রামও এককালে সাক্ষাৎ ঘোড়ায় টানত। সে খুব বেশী দিনের কথাও নয়। অবশ্য আমাদের আজকের ট্রাম কোম্পানি তখন জন্মায়নি। এদের জন্ম বিলেতে ১৮৮০ সনে। কলকাতায় আসতে লেগেছে এক বছর। আর আমি বলছি ১৮৭৩ সনের কথা।

সে ট্রাম চালিয়েছিলেন—বিলাতী কোম্পানি নয়, বিলাতী সরকার। ভবিষ্যতে আমাদের দেশী সরকারও চালাতে পারেন (অবশ্য ১৯৭২ সনের পরে যদি তাঁরা ইচ্ছে করেন), সুতরাং তাদের ইতিহাসটা শুনে রাখা ভাল।

শিয়ালদহে তখন শিয়ালদের হটিয়ে রেলের আড্ডা বসেছে। আর ব্যবসায়ের আড্ডা তখন গঙ্গার তীরে—চিৎপুর, শোভাবাজার, আহেরিটোলায়। কলকাতা তখন পুরোপুরি ব্যবসায়ীর শহর। অফিস-বাবু নয়, ইষ্টিশনে আর গুদোমে মালপত্তর টানাটানি করাই তখন নগরকর্তাদের সমস্যা। ভারত সরকার তাদের পরামর্শ দিলেন: ট্রাম বসাও, হাঙ্গামা চুকে যাবে। বঙ্গ সরকার বসে বসে তার প্ল্যান কষলেন। প্ল্যান মঞ্জুর হল এবং দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে বসান হল ট্রাম লাইন। একখানা মাত্র মিটারগেজ লাইন! শিয়ালদা থেকে শুরু করে বৌবাজার ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে, কাস্টমস হাউসের ভিতর দিয়ে স্ট্রাণ্ড রোড ধরে আরমেনিয়ান ঘাট অবধি তার সীমা। দু মাইল মাত্র পথ। এদিকে রেল কোম্পানিও বড় ব্যবসাদার। কথা ছিল তারা শহরে ঢুকবে না। কিন্তু শহরে না এলে মালগাড়ি খালি যায় দেখে—পা বাড়িয়ে চলে এল চিৎপুরে। ফলে মালটানা-ট্রাম মালের বদলে মানুষ নিয়েই চলল আরমেনিয়ান ঘাট থেকে শিয়ালদার দিকে।

বেশীদিন চলতে হল না। ১৮৭৩ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২০শে নভেম্বর। মাত্র এ কয় মাসের পরমায়ু নিয়েই জন্মেছিল কলকাতার প্রথম ট্রাম। টুক-টুক করে এ কমাস কোনমতে চলে তারপর গেল বন্ধ হয়ে।

সরকার বললেন: এর জন্যে দায়ী রেল কোম্পানি। তারা মাল টানতে চিৎপুরে এল বলেই না মাসে মাসে আমাদের লোকসান দিতে হল পাঁচ শ টাকা করে। সুতরাং ভারত সরকারের উচিত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া।

ভারত সরকার ক্ষতিপূরণ দিলেন না। ফলে স্থির হল ট্রামের লাইন এবং গাড়ি সব বিক্রি করে দেওয়া হবে। ম্যাকিলিস্টার নামে এক সাহেব কেনা দামে কিনতে রাজীও হলেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কিনলেন বিলেতের মেসার্স পারিস অ্যান্ড সাউদার। তাঁরাই আমাদের আজকের কোম্পানি। এঁদের হাতে কলকাতার রাস্তায় প্রথম গাড়ি চলে ১৮৭৯ সনের ২রা অক্টোবর। এঁদেরও হাতেখড়ি ঘোড়াটানা গাড়িতে। একটি মাত্র সেকশনে মাত্র ছিল স্টীম ইঞ্জিন। দেখতে দেখতে আরও সেকশন খুলে গেল, আরও ইঞ্জিন এল। সরকার তাজ্জব বনে গেলেন—এদের কাজ দেখে। ১৯০০ সনে উনিশ মাইল পথ হয়ে গিয়েছে ওদের। গাড়ি ও স্টীমে ঘোড়ায় মিলিয়ে কম নয়—১৮৬টি। বছরে ১৩০ লক্ষ লোক চাপে এখন ট্রাম। অথচ মাত্র কবছর আগে লোকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল তাদের লাইনটি। একেই বলে ভাগ্য!

কোম্পানির ভাগ্যে কলকাতায় বিজলী এল। ১৯০২ থেকে চলল বিজলী গাড়ি। কবছরের মধ্যে ঘোড়া বিদায় নিল, স্টীম লাগল কাপড় কাচার কাজে। কলকাতার ট্রাম এখন বিজলীর ট্রাম। আধুনিকতম যান। সাড়ে তিন হাজার লোক কাজ করে এর কারখানায়—ড্রাইভার কন্ডাক্টার মিলিয়ে তার ফৌজের সংখ্যা ছ' হাজার।

ছ' হাজার মানুষ আজ ট্রাম চালায়। না চালালে ট্রাম বন্ধ হয়, কিন্তু শহর থামে না।

ছ' হাজার কেন, এগার হাজার কয়েক শ ঠিকা বেহারারও সাধ্যে কুলোয়নি যে, এ শহর থামিয়ে দেয়। কলকাতা থেমে দাঁড়ায়, কিন্তু একেবারে থামে না—এ সত্যটা প্রমাণ হয়েছিল সেদিন। ১৩০ বছর পরে—আজও সে কাহিনীটি শোনার মত। বিশেষত, সেদিনের শিক্ষায় আজও আমাদের উপকারের সম্ভাবনা।

ট্রাম ত পরের কথা, ঘোড়াগাড়ি রিকশা কিছুই নেই তখন কলকাতায়। শহর কলকাতা তখন চলে ঠিকা বেহারার ঘাড়ে চড়ে। পালকি তার একমাত্র বাহন। প্রাইভেট পালকি এবং ঠিকা পালকি।

ইউনিয়ন, ধর্মঘট, এসব কথার তখন জন্মও হয়নি। ১৮২৭ সনের কথা। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ওড়িয়া বেহারারা সব ঘাড় থেকে পালকি নামিয়ে রেখেছে। এগার হাজার কয়েক শ ঠিকা বেহারা। জাত খুইয়ে পালকি বইবে না তারা।

কী ব্যাপার?

কেউ কেউ বললেন, "অনুমান হয় ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক।" ('সমাচার দর্পণ') এটা

বোধ হয় কর্তৃপক্ষের মত। অনুমানের কিছু নেই। এ ধর্মঘটের কারণ তারাই।

'পোলিশ আফিস' থেকে ফতোয়া বের হয়েছে সব ঠিকা বেহারাকে লাইসেন্স করাতে হবে। পালকি বইবার সময়ে সেই লাইসেন্সটি ঝুলিয়ে রাখতে হবে হাতে—আজকের শিয়ালদার কুলিদের মত। এ তাবিজটি আবার সবাইকে কিনতে হবে নিজের নিজের পয়সায়।

'পোলিশ আফিস' ভাড়াও বেঁধে দিল। তাদের বিধানমত এখন থেকে পালকি ভাড়া :—

"সমস্ত দিন ফি—।০ চারি আনা

ইঙ্গরেজি ১৪ ঘড়িতে একদিন গণা যাইবেক

অর্ধদিন—অর্থাৎ ইঙ্গরেজি এক ঘড়ির অধিক পাঁচ ঘড়ির কম—৵০ দুই আনা।"
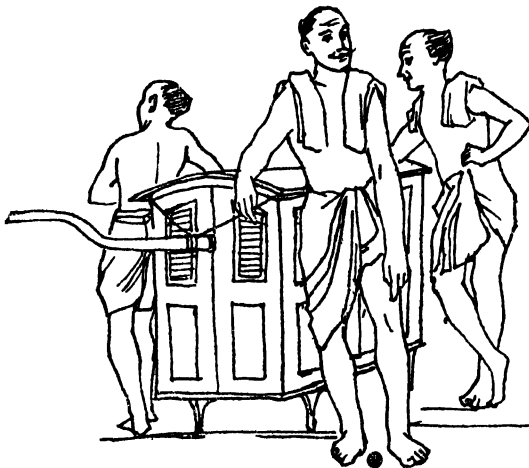
পাল্কী-বেহারা

বেহারাদের ভাড়াও তাই। দিনে চার আনা। চোদ্দ ঘড়ির দিন। অবশ্য "ইতোমধ্যে বিশ্রাম ও জলপানের সমুচিত ছুটি দিতে হইবেক।" আধা দিন হলে মজুরি হবে দু আনা। তবে, "ইঙ্গরেজি এক ঘড়ির কম হইলে ফি বেহারা এক আনা ও ফি পালকির ভাড়া এক আনা পাইবেক।"

বেহারারা দল বেঁধে হাজির হল 'কলকাতার পোলিশ আফিসে'। যাওয়ার আগে তাদের একটা মিটিংও হল ময়দানে (Calcutta plains)। পোলিশ আফিসের কর্তারা তাদের বক্তব্য শুনলেন। তাঁদের তরফ থেকে কিঞ্চিৎ ছাড়লেনও। কথা দিলেন লাইসেন্সের তাবিজটির জন্যে পয়সা দিতে হবে না বেহারাদের। বেহারারা চুপ করে শুনল। "তাহাদের প্রত্যাগমন কালে এমত বোধ হইল যে তাহাদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহাবা সকলেই স্ব-স্ব কর্মে নিযুক্ত থাকিবেক।" কিন্তু ইংলিশম্যানের রিপোর্টে দেখা যায়—লালবাজার থেকে বের হয়েই তারা জমা হল সুপ্রিম কোর্টের

সামনের জমিটায়। এবং সেখানে বেশ হৈ-হট্টগোল হল কিছুক্ষণ। ("They resorted to the meadow before Supreme Court and raised loud clamours") বোধ হয় সরকারী প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হল।

লিখিত কোন প্রস্তাব নেওয়া হল না বটে, কিন্তু পরদিনও দেখা গেল বেহারা অনুপস্থিত। কোন পালকি নেই কলকাতার পথে। কেন থাকবে? রুটির জন্যে জাত খোয়াতে পারে না তারা। হাতে চাক্তি বাঁধা মানে জাত দেওয়া।

কারও কারও কাছে রুটিটা যে জাতের চেয়ে বেশী দামী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সর্দাররা ধর্মঘটের মধ্যেই সবাইকে শাসিয়ে দিয়েছে, যদি কেউ দল ভাঙাও তবে একঘরে হবে।

একঘরে হতে এখনও কেউ রাজী হয় না সহজে। তখনকার কাল ত আরও কঠিন!

শুরু হল তাই বেহারাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আধুনিক ভাষায় শহর কলকাতায় মেহনতী জনতার পয়লা লড়াই।

পাবলিক প্রমাদ গুনলেন। কাগজে কাগজে শুরু হল লেখালেখি।

কেউ লিখলেন, সত্যিই ত, ঘড়ি দেখে মজুরি নিতে গেলে বেচারাদের পোষাবে কেন? "কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহাদের অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতা হইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরে পিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক২ আনা করিয়া পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহাদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে।"

কেউ কেউ কনস্ট্রাকটিভ মত দিলেন। এক ইংরেজী কাগজের মতে "সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের আইন হওয়াতে বেহারাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারাদের ঘড়ী নাই আরোহকদের ঘড়ী আছে এবং ইতর লোক অপেক্ষা মান্য লোকের কথা প্রায় সর্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্য লোক আছেন যে তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পর্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন বেচারা বেহারা তাহাতে বাধ্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু।"

অতএব তাঁদের পরামর্শ "সরকারী ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক২টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পাল্কী ঘাড়ে করিবেক তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পাল্কী নামাইবেক তখন বস্ত্র দ্বারা মুখের ঘাম মুচিয়া পুনবার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনাদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারাদের নিজ খরচ।"

খবরের কাগজের লেখালেখিতে কিছু হল না। এদিকে প্রাইভেট পালকির মালিকরাও পড়লেন বিপদে। দিব্যি চলছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের বেহারাও

বেঁকে বসল একদিন। ঠিকা ভাইদের সমর্থনে তাদেরও ধর্মঘট।

গলা দিয়ে ফুটে না বের হলেও 'শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল কলকাতায়। ঊনবিংশ শতকের কলকাতার রাস্তায়। মনে মনে আশার ঢেউ খেলে গেল ঠিকা বেহারাদের বুকে।

কিন্তু 'মা কলকেত্তাশ্বরী'র মর্জিই ভিন্ন। তিনি যদি কলকাতাকে রাখেন তবে কলকাতাকে থামায় কে?

তাঁরই ইচ্ছেয় সব হয়। ওড়িয়াদের মতিগতি দেখে হিন্দুস্থানী রাউনী বেহারারা সব পার হতে লাগল হাওড়ার সাঁকো। মা কলকেত্তাশ্বরী তাদের ডেকেছেন।

দেখতে দেখতে রাউনী বেহারায় শহর ছেয়ে গেল। ঠিক আজ যেমন বাসে বাসে কলকাতা ভরে উঠেছে, তেমনি।

কলকাতার মনে আরও ছিল। চৌরঙ্গির জনৈক মিঃ ব্রাউনলোকে স্বপ্নে তিনি দেখা দিলেন। কী বললেন তিনিই জানেন। তিন দিন মনমরা হয়ে পড়ে ছিল সাহেব। আপিস যাওয়া হয়নি। সেদিন ঘুম থেকে উঠেই লাগলেন হাতুড়ি বাটালি নিয়ে। পালকিটার নীচে চারটে চাকা জুড়লেন। তারপর সামনের হাতলটায় একটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে—চললেন আপিসে।

কলকাতার রাস্তায় বের হল—ব্রাউন বেরি। নেটিভরা বলে—পালকিগাড়ি। খবরের কাগজে ঘোষিত হল: "কলকাতা নগরে ঘোড়া সকল পাল্কী বাহক হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়াদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।"
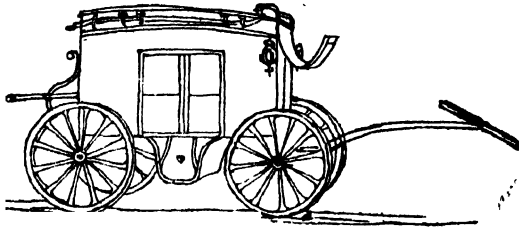
পাল্কী-গাড়ি

এদিকে বেহারারা দেখলে বেগতিক। তারা তৎক্ষণাৎ ছুটে এল যে যার কাজে। ঘাট হয়ে গিয়েছে। আর বিবাদ করবে না তারা। "A meeting was held, rates were fixed, palkees numbered and bearers ticketed returned to their labours".

কিন্তু ততক্ষণে কলকাতা শহর ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর।

তারপর ঘোড়াদের সভা এবং দরখাস্তের আগেই এল একদিন ট্রাম। আজবগাড়ি। বাষ্পে টানে, বিদ্যুতে ঠেলে। অক্ষম ঘোড়ারা তাই নিরুপায় হয়ে চোখ বুজে গাড়ি টানে। ট্রাম-বাসের জন্যে মুখ ফুটে কিছুই বলা হয় না তাদের।

কলকাতার ট্রাম—এ শহরের পথের এই ইতিহাসটিকে বেমালুম ভুলে গেলে, তার বেহারাদের মত ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাসের রাউনী বেহারারা যদি এই বিলেতী উড়েদের চমকে না দিয়ে থাকে তবে বলতে হবে, আটান্ন বছরেও কলকাতার মেজাজ জানতে পায়নি সে।

যে হারে কলকাতাবাসী পদচর্চা শুরু করেছেন কে জানে মা কলকেত্তা-শ্বরীর মনে কী আছে।

বিশেষত, ট্রাম ছাড়া শহর মেলাই আছে ভূমণ্ডলে এবং কলকাতা ভূমণ্ডলের বহির্ভূত নয়। স্বপ্নে একালের ব্রাউনলো সাহেবদের কী শেখাচ্ছেন তিনি, তিনিই জানেন।

ডাক্তার-বদ্যি
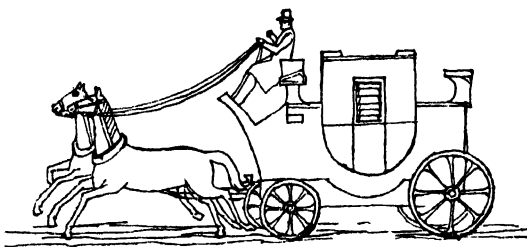
অষ্টাদশ শতকের কলকাতা—সাক্ষাৎ যমপুরী। লোক আসে আর মরে। মরে, তবুও আসে। আসার যেমন বিরাম নেই, মরারও তেমনি শেষ নেই। দিব্যি সুস্থ-সমর্থ জোয়ান ছেলে সন্ধ্যায় নেমেছে চাঁদপালঘাটে। রাত্তিরটাও কাটল না—ভোরবেলাতেই দেখা গেল কলকাতা এ্যাডভেনচারে দাঁড়ি পড়ে গেছে তার। 'The travellers at eve' were in the morning dead.'

কেউ ঠাহর করতে পারল না কি ব্যামো হয়েছিল ছেলেটার। অজানা দেশ। রোগও অজানা। নিঃশব্দে সবাই দেহটাকে বয়ে নিয়ে গেল কবরখানায়। মাটি চাপা দেওয়া হল। কিন্তু একজন তো আর নয়। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এই। লোক আসে মরে। হ্যামিলটন সাহেব লিখেছেনঃ এক বছর আমি কলকাতায় ছিলুম। ওটা ছিল আগস্ট মাস। মিলিটারী সিবিলিয়ান এবং নাবিকে মিলে শ' বারো লোক ছিল শহরে। জানুয়ারীর প্রথমেই দেখা গেল—তার মধ্যেই এ কয় মাসে মৃত্যু রেজিস্টারে নাম উঠেছে চার শ' ষাটজনের!

কলকাতা তাই যমপুরী। ঘুম থেকে উঠে কে বেঁচে আছে কে বেঁচে নেই ঠাহর করা কঠিন এখানে। ইংরেজরা তাই নিয়ম করেছিলেন একদিন মিলতে হবে সবাইকে একসঙ্গে, এক জায়গায়। জায়গাটার কোন ঠিক ছিল না, কিন্তু দিনটি নির্দিষ্ট ছিল—১৫ই নভেম্বর। গ্রীষ্ম-বর্ষার ধকল কাটিয়ে যাঁরা বেঁচে থাকতেন তাঁরা সেদিন সকলে মিলে হিসেব মিলাতেন। কে গেল, কে রইল তারই হিসেব।

লোক মরত। এখনও মরে, তখনও মরত। সাহেব-নেটিভ নির্বিশেষেই মরত। শুধু ভিন দেশের আবহাওয়ায় নয়, কেউ মরত ম্যালেরিয়ায়, কেউ পাক্কা জ্বরে, কেউ রক্ত আমাশায়। সহরের তিন ভাগের দু-ভাগ লোক নাকি ছিল পেটের রোগী। তবে পেটের রোগী নেটিভরা মরত না খেয়ে কিংবা কম খেয়ে, আর সাহেবরা বেশি খেয়ে। এক সাহেব লিখেছেনঃ "বাব্বা, সে-কি খাওয়া! হাড্ডিসার লিকলিকে একটা মেয়ে আড়াই পাউন্ড মুরগীর রোস্টখানা কিনা তুলে ফেলল অক্লেশে!" স্বভাবতই সাহেবরা বেশি মরত কলেরায়। এমনকি কখনও কখনও নেচে নেচেও মরত ওরা। বল্‌নাচ ছিল তখনকার কলকাতার ইঙ্গ-সমাজের একমাত্র আনন্দ, রিক্রিয়েশান। এক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেনঃ "নাচ বটে! বিকেলে সুরু হয়েছে, এখনও বিরাম নেই। সুরার

সঙ্গে অনবরত নেচে নেচে এই শীতের রাতেও ঘেমে উঠেছে মেয়েগুলো। ভোর অবধি চলবে এমনি!"

বলা বাহুল্য—এই অতিরিক্ত আনন্দে কেউ কেউ ভোরের দিকে পরমানন্দের দেশে পেঁাছে যেত। ডাকলেও আর সাড়া পাওয়া যেত না তাদের। যম তাই ওৎ পেতে থাকত এখানে ওখানে। খানার টেবিলের নীচে, নাচের আসরের আড়ালে—পথেঘাটে সর্বত্র।

যমপুরী কলকাতা ছিল তাই ডাক্তারদের কাছে স্বর্গপুরী। এ অলকায় তারা আর আইনজীবীরা ছাড়া আর মানুষ ছিল না। বাদ বাকী যারা ছিল তারা সব দোকানী। কথাটা আমি বানিয়ে বলছি না। শম্ভুচন্দর মুখার্জি তাঁর Mookerjee's Magazine-এ লিখেছেনঃ নেপোলিয়ান ইংরেজদের ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'দোকানীর জাত' (A nation of shop-keeper) কলকাতাকে যদি তেমনি বলা যায় দোকানীর শহর তবে মিথ্যে বলা হয় না। ছোট-বড়, মাঝারি, দেশী এবং বিদেশী দোকানীতে মিলেই ছিল তখনকার শহর কলকাতা। বুদ্ধিজীবী বলতে ছিলেন এই ডাক্তার-বদ্যি আর আইনজীবীরা, এবং বুদ্ধিজীবী বলতে যোগ্যার্থে যা বোঝায় তাই ছিলেন তাঁরা। পাসকরা বিদ্যে নয়, জন্মলব্ধ বুদ্ধিটুকুই ছিল তাঁদের কারবারের ষোল আনা মূলধন। ওটাকে খাটিয়েই রুজি-রুজকার করতেন তাঁরা এবং পরিমাণের দিক থেকে তা যে আজকালের তুলনায় কম ছিল না সেকথা বলাই বাহুল্য।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতার এই ডাক্তার-বদ্যিদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে সুকুমার রায়ের কথা। আমি হলপ করে বলতে পারি, তাঁর 'ছায়ার অষুধে' অতি অল্প-দিনেই নেটিভ মহলে তাঁর পসার এমনি বাড়িয়ে তুলত যে, কবিতা লেখার আর মোটেই সময় পেতেন না তিনি। চাই কি 'আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে' বাঁচবার জন্যে সাহেবরা হয়ত তাঁর দোরগোড়ায় 'তেঁতুল গাছের তপ্ত ছায়ার' জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াত। তাছাড়া, কাগজের রোগী কেটে যেভাবে তিনি হাত মক্‌স করেছিলেন—তাতে 'সারজন' হিসাবেও ও-মহলে তাঁর যথেষ্ট খাতির হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, ডাক্তারী বলতে এর চেয়ে বেশি কোন বিদ্যা তখন চালু ছিল না শহরে। না ব্ল্যাক টাউনে, না চৌরঙ্গী পাড়ায়।

ব্ল্যাক টাউনে চিকিৎসা বলতে ছিল—যা খুশি। কবরেজি, হেকিমি, ফুঁ-ঝাড়া মন্ত্র, তাবিজ-কবচ—সব। দৈব ওষুধ বা স্বপ্নাদ্য ওষুধ, ভালুকের লোম, সাপের চোখ, ধনঞ্জয় পাখীর ঠোঁট—এসবও চালু ছিল আজকের মত। তবে সবচেয়ে বেশী চলত—জ্ঞানোপ্যাথি অর্থাৎ যার যার জ্ঞানমত চিকিৎসা। স্বভাবতঃই বিজ্ঞানসন্ধী সাহেবরা বাতিল করে দিয়েছেন আমাদের নেটিভ চিকিৎসকদের। সাহেব রোগীরা কি করতেন জানি না, তবে সাহেব পণ্ডিতেরা তাই করেছেন। উইলিয়াম জোন্স লিখেছেন ঃ হিন্দুরা এত শাস্ত্র লিখেছেন যা এক জীবনে পড়ে শেষ করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের কেন, প্রাচ্যখণ্ডের কোন ভাষাতেই এমন চিকিৎসাশাস্ত্র নেই যাকে আমরা বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে পারি। অধ্যাপক উইলসন লিখেছেন ঃ In the treatment of disease, the Hindoo writers are essentially deficient.

তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেনঃ—এদের ওষুধ হাস্যকর! ওয়ার্ড সাহেবেরও তাই মত। হিন্দু-বদ্যিরা চিকিৎসা জানে না, তাও বরং কিঞ্চিৎ জানে মুসলমান হেকিমরা।

তা বেশ, না জানুক। ওঁরা নিজেরা কেমন জানতেন এবার শুনুন তার কাহিনী। সাহেব কবিই লিখে গেছেন ঃ

Some doctors in India would make Plato smile,
If you fracture your skull they pronounce it bile,
And with terrific phiz and stare most sagacious,
Give a horse-ball Jalap and pills saponaceous.
Asprain in your toe or an aguish shiver,
The faculty here call a touch of liver,
And with ointment mercuri and pills calomelli
They reduce all bones in your skin to a jelly. ইত্যাদি।

এবার একটু শুনুন তাদের জ্বরের চিকিৎসা বিবরণ। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। ১৮৬৪ সনের একটি হাসপাতালের জনৈক রোগীর চিকিৎসার বিস্তৃত রেকর্ড। রোগীটির নাম ধরুন—মিঃ বি। মিঃ বি'র জ্বর হয়েছে। বিদেশ-বিভুঁয়ে দেখাশুনা করবে কে, তাই হাসপাতালে এসেছে। ৯ই জুলাই সে ভোরে ভর্তি হল। বেলা ১টায় শুরু হল চিকিৎসা। ডাক্তাররা কেউ বিলাতফেরৎ নয়, সব বিলাতজাত। সুতরাং প্রথমেই রোগীর শরীর থেকে রক্ত ফেলে দেওয়া হল এক পাউণ্ড। ঐ দিনই বেলা দুটোয় আর এক পাউণ্ড। তারপর তেল এবং নুনের কি একটা ঘণ্ট খেতে দেওয়া হল। তারপর এ জাতীয় আরও ওষুধ। (ডাক্তারী পরিভাষা আমার জানা নেই। তাই অনুবাদ করা ক্ষান্ত দিচ্ছি।) কোনমতে সেদিনটা চলে গেল। পরের দিন, অর্থাৎ ১০ই তারিখ সকালে খেতে দেওয়া হল ক্যাস্টর অয়েল। তারপরঃ

"At 7 a.m. 16 oz. of blood was taken away and antimonial wine in camphor mixture was prescribed. At noon 18 leeches were applied to the right side; at 9 a.m. the patient was bathed in perspiration and a blister was applied to the epigastrain."

"তবুও দুঃখের বিষয় দুপুরে মারা গেল লোকটা!"

যদি প্রেস্‌ক্রিপশানখানা পড়ে মনে হয় আপনার রক্তপাতের ফলেই মরেছে হতভাগ্য লোকটি তাহলে আজকের কোন ডাক্তার হয়ত তাতে আপত্তি করবেন না। কিন্ত সেকালে হলে মানহানির মামলা দায়ের হয়ে যেতে পারত আপনার নামে। কারণ ওটাই তখন 'বিজ্ঞান', ওই তখনকার চিকিৎসা। কলকাতা তো কোন্ ছার! খোদ ইংলণ্ডেও তখন একই অবস্থা। এখান থেকে বিচারপতি ইম্পে চিঠি লিখেছেনঃ—ক'দিন ধরে একটু জ্বর যাচ্ছে। তবে আশা করছি এবার সেরে উঠব। কারণ, গতকাল রক্তপাত করা হয়েছে।' ওখান থেকে তাঁর পরিবারের লোকেরা আবাব লিখছেনঃ 'অমুককে অমুকদিন ব্লিডিং করান হয়েছে, বেচারা ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছিল কিনা তাই।'

ব্লিডিং আর ব্লিডিং। শুকিয়ে যাচ্ছ?—কেন জান? তোমার গায়ের রক্ত খারাপ হয়ে গেছে তাই। বিজ্ঞান তাই বলে। সের দুই রক্ত ফেলে দাও, দেখবে আবার কেমন মুটিয়ে গেছ। অতঃপর বিজ্ঞানকে আর অস্বীকার করবে কে! শোনা যায়, বায়রণ পর্যন্ত তা করতে পারেন নি। মুমূর্ষু কবি শিয়রে তাঁর ডাক্তারদের দেখে নাকি রেগে বলে উঠেছিলেনঃ There you are, I see a damned set of butchers; take away as much blood as you like and have done with it.

২০ আউন্স রক্ত নিয়েছিল ওরা সেদিন। আর নিয়েছিল স্বয়ং কবিকেও।

তবুও রোগীর অভাব হত না। বরং অভাব ঘটে যেত কখনও কখনও ডাক্তারের। ফলে বিজ্ঞাপন দিয়ে পর্যন্ত ডাক্তার ধরতে হত রোগীকে। ১৭৯৩ সনে একখানা বিজ্ঞাপন তুলে দিচ্ছি। 'নব যৌবন শক্তি' কিংবা 'সিংহ মার্কা জোয়ান মিকশ্চারের' বিজ্ঞাপন নয়,—'ডাক্তার চাই' 'ডাক্তার চাই' আবেদন।

"A person suffering much by corns under his feet, will give one thousand sicca rupees to any person capable of extracting them, to be paid upon the performance of the cure. Enquire No.—83, Zig Zag Lane."

যা হোক্, বিজ্ঞাপন পেয়ে নিশ্চয়ই ডাক্তার এলেন। তাঁর পাল্কী এসে থামল ৮৩ নম্বরের দোরগোড়ায়। কণ্ট্রাক্টের চিকিৎসা। ডাক্তার সেটা জানেন।—'টাকা না হয় দেবেন কণ্ট্রাক্ট শেষ হলে—এখন ফি-টা দেবেন তো?' বালিশের তলা থেকে রোগী বের করে দিলেন ফি। ৬৪টি সিক্কা টাকা, নয়ত এক সোনা-মোহর। গুণে গুণে পকেটে পুরলেন ডাক্তার। —'তারপর, বেহারার মজুরী? বেহারাদের পয়সা দিতে হবে না বুঝি?' ক্ষেত্রবিশেষে ওটাও দিতে হত। আজকালকার মত গাড়ি নয়, পাল্কী ছিল ডাক্তারদের বাহন, ফলে আজকের গাড়ি-ফির মত তখন দিতে হত পাল্কী-ফি! এখানেই শেষ হল না। তারপর ডাক্তারবাবু বললেন—চলুন একজন আমার সঙ্গে ওষুধ আনতে হবে। বলা বাহুল্য, তারও দামও দিতে হবে। মিসেস সোফিয়া গোল্ড বোর্ণ তাঁর 'Hearty House'এ লিখেছেন ঃ

"The extras are enormous, such as a Bolus—one rupee, an ounce of salt, ditto; an ounce of bark,—three rupees; such a lot of these commodities have to be swallowed, that literally speaking you may ruin your fortune to preserve your health."

অর্থাৎ ডাক্তারের এই উপরি পাওনাও কম নয়। এক আউন্স নুন তার কাছে এক টাকা, একটুকরো গাছের ছাল—তিন টাকা। এমনি সব গাদা গাদা জিনিষ গিলতে হবে তোমাকে। মোটকথা—স্বাস্থ্যটিকে বাঁচাতে হলে—বিষয় আশয়ের চিন্তা বাদ দিতে হবে।

কলকাতায় তাই রোগী মারা যেত শেষ অবধি চিকিৎসার অভাবে নয়,—টাকার অভাবে। আর ওদিকে টাকায় গড়াগড়ি যেতেন ডাক্তার-বদ্যিরা। আগেই বলেছি—উকিল-মোক্তার-ব্যারিস্টার আর ডাক্তার-বদ্যি অর্থভাগ্যে এ শহরে বণিক-ব্যবসায়ীর পরেই। এ ব্যাপারে ভাল ডাক্তার আর মন্দ ডাক্তারের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত। অন্ততঃ অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস তাই বলে।

১৭৯৫ সালের কথা। ডিন উইন্ডি বলে এক ডাক্তার এলেন কলকাতায়। এসেই বিজ্ঞাপন ছেড়ে দিলেন তিনি একখানা ঃ নেচারেল ফিলজফি এবং কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা দেব ক'খানা।—এই গোটা পঁচিশ। যার ইচ্ছে শুনতে পার—তবে দশ মোহর করে দক্ষিণা।

ব্যস, তাতে কি? অনেকে ডাক্তারের বক্তৃতা শুনল। ফেরার পথে তাদের সবাই হয়ে গেল ডাক্তার। ২৫খানা বক্তৃতা শুনেছি আর কি? শুরু হয়ে গেল তাদের প্রাক্‌টিস্। ক্রমে পসার। একজন বলেছেন ঃ এই যে আজ যিনি নাড়ী ধরে বসে আছেন আপনার, গতকাল তিনি বসে থাকতেন এমনি জাহাজের দড়ি ধরে। আমাদের প্রিণ্টার-কাম-ডাক্তার—তথা—সাংবাদিক হিকি তার বড় প্রমাণ।

যা হোক, অবশেষে একদিন এ সব ডাক্তারির মৃত্যু ঘোষণা করে দুমদুম করে কেল্লা থেকে গর্জে উঠল তোপ। ১৮৩৫ সনের কথা। কি ব্যাপার? —না মড়া কাটা হচ্ছে মেডিকেল কলেজে। সে বছরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ। বাঙ্গালীর ছেলেরা আজ মড়া কাটল সেখানে। মধুসূদন গুপ্ত আর রাজকৃষ্ণ দে মড়া কেটেছে—তাই এই তোপধ্বনি। কাগজের রোগী নয়, জ্যান্ত মড়া!

তার ক' বছর পর। আবার হৈ-চৈ ব্যাপার। কি হয়েছে? না বাঙ্গালীর ছেলে বিলেত যাচ্ছে। ডাক্তারী শিখবে। চার চারজন বাঙ্গালী তরুণ। শ্বশুরের পয়সায় যাচ্ছে না কেউ। খরচ জোগাচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ, ডাঃ গুডিভ্ আর জনসাধারণ। তিনজনের খরচ দিচ্ছেন তাঁরা দু'জন আর একজনের গোটা কলকাতার মানুষ! ডাক্তার চাই, বিজ্ঞান চাই।

দুশো বছর হতে চলল প্রায়। বহু ডাক্তার দিয়েছে মেডিকেল কলেজ, বহু বিলেতী ডাক্তার বানিয়ে দিয়েছেন শ্বশুরকুল, কিন্তু আজও কলকাতার আনাচে-কানাচে পথে-ঘাটে দেখবেন অষ্টাদশ শতকী সেই ফকির বদ্যিদের। সেই কবচের দোকান, সেই পাখীর ঠোঁট, হাতির পা আর বাঘের চোখের গুদোম, আর স্বপ্নাদ্যের বিজ্ঞাপন। কলকাতা এখনও বলে—তার কাছে বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড় এবং রোগীর চেয়ে পয়সা।

কোম্পানির চিত্রকর

কলকাতা তথা গোটা হিন্দুস্থানে তখন শিল্পীর হাট। ইংরেজ চিত্রকরদের বাজার। ১৭৭০ সাল থেকে ১৮২০—আধা শতক। পুরো পঞ্চাশ বছর। পঞ্চাশ বছরে ষাটজন পেশাদার ইংরেজ শিল্পী এসেছিলেন সেদিন আমাদের দেশে। অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে একজনেরও বেশী!

বলা বাহুল্য, যে কারণে লিণ্ডেন স্ট্রীট থেকে সেদিন কলকাতা অবধি ছুটে এসেছিলেন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা, এঁদেরও সেই এক কারণেই আসা। ব্যবসায়ের কারণে। টাকার জন্য। ভারতবর্ষে তখন কোম্পানীর পাকা কারবার। সুতরাং কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি ওখানে। সিনিয়র জুনিয়র মার্চেণ্ট রাইটার ফ্যাক্টার সবাই লাখপতি। তাছাড়া, ভারতবর্ষ নবাবদের দেশ। ওদেশে ঘরে ঘরে নবাব। তাঁরা সোনার থালায় হীরের ভাত খান। তাঁদের জেনানায় তিন শ' করে বিবি, আস্তাবলে তিন হাজার ঘোড়া। তদুপরি ইংরেজ শুনলেই মূর্ছা যান ওঁরা। কখনও ভয়ে, কখনও পুলকে। সুতরাং ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করতে হয় তো রং-তুলি নিয়ে চল ভারতবর্ষে।

অবশ্য সেকালের ভারতবর্ষে ইংরেজদের এই ব্যাপক চিত্রচর্চার পেছনে অন্য একটি কারণও ছিল। সেটি জানতে হলে আমাদের তাকাতে হবে অপেশাদার শিল্পীদের তালিকার দিকে। সে তালিকা দীর্ঘতর। শিল্পীরা সেখানে সংখ্যায় অনেক। প্রায় অগণিত। তাদের কেউ সিবিলিয়ান, কেউ মিলিটারী, কেউবা আটপৌরে গৃহস্থ-পত্নী। কোন মফঃস্বল কালেক্টার কিংবা সাব-অল্টার্নের ঘরের বউ।

মিসেস লিউইন-এর ছেলে কোম্পানীর ফৌজে কাজ করেন। মা চিঠি লিখছেনঃ "বাছা, আমি আশা করে আছি তুমি ঐ অদ্ভুত দেশের, ওখানকার নেটিভদের, তোমার নিজের এবং তোমার বাংলো, ঘোড়া ইত্যাদির ছবি এঁকে পাঠাবে আমায়।" কোলসওয়ার্দি গ্রাণ্টের মা দেশে। ছেলে কলকাতায়। কলকাতার সচিত্র বিবরণ দিয়ে গ্রাণ্ট চিঠি লেখেন মাকে। সে চিঠি সুন্দর একখানা চিত্রিত বই। (An Anglo-Indian Domestic Sketch.) গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন এমিলি ইডেনের চিঠিও নিজের হাতে আঁকা ছবিতে বোঝাই। পাতায় পাতায় ছবি বিশপ হিবারের নোট বই-এ।

চিত্র-চর্চায় এমনি সার্বজনীন আগ্রহের কারণ—সেকালের ইংলণ্ড। আমরা যাকে লঘুভাবে বলি 'সাংস্কৃতিক',—ইংলণ্ডে তখন সে ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের খুব খাতির। সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদিতে আগ্রহ ছিল তখন মার্জিত

বৈদগ্ধ্যের অঙ্গ। যদি কেউ তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে পা বাড়িয়ে আকর্ষণ দেখাতেন পারসিক, আরবী বা হিব্রুর মত দূরবর্তী কোন ভাষায় অথবা প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্য কিংবা দূর দ্বীপের প্রকৃতিবিজ্ঞানে,—তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেড়ে যেত তাঁর। যেমন গিয়েছিল জোন্স, কোলব্রুক প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের। উইলিয়াম জোন্স ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, উইলকিন্স সিবিলিয়ান, উইলসন মিণ্টমাস্টার। তাছাড়া আরও একটা পরিবর্তন ঘটেছিল সেকালের বৃটিশ দ্বীপে। সেটি মানসিক রুচির। সাজানো ফুটফুটে বাগানের চেয়ে বন্য প্রকৃতিতে তখন বেশী মন মানুষের। লণ্ডনের চেয়ে বেশী আকর্ষণ লেক ডিস্ট্রিক্ট এবং আল্পসের। সালঙ্কার স্থাপত্যের স্থান দখল করেছে তখন সাদাসিধে নতুন ধরনের ঘরবাড়ি। আভিজাত্যের জৌলুস কাটিয়ে শিক্ষিতের মন জুড়ে বসেছে তখন সাধারণ মানুষের জীবনাচার, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম। মোট কথা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইংলণ্ড এক নতুন দেশ। অষ্টপ্রহর সে সুন্দর খোঁজে, নতুন দেখে। কি প্রকৃতিতে কিংবা মানুষের আঁকা পটে। ছবি দেখা তখন তার ব্যামো। ছবি আঁকার নেশা ইংরেজদের মধ্যে মহামারী। যা দেখছি, তা আঁকতে হবে। হয় কলমে, না হয় তুলিতে। অসম্ভব না হলে—দু'য়েতেই। দেখাটা কালচারের লক্ষণ, আঁকা বা লেখাটা তার হাতেনাতে প্রমাণ।

এ ধরনের একটা তৈরি মন নিয়েই অষ্টাদশ শতকের ইংরেজেরা পা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের মাটিতে। উদ্দেশ্য তাঁদের সম্পূর্ণ অন্য। একান্ত সাধারণ। দু'টো পুরো 'মিল', দু গণ্ডা পয়সা। কিন্তু আর যায় কোথা! জনসন—কোম্পানীর নেভির একজন সার্জেণ্ট। ভারতবর্ষের এলায়িত দেহটা চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তারঃ 'দি সিনারী ইজ ট্রুলি রোমাণ্টিক!' লেডি ফকল্যাণ্ড উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেনঃ What bits to sketch! What effects here! What colouring there!....What exquisite foregrounds for Ruysdad or Hobbima! What splendid lights and solemn musky shades for Rembrandt! What brutal filthy clowns for Tiniers!

মিসেস পোস্টানের মনে হয়—প্রতিটি লোক এখানকার যেন তাঁর স্কেচের জন্যেই তৈরি হয়েছে! শুধু মানুষ কেন, ঘটনারই বা অভাব কি ভারতবর্ষে! সতীদাহ আছে, শিকার-চড়ক-মহরম আছে। আছে হিন্দু-মুসলমানের বিয়ের মিছিল, দরবারী নাচ। ক্ষেপে উঠলেন কোম্পানীর শৌখিন শিল্পীরা।

মে মাসের রোদ্দুরকে তুচ্ছ করে মিসেস পোস্টান বেয়ে বেয়ে উঠলেন গুজরাতের এক পর্বতচূড়ায়। জৈন মন্দির আঁকবেন তিনি। সাতদিন কেটে গেল সে কাজে। অগাস্টা ডিন নামে এক মহিলা বাঘ, ডাকাত এবং খরস্রোতা নদীর বিপদকে অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ছবির সন্ধানে। কিছু 'রোমাণ্টিক ভিউ' আঁকতে চান তিনি। ইসা রবার্টস তাঁরও ওপরে। শুধু একটি পেটিকোট আর বনেট চাপিয়ে তিনি চললেন হিমালয়ের পথে। কখনও কোমর অবধি ডুবে যায় বরফে। তবুও ফিরবার কথা ওঠে না। ইমা লিখছেনঃ আমরা আগেই জানতাম এমন ঘটতে পারে। ক্ষুধা, ঠাণ্ডা এবং অনুচরদের বিদ্রোহ বিপদে ফেলতে পারে।

'But our ardour in the pursuit of the picturesque led us to think lightly of such things.'

জনৈক কালেক্টার-গিন্নি ফেনি পার্কাসও এমন একই কারণেই বেপরোয়া-ভাবে দীর্ঘ তেইশ বছর ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতবর্ষে। লেখার মত ছবি আঁকা ছিল তাঁর নেশা।

কেউ কেউ নিছক সময় কাটানোর জন্যেও (to whiling away a solitary hour) আঁকতেন। ফলে আঁকিয়ের আর অভাব ছিল না তখন। ক্যাপ্টেন ইলিয়ট, ক্যাপ্টেন গোল্ড, স্যার চার্লস ডি'ওলি, প্রত্নতাত্ত্বিক জেমস প্রিন্সেপ, উইলিয়াম বেলি, হিবার, এমেলি ইডেন ইত্যাদি মিলিয়ে সে এক দীর্ঘ মিছিল! প্রায় দেড়শ' বছরের ভারতবর্ষের খুঁটিনাটি বিবরণের এক বিচিত্র অ্যালবাম।

অনেক ক্ষেত্রেই এ সব শৌখিন চিত্রীদের ছবির চিত্রমূল্য হয়ত তেমন কিছু নেই। কারণ, সমসাময়িক কেউ কেউ এঁদের আখ্যা দিয়েছেন—নেহাৎ আঁকিয়ে মাত্র, আর কিছু নয়। কারও কারও মতে—এঁদের ছবির 'সব গুণই আছে, নেই শুধু সৌন্দর্য!' (Every merit execpt beauty) সুতরাং এঁরা হচ্ছেন—'mere fashionable screen-sketcher and murderer of the Picturesque !'

তবুও এই সব শিক্ষাহীন, অপেশাদার শিল্পীরা ভারতে ইংরেজ চিত্রকলার ইতিহাস প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। অন্তত আমাদের পক্ষে। অন্যান্য ফলাফলের কথা বাদ দিলেও হাতে-হাতে ক্যামেরার কাজ করে রেখে গেছেন ওঁরা আমাদের জন্য। এঁরা তুলি না ধরলে দেড়শ' বা দু শ' বছর আগেকার কলকাতার চেহারাটাই যে শুধু অস্পষ্ট থেকে যেত আমাদের কাছে তা নয়, অগোচরে থেকে যেত রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঘটনা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের মাঠে-ঘাটে বাজারে দরবারে সাধারণ অসাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবনাচারের অনেকখানি। সেকালের ভারতবর্ষের চাক্ষুষ পরিচয়লাভের আজও যে সুযোগ, তা কিছু পরিমাণে হলেও ঐ সব শৌখিন শিল্পীদেরই কৃতিত্ব।

শৌখিন শিল্পীরা সংখ্যায় অনেক হলেও চিত্রকলার ইতিহাসে স্থান তাঁদের অল্প। কারণ তাঁরা প্রথমত এবং প্রধানত কোম্পানীর কর্মচারী, নেশায় কিংবা অবসরে শিল্পী। ইতিহাস ষোল আনা শিল্পী যাঁরা তাঁরাই গড়েন। কৃতিত্ব অকৃতিত্বের আসল দায় তাঁদেরই। সেদিক থেকে কোম্পানীর আসল শিল্পী স্বাধীন পেশাদার চিত্রকরেরা। ভারতবর্ষের দিকে কোন শৌখিন মানসিক আকর্ষণে নয়, কোম্পানীর সাফল্যে লুব্ধ হয়ে বৈষয়িক কারণেই যাঁরা ছুটে এসেছিলেন এদেশে তাঁরাই কোম্পানীর আসল চিত্রকর। ভারতবর্ষে ইংরেজ শিল্পীর ইতিহাস বলতে বোঝায় তাঁদেরই বিচিত্র জীবন-কথা।

এতরফের ইতিহাসের শুরু ১৬৬৯ সালের জুন মাসে,—মাদ্রাজে টিলি কিটল-এর পদার্পণে; শেষ--১৮২০-তে, জর্জ সিনারীর ভারত ত্যাগে। কিটল থেকে সিনারী অবধি মোট ষাট জন শিল্পীকে ভাগ করতে পারি আমরা তিন ভাগে। অর্থাৎ তিনটি ভিন্ন শ্রেণীতে। টেকনিক্যাল শ্রেণী। তেল রং, মিনিয়েচারিস্ট এবং ওয়াটার কলারিস্ট বা জল রং-এর কারবারী।

প্রথম দলে বিখ্যাতদের মধ্যে আছেন কিটল, জোনান জোফেনি

(১৭৮৩-৮৯), আর্থার ডেভিস (১৭৮৫-৯৫), টমাস হিকি প্রভৃতি প্রখ্যাত ইংরেজ প্রতিকৃতিশিল্পীরা। দ্বিতীয় দল হাতীর দাঁতে মিনিয়েচার আঁকতেন। তাঁদের মধ্যে জন স্মার্ট (১৭৮৫-৯৫), ওজিয়াস হামফ্রে (১৭৮৫-৯৭), স্যামুয়েল এল্ডুস (১৭৯১-১৮০৭), ডায়না হিল (১৭৮৬-১৮০৪), জর্জ সিনারী (১৮০২-২৫) প্রভৃতি খ্যাতিমান। তৃতীয় দল আকারে আর দু' দলের চেয়ে বড়। এ'রা মোটামুটি শৌখিনদের দলেরই সম্প্রসারণ মাত্র। পার্থক্য এই, এই শিল্পীরা শৌখিন নন, শিক্ষিত শিল্পী। এবং মা বা বন্ধুর কাছে লেখা চিঠির অলঙ্করণ নয়, এ'দের ছবির উদ্দেশ্য ছিল—স্বদেশবাসীর ভারত-আগ্রহকে কিঞ্চিৎ পয়সার মূল্যে মিটানো। এই শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন উইলিয়াম হজেস (১৭৮০-৮৩) এবং দুই ড্যানিয়েল—টমাস ড্যানিয়েল এবং তাঁর ভাইপো উইলিয়াম ড্যানিয়েল।

*

টিলি কিটল লণ্ডনেও জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। তাঁর প্রতিকৃতিকে অনেক সময় লোকে ভুল করত জোশুয়া রোনাল্ডের বলে। স্বভাবতই কাজের অভাব ঘটত না তাঁর। তবুও কিটল কোম্পানীর কাছে অনুমতি চাইলেন ভারতবর্ষে আসার। কোম্পানী ছাড়পত্র দিলেন তাঁকে। কিটল এসে নামলেন মাদ্রাজে। দু'বছর সেখানে থেকে লক্ষ্ণৌ-এ সুজাউদ্দৌলার দরবার। সুজাউদ্দৌলার একটি প্রতিকৃতি আঁকলেন তিনি। এক হাজার গিনিতে মিসেস হেস্টিংস সে ছবি কিনে উপহার দিলেন নবাবকে। পরবর্তীকালে ক্রিস্টির নীলাম-ঘরে সাত গিনিতে বিক্রী হয়েছিল সেটি! সুতরাং সহজেই বোঝা যায় কেন লণ্ডনের খাতির ছেড়ে কিটল পাড়ি জমিয়েছিলেন এই দূর দেশে। ১৭৭৩-এ কিটল চলে এলেন কলকাতায়। তিন বছর পরে দেশে ফিরে যাওয়া অবধি এখানেই ছিলেন তিনি। কলকাতায় তাঁর ফি ছিল চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। সুতরাং রাজার হালে থাকতেন। শোনা যায়, এ শহরে তাঁর বিবিও ছিল একটি। অবিবাহিত স্ত্রী। তার দুটি ছেলেমেয়েকে ইচ্ছেমত বকশিস্ দিয়ে কিটল যখন দেশে ফিরেছেন তখনও তাঁর পকেটে রাশি রাশি টাকা। এ টাকায় একখানা বাড়ি করলেন তিনি, আর করলেন বিয়ে। তারপরই শুরু হলো দুর্ভাগ্য। ১৭৮৬-তে শোনা গেল কিটল দেউলে এবং অর্থের সন্ধানে আবার দেশ ত্যাগ করেছেন। এবারও পূবের পথে। হয়ত কলকাতায়ই ফিরে আসতেন কিটল। কিন্তু মেসোপোটেমিয়ার মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে এলিপো এবং বসরার মাঝামাঝি কোন জায়গায় জীবনাবসান ঘটে তাঁর। ঠিক কোথায় বা কবে তা আজও জানা যায়নি।

কিটলের সাফল্য দেখে জোফেনিও দরখাস্ত করলেন কোম্পানীর কাছে। আমাকে অনুমতি দাও, আমিও যাব ভারতবর্ষে। দিন যায় কিন্তু উত্তর আর আসে না। অবশেষে জানা গেল কোম্পানী খারিজ করে দিয়েছেন তাঁর আবেদন-পত্র। পুরো নামঞ্জুর নয়, কোম্পানীর বক্তব্য ঃ যেতে পার তবে আমাদের কোন জাহাজের যাত্রী হিসেবে নয়। অর্থাৎ সাদা কথায় যেতে পার না। কারণ ভারতবর্ষে কোম্পানীর মনোপলি কারবার। সুতরাং ইংলণ্ড থেকে কোম্পানীর জাহাজ ছাড়া সে দেশে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

জোফেনি কৈফিয়ত চাইলেন না, তিনি অপেক্ষা করে রইলেন। তাঁর দেহে বোহেমিয়ান রক্ত। জাতিতে তিনি জার্মান, যদিও তাঁর বাস ইংলণ্ডে এবং জাতীয়তায় তিনি পুরো ইংরেজ। তিনি দিন গুনতে লাগলেন।

অবশেষে ১৭৮৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় 'গর্ড ম্যাকার্নে' জাহাজের ক্যাপ্টেন আবিষ্কার করলেন, তাঁর জাহাজে জোহান জোফেনি নামে একটি লোক ছিল, সে এখন নেই। কোথায় গেল সেই রহস্যময় যাত্রী!

পকেটে কোম্পানীর টিকিট ছিল না বলেই জোফেনি পালিয়ে নেমে গিয়েছিলেন ডায়মণ্ডহারবার থেকেও কুড়ি মাইল দূরে—খেজুরীতে। অবশেষে কলকাতা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর রাজধানী বিনা প্রশ্নে লুফে নিল তাঁকে। গভর্নর জেনারেল চীফ জস্টিস প্রভৃতির সঙ্গে খানাপিনায় চাপা পড়ে গেল ছাড়পত্রের প্রশ্ন। বিশেষ বিশেষ শিল্পীদের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন উঠত না তখন বড় একটা। আর্থার ডেভিডও পেছনের দরজা দিয়েই ঢুকেছিলেন। কর্তৃপক্ষ বললেন—তুমি শিল্পী ঘটে, কিন্তু কোম্পানীর অনুমতি না আসা অবধি আপাততঃ তোমার ছবি আঁকা বারণ। তবুও দশ বছর এদেশে ছবি এঁকে গিয়েছেন ডেভিড। ইচ্ছে ছিল 'দি আর্টস ম্যানুফ্যাকচার এণ্ড এগ্রিকালচার ইন বেঙ্গল' নাম দিয়ে ছবির একখানা অ্যালবামও বার করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর টাকার অভাবে হয়ে ওঠেনি তা। ১৭৯৫-তে ডেভিড ফিরে গেলেন দেশে। ইতিমধ্যে কোম্পানীর অনুমতি কিন্তু আসেনি তখনও।

আসলে শিল্পীদের সম্পর্কে কোম্পানী তত কড়া ছিলেন না বলেই মনে হয়। বস্তুত একবার স্পষ্টতই তাঁরা বলেছিলেন ঃ শিল্পীদের ভারতবর্ষে যেতে দিতে আমাদের আপত্তি নেই, আপত্তি শুধু এই জন্যেই, যে শিল্পী পরিচয়ের আবরণে দুষ্ট লোকেরাও তো চলে যেতে পারে ওদেশে। স্বাধীন ব্যবসায়ীদের ভীষণ ভয় করতেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টররা।

যাহোক, এদিকে জোফেনিকে পেয়ে কলকাতা মহা খুশী। কারণ, জোফেনি ইংলণ্ডের নামজাদা শিল্পী। তিনি গেরিকের বন্ধু। তাঁর পৃষ্ঠপোষণায় লণ্ডনের বনেদী পাড়ায় জোফেনির তখন ভীষণ খাতির। রয়াল একাডেমি অব আর্টস-এর জন্ম থেকেই তিনি তার সদস্য। রাজা তৃতীয় জর্জ নিজে ছত্রিশজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের তালিকায় জুড়ে দিয়েছিলেন জোফেনির নাম।

সুতরাং একাডেমিসিয়ান জোফেনির ইজেলের সামনে এসে বসলেন—গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস, লাটগিন্নি মিসেস হেস্টিংস, প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে প্রমুখ কলকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বড় মানুষেরা। ছবি করানোর এই তো সুযোগ। মিসেস হেস্টিংস অবশ্য ঠোঁট বাঁকালেন। তাঁর তত ভালো লাগল না নিজের ছবিটা। ভঙ্গীটা যেন কেমন নাটুকে—থিয়েট্রিক্যাল পোজ। কিন্তু রাশি রাশি খদ্দের জুটে গেল হেস্টিংস-এর ছবির। মূল ছবির নয়, তার প্রিণ্ট-এর। ক্যালকাটা গেজেটে (২৯শে জুলাই, ১৭৮৪) জনৈক এনগ্রেভার জানাচ্ছেন ঃ জোফেনরি আঁকা হেস্টিংস-এর বিখ্যাত ছবির প্রিণ্ট বিক্রির জন্যে তৈরী তাঁর কাছে। 'প্রতিটি ছবি বাঁধানো এবং জেল্লা দেওয়া। দাম মাত্র দুই গোল্ড মোহর।'

তার ক'দিন পরেই কাগজে বের হলো জোফেনির দ্বিতীয় সংবাদ। সেণ্ট

জন চার্চের অল্টারপিসের জন্যে 'শেষ ভোজ' বা 'লাস্ট সাপারের' ছবি আঁকছেন তিনি, দ্রুত এগিয়ে চলেছে সেই কাজ।

সেণ্ট জন চার্চ নিয়ে যেমনি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল তেমনি উত্তেজনা কলকাতায় জোফেনির ছবি নিয়ে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি চার্চ কর্তৃপক্ষকে উপহার দিলেন ছবিখানা। পরের জুনে চার্চের উদ্বোধন। স্বভাবজ গাম্ভীর্যের সঙ্গে জোফেনির উপহার গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষ বললেনঃ

"We should do a violence to your delicacy were we to express or endeavour to express in such terms as the occasion calls for our sense of the favour you have conferr'd upon the settlement by presenting to their place of worship so capital a painting that it would adorn the first church in Europe, and should excite in the breasts of its spectators those sentiments of virtue and piety which are so happily portrayed in its figure.

কিন্তু ছবির মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে কলকাতার লোকেদের ধারণা হলো অন্য। প্রতিটি মানুষকে পরিষ্কার চিনতে পারলেন তাঁরা। —ঐতো প্রভুর আসনে বসে আছেন গ্রীক বিশপ পার্থেনিও! আরে, জুডাস তো দেখছি আমাদের মিঃ টুলা। টুলা (Tulloh) তখন কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা ব্যবসায়ী। ইউরোপিয়ান সওদা কিনতে হলে যেতেই হবে তাঁর দোকানে, নিলাম ঘরে! প্রচুর পয়সাওয়ালা লোক তিনি। কি জানি, কি মনে করে জোফেনি কুখ্যাত জুডাসের ভূমিকা দিলেন তাঁকে! অথচ আশ্চর্য এই, টুলা আগাগোড়া জানেন—জোফেনিকে সাধু জনএর ছবির জন্যেই সিটিং দিচ্ছেন তিনি! আর এখন, কোথায় এপস্‌ল জন্ আর কোথায় জুডাস ইসক্রাইস্! লোকেরা মুখে রুমাল দিয়ে হাসে বটে, কিন্তু মিঃ টুলা রেগে আগুন! জনশ্রুতি এই, জোফেনির বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও নাকি দায়ের করেছিলেন তিনি!

এক বছরও হয়নি জোফেনি কলকাতায় নেমেছেন। এরই মধ্যে এত কাণ্ড! কলকাতা ছেড়ে জোফেনি এবার হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে চললেন লক্ষ্ণৌ। যাওয়ার আগে গভর্নর জেনারেলের টানা পাখাটির দু'দিকে দুটি ছবি এঁকে দিয়ে গেলেন। শিকারের দৃশ্য। এ দুটোও জোফেনির উল্লেখযোগ্য কাজ।

লক্ষ্ণৌতে আসফউদ্দৌলার দরবার অভিযাত্রী বিদেশীদের স্বর্গ। নবাবের রাজনৈতিক এবং সামরিক উপদেষ্টা তখন বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী জেনারেল ক্লাউড মার্টিন। চার চারটি বিবি, অগণিত দাসদাসী নিয়ে দ্বিতীয় নবাবের মত থাকেন তিনি। পুরো সাত দিন লেগে যায় তাঁর বাড়িখানা ভালো করে দেখতে। সে এক যাদুঘর! জোফেনির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ফরাসী সাহেবের। দু' বছর ছিলেন তিনি ওখানে। হাজার টাকা ফি তাঁর। কিন্তু তবুও কাজের অভাব নেই। ১৮১০ সালে মার্টিন মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি যখন নিলাম হয়—তখন তার মধ্যে একা জোফেনির ছবিই ছিল চল্লিশখানা!

জোফেনির অন্যতম বিখ্যাত ছবি হচ্ছে 'হাইদরবেগ এম্‌বেসি' (The Embassy of Hyderback) অযোধ্যার উজির সদলবলে কলকাতায় আসছেন লর্ড কর্নওয়ালিশের সঙ্গে দেখা করতে। পথে পাটনায় সহসা ক্ষেপে উঠল হাতী। মাহুত তার শুঁড়ে। পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অসহায় আরোহীরা। বিরাট নাটকীয় ছবি। জোফেনি সহ সবশুদ্ধ সাঁইত্রিশটি চরিত্র আছে ছবিটিতে। প্রত্যেকটি চরিত্র ভিন্ন। কিন্তু জীবন্ত।

'৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে লক্ষ্ণৌ থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায় ছবিটি। বহুদিন পরে—Wight দ্বীপের একটি কুটিরে আবার আবির্ভাব ঘটে তার। স্যার রাজেন মুখার্জির অর্থে এবং আগ্রহে অবশেষে আজ এটি কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্পত্তি।

জোফেনি ভারতবর্ষে ছিলেন মাত্র সাত বছর! সাত বছরেই দশ হাজার পাউণ্ড জমিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে ১৭৯০ সালে দেশের পথে জাহাজে চড়লেন শিল্পী। এবার একটি ফরাসী জাহাজে। পথে আন্দামানে জাহাজডুবি হলো। জীবন বাঁচাতে গিয়ে জোফেনিরা মৃত সৈনিকের দেহে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। কিন্তু আসলে সেটা গল্প বলেই অন্যদের ধারণা। তাহলে গাদা-গাদা ছবি নিয়ে লণ্ডনে নামতে পারতেন না তিনি। অথচ জোফেনি নিজে বলেছেন ভারতবর্ষ থেকে নিজের আঁকা বহু ছবি নিয়ে ফিরেছেন তিনি!

ক'বছর পরে আবার এদেশে আসার কথা ওঠে তাঁর। কোম্পানীর কাগজপত্র বলে জোফেনিকে ভারতবর্ষে ফিরবার অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁরা ১৭৯৮ সালের মার্চে।

বিনা অনুমতিতেই এককালে কলকাতায় নেমেছিলেন জোফেনি। কিন্তু এবার অনুমতি পেয়েও আর আসা হলো না তাঁর। কারণ তিনি তখন প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ। ১৮১০ সালে মিডলসেক্স-এ পরিণত বয়সে মারা যান তিনি।

*

জোফেনির পরে এদেশে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অধিকাংশই মিনিয়েচার শিল্পী। তৈলচিত্রের চেয়ে হাতীর দাঁতের ওপর চিকন কাজ বা মিনিয়েচারই ভারতবর্ষে তখন চলতো বেশি। যদিও চিত্রশিল্পের এই বিশেষ শাখায় আমাদের দেশের ঐতিহ্য অনেক দিনের, তবুও তৎকালের ইংলণ্ডেও এ কাজে শিল্পীর অভাব ছিল না। হিলার্ড ছিলেন সেকালের নামজাদা মিনিয়েচারিস্ট।

নানা কারণে ভারতবর্ষে তখন মিনিয়েচারের বাজার। মিনিয়েচার কোম্পানীর কর্মীদের ফ্যাসান। সাহেবেরা মিনিয়েচারে টেবিল সাজান, বিবিরা গলায় মিনিয়েচারের লকেট পরেন! এটাই স্টাইল।

বিলেত থেকে কলকাতায় প্রথম মিনিয়েচার-শিল্পী যিনি আসেন তিনি একজন ইহুদি মহিলা। নাম—ইসাকস। কলকাতায় পেঁছান তিনি ১৭৭৮ সালে। কিন্তু এক বছরও আঁকা হয়নি তাঁর। নামতে না নামতেই কোম্পানীর একজন সম্পন্ন কর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ছবি আঁকাও।

তারপর এলেন—হামফ্রে। বিখ্যাত ওজিয়াস হামফ্রে। হামফ্রে ভারতে আসেন ১৭৮৫ সালে। সে বছরই বোম্বাইতে নামলেন—জন স্মার্ট। হামফ্রে গরীবের ছেলে। বাবা ছিলেন লেস-ব্যবসায়ী। একটা মদের দোকানও ছিল তাঁর। কিন্তু বছরে বিক্রি ছিল মোটে দু'তিন পিপে! সুতরাং 'টাকা' 'টাকা' জপতে জপতে হামফ্রে এসে নামলেন কলকাতায়। সৌভাগ্যক্রমে গভর্নর জেনারেল ম্যাকফারসন স্বয়ং পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর। পনের দিনের মধ্যেই তাঁর আনুকূল্যে হামফ্রে দেশে তাঁর ভাইপোকে লিখলেন—"এরই মধ্যে ২০০ পাউন্ড করে ফেলেছি। দু' বছরে নির্ঘাত পাঁচ হাজার পাউন্ড করব আমি।"

তখনকার সময়ে হামফ্রে যে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছিলেন—এমন কথা বলতে পারি না আমরা। জোফেনির কথাতো আগেই বলেছি। চার্লস স্মিথ নামে একজন শিল্পী ক'বছরে কুড়ি হাজার পাউন্ড নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। টমাস হিকিও কম করেননি। তাঁর চার্জ ছিল—২৫০ পাউন্ড। কলকাতা এবং মাদ্রাজে ক'বছরে অনেক রোজগার করেছেন তিনি। প্রথমবার দেশে গিয়ে আবার ফিরে আসেন ভদ্রলোক। এরপর আর ফেরা হয়নি। মৃত্যু অবধি চব্বিশ বছর এদেশেই কাটিয়ে গেছেন সপরিবারে। তাঁর সমসাময়িক শিল্পী উইলসন জমিয়েছিলেন পনের হাজার পাউন্ড! জন টমাস সিটনের পকেটে ছিল—বারো হাজার পাউন্ড। কলকাতায় তখনকার দিনে তেত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি করেছিলেন এই শিল্পীটি।

সুতরাং হামফ্রে অত্যধিক কিছু কামনা করেন নি। বিশেষতঃ তিনি সমর্থ শিল্পী। মিনিয়েচারের জন্য তাঁর মজুরী ছিল—পাঁচ শ' সিক্কা টাকা, আর বড় ছবি হলে হাজার! তাও দিব্যি কাজ পান। পাঁচশ টাকা তাঁর বাড়ি ভাড়া।

এমন সময় ম্যাকফারসন পরামর্শ দিলেন—তুমি লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে এস। দেখবে, বেশি টাকা পাবে। আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি নবাবকে। হামফ্রে বললেন—কলকাতায় সপ্তাহে হাজার টাকা রোজগার আমার। লক্ষ্ণৌতে কি তেমন হবে? ম্যাকফারসন বললেন—কেন হবে না, যাও না তুমি একবার।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ-এ এলেন হামফ্রে। জোফেনি তখনও সেখানে। মাদ্রাজ থেকে এসেছেন স্মার্টও। তবুও গভর্নর জেনারেলের চিঠি। খাতিরে কোন ত্রুটি দেখালেন না নবাব। তিনি হামফ্রেকে সিটিং দিলেন। মোট পাঁচখানা ছবি হলো।

কিন্তু গোলমাল বাধলো তার দাম নিয়ে। লক্ষ্ণৌ পেঁছেই হামফ্রে চিঠি লিখেছিলেন ম্যাকফারসনকেঃ ছবিতো আঁকছি, টাকার কি হবে? ম্যাকফারসন অভয় দিলেন—টাকার জন্যে ভেবো না, কাজ করে যাও।

—এবার কাজ শেষ হয়েছে। টাকা দাও। নবাবের কাছে বিল উপস্থিত করলেন হামফ্রে। সাড়ে তেইশ সপ্তাহ আছেন তিনি লক্ষ্ণৌ। সপ্তাহে হাজার টাকা করে ধরলে তাঁর প্রাপ্য দাঁড়ায় সাড়ে তেইশ হাজার টাকা। হামফ্রে এর দ্বিগুণ চান। তাঁর দাবী সাতচল্লিশ হাজার টাকা। আরকটের দরবারে এই কায়দায়ই নাকি বিল করতেন উইলসন। এটাই রীতি।

নবাব আপত্তি করলেন না। পাঁচ হাজার টাকা তক্ষুনি দিয়ে দিলেন

তাঁকে। আর বাকী বিয়াল্লিশ হাজার টাকার জন্যে দিলেন একখানা হ্যাণ্ডনোট। আসছে ফসলী মরসুমে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

হামফ্রে বদমেজাজী শিল্পী ছিলেন। তিনি ক্ষেপে গেলেন। কলকাতায় এসেই আদালতে নালিশ করে বসলেন তিনি ম্যাকফারসনের নামে। ক্ষতি-পূরণের মোকদ্দমা। যদিও সরকারী ডাকের পাল্কীতেই লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন তিনি তবুও রাহাখরচ ধরলেন বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। তার উপর ছবির মজুরী, বাকী টাকার সুদ ইত্যাদি মিলিয়ে বিরাট দাবী তাঁর। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমায় হেরে গেলেন তিনি। উল্টো এবার ম্যাকফারসনকে টাকা দিতে হয় তাঁর। অবশ্য ম্যাকফারসন সে টাকা দাবী করেন নি। হামফ্রের ঔদ্ধত্যকে উদারতায় ক্ষমা করেছিলেন তিনি।

তবুও আর কলকাতায় থাকা হলো না তাঁর। ইতিমধ্যে নতুন প্রতিযোগী একজন আবির্ভূত হয়েছেন শহরে। তিনি মিসেস ডায়েনা হিল। দুটি শিশু-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বিধবা হিল কলকাতা নামা মাত্র হামফ্রে দেশে চিঠি লিখলেন—'All the male artists of England are better than this female. দেখবে, এবার চুটিয়ে কারবার করবে এই মহিলা।'

কথাটা সত্য। ডায়না হামফ্রের ছেড়ে যাওয়া বাড়িটাই ভাড়া নিলেন। হু-হু করে বেড়ে চললো তাঁর পসার। ক্রমে বেঙ্গল নেটিভ আর্মির একজন অফিসারের সঙ্গে আবার বিয়েও হলো তাঁর।

হামফ্রে তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায়। ক'বছর আগে রয়াল একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু চোখের অবস্থা ভাল নয়। তবুও রাজার একজন প্রতিকৃতি (crayon) শিল্পী হিসাবে কোনমতে হয়ত দিন চলে যেত তাঁর। কিন্তু ছিটগ্রস্ত হামফ্রে এখন প্রায় উন্মাদ। হিকির সঙ্গে রাস্তায় দেখা। অবাক হয়ে হিকি দেখেন—হামফ্রের গায়ে শার্টের ওপর ছ'খানা ওয়েস্ট কোট, তার ওপর আবার কোট! —কি ব্যাপার! না, ডাক্তার নাকি তাঁকে বলেছে একমাত্র এভাবে গরমে থাকতে পারলেই তাঁর পেটের ব্যামো সারবে। শেষ পর্যন্ত অন্ধ অবস্থায় ১৮১০ সালে মারা গেলেন হামফ্রে।

মরার আগে ভাইপোকে ডেকে বললেন—তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে ছুটে গিয়ে 'সান' কাগজের এডিটর মিঃ টেলারকে দিয়ে আসে খবরটা। আর বেঞ্জামিন ওয়েস্টকে। ওঁরা নিশ্চয়ই অখ্যাত অবস্থায় মরতে দেবেন না ওঁকে!

হামফ্রে চলে যাওয়ার পর কলকাতায় সবচেয়ে জনপ্রিয় মিনিয়েচারিস্ট হয়ে দাঁড়ান রবার্ট হোম আর মিসেস ডায়না হিল। হোম সাহেবও জোফেনির মত পালিয়েই এসেছিলেন ভারতবর্ষে। এতকাল তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল মাদ্রাজ। মাদ্রাজে পাঁচ বছর কাটিয়ে হোম চলে এলেন কলকাতায়। তখনকার কলকাতায় তিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিক। এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। সোসাইটি প্রধানদের অনেক ছবি এঁকেছেন হোম। তার কিছু কিছু আজও রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। শোনা যায়, হোম সাহেবের বাঁ হাতখানা ছিল সম্পূর্ণ অবশ। ছোটবেলায় অসুখে সেটি নষ্ট

হয়ে যায়। হোম নাকি বলতেন—'এতে সুবিধেই হয়েছে আমার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি রং-এর প্লেট ধরে রাখতে পারি। হাতে ব্যথা ধরে না।'

ভালই চলছিল হোমের কাজকর্ম। এমন সময় কলকাতায় এসে হাজির হলেন জর্জ সিনারী। সিনারী ভারতবর্ষে শেষ বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে হোম চলে গেলেন লক্ষ্ণৌ। নবাবের কাজ নিলেন। চৌদ্দ বছর ছিলেন তিনি ও-কাজে। তারপর ১৮৩৪ সালে ৮২ বছর বয়সে লক্ষ্ণৌতেই শেষ নিঃশ্বাস পড়ে তাঁর। হোম বিয়াল্লিশ বছর ছিলেন আমাদের দেশে।

সিনারীও একেবারে কম দিন ছিলেন না। মাদ্রাজ আর কলকাতা মিলিয়ে প্রায় একুশ বছর ছিলেন তিনি ভারতবর্ষে। তার মধ্যে পনের বছর কলকাতাতেই।

সিনারীর বাবা ছিলেন ভারতপ্রবাসী। মাদ্রাজে তাঁর একটা কারখানা এবং এজেন্সি হাউস ছিল। ১৮২২ সালে সে সব উঠে যায়। তার বহু আগেই বিলেত থেকে তরুণ চিত্রকর পুত্র জর্জ এসে যোগ দিয়েছেন বাবার সঙ্গে। এটা ১৭৯৭ সালের প্রথম দিককার কথা। দু'বছর পরে মাদ্রাজেই আর এক শিল্পীর বোনকে বিয়ে করেন তিনি। বিয়ের তিন বছর পর ফিরে গেলেন স্বদেশে। রয়াল একাডেমিতে সে বছর প্রদর্শিত হলো তাঁর ছবি। কিন্তু সিনারী সে বছরই আবার ফিরে এলেন মাদ্রাজে। কোম্পানী আপত্তি জানিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সিনারী সে আপত্তি শুনলেন না। ভারতবর্ষে তাঁর পরিবারের ব্যবসা আছে। সুতরাং ওদেশে তিনি যাবেন বৈকি!

যা' হক, ক'বছর মাদ্রাজে কাটিয়ে সিনারী চলে এলেন কলকাতায়। সেটা ১৮০৮ সালের কথা। দু'বছর কলকাতা থেকে চলে গেলেন ঢাকা। সেখান থেকে দু'বছর পরে আবার কলকাতা।

কলকাতায় তাঁর স্টুডিও ছিল "eastward of Mrs. Fairlie, Ferguson & Co." স্যার চার্লস ডি'ওলি ছিলেন তাঁর ছাত্র। ঢাকায় কালেক্টার থাকা কালে সিনারীর কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন তিনি। ডি'ওলির মতে সিনারী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পী (A best liner of the land). তিনি একটা সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন গুরুদেবের স্টুডিওর।

ঘরভর্তি এদিক-ওদিক ছড়ানো রং, স্কেচ-বুক, উকিলের চিঠি, নেমন্তন্নের চিঠি। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই হুঁকো টানতে টানতে একমনে কাজ করেন সিনারী। কখনও কোন ছবির মুখখানা হওয়া মাত্রই নতুন ক্যানভাসে হাত দেন। কখনও যা আঁকেন তা আবার নষ্ট করে ফেলেন নিজে ইচ্ছে করেই। একটু খ্যাপাটে ধরনের মানুষ ছিলেন সিনারী। ইয়া লম্বা চুল ছিল তাঁর মাথায়। ঝুঁটি করে হাড়ের চিরুণী দিয়ে শিখদের মত চুল বাঁধতেন তিনি। খেতেনও নাকি প্রচুর। তবে মদ বাদ দিয়ে। সিনারীর নেশা ছিল তামাক।

পাগলাটে ধরনের মানুষ হলেও সিনারীর কাজের অভাব হতো না। বছরে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করতেন তিনি। খরচের হাতও ছিল তেমনি। নিজের হিসেবেই ১৮২২ সালে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ হাজার পাউন্ড!

সুতরাং আর কলকাতা নয়। সিনারী প্রথমে পালিয়ে গেলেন ডেন-রাজ্য শ্রীরামপুরে, তারপর আরও দূরে,- পর্তুগীজদের ম্যাকাও দ্বীপে। উদ্দেশ্য ঋণ এড়াবেন, এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীকেও। বিলেত থেকে সে মহিলা এসে চার বছর আগে কলকাতায় এসে ধরে ফেলেছেন ওঁকে।

তিনি ম্যাকাও অবধিও ধাওয়া করতে পারেন শুনে—সিনারী চলে গেলেন ক্যাণ্টনে! শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের প্রবেশের ছাড়পত্র ছিল না ওখানে। ক্যাণ্টন থেকে সিনারী লিখছেন—'দিব্যি আছি এখানে!'

'What a kind providence is this Chinese Government that it forbids the softer sex from coming and bothering us here!'

ক্যাণ্টন থেকে দু'বছর পরে আবার তিনি চলে আসেন ম্যাকাও। সেখানেই ১৮৫২ সালে মৃত্যু হয় তাঁর। চীনারা বলে—একশ' বছর বেঁচে ছিলেন তিনি।

অনেকে বলেন, সিনারী তরুণ বয়স থেকেই একটু ছিটগ্রস্ত। লণ্ডনে বিশেষ একজন মহিলার কাছে নাকি প্রায় বার শ' পেন্সিল স্কেচ ছিল সিনারীর আঁকা। তাদের পেছনে পেছনে অদ্ভুত হরফে কি সব হিজিবিজি লেখা। সে লেখার কী অর্থ কেউ বার করতে পারেন নি আজও। অবশ্য, সে মহিলা পেরেছিলেন কিনা ঈশ্বরই জানেন!

যদিও কলকাতা ছাড়ার সময় তাঁর স্টুডিওতে মোট কুড়িখানা ছবিই পাওয়া গিয়েছিল অসম্পূর্ণ অবস্থায়, তবুও বহু ছবি যে শেষ করেছিলেন তিনি এখানে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনকার কলকাতার বাঙগালী বড়মানুষেরাও ছিলেন তাঁর অন্যতম খদ্দের, পৃষ্ঠপোষক।

সব ইংরেজ শিল্পী সম্বন্ধে সমান শ্রদ্ধা ছিল না বাঙগালীদের। সিনারী সম্পর্কে তাঁদের মনে ছিল ভয়। লোকে বলতো ওঁর সামনে বসলে অকালমৃত্যু নিশ্চিত। ধনবান বাঙগালীরা এজন্যে সযত্নে এড়িয়ে চলতেন সিনারীর স্টুডিও। প্রথম দুঃসাহসী (!) ভারতীয় যিনি সিনারীকে সিটিং দেন, তিনি—এডোয়ার্ড হুইলারের স্বনামধন্য বেনিয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর। ভাইরা কিছুতেই বসতে দেবেন না তাঁকে, কিন্তু গোপীমোহন বসবেন। শেষ পর্যন্ত বসলেনও। শুধু তিনি নন, তাঁর পুত্রদেরও ছবি করালেন তিনি সিনারীকে দিয়ে। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের কাছে এগুলো সহ আর অনেক ছবি ছিল তাঁর।

সিনারীর আর একটি বিখ্যাত ছবি—বর্ধমানের রাজকুমারের ছবি। মহারাজ তেজচাঁদের পুত্র প্রতাপচাঁদের একটা প্রতিকৃতি করেছিলেন সিনারী। চৌদ্দ বছর নিখোঁজ থাকার পর—প্রতাপচাঁদের আবির্ভাবে যখন বিখ্যাত জাল-প্রতাপের মোকদ্দমা শুরু হয় তখন হুগলীর আদালতে অন্যতম সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায় সিনারীর ছবিটি। ছবির এমনি আদালতি স্বীকৃতি সেকালে এই প্রথম ঘটনা।

*

ভারতে শেষ বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী সিনারী। তবে তাঁর ভারত ত্যাগের আগে আরও এমন ক'জন শিল্পী এসেছিলেন আমাদের দেশে যাঁদের কাহিনী

উল্লেখ করার মত। এঁরা সকলেই জল-রং শিল্পী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত উইলিয়াম হজেস্ এবং দুই ডানিয়েল।

হজেস এক কর্মকারের পুত্র ছিলেন। দক্ষিণ সাগরে ক্যাপ্টেন কুকের দ্বিতীয় অভিযানে ড্রাফটসম্যান হিসাবে সঙ্গী ছিলেন তিনি। এদেশের ছাড়পত্রও পেয়েছিলেন তিনি ড্রাফটসম্যান হিসাবেই। মাদ্রাজে আসেন তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। তিন বছর মোট ছিলেন তিনি ভারতবর্ষে। ১৭৮৪ সালে লণ্ডনে বের হয় তাঁর সচিত্র ভারত ভ্রমণ কাহিনী। তার গ্রাহক মিললেও, অর্থাভাবে পড়লেন হজেস। বস্তুত সকলেই যে ভারতে সমান টাকা পেত তা নয়। বহু শিল্পী রিক্ত অবস্থায়ও মারা গেছেন এখানে। 'আলেফাউণ্ডার নামে এক শিল্পী ১৭৯৪ সালে আত্মহত্যা করেন কলকাতায়। তাঁর পোর্ট্রেট-এর দাম ছিল ২০ থেকে ২৫ গোল্ড মোহর। কলকাতার বিখ্যাত ম্যাপ আঁকিয়ে আপ্‌জন যখন ১৮০০ সালে মারা যান তখন ঋণের ভয়ে এক বন্ধু গৃহে পলাতকের জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি।

অবশ্য আবার এমন ভাগ্যবান শিল্পীও ছিলেন যাঁরা কলকাতায় বাস না করেও প্রভূত অর্থ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন দেশে। যেমন জজ কার্টার। ১৭৮৬ সালের কলকাতা গেজেটের বিজ্ঞাপনে জানা যায়—কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে লটারী করছেন কার্টার সাহেব! তাঁর ছবির লটারী! প্রতিখানা টিকিটের দাম একশ' সিক্কা টাকা! তবুও ভীড় হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিশ নিজে পর্যন্ত গিয়েছিলেন তাঁর সেই প্রদর্শনীতে!

তবে হজেসের দুর্ভাগ্যের কারণ তিনি নিজে। পর পর তিনটে বিয়ে করেছিলেন তিনি। পাঁচটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে। ছবি আঁকায় এখন আর সংসার চলে না। হজেস ব্যাঙ্ক খুললেন। এবং ব্যাঙ্কের টাকা ভেঙে শেষে আত্মহত্যা করলেন বিষ খেয়ে। লণ্ডনে তখনও বিক্রি হচ্ছে তাঁর ভারতীয় চিত্রের বই। চার খণ্ডে মোট ২৪টা প্লেট। এক এক খণ্ডের খুচরো দাম ৩০ শিলিং। সব খণ্ড একসঙ্গে মিলিয়ে নিলে—সাধারণ সংস্করণ ১৮ পাউণ্ড। বাঁধানো ২০ পাউণ্ড।

কলকাতায় সে বই বিকোচ্ছে তখন জলের দরে। হজেস চলে যাওয়ার ক'বছর পরে ডানিয়েলরা এসে জানাচ্ছেন—হামফ্রে যে সব প্রিণ্ট রেখে গিয়েছিলে কলকাতায় কিছুতেই ওঁরা বিক্রি করতে পারছেন না সেগুলো। বড় দুর্দিন পড়েছে ব্যবসায়ে। বাজার ভর্তি প্রিণ্ট-এ ("a commonest Bazar is full of prints") গাড়ি গাড়ি বিক্রি হচ্ছে হজেসের ছবি। কাচে বাঁধানো এবং জেল্লা দেওয়া প্রিণ্ট, কিন্তু যে দরে বিক্রি হচ্ছে, তাতে কাচের দামটা উঠবে কিনা সন্দেহ!'

বাজারের এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যেই ১৭৮৬ সালে ডানিয়েলরা এসে নামলেন ভারতবর্ষে। টমাস আর তাঁর ভাইপো উইলিয়াম ডানিয়েল। টমাসের বয়স তখন ৩৬ বছর, উইলিয়ামের ১৬।

টমাস বারো বছর ল্যাণ্ডস্কেপ পেইণ্টার হিসেবে কাজ করেছেন লণ্ডনে। নামজাদা না হলেও তিনি অভিজ্ঞ শিল্পী। উইলিয়াম শিক্ষানবীশ। কাকার এনগ্রেভিং-এর প্লেট ঠিক করে দেন, এটা-ওটা সাহায্য করেন। তখন সবে এচিং-এ ওয়াসের ফল আনার প্রক্রিয়া বা এ্যাকুয়াটিণ্ট-এর প্রথা আবিষ্কৃত

হয়েছে বিলেতে। টমাসের কাছে উইলিয়াম তাও শিখেন।

কলকাতায় নেমেই ডানিয়েলেরা ঘোষণা করলেন—কলকাতার বারোখানা চিত্রের একখানা এ্যালবাম বার করবেন তাঁরা। দু'বছর কেটে গেল একাজে। বের হলো ওঁদের বিখ্যাত "Twelve Views of Calcutta".

একখানা পানসীতে চড়ে ডানিয়েলেরা অতঃপর চললেন উত্তর ভারতের দিকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল হয়ে গংগা ধরে এগিয়ে চললো তাঁর নৌকো। বেনারসে এসে পাল্কী ধরলেন। তারপর পাল্কীতে কানপুর, আগ্রা, দিল্লী। অবশেষে শ্রীনগর। কলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইলের পথ। এ পথে উল্লেখযোগ্য যা দর্শনীয় পড়েছে সবই দেখেছেন ওঁরা। এঁকেছেনও প্রায় সব। সংগে সংগে একটা একটা ডাইরীও রেখেছিলেন দু'জনে!

ফিরবার সময়ে ধরলেন নতুন পথ। লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর হয়ে এক বছর কাটালেন ভাগলপুরে। তারপর আবার কলকাতা। কলকাতায় এক বছর বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন দুই ডানিয়েল। এবার দক্ষিণ ভারত। ছ'মাস দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন দু'জন। ইচ্ছে ছিল—বোম্বাই হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে দেশে ফেরেন। কিন্তু ওদিকে তখন নানা গোলযোগ। সুতরাং সিংহলের দিকে চললেন ওঁরা। মারিয়া গ্রাহাম নামে সেকালে এক জনপ্রিয় লেখিকা ছিলেন কলকাতায়। সিংহলে তাঁর সংগে দেখা হয়েছিল ডানিয়েলদের। ডানিয়েলেরা তখন একটা গ্রামে আছেন। ঘুরে বেড়াবার নেশা তখনও কাটেনি ওঁদের। মারিয়া লিখছেনঃ এই হতচ্ছাড়া জীবন-যাপনের ফলে শরীরের যাতে কোন ক্ষতি না হয়—ডানিয়েল এজন্যে ভীষণ তামাক খান। রাত্তিরে তাঁবুর বাইরে এবং ভিতরে আগুন জ্বালিয়ে গরম থাকেন তিনি। গ্রামাঞ্চলে কত মাইল ঘুরেছেন তিনি ইতিমধ্যে তার হিসেব থাকত তাঁর প্যারামবুলেটরে।

বস্তুত ডানিয়েলের মত এমন করে আর ভারতবর্ষ দেখেননি কোন শিল্পী। ভ্রমণের উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈজ্ঞানিকেরা এশিয়ার এই ভূখণ্ডে এমনি এসেছেন মানুষ হত্যার জন্য নয়, বিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কার করার জন্যে; এসেছেন এমনি নির্দোষ উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মযাজক এবং দার্শনিকেরাও। তবে শিল্পীরা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

ডানিয়েলের মত একাজ এমন গুরুত্ব সহকারে এবং এমন সাফল্যের সংগে বোধ হয় আর কেউ করেননি কোন দিন। দেশে ফিরবার পরেই ১৭৯৫ সালে বের হলো তাঁদের ভারত ভ্রমণের প্রথম ফসল,—Oriental scenery-র প্রথম খণ্ড। ২৪ খানা ছবি। লম্বায় প্রতিটি ২৬ ইঞ্চি, চওড়ায়—১৯ ইঞ্চি। ভারতে তার দাম—২০০ সিক্কা টাকা। পরবর্তী বারো বছরে বের হলো একই আকারের আরও পাঁচ খণ্ড। সেকালের লণ্ডনে দু'শ' দশ পাউণ্ডেও খদ্দেরের অভাব হয়নি এই বইটির।

ডানিয়েলের বই ছাড়া সেকালে আরও কয়টি জনপ্রিয় ছবির বই ছিল আমাদের দেশে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালতাজার সলভিন (Baltasar Solvyn)-এর আঁকা ২৫০টি প্লেটের বইঃ Manner and Customs and Dresses of the Natives of Bengal. বইটির দাম ছিল —২৫০৲। জেমস মোফাৎ-এর Views of Calcutta ইত্যাদি (১৮০৫) নামে

বইটিরও ভাল বিক্রি ছিল। এছাড়া বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—রবার্ট ম্যাবন ৩০ টাকায় 'ওরিয়েণ্টাল মেনার্স' বিষয়ে ২০টি প্লেটের একখানা বই বিক্রি করেছিলেন এখানে। বেইলির বইও বিজ্ঞাপনে বিক্রি হতো। তাঁর বইটিতে শুধু কলকাতার ছবিই ছিল। প্রত্যেকটি ছবি লম্বায় ১৩ ইঞ্চি, চওড়ায় সাড়ে নয় ইঞ্চি! মোট কুড়িখানা ছবি, দাম—৫০ টাকা। এলি ফাউণ্ডারেরও কথা ছিল একখানা এমন বই বার করবার। কিন্তু টাকার অভাবে আর তা পারেননি তিনি। তার আগেই আত্মহত্যা করেছিলেন বেচারা।

ডানিয়েলের চিঠিতেই শোনা গিয়েছিল বাজার-মন্দার খবর। এ খবর যে সাময়িক নয়, সেটি বোঝা গেল আর ক' বছর পরে। ১৮২৮ সালে ডানকান বিচি নামলেন এসে কলকাতায়। তিনি একাডেমিসিয়ান উইলিয়াম বিচির ছেলে। নিজেও ভাল শিল্পী। কলকাতা তাঁকে সমাদরে কোন ত্রুটি দেখালো না বটে, কিন্তু বিচি চলে গেলেন লক্ষ্মৌতে। একখানা উপহার-ছবির জন্যে কলকাতা কর্তৃপক্ষ ৭০০ পাউণ্ড দিয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তবুও কলকাতাকে নির্ভর করতে পারলেন না বিচি। তিনি লক্ষ্মৌএ আস্তানা পাতলেন। হোম সাহেবের মৃত্যুর পরে, লক্ষ্মৌর দরবারী-শিল্পীর সম্মান-জনক আসনটি তখনও ফাঁকা। বিচিকে সাদরে তাতে প্রতিষ্ঠিত করলেন নবাব। এর পর বিচি আর লক্ষ্মৌ ছাড়েননি। সেখানেই ১৮৫২ সালে মৃত্যু হয় তাঁর। বিচি একটি হিন্দুস্তানী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাকে নিয়েই সংসার পেতেছিলেন তিনি লক্ষ্মৌএ। তাঁর ঐ স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সহ নিজের একখানা প্রতিকৃতি আজও ঝুলছে এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে। ছবিটার নাম—'A Hindustani Family'. কিন্তু বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন—নবাবের বেশে ঐ ইউরোপিয়ানটি বিচি নিজে। লোকে বলে, এই নবাব-বিচির ভূত বহুদিন অবধি ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর লক্ষ্মৌর বাড়িতে। অবশ্য বাড়িটার পরবর্তী কোন ইংরেজ বাসিন্দার সঙ্গে কোনদিন মাঝরাত্তিরে দেখা হয়নি তাঁর। হিন্দুস্তানী চাকরেরাই শুধু দেখতে পেত 'বিচি সাহেবের ভূত।'

যা হোক, মোটামুটিভাবে লক্ষ্মৌএ ডানকান বিচির ভূতই ভারতে শেষ উল্লেখযোগ্য চিত্রকর। উল্লেখযোগ্য মানে, তবুও নবাব সরকারের একটা কাজ পেয়েছিলেন তিনি। এরপর কি কলকাতা, কি লক্ষ্মৌ—কোথাও শিল্পীদের কাজ পাওয়ার যেন সম্ভাবনা রইল না আর। দিন পাল্টাচ্ছে নয়, যুগ যেন সত্যিই পাল্টে গেছে ভারতবর্ষে। ১৮৩১ সালে খবরের কাগজের সংবাদঃ মাত্র একজন মিনিয়েচার শিল্পী আছেন কলকাতায়। জনৈক মিস জেনি ড্রুমণ্ড (Jane Drummond)। ভদ্রমহিলার হাত ভাল। কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠেপোষক নেই কলকাতায়! মিনিয়েচার আজ আর করাতে চায় না কেউ! অথচ এই কলকাতা ক'বছর আগেও (১৮১০) ১৩০ সিক্কা টাকা করে দেদার মিনিয়েচার আঁকিয়েছে মিঃ বেলনসকে দিয়ে। মিস জেনির ব্যর্থতায় বোঝা গেল সে দিন বিগত। ১৮৩৪ সালে কোম্পানী সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেনঃ শিল্পিগণ! তোমরা এবার ইচ্ছে করলে আসতে পার কলকাতায়! ভারতবর্ষের যেখানে তোমাদের ইচ্ছে। কোন পারমিট চাইব না আর আমরা তোমাদের কাছে!

কিন্তু কেউ এলো না আর। এমন আমন্ত্রণেও সাড়া দিল না কেউ। কোম্পানীর চিত্রকরদের নাতিদীর্ঘ ইতিহাসটা আরম্ভ হতে হতেই যেন শেষ হয়ে গেল হঠাৎ।

কিন্তু কেন? এ অঘটনের আসলে ভেতরে ভেতরে কারণ ছিল অনেক। প্রথম কারণ, ভারতবর্ষ এবং বৃটেনের মধ্যে মনোভঙ্গীর ক্রম দূরত্ব। প্রথম যুগের ব্যবসায়ীদের ঔদার্যের স্থানে ধীরে ধীরে আসছে তখন দুই জাতির স্পষ্ট ব্যবধান। শাসক আর শাসিতের এই শ্রেণী এবং জাতিভেদ পূর্ণ এবং প্রবলতর হলো এসে সিপাহী বিদ্রোহে। বিদ্রোহের পরে রাজনৈতিক দিক থেকে যেমন কোম্পানীর রাজত্বের অবসান, সামাজিক দিক থেকেও তেমনি অবসান ঘটলো—ইংরেজ আর ভারতীয়দের মধ্যে যাবতীয় আদান-প্রদানের। এককালের ব্যক্তিগত যোগাযোগ হারিয়ে ক্রমে যন্ত্রে পরিণত হতে চললেন বিদেশী সরকার। চিত্রকলা ইত্যাদির প্রতি পৃষ্ঠপোষণা দেখালেন তাঁরা আর্ট স্কুল স্থাপন করে। শিক্ষক ছাড়া—আর বিদেশী শিল্পীদের, এদেশে আসার প্রশ্ন ওঠে না এখন। আগে কোম্পানীর কর্মচারীদের হার্টফোর্ড লেজার রাখার কৌশল শেখার সঙ্গে শিখতে হতো ছবি আঁকাও। কিন্তু হেইলিবারিতে তার দরকার নেই। স্বশিক্ষিত শিল্পীরাও এখন তুলি ধরতে ভয় পান রীতিমত। ছবি সম্পর্কে ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকী মতামতে পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। রাস্কিনের কলমে নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সেখানে। তাছাড়া, আঁকবেনই-বা কার জন্যে। ভারতবর্ষ যতদিন আয়ত্তের বাইরে ছিল—ততদিনই ছিল অদ্ভূত আকর্ষণীয় দেশ। পুরো পুরো এদেশটাকে হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল সেই পুরানো আগ্রহ।

তারপর শৌখিন শিল্পীদের পূর্বেকার অবসরও আর নেই আজ। নৌকো বা পাল্কীতে চড়ে যেতে যেতে থামতে হতো স্থানে স্থানে। সে সময়টা কাটানো যেত ছবি এঁকে। এখন রেল বসেছে। রেলের কামরায় বসে মাঝ রাত্তিরে বেনারসের স্নানের ঘাটের স্কেচ হয় না!

এর উপর অবশেষে এলো ক্যামেরা। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ক্যামেরা এসে পেঁছালো ভারতবর্ষে। ১৮৭০ সালে এদেশ পুরোপুরি চলে গেল তার দখলে। ক্রমে এলো—ছবি গ্রহণের সহজ প্লেট, ওয়েট প্লেট। পাটনার রায় সুলতান বাহাদুর গোটা ভারতবর্ষের হয়ে গ্রহণ করলেন ওটিকে।

ভারতের তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং আর লেডি ক্যানিং স্থির করলেন গোটা ভারতবর্ষের একটা ফটো এ্যালবাম করবেন তাঁরা!

সুতরাং ওয়ারেন হেস্টিংস বা জোহান জোফেনির যুগ যে ইতিহাসে পরিণত সে বিষয়ে অতঃপর আর সংশয় রইলো না কারও।

সহসা আধুনিক হয়ে গেল ভারতবর্ষ।

অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে একটা। এই যে আধা শতক ধরে ছোট বড় শৌখিন এবং পেশাদার এতগুলো চিত্রকর বেপরোয়া চিত্র-চর্চা করলেন ভারতবর্ষের মাটিতে বসে—এদেশের চিত্র-স্বভাবে কি কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি তার? আমরা জানি, গ্রীক আক্রমণের কাল থেকে পারসিক

মোগল যত বিদেশী শিল্পধারা এসেছে ভারতবর্ষে—সকলেই কমবেশী আপোষরফা করে মিলেছে এদেশের চিত্র ঐতিহ্যে। ইংরেজ চিত্রকরদের অভিযান কি সেদিক থেকে পুরোপুরি নিষ্ফল?

প্রশ্নটা যেমন সংগত, তেমনি গুরুতর। এর সঠিক উত্তর দিতে হলে আমাদের তৎকালীন ঘরোয়া চিত্রজগতের হালচাল একটু খতিয়ে দেখতে হয়। দিল্লীর দরবারী মোগল স্কুল তখন ভাংগা। উদ্বাস্তু শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গোটা ভারতময়। কখনও মুর্শিদাবাদ, কখনও পাটনা। কেউ—লক্ষ্মৌ, কেউ—দিল্লী। সুদিনের স্বপ্ন দেখছেন পতিত রাজধানীকে আঁকড়ে। কেউ কেউ আবার ছিটকে এসে পড়েছিলেন সুদূর কলকাতায়ও।

এমেলি ইডেন লিখছেন ঃ (১৮৩৬) একদিন বালীগঞ্জ বেড়াতে যাওয়ার পথে সহসা ছোট্ট একখানা কুটিরে নজর পড়ে আমাদের। পাতায় ছাওয়া একটি ঘর, চারপাশে ক'খানা নারকেল গাছ। দেখি, দরজার ওপর ঝুলছে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা—"পীর বক্স,—মিনিয়েচার পেইণ্টার"। আমি আর জর্জ (লর্ড অ্যাকল্যাণ্ড) ভেবে অবাক হয়ে গেলাম। আলো-বাতাসহীন এই বদ্ধকুটিরে না জানি কি মিনিয়েচারই আঁকছে পীর বক্স! ওর ঘরটা ছিল বডিগার্ডদের ব্যারাকের পাশেই। আমরা চলে আসার পর বডিগার্ডদের একজন অফিসার ঢুকলেন ওর ঘরে। পীর বক্স সত্যিই একটা সুন্দর প্রতিকৃতি করে ফেললো তাঁর। একটু স্টীফ্ বটে, কিন্তু ফিনিশিং খুবই চমৎকার।"

পীর বক্স ছাড়াও তখন (১৮৪০-৪৫) কলকাতায় উদ্বাস্তু ভারতীয় শিল্পী ছিলেন একজন। তাঁর নাম--সৈয়দ মহম্মদ আমীর। আমীর সাহেবের বাস ছিল শহরতলিতে, কড়েয়ায় বা আজকের পার্ক সার্কাসে। তিনি ছবি এঁকে এঁকে শহরে এনে বিক্রি করতেন। কখনও কখনও সাহেবেরা কিনতেন। ফেনি পার্কাস কিছু কিনেছিলেন। আমীর সাহেবের ক'টা ছবির প্রতিলিপি তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। বইখানার নামঃ Wanderings of a Pilgrim in search of Picturesque.

এসব ছবিকে বলা হতো ফিরকা (Firka)। আজকের দিনে টুরিস্টরা যেমন ফটোর সেট কেনেন সেকালে সাহেবরাও তেমনি কিনতেন ফিরকা সেট। অর্থাৎ নানা ধরনের, নানা পেশার দেশী লোকের ছবি। গংগার ধারে ধারে, সাহেবদের আনাগোনার পথে দেশী চিত্রকরেরা ফেরি করে বেড়াতেন এসব সেট। দাম খুবই সস্তা। আভের ওপর বারোখানা ছবির একটি প্যাকেট—দু' টাকা দশ আনা!

কি করবেন দেশী চিত্রকররা। সস্তা ছবির এই পসরা নিয়ে বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না তখন তাঁদের সামনে। মুর্শিদাবাদ বা পাটনায় যাঁরা বসেছিলেন—তাঁদের উপনিবেশও উদ্বাস্তু শিবিরের মতো সাময়িক আস্তানা। দেউলে নবাবেরা চিরকালের জন্যে আশ্রয় দিতে পারলেন না তাঁদের। সুতরাং ওঁরা—টুরিস্টদের কাছে ছবি বেচতে বের হলেন।

কেউ কেউ কোম্পানীর সাহেবদের ঘরে চাকরিও পেলেন। কিন্তু সে শ্রমজীবীর কাজ, চিত্রকরের নয়। তাঁরা এসে কোম্পানীর কুঠি সাজান, পাখায় নক্সা কাটেন। কেউ কেউ ড্রাফটস্ম্যান হিসাবে ম্যাপ আঁকার চাকরিও পেলেন। কেউ কেউ নিযুক্ত হলেন বোটানি বই-এর আলঙ্কারিক। এ ধরনের কাজে

স্বভাবতই তাঁদের চিরাচরিত চিত্রাদর্শে ব্যাপক কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না।

পরিবর্তন যেটুকু হয়েছিল সে নিতান্তই পদ্ধতিগত। ইংরেজসংসর্গে কতকগুলো বিশেষ টেকনিক্যাল জ্ঞান লাভ করলেন আমাদের শিল্পীরা। যেমন—কপার এনগ্রেভিং বা এচিং!

প্রিন্সেপ সাহেবের বেনারসের ছবির বইএর (Benares Illustrated, 1880-83) কিছু কিছু ছবি এনগ্রেভ করেছিলেন কলকাতার বাঙালী শিল্পী কাশীনাথ। প্রিন্সেপের প্রথমে পছন্দ হয়নি তাঁর কাজ। তিনি ছবির নোট দিতে গিয়ে লিখছেন ঃ "the state of art in Calcutta would not allow an attempt in shading". তারপর কাশীনাথ সম্পর্কে তিনি লিখছেন ঃ He has much to learn in perfection, both aerial and liner; in other respects the plates are creditable enough to the progress of the Arts in Calcutta. এটা ১৮৮০ সালের কথা।

ক'বছর পরে, ১৮১৮-১৯ সালে কলকাতা স্কুল বোর্ড সোসাইটির বিবরণে জানা যায় যে, কাশীনাথ কপার এনগ্রেভিংএ বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। ছাপা বইয়ের মত চিত্রকলার যান্ত্রিক দিকে এই দক্ষতাও নিঃসন্দেহে ইংরেজ শিল্পীদের দান।

বলা বাহুল্য, ইংরেজ চিত্রশিল্পীরা কোনদিন এদেশে না এলেও বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ এসব যান্ত্রিক বিদ্যায় চিরকাল অজ্ঞ থেকে যেত না নিশ্চয়ই। সুতরাং ইংরেজ চিত্রকরদের সাক্ষাৎ সংসর্গে মাত্র এটুকুই যদি পাওনার ঘরে এসে থাকে আমাদের তবে--এ যোগাযোগ ব্যর্থ হয়েছে বলেই ঘোষণা করা সঙ্গত।

কিন্তু তা করতে পারি না আমরা। কারণ, অল্পবিস্তর হলেও মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমাদের ঘরোয়া চিত্রকলা বিলেতি হাওয়া পেয়েছিল কিছু কিছু। কথাটা স্পষ্ট বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হয় কাছাকাছি কালীঘাটের দিকে।

কলকাতার মাটিতে ইংরেজদের পা পড়ার আগেও কালীঘাট ছিল সত্য, কিন্তু সে কালীঘাটে পট ছিল না। কালীঘাটের পটের জন্মকাল—ঊনবিংশ শতকের আরম্ভে। মনোযোগ দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে--যে কোন সূত্রেই হোক ইংরেজ প্রভাব এসে পড়েছে এই সব এক আনা থেকে এক পয়সা দামের পটে। প্রথমত কাগজের কথাই ধরা যাক। সস্তা এবং হাল্কা যে কাগজে কালীঘাটের স্ফূর্তি তা বিলেতী কাগজ। দ্বিতীয়ত, লক্ষণীয়, কালীঘাটের শিল্পীরা কিন্তু ছবি আঁকতেন জলরঙে। অথচ ভারতের ঐতিহ্য-সম্মত রং হচ্ছে টেম্পেরা! তৃতীয়ত, ছবিগুলোর আকৃতি। ভারতে মিনিয়েচার ছবির মাপ ছিল সাধারণত দৈর্ঘ্যে ১৭ ইঞ্চি, চওড়ায় ১১ ইঞ্চি। কালীঘাটের ছবির মাপ এর চেয়ে বড়। প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চায় সাহেবেরা এদেশী শিল্পীদের দিয়ে যেসব ছবি আঁকিয়েছিলেন সেগুলোর মত। তেমনি ফাঁকা কাগজে আঁকা। অথচ চিত্রপট রঙে ভরে দেওয়াই আমাদের দেশে সাধারণ রীতি!

তবে কালীঘাটে ইংরেজ প্রভাবের সবচেয়ে বড় প্রমাণ—তার বিষয়বস্তু এবং

ছায়াসম্পাতের কৌশল। শা'জাহানের আমলে দু'একটি ক্ষেত্রে চিত্রকলায় সাধারণ মানুষ বা ঘটনাকে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা হলেও—তৎকালীন ভারতবর্ষে শিল্পীদের বিষয়বস্তু ধর্ম কিংবা দরবার এই দুইয়ের বাইরে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ তৎকালীন কলকাতার সমাজের বিস্তৃত এবং বিশ্বস্ত ছবি মেলে কালীঘাটে। সে সব ছবিতে যেভাবে জলরঙে মানুষের দেহের গড়ন আনা হয়েছে তাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আদিগঙ্গার ধারের এই কুটিরগুলোতে সেদিন বয়েছিল চৌরঙ্গীপাড়ার হাওয়া।

এই আকস্মিক বিলেতী শিক্ষায় শিক্ষিত কালীঘাটের দরিদ্র পটুয়ারা কি নতুন জিনিস দিয়েছে আমাদের জাতীয় চিত্রধারায় সে স্বতন্ত্র আলোচনার বস্তু। যদি ভারতের চিত্রঐতিহ্যে এসব স্থানীয় ঘরাণার দান থেকে থাকে কিছু, তবে অবশ্যই কোম্পানীর চিত্রকরেরা বলতে পারেন,—'আমরা শুধু নেইনি, তোমাদের দিয়েছিও কিছু কিছু।'

লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এ প্রাপ্তিযোগে আমরা ঠকেছি কি জিতেছি সে অবশ্য অন্য কথা।
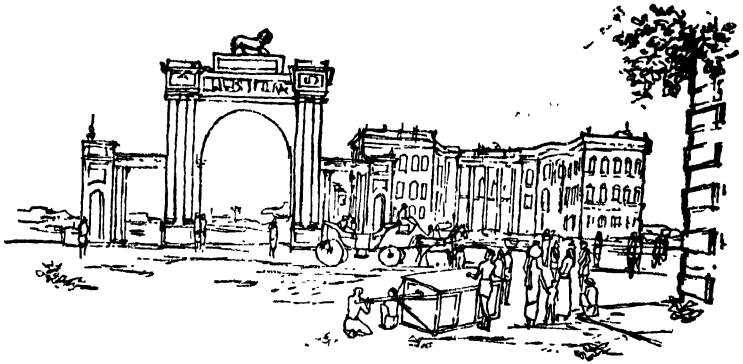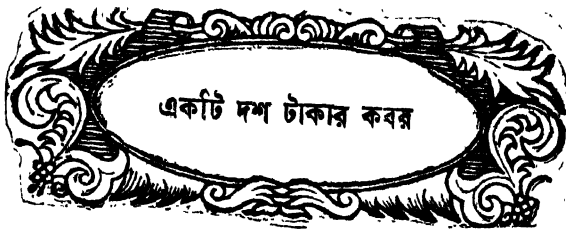
নাঃ, পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি হল, কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না কবরটাকে। দশ টাকার চুন-বালি-ইটের সেই করুণ ইতিহাসটাকে।

পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো অথবা বেকবাগান থেকে কাসিয়াবাগানের পথে কাসিয়াবাগান কবরখানা। ইংরেজদের যেমন সাউথ পার্ক স্ট্রীট সিমেট্রি, মুসলমানদেরও তেমনি কাসিয়াবাগান। দুই জায়গায় মাটির নীচে ইতিহাসের দুটি অধ্যায়। একই যুগ, একই দেশ। শুধু দুটি ভিন্ন জাতি। একটি বিজয়ী, অন্যটি বিজিত। সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানায় নিদ্রিত সেই বিজয়ী দলের নায়কেরা, কাসিয়াবাগানে পরাজিত নবাবেরা।

সাহায্য করতে এগিয়ে এল দীন মহম্মদ। পাশের বস্তির একটি ছেলে। কবরখানাটা সে চেনে। এখানে যে নবাবদের মাটি দেওয়া হয়েছে তাও জানে। কোথাকার নবাব তা অবশ্য তার জানা নেই, কিন্তু দীন মহম্মদ উর্দু পড়তে জানে। সুতরাং, উৎসাহের সঙ্গেই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সে আমাদের।

কাসিয়াবাগান কবরখানা। বলতে গেলে কলকাতার আদি বনেদী মুসলিম কবরখানা। কিন্তু আজ তার দিকে তাকিয়ে কারও মনে হবে না সেকথা। মনে হবে না, এখানে মাটির নীচে ঘুমুচ্ছেন মহীশূরের নবাবজাদারা, অযোধ্যার খোদ নবাবেরা এবং এমনি আরও বড় মানুষেরা।

বিরাট এলাকা। কিন্তু কবর মোটে কয়টি। নবাবদের বেওয়ারিশ কবরখানায় আজ অবহেলার রাজত্ব। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্লাইউড-এর শয্যা বিছিয়েছে পাশের করাত কল, ফাঁকে ফাঁকে ঘুঁটের আলপনা দিয়েছে প্রতিবেশী বস্তিবাসীর দল। দীন মহম্মদ মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পেরেছে, এর নীচে থেকে কোন নবাবকে খুঁজে বের করা তার কাজ নয়।

তবুও খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে ভোরের সূর্য এসে পৌঁছল অফিস টাইমে। কিন্তু তবুও পাওয়া গেল না দশ টাকার সেই ঐতিহাসিক ইমারতটিকে। হয়ত এই সামান্য অর্থের বলে দেড়শ' বছর একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বেচারা। অস্বাস্থ্য আর অবহেলায় ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কোন কালে। কিংবা এমনও হতে পারে, হয়ত এই সামান্য কয়টি জীবিত কবরের মধ্যেই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আজও বেঁচে আছে সেই ঐতিহাসিক অবজ্ঞাটি।

ওয়াজির আলির বিয়ের খরচা হয়েছিল তিরিশ লাখ টাকা, আর শেষকৃত্যে মাত্র সত্তর টাকা। কবর খরচা বেশী হলে দশ টাকা!

১৭৯৪ সন। মহাধুমধাম করে নবাব আসফউদ্দৌলা বিয়ে দিলেন পুত্র ওয়াজির আলির। ওয়াজির তাঁর ছেলে নয়, পোষ্যপুত্র। তাই বলেই বা কেন কম খরচা করবেন নবাব আসফউদ্দৌলা! ওয়াজির আলি তাঁর উত্তরাধিকারী। অযোধ্যার সে ভবিষ্যৎ নবাব। সুতরাং, মাস ভরে উৎসব হল। দেশ-বিদেশের লোকেরা নেমন্তন্ন পেল। ওয়াজির আলির বিয়েতে পাকা তিরিশ লাখ টাকা খরচ হল।

তিন বছর পরে, ১৭৯৭ সনে বিদায় নিলেন আসফউদ্দৌলা। অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন তরুণ নবাব ওয়াজির আলি। হয়ত নবাবের মতই বেঁচে থাকতেন তিনি, হয়ত মৃত্যুর পর কবরস্থ হতেন রাজকীয় মর্যাদায় কিন্তু ওয়াজির আলি ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার মতই অসহিষ্ণু নবাব।

সুতরাং, সিংহাসনে ভাল করে বসতে না বসতেই ইংরেজরা জানতে পেলেন, ওয়াজির আলি তাঁদের শত্রু। ইংরেজদের পরাজিত করতে না পারলেও অপদস্থ করাই তাঁর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

সময় থাকতে ইংরেজরা সাবধান হলেন। তাঁরা ওয়াজির আলিকে সহসা সিংহাসনচ্যুত করলেন। বিগত নবাবের পুত্র সাদত আলি এ ব্যাপারে সহায়ক হলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি অযোধ্যার সিংহাসন পেলেন, ওয়াজির আলি পেলেন নির্বাসনদণ্ড।

অসহায়ের মত ওয়াজির আলি মেনে নিলেন সে দণ্ড। লখনউ থেকে তিনি বেনারস এলেন। বেনারসের রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ চেরীর দরবারে ডাক পড়েছে তাঁর। এর পর তিনি কোথায় যাবেন তা স্থির হবে ওখানেই।

যথাসময়ে মিঃ চেরীর দরবারে ডাক পড়ল পদচ্যুত নবাবের। সেদিন ১৪ই জানুয়ারী, ১৭৯৯ সন। ওয়াজির আলিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মিঃ চেরী বাইরে এসেছেন। এসেই চমকে উঠলেন তিনি। ওয়াজির আলি একা আসেন নি তাঁর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। সঙ্গে এসেছে রাশি রাশি 'সোয়ারী'। নবাবের অনুগত ফৌজ। পালাবার আর তখন পথ নেই সামনে। মিঃ চেরী সোয়ারীদের হাতে প্রাণ হারালেন। মারা গেলেন—ক্যাপ্টেন কনওয়ে এবং মিঃ গ্রাহাম।

ওয়াজির আলির ক্ষিপ্ত অনুচরেরা চলল তখন জজ সাহেবের কুটির দিকে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র একটা বর্শা দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন বিচারপতি মিঃ ডেভিস। অনুচরদের নিয়ে ওয়াজির আলি পালিয়ে গেলেন বেরার।

বেরারেই ইংরজদের হাতে অবশেষে বন্দী হলেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে চালান দেওয়া হল কোম্পানির রাজধানীতে—কলকাতায়। তারপর শুরু হল, সেই লজ্জাকর শেষকৃত্যের প্রস্তুতি।

ইংরেজদের তথাকথিত বিচারে কলকাতায় অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাবের স্থান হল ফোর্ট উইলিয়ামের একটা অন্ধকার ঘরে একটা লোহার খাঁচায়। চরম অবহেলার মধ্যে আজন্ম ঐশ্বর্যলালিত নবাব বন্দী-জীবন যাপন করে চললেন। রাজকীয় বন্দীর জন্যে সামান্য মানবিক কর্তব্যগুলোও পালন করা সঙ্গত মনে করলেন না ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি, সময়মত পানাহারের বন্দোবস্তটুকুও করেন নি তাঁরা। ওয়াজির আলি পেট ভরে খেতে পেতেন

না—বরাদ্দের বেশী এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হত না তাঁকে।

তবুও ইংরেজদের তৎকালীন বর্বরতার সাক্ষী হয়ে দীর্ঘ সতের বছর কয়েক মাস ফোর্ট উইলিয়ামে বেঁচে ছিলেন আসফউদ্দৌলার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী। অবশেষে ১৮১৭ সনের মে মাসে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লোহার খাঁচাটিকে ফাঁকি দিয়ে চিরকালের মত ইংরেজদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন বিদ্রোহী নবাব।

মৃত্যুর পরেও যেন ইংরেজরা শান্ত হলেন না। ওয়াজির আলির উপর তাঁদের প্রতিশোধের তখনও কিছু বাকী। কাসিয়াবাগান কবরখানায় এই সেদিন অবধিও ছিল তাঁদের সেই শেষ নৃশংসতার সাক্ষীটি। দীন মহম্মদ জানে না—সেটিকে মুছে ফেলে ইংরেজের কত উপকার করেছে তারা।

মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্রই ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন, ওয়াজির আলির শেষকৃত্যে যেন সত্তর টাকার বেশী খরচ না হয়। ইংরেজরা জানত, তেইশ বছর আগে—এই তরুণটি যখন বিয়ে করে, তখন খরচ হয়েছিল নগদ তিরিশ লাখ টাকা। অনেক বড় বড় সাহেব নেমন্তন্নও পেয়েছিল সেই বিয়েতে। সুতরাং, এবার হুকুম হল, সত্তর টাকার বেশী নয়!—অর্থাৎ, আর আর খরচ মিটিয়ে কবরের জন্য শেষ পর্যন্ত দশটা টাকাও থাকবে কিনা সন্দেহ।

অযোধ্যার নবাবকে দশ টাকায় কেন কবর দিতে চেয়েছিলেন ইংরেজরা? মানুষকে মানুষের নিয়তির কথা শেখাতে চেয়েছিলেন কি তাঁরা? অথবা, মর্ত্যে ঈশ্বরের বিচার দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁরা? কিংবা ইতিহাসকে নিজেদের হীনতা দেখাতে?

কাসিয়াবাগানের কবরখানা অনেক দিন অনেক মানুষকে দেখিয়েছে তা। আজ যদি একান্তই তা নজরে না পড়ে আপনার, তাতেও বোধ হয় ক্ষতি নেই তেমন। কেননা, ওয়াজির আলির সেই দশ টাকার কবরটি না থাকলেও তার ইতিহাসটা আছে আজও। চিরকাল থাকবে।
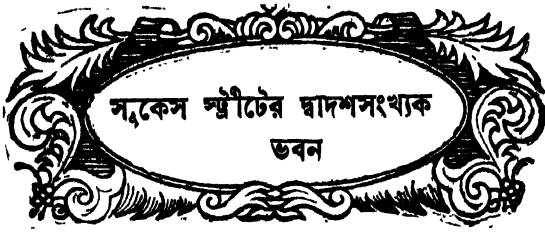
কলকাতায় অগণিত রাজপথ, অসংখ্য ঘরবাড়ি। সাবেকি কলাগেছে থাম-ওয়ালা বাড়ি থেকে আইভিলতাখচিত সম্পন্নের প্রাসাদ, গরিবের রকমারি কুটির, মধ্যবিত্তের বারোয়ারী আস্তানা—এ শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অজস্র মানুষের ঠিকানা। যুগের পর যুগ, পুরুষানুক্রমে জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে সেখানে। অষ্টপ্রহর ঘরে ঘরে চলেছে বিচিত্র জীবন-নাটক। অনেক হাসি অনেক কান্না, অনেক জয়-পরাজয় লাভ-লোকসানের ইতিকথা। প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘর। কুলীন অথবা অ-কুলীন. তাদের প্রত্যেকের ইটপাঁজরে লেখা আছে অনেক ওয়াটারলু জেতবার অথবা খোয়াবার, অনেক গৌরীশঙ্কর পেঁৗছবার অথবা পথ থেকে ফেরবার কাহিনী।

কিন্তু সে কাহিনীর অধিকাংশই একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক অথবা বড়জোর আপিসের কাউকে বা দূর-সম্পর্কের কোন নির্ভরযোগ্য আত্মীয়কে বলা যায়। প্রতিবেশীদের ডেকে এনে শোনান যায় না। সভা ডেকে গলা ফাটিয়ে বলা যায় না, কাগজ ছাপিয়ে দেশ দেশান্তরে বিলি করা যায় না। কলকাতার অধিকাংশ বাড়িই তাই চলমান ইতিহাস হয়েও, আস্তানা মাত্র। বয়সে প্রবীণ হয়েও বাড়ি মাত্র, ইতিহাস নয়।

কিন্তু 'সিমুলিয়ার সুকেস স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনটি' অনায়াসে বলতে পারে ঐ আমি ইতিহাস। শুধু কলকাতায় একটি অমিতবীর্য মানুষের নয়, গোটা বাংলাদেশের ইতিহাস।

সে এক অবিস্মরণীয় দিন। সুকিয়া স্ট্রীটের "দ্বাদশ সংখ্যক ভবনে" সেদিন বাংলাদেশের জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতেরা চিঠি পেয়েছিলেন—সংস্কৃত কবিতায়। ডাকে এবং হাতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আটশ' জনের কাছে সেই বিস্ময়কর সংবাদ পেঁৗছেছিল বাংলা গদ্যে। ছাপান হরফে সামান্য কয়টি কথাঃ

"শ্রীশ্রীলক্ষ্মমণিদেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্। ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার বিধবা কন্যার শুভবিবাহ হইবেক; মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেস্ স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম করিবেন।—ইতি তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৮।"

এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাওয়ার মত একটিমাত্র বাক্য। কিন্তু তবুও চিঠিখানা হাতে নিয়ে সেদিন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল অনেকের। কেন না, ১২নং

সুকেস স্ট্রীট থেকে যে সমাচার এসেছে তাতে আনন্দিত হওয়ার মত মানুষ সেদিন বাংলাদেশে খুবই কম।

বিধবা কন্যার শুভবিবাহ? বিদ্যাসাগরের চটি বইখানা হাতে নিয়ে আঁৎকে উঠেছিলেন রাধাকান্ত দেব। সে ১৮৫৩ সনের কথা।.

দিন রাত সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি মন্থন করছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মনে যে যন্ত্রণা, শত বছর, হাজার বছর আগেকার এই বহুদর্শী শাস্ত্রজ্ঞদের কারও মনে কি ক্ষণকালের জন্যেও জাগ্রত হয়নি সেই বেদনা? কারও দৃষ্টিতে কি একবারের জন্যেও পড়েনি আট বছর দশ বছর বয়সের এই মেয়েগুলোর মুখ? বিদ্যাসাগর মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন না সে কথা। কোথাও না কোথাও আছে। —আছেই।

অবশেষে একদিন চমকে উঠলেন বন্ধুরা। সহসা লাইব্রেরি-ঘরে চিৎকার শোনা গেল—পেয়েছি, পেয়েছি।

বিধবার মনোবেদনার সপক্ষে শাস্ত্রীয় সাক্ষ্য পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দরবারে বিদ্যাসাগর পেশ করলেন তাঁর বহুদিনের মনে মনে পোষা বক্তব্য। বিধবা বিবাহ বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব।

সে প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সভা বসল শোভাবাজারে। রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে। প্রস্তাবের সপক্ষে তর্ক করে বিজয়ী হলেন ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন। রাধাকান্ত একজোড়া মূল্যবান শালে পুরস্কৃত করলেন তাঁকে।

কিন্তু সে বিজয় নয়। সবে যুদ্ধের শুরু মাত্র। দেখতে দেখতে রাধাকান্ত দেব-ই যে শুধু বিরোধী পক্ষের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাই নয়, শাল-বিজয়ী ভবশঙ্কর সেই শালখানা গায়ে দিয়েই এসে পাশে দাঁড়ালেন তাঁর। এমনকি বিদ্যাসাগর তাকিয়ে দেখলেন মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মশাই পর্যন্ত আর তাঁর পিছনে নেই। অথচ বিধবা বিবাহের প্রথম ব্যবস্থাপত্রখানা নিজের হাতে লিখেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় বইটি বের হল ১৮৫৫ সনের শেষভাগে। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনার আগুন। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে।

কলেজ থেকে রাত্রে বাড়ি ফেরবার পথে ঠনঠনের কালীতলায় এসে থমকে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগর। ঘৃণায় মোচড় দিয়ে উঠল তাঁর ছোট্ট দেহটি। ষণ্ডামার্কা ক'টা লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। মুহূর্তে এদের উদ্দেশ্য কি জানতে বাকী রইল না তাঁর। এরা এই অন্ধকার রাজপথে তাঁকে হত্যা করে হিন্দু ধর্মকে বাঁচাতে চায়!

এভাবে পথ থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী হওয়ার মত মানুষ ছিলেন না বিদ্যাসাগর। তিনি এর জন্যে তৈরী হয়েই ছিলেন। সুতরাং, তিনি শুধু বললেন—কৈ রে ছিরে, সঙ্গে আছিস কি? ছায়ার মত পিছনে পিছনে আসছিল একটি লোক। হাতে তার পাকা বাঁশের লাঠি। শোনা গেল, সে বলছে—'তুমি চল না, কে আসে কে যায়, সে আমি দেখব। তুমি চলে যাও, সঙ্গে আমি আছি।' শ্রীমন্তের এ কথার পর মুহূর্তে কালীতলার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনেক ষড়যন্ত্র। বিধবা বিয়ে দেওয়ার পর রাজনারায়ণ বসু শুনলেন—একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলছেন—'রাজনারায়ণবাবু জানেন না যে, তিনি বাঙ্গালা-

ঘরে বাস করেন, তখন আমরা অনায়াসে তাহা পোড়াইয়া দিতে পারি। আমি ও সেকেণ্ড মাস্টার উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—আমরা দুইজনে একদিন জঙ্গলে গিয়া দুই মোটা লাঠি কাটিয়া লইয়া আসি, যদি দাঙ্গা হয় তবে সেই সময় ব্যবহার করা যাইবে।'

দাঙ্গা হয় হবে, কিন্তু বিধবা বিবাহ চালু যদি করতেই হয় তবে চাই আইনের সম্মতি। বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা সমীপে দরখাস্ত পাঠালেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাংলার এক হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করলেন সেই আর্জিতে। বর্ধমানের এবং নবদ্বীপের মহারাজা এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট জমিদাররা স্বতন্ত্রভাবে আবেদন পাঠিয়ে সমর্থন জানালেন তাঁদের। ১৮৮৫ সনের ৪ঠা অক্টোবর কলকাতার পঁচিশ হাজার নাগরিক সমবেত হয়ে দাখিল করলেন সেই ঐতিহাসিক আবেদনপত্র।

বিরোধীপক্ষও এসে হাজির হলেন যথাসময়ে। তাঁদের দরখাস্তে ছত্রিশ হাজার সাতশ' তেষট্টি জনের সই।

তবুও ব্যবস্থাপক সভার লড়াইয়ে জিতে গেলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল। ১৮৫৬ সনের ২৬শে জুলাই পাস হয়ে গেল বিধবা-বিবাহ আইন। চারদিকে বিদ্যাসাগরের জয়-জয়কার। শুধু বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণে-পশ্চিমে হিন্দুস্থানের প্রতিটি গাঁয়ে গঞ্জে একমাত্র আলোচ্য তখন—বিদ্যাসাগর আর বিধবা বিবাহ।

উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহ নাটক লিখলেন, দাশু লিখলেন পাঁচালী। দেখতে দেখতে পক্ষে বিপক্ষে পুস্তিকা কবিতায় ছেয়ে গেল দেশ। গাঁয়ে গাঁয়ে তখন সবচেয়ে জনপ্রিয় গান—'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।' তার পরেই লোকেরা শুনতে ভালবাসে—'দিদির ফিরল কপাল'-এর সুরটি। মেয়েদের এখন সবচেয়ে পছন্দ শান্তিপুরের বিদ্যাসাগর বা বিধবা বিয়ে ডিজাইনের শাড়ি। বাংলাদেশ তখন বিদ্যাসাগর আর বিধবা বিয়ে ছাড়া কিছু জানে না। কিছু ভাবতে পারে না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজের ভাবনা অন্য। তিনি জানেন বিধবা বিয়ের চেষ্টা এই প্রথম নয়। রঘুনন্দন নিজের বিধবা মেয়ের বিয়ের জন্যে প্রাণপাত চেষ্টা করে গিয়েছেন এদেশে। অক্লান্ত উদ্যোগ দেখিয়েছেন ঢাকার রাজা রাজবল্লভ! আরও অনেকে চেষ্টা করেছেন। এমনকি, মাত্র কয় বছর আগে (১৮৩৭ সনে) এই কলকাতায় নগরের অন্যতম ধনাঢ্য মতিলাল শীল কুড়ি হাজার টাকা পণ ঘোষণা করে 'ইংলিশম্যান' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র সন্ধান করেছেন একটি বিধবা বালিকার জন্যে। শোনা যায়, টাকায় সে পাত্র তিনি কিনতেও সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তেমন পাত্র চান না। তিনি বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করেছেন। তিনি প্রকৃত পাত্র চান, আইনের মর্যাদা রাখতে পারে এমন ছেলে।

অবশেষে লক্ষ্মীমণি দেবীর নিমন্ত্রণপত্র দেশের লোক জানতে পেলেন—বিদ্যাসাগর তাঁর সেই মনের মত পাত্র পেয়েছেন।

ছেলেটি যশোরের খাটুরা গ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মশাইয়ের অবসর গ্রহণের পর

থেকে তিনি তৎকালের অন্যতম সম্মানের পদ মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

কুলগৌরবে পাত্রীটিও যথেষ্ট অভিজাত। মেয়েটির নাম কালীমতী দেবী। বাবার নাম ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়। নিবাস বর্ধমানের পলাশডাঙ্গা গ্রাম। কালীমতির বয়স যখন চার বছর তখন সেকালের নিয়মে তার বিয়ে দেওয়া হল।

স্বামী হলেন 'নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য'। আকস্মিকভাবেই দু বছরের মধ্যেই বিধবা হল কালীমতী। তখন তার বয়স মোটে ছ' বছর।

ছ'বছরের মেয়ে কিছুদিন পরেই বিধবা সেজে আবার ফিরে এল মা বাবার কোলে। কিছুদিন পরে বিদায় নিলেন বাবা। এখন সংসারে কালীমতীর আছে বলতে—মা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাড়িতে মাঝে মাঝে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে আসেন মা লক্ষ্মীমণি দেবী। মেয়ের দুঃখের কথা তর্কালঙ্কারের কাছে বলেন। তর্কালঙ্কার শোনেন ভাবেন। অবশেষে প্রস্তাব দিলেন শ্রীশকে। শ্রীশ রাজী হলেন। স্থির হয়ে গেল বিয়ের দিন। তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১২৬৩ সাল।

নিমন্ত্রণপত্রে জানা গেল বিবাহ-বাসর—'সিমুলিয়ার সুকেস স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবন।' সুকিয়া স্ট্রীটের ঐ বিশেষ খণ্ডটির আজ নাম বদল হয়ে গেছে। এখন তার পরিচয়—কৈলাস বসু স্ট্রীট। প্রতিদিন বহু লোকের আনাগোনা সেখান। কিন্তু তাদের অতি অল্পজনই চেনেন সেই ঐতিহাসিক দ্বাদশ সংখ্যক ভবনটি। কারণ, আজ আর তার সংখ্যা দশকের ঘরে নেই। নামবদলের মত কালের নড়াচড়ায় বদলে গেছে তার পরিচয়-অঙ্কটিও। সুতরাং যদি এরই মধ্য থেকে বাংলাদেশের প্রথম বিধবা বিবাহ বাসরটিকে খুঁজে পেতে চান, তবে জিজ্ঞেস করে এদিক সেদিক ঘুরে তাঁকে দাঁড়াতে হবে—'৪৮ এ' এবং '৪৮ বি' নম্বর আঁটা যমজ-বাড়িটির সামনে।

সেকালে এই বাড়িটির গৃহপতি ছিলেন কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। নাম—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন তিনি। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে রাজকৃষ্ণবাবু ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের একজন অন্তরঙ্গ সহযোগী।

সেই বিখ্যাত আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। মেয়ে কালীমতীকে নিয়ে বর্ধমান থেকে মা এসে উঠলেন তাঁর বাড়িতে। অর্থাৎ, আজকের '৪৮ এ এবং ৪৮ বি' নং কৈলাস বসু স্ট্রীটে।

অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন চিলেকোঠাটি বাদ দিলে একটু সেকেলে ধরনের একখানা দোতলা বাড়ি। দোতলায় টালি-ছাওয়া বারান্দা, নীচে গ্যারেজ।

কিন্তু সেদিন? —পাত্র এসে উঠেছিলেন বৌবাজারে, বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মশায়ের বাড়িতে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। আগেই পালকিতে চাপলেন বিদ্যারত্ন। সঙ্গে চললেন বরযাত্রীরা। বরযাত্রী মানে, কলকাতার বাছা বাছা বাঙালী নায়কেরা। পালকি ধরে আগে আগে হেঁটে চললেন বিদ্যাসাগর

স্বয়ং। ডাইনে বাঁয়ে বরানুগমন করলেন—রামগোপাল ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

রাস্তা লোকে লোকারণ্য। দুই পাশে কাতারে কাতারে অপেক্ষা করছে হাজার হাজার নারী পুরুষ। সবাই একনজর দেখতে চায় এই সাহসী বরটিকে। দু'পা চলেই থেমে থেমে দাঁড়াতে হল পাল্কি-বাহকদের।

কোথাও জয়ধ্বনি, কোথাও বিদ্রূপ ব্যঙ্গ। ধীরে ধীরে পিছনে ইতিহাস সৃষ্টি করে এগিয়ে চলল পাল্কি। বরযাত্রীদের মনে যুগপৎ আনন্দ ও শঙ্কা। গোলমাল যদি হয়! পুলিসের সাহায্যপ্রার্থনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সরকার কোন ত্রুটি রাখেননি নিরাপত্তা ব্যবস্থার। দীর্ঘ পথে দুই হাত ছাড়িয়ে ছাড়িয়েই একজন করে কনস্টেবল দণ্ডায়মান।

নিশ্চিন্তমনে মাঝপথে শোভাযাত্রা থেকে বিদায় নিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। বর এবং বরযাত্রীরা এসে পোঁছাল সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে।

সেখানে তখন সে এক দৃশ্য। গাড়ি, পাল্কি আর পদাতিকে গোটা সুকিয়া স্ট্রীটে এক বিরাট জনসমুদ্র। আর কখনও একসঙ্গে এত লোক জমায়েত হয়নি এই পথে। না আগে, না পরে। তিন মাসও হয়নি পাস হয়েছে বিধবা বিবাহ আইন। এরই মধ্যে খাস কলকাতায় বিধবার বিয়ে? নগর যেন ভেঙ্গে পড়ল সুকিয়া স্ট্রীটে।

অতি কষ্টে জনতার ভীড় ঠেলে বর এসে বসলেন বিয়ের আসরে। তখন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত। সংস্কৃত কলেজ থেকে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এসেছেন। এ ছাড়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন—ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং শাস্ত্রজ্ঞগণ।

মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে ঘোষিত হল বিবাহ বাসরে পাত্রীর আগমনবার্তা। গায়ে মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার, পরিধানে মনোহর পরিচ্ছদ। দশ বছর বয়স্কা কালীমতী দেবী আসনে বসলেন। বিদ্যাসাগর নিজের অর্থে নিজে দেখেশুনে কিনে এনেছেন কালীমতীর বস্ত্রালঙ্কার।

মন্ত্রপাঠ শেষ হল। হিন্দুর চিরাচরিত শাস্ত্র থেকেই সংগৃহীত বিবাহ-মন্ত্র। নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল কলকাতার প্রথম বিধবা বিবাহ। ১২৬৩ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার। সিমুলিয়ার সুকেস স্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনের গৌরব অধ্যায়। বিদ্যাসাগর জিতলেন। প্রগতি বিজয়ী হল। একটি দশ বছরের মেয়ের মলিন মুখে হাসি ফুটল।

এই গ্রীষ্মের সখাটিকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন আপনারা। এতদিন,—এমন কি সম্প্রতি-বিগত কলকাতার ডিগ্রী ডিগ্রী গরমেও কেন এর বন্দনায় অবতীর্ণ হইনি, তার কৈফিয়তস্বরূপ বলে রাখি—কারণটি সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল। সিদ্ধ এবং বুদ্ধ উভয় শ্রেণীর শিল্প-সূত্রকাররা বলে থাকেন—সৃষ্টিতে যাতে পেঁচোয়-পাওয়া না হয়, তার জন্যে কাঁচামাল এবং কারিগরের মধ্যে—অর্থাৎ লেখক এবং লেখ্যবস্তুর মধ্যে ডিটাচ্‌মেণ্ট বা বিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি আমার তাই ঘটেছে। শুধু আমারই বা বলি কেন—এতদিনে তার ভো-ভো কিংবা পন্‌-পন্‌ নিশ্চয়ই স্তব্ধ হয়ে গেছে আপনার মাথার ওপরেও। আমারটির স্থান অবশ্য মস্তকোপরি ছিল না—ছিল যথার্থ সখা হিসাবে শয্যাতেই। সম্প্রতি তিনি স্থান নিয়েছেন উনুন পার্শ্বে। অবশ্য স্থান বদল হলেও হাত বদল হয়নি। ডাটাটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তা হওয়ার উপায় নেই। শীত-গ্রীষ্ম-নির্বিশেষে আর পাঁচটা নিম্নবিত্ত ঘরের মত গৃহিণীর সখারূপে তাকে সেখানে অবস্থান করতেই হবে।

সে-কথা থাক। হঠাৎ পাখাকে নিয়ে লেখার আরও একটা কারণ আছে। কলকাতা-বিষয়ক অন্তত একটা হলেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা উচিত—এ-কথা বারবার পরামর্শ হিসেবে বন্ধুদের থেকে শুনে আসছি। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছি—পাখাই এ-ব্যাপারে আমার কঠিনতম পরীক্ষা। এছাড়া গবেষণাযোগ্য দ্বিতীয় কোন বিষয় কলকাতা শহরে আছে বলে আমার জানা নেই। সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে রাজনীতিক্ষেত্রে কতখানি ভুল করেছিলেন, অন্ধকূপ হত্যা সত্য কিনা কিংবা আদৌ কোন হলওয়েল মনুমেণ্ট ছিল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে ঢের লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আশা করি, ভবিষ্যতে 'নবতর' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আরও হবে। কিন্তু এতে কেউ হাত দেননি। অথচ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গবেষণামূলক। কারণ, এর প্রচলনের সন-তারিখ রীতিমত বিতর্কমূলক। দ্বিতীয়ত, এর পরিবর্ধন, সংস্কার এবং পরিবর্জনের ধারাবাহিকতা কলকাতা তথা তামাম হিন্দুস্থানের ইতিহাসের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। তৃতীয়ত, ইঙ্গজীবনে বঙ্গপ্রভাব, অর্থাৎ কলকাতাস্থ ইঙ্গ-সমাজে বঙ্গীয় হাওয়া যদি কিছু লেগে থাকে, তবে তার অনেকখানিই সঞ্চালিত হয়েছে এই পাখার মাধ্যমেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন—তথাকথিত বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে এটি কত গভীর অনুধ্যানের বিষয়। আমার কাছে আরও এই কারণে যে, একমাত্র এতেই

আমার পক্ষে সম্ভব এক ঢিলে দুটো পাখি মারা। একসঙ্গে যুগল বন্ধুকৃত্য সম্পাদনের এমন সুযোগ বোধ হয় আর আমি পাব না। আশা করি, এতে একদিকে যেমন এই নির্বাক মৌসুমী মিত্রটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হবে, অন্যদিকে কফি-হৌসের বন্ধুদেরও স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

পাখা কবে কিংবা কিভাবে অত্র শহরে চালু হয়, সে বিষয়ে গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে, কেন কোন পরিস্থিতিতে প্রচলিত হয়, তা অনুসন্ধান করা সমাজ-সচেতন গবেষক হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য। তদনুযায়ী যথেষ্ট পরিশ্রম করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗছেছি যে, কলকাতায় পাখা প্রচলিত হওয়ার পশ্চাৎকার কারণ গ্রীষ্ম নয়—মশা-মাছি। গরম সম-অক্ষাংশ-দ্রাঘিমায় পৃথিবীর অন্যত্রও সম পরিমাণে ছিল কিন্তু টানা-পাখা ছিল না সেখানে। অথচ কলকাতায় যে পরিমাণ মশা-মাছি ছিল, তার তুল্য মশা-মাছি ভূ এবং ভারতে কুত্রাপি ছিল না। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখে গেছেন—প্রতিদিন ভোরে একটি গরুর গাড়ি বোঝাই করে মাছি আদি প্রাণীর শবদেহ নিয়ে যাওয়া হতো স্পেন্সেস্ হোটেল থেকে। উজ্জ্বল আলোর আকর্ষণে তারা রাত্রে মৃত্যুবরণ করত সেখানে। মশার কথা বলাই বাহুল্য। আজও ১৯৬০ সালে কলকাতার মত আধুনিক শহরে কর্পোরেশনের সৌজন্যে এই প্রাণীটি আমাদের কাছে সুদুর্লভ হয়ে ওঠেনি, সে আমাদের সৌভাগ্য। কর্পোরেশনের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে শুধুমাত্র ঈশ্বর গুপ্ত মশাই কলকাতার মশক-কুলকে এতকাল নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হতেন না। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই অষ্টাদশ শতকের মশা আজ আর নেই। মশার যথেষ্ট প্রকৃতি বদল হয়ে গেছে গেল দেড়শ' দু'শ বছরে। শোনা যায়, আগে এরা লোক চিনে কামড়াত, নেটিভদের ওপর বৃহত্তর মশকদের শোষণ দেখে এরা নাকি তাদের করুণা করত। যে-কোন কারণেই হোক রক্তহীন নেটিভ-অঙ্গের চেয়ে ইউরোপীয়ানদের প্রতিই ছিল এদের বেশি আকর্ষণ। এ-সম্পর্কে স্যার চার্লস্ ডি'ওলির (Charles D'oyly) সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ মশার গুঞ্জন শুনতে চাও সন্ধ্যের দিকে কোন ইউরোপিয়ানের বাসায় এসো। ঝাঁকে ঝাঁকে মশারা সব গান ধরে তখন। শব্দ শুনে মনে হয় যেন তাঁত চলছে বাড়িতে। নেটিভেরা সাধারণত এ সময়টায় তাদের রাত্তিরের খানা পাকায়। ফলে ধোঁয়ার জ্বালায় মশারা টিকতে পারে না ওখানে। তারা পাখা মেলে পাড়ি জমায় ইউরোপিয়ান কোয়ার্টারের দিকে। অনুমান করি, এই ক্রমাগত এবং একতরফা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যেই একদিন এই কলকাতা শহরে মশকদের সংহারার্থে কামান দেগে বসেছিলেন কোন মেজাজী ইউরোপিয়ান সৈনিক। বাংলা প্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্যে যাঁদের আস্থা আছে এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, অষ্টাদশ শতকের এ-দেশীয় ইংরেজ জীবনের সঙ্গে তাঁরা অতঃপর আমার এই কথাটিকে 'অনুমান মাত্র' বলে মনে করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। অন্য একজন লেখক পরিষ্কার লিখেছেনঃ পাখা সঞ্চালনের প্রথম উদ্দেশ্য মাছি বিতাড়ন। অতঃপর বায়ু সঞ্চালন। (এখানে বলে রাখা দরকার, মাছি এবং মশার পার্থক্য প্রথম যুগে অনেক ইংরেজের কাছেই খুব স্পষ্ট ছিল না। ফলে Fly বলতে উনি মশককে বাদ দিয়ে বলেছেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই।)

যা হোক, পাখার জন্মের দ্বিতীয় কারণটি যে কলকাতার গরম, এ-বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বাঙালী লেখকদের সঙ্গে আমি একমত। কারণ, এই অতিশয় মনোরম এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রটির অন্যতম কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রায় সকলেই বলে আসছেন—ইহা বায়ুকে আন্দোলিত করে (It agitates the air greatly)। কেউ কেউ বলেছেন, ইহা কৃত্রিম বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি করে। (Produces a tolerably comfortable artificial air.)

অর্থাৎ বর্তমান যুক্তিধারায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কলকাতায় মশা-মাছি ছিল বলেই পাখা আছে এবং পাখা বাতাস সঞ্চালনে সক্ষম বলেই গ্রীষ্মের সখারূপে এতদ্দেশে স্বীকৃত ও আদৃত হয়েছে।

এখানে কলকাতার গ্রীষ্মকে বাদ দিয়ে শুধু পাংখা বিচারে মত্ত হলে আমাদের সিদ্ধান্তে ত্রুটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, কলকাতার গরম ভারতের অন্যান্য বহু জায়গার থেকে কম হলেও, অন্যান্য সকল স্থানের ইঙ্গ সমাজে এর অবদান রয়েছে। সুতরাং কলকাতার গরম সম্পর্কে এখানে দু'-চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই এই গ্রীষ্মের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলা চলে—অষ্টাদশ শতকে কলকাতার রোদ ছিল সাহেবদের কাছে দড়ির তুল্য। অর্থাৎ গলায় দড়ি না বেঁধে নগ্ন মস্তকে রাস্তায় দু'-একটা পাক খেলেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। (..To be out in the sunshine was looked upon as attempted suicide.—H. HOBBS.) অনেকেই এভাবেই আত্মহত্যা করত তখন! ভাবতে পারেন কোথায়, আমরা তো সাঙ্গ হই না। সে হয়ত আমাদের মন্দভাগ্য, তাই গলায় দড়ি বেঁধে হেঁচ্‌কা-হেঁচ্‌কি করি, নয়ত কেরোসিন ঢেলে চিৎকার করি। তাছাড়া সে-গরমও বোধ হয় আজ আর নেই। এমিলি ইডেন অতি সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্তভাবে তা বুঝিয়েছেন আমাদের। তিনি লিখেছেন: It was so HOT—I don't know how to spell it large enough. 'হট্' কথাটাকে ক্যাপিটাল অক্ষরে বলে তিনি যে গরমটি বোঝাতে চেয়েছেন, আশা করি, তা সর্বজনবোধ্য। নয়ত অন্যান্য বিবরণ আমাদের কাছে রীতিমত অর্থহীন হয় বলেই আমার ধারণা। যেমন একজন লিখেছেন: বাপ্, কি গরম, মনে হয় যেন, বাস্তিলের দেওয়াল-বেষ্টনীতে আছি।

তবে হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে, কলকাতার এই প্রচণ্ড গরমই, সাহেবদের হাতে পাখা তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তুলেছে শোলার টুপি। (টুপির ওপরে সেলুলয়েডের হাল্কা আস্তরণটি অবশ্য বসিয়েছে কলকাতার বৃষ্টি) তদুপরি এই গ্রীষ্মই শিখিয়েছে তাঁদের স্নানাভ্যাস এবং পরিমিত পানাভ্যাস। সুতরাং গরমেরও কৃতিত্ব আছে বৈ কি!

যা হোক, গরম ছেড়ে আবার পাখার কথায় আসা যাক এবার। কেন কলকাতায় পাখা প্রচলিত হয় তা নির্ণয়ে আমরা সমর্থ হয়েছি। এবার আমাদের সন্ধান করতে হবে কলকাতায় পাখা প্রচলিত হয় সঠিক কোন্ সময়ে। যাঁরা গুরুতর সমাজতাত্ত্বিক তাঁরা বলবেন,—সামন্ত যুগে। ব্যক্তিগত বিলাস-বিহ্বল জীবনকে ফুরফুরে করে তোলার জন্যে দাসশ্রেণীর পায়ে বেড়ী দিয়ে, হাতে পরমানন্দে দড়িটি ছেড়ে দিয়ে যে যুগে দরজা বন্ধ করে মানুষ ঘুমাতো

সেই যুগে অর্থাৎ মুঘল যুগে, ক্লাইভ আমলে। কিন্তু ইতিহাস বলে—'না'। ক্লাইভ তো পরে; এমন কি হেস্টিংস-ফ্র্যান্সিসের আমলেও পাখা ছিল না কলকাতায়। কেননা, তখন সহস্রবিধ ভৃত্যশ্রেণীর সন্ধান মিললেও সে তালিকায় পাংখা-বরদার অনুপস্থিত। মিসেস গোল্ডবার্ন (১৭৮৩-৮৪) সালে লিখছেনঃ খেতে বসলে চারদিকে ঘিরে ছেলেরা সব ছোটবড় পাখা নিয়ে দাঁড়াবে হাওয়া করার জন্যে। ("....during the whole period of dinner boys with flappers and fans surround you....") পাখা সম্পর্কে সেই প্রথম ঘোড়ার মুখের সংবাদ। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে পাখা ছিল।

ঐতিহাসিক অমনি তেড়ে এলেন--পাখা তো বৈদিক যুগেও ছিল। কালিদাস কি ভেজা পদ্মপত্রে শকুন্তলাকে হাওয়া খাওয়ান নি? শুধু পদ্ম-পাতাই বা বলি কেন, তালপত্রও ছিল। 'না বাতি বায়ুস্তৎপার্শ্বে তাল বৃন্তানিলাধিকম্'। তারকাসুরের বাগানের কথা বলা হচ্ছে। সেখানে পাছে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে তার জন্যে বাতাস তালপাতার পাখার চাইতে জোরে বইত না। সুতরাং প্রশ্নঃ পাখা কবে কলকাতায় প্রচলিত হয়েছে তা নয়, টানা-পাখা কবে থেকে চালু হয়েছে তাই হচ্ছে জিজ্ঞাসা। মিসেস গোল্ডবার্নের কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়--তখন পাখা থাকলেও টানা-পাখা ছিল না। অথচ তার ক'বছর পরেই (১৮৭৯) M. L. De Grandpre লিখেছেনঃ অনেক বাড়িতে খাওয়ার টেবিলের উপরে সিলিং থেকে একটা পাখা ঝুলতে দেখা যায়। সুতরাং অনায়াসেই সিদ্ধান্ত হলো টানা-পাখার জন্ম ১৭৮৪ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে। তারপর এর স্বাভাবিক নিয়মেই বৃদ্ধি হয়েছে, পুষ্টি হয়েছে—ক্রমে আদৃত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নঃ কে এর জাতক?

এই জাতক নির্ণয় সহজ কর্ম নয়। বিজ্ঞজন যাঁরা তাঁরা হয়ত বলবেন—জাতক ব্যক্তি নয়, যুগ। যে যুগে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাতে শিখেছে মানুষ সেই যুগেই শিখেছে পাখার লেজে দড়ি লাগাতে। কিন্তু মূঢ় পিতা তাতে সম্মত নন। জাতির রূপ ধরে এগিয়ে এলেন তিনি। বললেনঃ শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছি আমরা, আর পাখা আবিষ্কার করেছ তোমরা তা কি হয়? এ অনিবার্য ভাবেই ইংরেজ সভ্যতার দান।

এ ভাবেই চলছিল। প্রথম আপত্তি জানালেন ভোলানাথ চন্দর। তিনি লিখলেন—অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে কলকাতার আগে চিনসুরার ডাচ গভর্নর তা আবিষ্কার করেন। ইউরোপীয় ইউরোপীয়ে বিবাদ। সুতরাং অন্যদের চুপ করে থাকার কথা নয়। ক'বছর মধ্যেই (১৭৯২) ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল লিখেছেনঃ পাংখা নামক যে যন্ত্রটি বর্তমানে আমাদের গৃহাদিতে প্রচলিত তা সর্বপ্রথম এদেশে আনেন—পর্তুগীজরা।

অর্থাৎ পাখার আবিষ্কারক ইংরেজ নয়, ডাচ নয়, পর্তুগীজ। আর যায় কোথা? হোক না মেশিন, তাই বলে কি প্রাচ্যের কোন দাবী থাকবে না এমনি একটা আবিষ্কার? Yule এবং Burnell সাহেব লিখলেনঃ অষ্টম শতকে আরব দেশে উহা প্রচলিত ছিল। কোথায় অষ্টাদশ, আর কোথায় অষ্টম শতক! সুতরাং একসঙ্গে নীরব হয়ে গেল, কলকাতা, চিনসুরা এবং লিসবন।

কিন্তু এগিয়ে চলল পাখার ব্যাপ্তি। রাজা সুখময় দেবের বাড়িতে এল

পাখা। এল নবাব, মুন্সি, মুৎসুদ্দির ঘরে ঘরে। দড়ি ধরে ঝিমুতে লাগল পাখা-বরদার। বংশানুক্রমে চলল তাদের হাওয়া জোগানোর কাজ। দেশের হাওয়া বদলায়, পাখার ঝালর বদল হয়, রং বদল হয়। নামি-ডাকি শিল্পী এসে চিত্র করতে বসেন তার গায়ে। এক এক বাড়ির পাখার তখন এক এক রকম খ্যাতি। সেই খ্যাতির মধ্যে চাপা পড়ে রইল আসল আবিষ্কর্তার নাম। কিন্তু তলে তলে লোক চালু রেখে গেল তার কাহিনীটি। সেটি হচ্ছে এই ঃ পাখার প্রকৃত আবিষ্কারক জনৈক ইউরেশিয়ান কেরানী। তার কাজ ছিল ফোর্ট উইলিয়মের একটা নীচু ঘরে। একদিন অসহ্য গরমে এবং মশার কামড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেচারা তার ক্যাম্পটেবিলের একটি দিক কাঠসমেত ছিঁড়ে মাথার উপরে ঝুলিয়ে তাতে একটা দড়ি সংযোগ করে টানতে শুরু করে! জন্ম হয় টানা-পাখার। কেরানীর ঘর থেকে প্রথমে পদ্ধতিটি চালু হয় বড়বাবুর ঘরে, তারপর ক্রমে আরও বড় ঘরের দিকে। উঠতে উঠতে যখন সবচেয়ে বড় ঘরে ঝুলল পাখা তখন কেরানীর ঘর আবার হয়ে গেল পাখাশূন্য। কারণ পাখা তখন টানবার জিনিস নয়, পোষবার জিনিস এবং পরিবার ছাড়া যে কোন সাধ আহ্লাদই তখন কেরানীদের পুষতে মানা।

পৃথিবীতে বোধ হয় সর্বপ্রথম কেরানীর ভাগ্যে এমনি একটি আবিষ্কার গৌরব জুটল। দেশীয় গবেষক হিসেবে স্বভাবতঃই বাঙালী কেরানীকে এই গৌরবের অংশভাগী করার জন্য আমি যারপরনাই চেষ্টা করেছি। ইউরেশিয়ান (Eurasian) কথাটা দেখে আশান্বিতও হয়েছিলাম যথেষ্ট। ভেবেছিলাম— চেষ্টা করলে এটাকে এশিয়ান,—ক্রমে বাঙালী রূপদানে সক্ষম হবো। কিন্তু সে চেষ্টার আগেই বাদ সেধেছেন স্বয়ং বাঙালী কেরানীকুল। তাঁদের মতামত নিয়ে দেখেছি এমন অবস্থায় পড়লে তাঁরা পাখা আবিষ্কারের বদলে যা করতেন বলে মনে করেন তা হচ্ছেঃ হয় কবিতা লেখা, নয় আত্মহত্যা। অন্য একদল এমন মশা এবং গরম মিশ্রিত নিদ্রাহীন রাত্রিটাকে কবিতার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করেন। আরেক দলের মতে—গিন্নির নিদ্রাভঙ্গ না করে ক্যাম্পখাট ভাঙতে পারলে কিংবা কড়িতে দড়ি লাগাতে পারলে আত্মহত্যার পক্ষে ওটাই 'বেস্ট মোমেণ্ট'।

একটি প্রেম ও কয়েকটি কবিতা
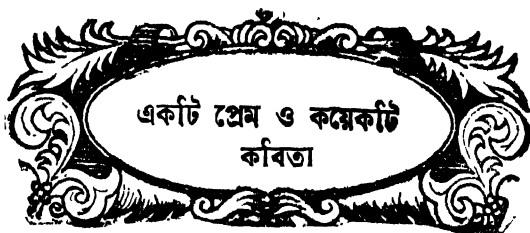
ছোট-গল্প করে বললে গল্পটা খুবই ছোট। কিন্তু যাঁর গল্প তিনি নিজে বলেছেন কবিতায়। একটি নয় তিনটি বইয়ে, অনেকগুলো গীতি-কবিতায়। তার প্রধান স্বাদ অবশ্য কবিতা হিসাবেই। কিন্তু সে-রসটুকু ছাড়াও একটু নজর করলে তলানি হিসাবে যা পাওয়া যায় তা একটি নিটোল গল্প। ভালবাসার গল্প। কবিতায় ভালবাসার গল্প অনেক আছে। কিন্তু এ গল্পটা একটু ভিন্ন ধরনের।

গল্প ওরফে কবিতার কথায় যাওয়ার আগে কবির কথাই হোক। কবির নাম—লরেন্স হোপ। বাংলা 'কবি' শব্দটার মত লরেন্স হোপ নামটারও স্বাভাবিক প্রবণতা পুরুষের দিকে। সুতরাং, বইখানা হাতে নিয়েই বাঘা বাঘা সমালোচকেরা একবাক্যে রায় দিলেন—ভদ্রলোক শক্তিশালী কবি।...অমুকের পর এমন কবি আর জন্মায়নি। যেমন ভাষার মাধুর্য, তেমনি আবেগ উদ্দামতা—তেমনি সুরের লালিত্য। বেঁচে থাকলে ইংরেজী সাহিত্যে এ কবির স্থান নিশ্চিত।

প্রকাশকরা বিদ্বজ্জনদের প্রশংসাকে কাজে লাগালেন। কিন্তু কবি হাসলেন। কারণ, তিনি ভদ্রলোক নন, ভদ্রমহিলা। তাছাড়া আরও একটু ভুল করেছেন ওঁরা। কবিতাগুলো ওঁরা পড়েছেন বটে, কিন্তু গল্পটা ধরতে পারেননি। তার জন্যে অবশ্য কবির মনে কোন আক্ষেপ নেই। বরং তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কেননা, ওঁরা গল্পটা জেনে গেলে নিশ্চয় আর এমন প্রশংসা করতেন না তাঁকে। এমন কি প্রকাশকরাও ছাপতে সাহসী হতেন কিনা কে জানে। কারণ, যত মানবিকই হোক, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পক্ষে গল্পটা সত্যিই 'শকিং'।

অথচ, মুশকিল হল এই যে গল্পটা সত্য।

মেয়েটির নাম ছিল আদেলা ফ্লোরেন্স। বাবার নাম কর্নেল কোরি। বাবা কাজ করতেন ভারতে। 'সিন্ধ গেজেটিয়ার'-এর সম্পাদক ছিলেন তিনি। আদেলার জন্ম বিলেতে। ১৮৬৫ সনের ৯ই এপ্রিল তারিখে। লেখাপড়াও ওখানেই।

বাবার কাছে আদেলা যখন ভারতে এল—সে তখন কিশোরী। কর্নেল সাহেবের মেয়েটি যখন তরুণী তখন তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে শোনা গেল—সে বাবার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করে। মানে, কিছু কিছু লেখে। কিন্তু সে কদাপি কবিতা নয়, গেজেটিয়ারী গদ্য।

তবে বলবার মত তেমন কিছু না থাকলেও দেখবার মত মেয়ে। রূপসী হয়ত নয়, কিন্তু অসাধারণ চেহারা। নরম 'পেঁপে গাছের' মত প্রাণচঞ্চল দীর্ঘ দেহ (....'I am slim, as this Papaya tree, with breasts out pointing as its fruits beneath this champa tree.) মাথা-ভর্তি সোনালী চুল গভীর পুকুরের মত স্বচ্ছ দুটি চোখ। পুষ্ট ঠোঁট।

আদেলা ফ্লোরেন্স

এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত বলে আদেলা অসাধারণ মেয়ে। সমসাময়িক একজন লেখিকা লিখেছেন—মেয়েটা খুবই ইনটারেস্টিং। আমার মতই রীতি-নীতির ধার ধারে না। সত্যি বলতে কি ওর সেই চমকপ্রদ দেহটার পাশে বসে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিই বোধ করতে হল আমাকে। দিনে দুপুরে একটা খোলা ভিক্টোরিয়া আর একখানা ছোট-গলা হাতকাটা সাটিনের গাউন পরে যদি কেউ বসে থাকে তবে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর কিনা বলুন।

যা হোক, দেখতে দেখতে কুড়ি পেরিয়ে চব্বিশে পা দিলেন কর্নেল কোরির মেয়ে আদেলা। সুতরাং এবার বিয়ে দিতে হয় মেয়েটার। ভারতে তখন পাত্রী কম, পাত্র বেশী। সুতরাং মোটেও ভাবতে হল না বাবাকে। বাসনাটা প্রকাশ পাওয়ামাত্র বিয়ে হয়ে গেল আদেলার। সে ১৮৮৯ সনের কথা।

পাত্রটি সত্যিই যাকে বলে সুপাত্র। বড় চাকুরে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল। অনেকগুলো ভাষা জানেন। কাজ করেন বেঙ্গল আর্মিতে। নাম কর্নেল ম্যালকম হাসেলস নিকলসন। বয়স আটচল্লিশ। অর্থাৎ আদেলার দ্বিগুণ। দুপক্ষের কেউই সেটা ধরলেন না। কারণ পাঁচের কোঠার বরেরাই তখন ভারতে তরুণ জামাই।

বিয়ের পর শুরু হল আদেলার সংসার। নিকলসন প্রবীণ হলেও হৃদয়হীন নন। তিনি আদেলাকে আদর করে নাম দিলেন—ভায়োলেট। ফুলের মত তাজা মেয়ে। ফুলের নামেই ওকে মানায় ভাল।

স্বামীর যাযাবরী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন আদেলা। আজ তিনি এখানে, কাল ওখানে। আজ এই ক্যান্টনমেণ্ট-এ, দু'দিন বাদেই অন্যত্র। ঘুরতে ঘুরতে ১৮৯৪ সনে অবশেষে নিকলসন-দম্পতি এসে হাজির হলেন মাউ-এ। নিকলসন এখন আরও বড় অফিসার। তিনি জেনারেল।

সেকালের যা রাজকীয় প্রথা, ইংরেজ সেনানায়কের সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন স্থানীয় রাজা। বড়া খানার আয়োজন হল রাজপ্রাসাদে। যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন নিকলসন। এই সম্মান এবং ভোজ দুই-ই সমান আকর্ষণীয় তাঁর কাছে। শুধু তাঁর কাছে কেন, যে কোন ইংরেজের কাছে। রাজাদের দরাজ হাত। ভোজের সঙ্গে ভেটও পাওয়া যায়। এমন কি, এক নিমন্ত্রণে জুটে যেতে পারে তিন জীবনের সঞ্চয়।

কিন্তু নিকলসন মন্দভাগ্য। ভোজের শেষে তিনি যখন ঘরে ফিরলেন তখন একজন অন্তত জেনে গেল—তিনি আজ রিক্ত মানুষ। আর কেউ জানে না, হয়ত নিকলসনও না, কিন্তু আদেলা নিশ্চিত জানেন সচরাচর যা ঘটে না তাই ঘটে গেছে আজ। কিছু পেতে গিয়ে, রাজার দরবারে সব কিছু খুইয়ে এসেছেন নিকলসন।

সেই রাত্রেই কবিতা লিখতে বসলেন আদেলা। এগার বছরের বিবাহিত জীবনে যা একদিনও চেষ্টা করেন নি তিনি—সেই কবিতা আজ সহসা ছুটে এল তাঁর বুকে। স্বপ্নের মত লিখে গেলেন আদেলা—

Upon the city ramparts, lit by the Sunset glim
The blue-eyes that conquer, meet the darker eyes that dream
The Dark-eyes so Eastern, and the bule eyes from the west
The last alight with action, the first so full of rest.

* * *

Meet and fall and meet again, then linger, look and smile
Time and distance all forgotten, for a while. ইত্যাদি

দীর্ঘ কবিতা। অনেক কথা। নাম—নগরপ্রাচীরের ধারে। মর্মার্থঃ অস্তমিত সূর্যের আভায় উদ্ভাসিত নগর-প্রাচীরের ধারে ওদের দেখা হল। দুই জোড়া চোখের সাক্ষাৎকার। এক জোড়া চোখ নীল, অন্য জোড়া কালো। নীল চোখ বিজয়ীর মত ঘুরে বেড়ায়, কালো চোখ স্বপ্ন দেখে। নীল—পশ্চিমের, কালো—পূর্বদেশীয়। কালো চোখে অনেক রহস্য, যুগ-যুগান্তের ইতিহাসের যাদু তাতে। নীল চোখ সদ্যজাত নবীন। আবার দুই চোখে দেখা। আবার, আবার। এবার একটু বিলম্বিত হল সেই সাক্ষাৎকার। দুজনেই হাসল একটু। তারপর—

East and the West so blending, for a little space,
All the sunshine seems to centre, round that enchanted place!

আকস্মিকভাবেই কালো চোখের ভালবাসায় পড়ে গেলেন আদেলা। একটি কবিতা শেষ হল বটে কিন্তু কাহিনীর তখন মোটে শুরু।

ইংরেজ-কন্যা আদেলা যেন এখন কুমারী। যেন কোন অ্যাংলোস্যাক্সন কুমারকেই ভালবেসেছেন তিনি। সামাজিকতার সমস্ত নিয়মকে অগ্রাহ্য করে সহসা একটি ভারতীয় যুবককে নিয়ে ক্ষেপে গেলেন মিসেস নিকলসন। সুযোগ পেলেই দু'জনে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। কখনও জনবিরল পাহাড় এবং বন এলাকায়। কখনও মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে অথচ কৌতূহলী চোখ তেড়ে আসে না এমন জায়গায়। ওঁরা কাছাকাছি বসেন। কথা বলেন, কথা শোনেন। স্বপ্নের মত কেটে যায় এক একটা দিন। অধীর অপেক্ষায় পরের দিনটির জন্যে স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকে একটির পর একটি রাত।

রাতে কবিতা লেখেন আদেলা।

Nearer and nearer cometh the car
Where the golden goddess towers,
Sweeter and sweeter grows the air
From a thousand trampled flowers,
We two rest in the temple shade
Safe from the pilgrim's flood. ইত্যাদি।

দিনে দিনে ক্রমেই কাছাকাছি হলেন ওঁরা। পশ্চিমের কর্নেল-কন্যা আর আর পূর্বের রাজকুমার। উত্তর ভারতের রহস্যময় সন্ধ্যায় ক্রমেই যেন রহস্যময় হয়ে উঠল ওঁদের সম্পর্ক। বাঁধভাঙা নদীর মত সব তুচ্ছ করে এগিয়ে চললেন আদেলা, জেনারেল নিকলসন-এর বিবাহিতা পত্নী।

দেখতে দেখতে কাহিনীর সঙ্গে তাল দিয়ে কবিতাও হল অনেকগুলো। মিসেস নিকলসন স্থির করলেন সেগুলো ছাপাবেন। তাঁর এই ভালবাসার কথা কি লোকেদের শোনাবার মত কথা নয়? তারুণ্যের কাছে উৎসর্গীকৃত এই যৌবন—সেকি রাজা-প্রজা সম্পর্কের কারণেই না শোনবার মত গান?

১৯০১ সন। বিলেত থেকে ছাপা হয়ে বের হল আদেলার প্রথম কবিতা-গুচ্ছ। প্রকাশক—উইলিয়াম হেইনমান। বইয়ের নাম—'দি গার্ডেন অব কাম অ্যাণ্ড আদার লাভ লিরিকস ফ্রম ইণ্ডিয়া'। কবির নাম—লরেন্স হোপ।

বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল লরেন্স হোপের নাম। কিন্তু কেউ একবার ভাবতেও পারলেন না—ভারতবাসী এই কবিটি নিকলসন-গৃহিণী আদেলা। এবং যাঁকে নিয়ে তাঁর এই কামনা-উচ্ছ্বাস সে একটি ভারতীয় যুবক।

চার বছর পরে বের হল তাঁর দ্বিতীয় বই। নাম—'ইণ্ডিয়ান লাভ!' এবার কানাঘুষায় কবির ছদ্মনামটা খসে পড়ল বটে, কিন্তু তাঁর নায়ক সেই রহস্যাবৃতই রয়ে গেলেন। তবে কারও কারও এটা বুঝতে আর অসুবিধা হল না যে, লোকটি যেই হোক, তিনি নিশ্চয় আদেলার বৃদ্ধ স্বামীটি নন। অন্তত, সমরসেট মম-এর তাই ধারণা। তাঁর নোট বইয়ে তিনি লিখেছেনঃ সবাই ভায়োলেট ফ্লোরেন্সকে নিয়ে গল্প করছে। সে একটি আবেগমথিত প্রেমের কবিতার বই লিখেছে। স্পষ্টতই বোঝা যায় কিছুতেই তার স্বামী এগুলোর উপলক্ষ্য নয়। তবুও কিছুতেই কেউ বিশ্বাস করবে না যে স্বামীর নাকের ডগায় বসে কোন মহিলার পক্ষে দিনের পর দিন এ ধরনের ব্যাপার সম্ভব।

(It makes them laugh to think that she'd carried on a long affair under his nose, and they'd have given anything to know what he felt when at last he read them.)

স্বামীর চোখের সামনে আদেলার মত জীবন অসম্ভব?—কী ভাবতে পারে নিকলসন পরপুরুষের উদ্দেশ্যে লেখা স্ত্রীর কবিতা পড়ে? মম একটি গল্প লিখে উত্তর দিলেন তার। যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন,—তাঁর 'কর্নেলস লেডি' গল্পটা আদেলার অবয়ব ধরেই লেখা।

উত্তরটা আদেলা নিজেও যে না দিয়েছেন তা নয়। নিকলসন তাঁকে ভালবাসতেন না এমন কথা তিনি কখনও বলেননি। একটি কবিতায় এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তার যুক্তি অতি সহজ ঃ আমার কাজিন আমাকে ভালবাসে, তার করুণাভরা চোখগুলো বলে সে সুখী। আমি তাকে বিয়ে করে তাকে সুখী করেছি—এবার তুমি আমাকে সুখী কর বন্ধু।

পাপ হবে?

—"The sins of youth, are hardly sins.
So frank they are and free"

আদেলা বলেন—যৌবনের কাছে কোন পাপই পাপ নয়। নৈতিকতা আমরা চাইব তখনই যখন গড়িয়ে আসবে আমাদের বয়স। ('Tis but when middle-age begins, we need morality)

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। অন্তরঙ্গ মানসিক সুর। ভারতীয় যুবককে ভালবেসে দূরের দেশ ভারতবর্ষকেও ভালবেসে ফেললেন আদেলা। 'ইন্ডিয়ান লাভ'-এর একটি কবিতায় তিনি বলছেন ঃ এরাই আমার লোক, এই আমার দেশ। এই দেশের গোপন অন্তঃকরণের প্রতিটি স্পন্দন আমি শুনতে পাই। একমাত্র এই দেশের জীবনকেই আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পাই।...

"Savage and simple and sane and whole
Washed in the light of a clear fierce sun
Heart, my heart, thy journey is done".

সুতরাং আদেলা ডুবে গেলেন। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেললেন তিনি। নিকলসনের ষাট বছরের অক্ষম চোখের সামনে একটা বছর ঘুরে আসতে না আসতেই রীতিমত জমে উঠল গল্পটা। আদেলা নিজেই ঘোষণা করলেন একদিন, তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

বিয়ের এগার বছর পরে প্রথমবারের মত মা হলেন আদেলা। ১৯০০ সনে একটি ছেলে হল তাঁর। ঘটনাটার মধ্যে অসাধারণত্ব হয়ত কিছু নেই। কিন্তু আদেলা অসাধারণ মেয়ে; সমালোচকেরা একটু নজর করলেই দেখতে পারতেন গোড়া থেকেই কবি লরেন্স হোপ-এর এটা অন্যতম প্রার্থনা। তিনি স্পষ্ট লিখছন—আহা, কি সুন্দরই না হত যদি আমাদের এই ফুলের মরসুম থেকে নতুন কোন জীবন ফুল হয়ে ফুটে উঠত। লোকেরা হয়ত তার নাম দিত কলঙ্কের সন্তান। কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা নিশ্চয় একটা মিষ্টি নাম দিত ওকে। তারা ওকে ডাকত—প্রেম-শিশু।...নিজের আইন কানুনে মানুষ অন্ধ। কিন্তু কেউ কেউ সত্যটুকু দেখতে পায়। যদি নিজের হাতে নিজের ভাগ্যকে লেখবার অধিকার পেতাম আমি, তাহলে, আমি জানি বর্ণহীন

রুটিন বাঁধা জীবনের সন্তান হওয়ার চেয়ে এই উদ্দাম জীবনের ফসল হতে পারলেই আনন্দিত হতাম আমি।

"If my own hand had written my fate
I know I had rather been
Fruit of a wild and exquisite love
Than a child of dull routine."

অন্যত্র তাঁর প্রার্থনা আরও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—আহা, যদি তোমার করুণা হত। যদি তুমি চিরকালের জন্য তোমার পরিচয়কে আমার ওপর লিখে দিতে! ওগো, তুমি তাই দাও। আমার প্রথম সন্তান যেন তোমারই হয়। (..My first-born should be thine, then all my life will, and just keep the memory of thee..)

সেই প্রার্থনা পূরণের সংবাদও আছে লরেন্স হোপ-এর কবিতায়।

"Justly I worship thee! thou art divine
Creating thus thy life anew in mine."

অর্থাৎ তুমি মহান। কারণ তুমি নতুন করে নিজেকে সৃষ্টি করেছ আমার মধ্যে।

ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হল। পরের বছরই আদেলার প্রথম বই। দেখতে দেখতে কেটে গেল মাউ-এর বছর কটা। এবার যা অনিবার্য তাই হল। গল্প দ্রুত এগিয়ে চলল উপসংহারের দিকে। সামরিক বিভাগের কর্মচারী নিকলসনকে এবার যেতে হবে মাদ্রাজ।

বিদায়-পর্বে অনেক কাঁদলেন আদেলা। অনেক কবিতা লিখলেন। যা আস্বাদ করেছেন এই কটি বছরে তার বিবরণ। যা হাতে পেয়েও আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলেন না তার কথা। খাতার পাতা ফুরিয়ে এল। মিলিটারী তাঁবুর সঙ্গে সে খাতা বাঁধা হয়ে গেল। বৃদ্ধ স্বামীর পিছনে পিছনে 'প্রেম-শিশু'কে কোলে নিয়ে জীবনের রুটিন রক্ষা করতে চললেন আদেলা। ১৯০৪ সন। মাউকে বিদায় জানিয়ে নিকলসনরা মাদ্রাজে এসে পৌঁছলেন।

মাদ্রাজে পৌঁছেই বৃদ্ধ নিকলসন শয্যা নিলেন। একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল তাঁকে। কিন্তু নিকলসনকে কিছুতেই বাঁচান গেল না।

মাউ-এ লেখা সেই স্বপ্নমণ্ডিত কবিতার খাতাটা বের করলেন আদেলা। বাছাই করে বই বাঁধলেন একটা। নাম দিলেন—'ইণ্ডিয়ান লাভ'। উৎসর্গ-পত্রে লিখলেন ম্যালকম নিকলসনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ কবিতা। তার মর্মঃ তোমাকে নিয়ে আমি কখনও কবিতা লিখিনি। কারণ তুমি ছিলে মহান। তোমার-আমার সম্পর্ককে তাই আমি জনতার মুখে মুখে ফিরি হতে দিইনি।

শেষে লিখেছেন ঃ আমি ভাগ্যহীনা। পনের বছরের বিবাহিত জীবনে তোমাকে কোন আনন্দই দিতে পারিনি আমি। কারণ আমাদের যখন দেখা হল নানা বেদনায় তখন তুমি রিক্ত। সুতরাং আজ মিছেই আমার আক্ষেপ।...ইত্যাদি।

এই বইখানা নিয়ে লণ্ডনের নানা মহলে নানা গবেষণার কথা আগেই বলেছি। এবার সহজেই ধরা পড়ে গেলেন আদেলা। মম ছাড়াও অনেকে জেনে গেলেন লরেন্স হোপ-এর আসল নাম।

কিন্তু হাতেনাতে ধরা গেল না তাঁকে। নিকলসন মারা যাওয়ার পর দুটো মাসও কাটল না। 'ইণ্ডিয়ান লাভ' পড়া তখনও শেষ হয়নি পাঠকদের। কৌতূহলীরা তখনও আড্ডায় আড্ডায় আদেলা ফ্লোরেন্সকে নিয়ে নানা রঙ্গীন গল্পে মত্ত। এমন সময় সহসা একদিন মাদ্রাজের খবর এসে পৌঁছাল লণ্ডনে। ৪ঠা অক্টোবর, ১৯০৪ সন। গুণগ্রাহী পাঠকেরা শুনলেন তাঁদের প্রিয় কবি লরেন্স হোপ আর ইহলোকে নেই। তর্কটাকে আরও জটিল করে দিয়ে নিজের হাতে বিষ খেয়েছেন আদেলা। কবিতা আগেই থেমে গিয়েছিল। এবার চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর মুখও। সাক্ষীর কাঠগড়ায় এখন থাকল শুধু—দুটি বই আর কতকগুলো কবিতা।

কবিতার জবানবন্দীতে কি আদেলাকে অসামাজিকতার আদালতে দাঁড় করাতে পারতো ভারতবাসীরা? দু'চারজন বাদ দিলে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ একবাক্যে বলতো—না, তা পার না। কেননা, আদেলা রাজকুলজাতা, আর তোমরা প্রজাকুল। আমরা পশ্চিমী, তোমরা পূর্বদেশীয়। আমাদের ঘরের মেয়ে হিদেনকে এমনভাবে ভালবাসতে পারে কখনো?

ইতিহাসে এর বিপরীত সাক্ষ্য ইংরেজরা অনেক রেখে গেছেন। থ্যাকারে তাঁর 'নিউ কামার'-এ জিজ্ঞেস করছেনঃ—'স্যর টমাস, আমার খুড়োর বিরুদ্ধে আপনার কি কিছু বলবার আছে? আমার কি ব্রাহ্মণ্যসূত্রে কোন খুড়তুত ভাইবোন আছে? আমাদের কি তার জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত?'

থ্যাকারের ব্যঙ্গের সুরটা খুব সরল। সেকালে সাদা-কালোর আত্মীয়তায় মোটেও লজ্জিত হতেন না ইংরেজরা। অন্তত ভারতীয় ইংরেজ সমাজে যাঁরা বড় তরফের মানুষ—তাঁদের অনেকেই যে তা হননি তার সাক্ষ্য বিস্তর। এখানে সেগুলো বলে লাভ নেই।

বলা যেতে পারে—এগুলো সবই পাত্রপক্ষের খবর। বিদেশ-বিভুঁয়ে যে কোন জাতিই তা করে থাকে। কিন্তু তাই বলে ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে ভারতীয় যুবকের প্রেম? আজকাল তা আকছার হতে পারে। কিন্তু সেকালের ভারতে? সিপাহী বিদ্রোহের ক'বছরের মধ্যেই?—অসম্ভব।

ভালবাসার ধর্ম যাঁরা বোঝেন তাঁরা বলেন—সম্ভব। তবে অধিকাংশই বলেন—মনে মনে। কেননা, একটা জাতির ইজ্জত তার সঙ্গে জড়িত। এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই জাতিটা স্ব-জাতি।

তবুও লরেন্স হোপ তথা আদেলাকে রহস্যে ঢেকে রাখলেও এমন ঘটনার ইতিহাসও আছে ভারতে। সেকালের ভারতেই। লক্ষ্মৌর নবাব নাসীর-উদ্দিনের হারেমবাসিনী মকুদেরা আউলিয়া নামে মেয়েটি কি ওয়াল্টারদের ঘরের মেয়ে নয়? সে কি স্বেচ্ছায় বরণ করেনি নবাবের পত্নীত্ব? ইংরেজেরা কৈফিয়ত দিয়েছিলেন—তা সত্য বটে, কিন্তু মেয়েটা আসলে ওয়াল্টার সাহেবের বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নয়!

সৌভাগ্য, লরেন্স হোপ-এর নামে এ ধরনের কোন কৈফিয়ত চালাতে চাননি তাঁরা। যাঁরা সাধারণত তা করে থাকেন—আগাগোড়া তাঁরা মৌন। এদেশে ও ওদেশে আদেলার রহস্যময় প্রণয়কাহিনীকে নিয়ে বহু প্রকাশ্য আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তা নাকচ করে দেওয়ার কোন প্রচেষ্টার কথা শোনা যায়নি। অবজ্ঞাকেই ঢাল করে আগাগোড়া আত্মরক্ষা করে আসছেন সাবধানী

প্রতিপক্ষ। কারণ তাছাড়া তাঁদের উপায় নেই। এতগুলো কবিতাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার মত কোন কৈফিয়ত নেই। কিন্তু লরেন্স হোপ কৈফিয়ত রেখে গেছেন, তাঁর নিজের তথাকথিত অস্বাভাবিক আচরণের কৈফিয়ত।

প্রথম কৈফিয়ত তাঁর কবিতা। কবিতাই আদেলার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। কবি মাত্রেরই তাই। কারও কারও ক্ষেত্রে আগে পিছে দু'চারটি ছত্রে কিছু 'মিথ্যা' হয়ত থাকে, কিন্তু আদেলার কামনামথিত কবিতাগুলোতে তা নেই বলেই অধিকাংশের ধারণা। কারণ, আদেলা 'জাত-কবি' ছিলেন না। কবি-কর্মের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিল নগণ্য। মাউ-এর বনভূমিই চকিতে একদিন কবি করে তুলেছিল তাঁকে। সেই সোনালী জীবনের মেয়াদ ছিল মাত্র চার বছর। এই চার বছরের জন্যে কবি হয়েছিলেন তিনি। তারপর আবার সেই মৌনতা। আবার সেই ছক-বাঁধা জীবনের কাছে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ।

মাঝখানের সেই স্বল্পায়ু অধ্যায়টিরও কৈফিয়ত দিয়ে গেছেন মিসেস নিকলসন। আদেলা বলেন—কৈফিয়ত আমার যৌবন—কৈফিয়ত তার যৌবন (I only know that he pleaded youth, A beautiful golden plea.)

সুতরাং এর পরও যদি কেউ সম্ভব অসম্ভব নিয়ে তর্ক করতে চান, তবে তিনি তা করতে পারেন। আমরা নিশ্চিত জানি, মাদ্রাজের সেণ্ট মেরী সমাধিক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবেন কর্নেল কোরির মেয়ে আদেলা। জেনারেল নিকলসনের স্ত্রী ভায়োলেট। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি। কারণ যৌবন তাঁর তুষ্ট।

> 'If fate should say,—Thy course is run
> It would not make me sad;
> All that I wished to do is done.'
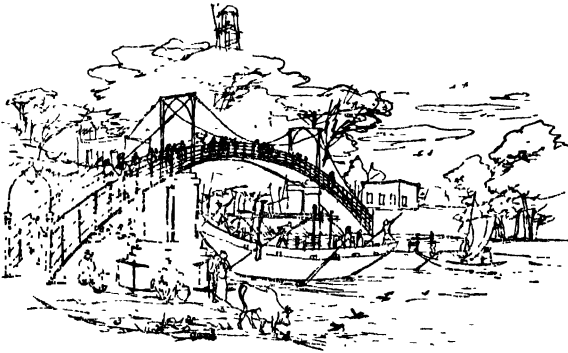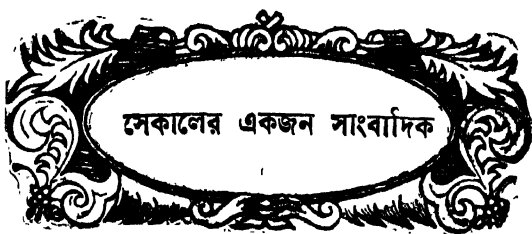
সাংবাদিক বাকিংহাম আর সরকারী কর্মচারী জেমসন সাহেবের ডুয়েল-সমাচারের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু বাকিংহামের কথা বলা হয়নি।

কলকাতার সেই ঘটনার পনের বছর পরের কথা। বাকিংহাম তখন আমেরিকায়—ওয়াশিংটনে। একদিন খবর পেলেন দু'জন মার্কিনী সিনেটার ডুয়েল লড়ছেন। পরক্ষণেই খবর এলো—একজন নিহত।

—ডুয়েলিং?—নিহত?—ক্ষেপে গেলেন বাকিংহাম। মার্কিন কংগ্রেসের উভয় পক্ষের সম্মিলিত শোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন: যে লড়াইয়ে একজন সদস্যকে হারালেন আপনারা তা 'বর্বরের লড়াই।' আমি চাই এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবশেষটুকু আপনারা আইন করে চিরকালের মত মুছে দিন।

ঠিক এই কথাই বাকিংহাম পর পর তিনবার বোঝাতে চেয়েছিলেন বৃটিশ পার্লামেণ্টকে। ডুয়েলিং বর্বরের খেলা। এ খেলায় প্রকাশ্যে পার্লামেণ্টের অসম্মতি জ্ঞাপন করা হোক।

অথচ আশ্চর্য, এই বাকিংহামকেও একদিন নামতে হয়েছিল পিস্তল হাতে। কলকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠে। অবতীর্ণ হতে হয়েছিল দ্বৈরথ সংগ্রামে। ডাঃ জেমসনের চ্যালেঞ্জের উত্তরে কলম ছেড়ে পিস্তলই হাতে তুলে নিয়েছিলেন সম্পাদক বাকিংহাম। সম্পাদকের পক্ষে কলমের লড়াই-ই অভিপ্রেত বাকিংহাম তা জানতেন। তবুও পিস্তলে হাত দিতে ইতস্তত করেননি তিনি। কারণ সেদিনের এই লড়াই পিস্তলের লড়াই হলেও আসলে ছিল কলমেরই লড়াই। কলমের ইজ্জতের নামে—পিস্তলের লড়াই। কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে শোনবার মত।

ডাঃ জেমসন রাজানুগৃহীত ব্যক্তি। কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে ইতিমধ্যেই তিনি তিন-তিনটি বিশিষ্ট পদের অধিকারী। একাধারে তিনি মেডিকেল বোর্ডের সেক্রেটারী, স্টেশনারী বিভাগের কেরানী এবং ফ্রি স্কুলের সার্জন। তার উপর যখন কলকাতার সরকার বাহাদুর তাঁকে চতুর্থ পদ হিসেবে দিতে চাইলেন--ভারতীয়দের জন্য মেডিকেল স্কুলের সুপারিণ্টেডেণ্টের পদটিও—তখন বাকিংহাম আর পারলেন না—তিনি সমস্ত ফলাফল জেনেও লিখলেন: এ অন্যায়। একজনকে চার চারটি পদে বিভূষিত করা শুধু অশোভন নয়, অত্যন্ত অসঙ্গত। বিশেষত ডাঃ জেমসনের একাজ করার মত সময় এবং যোগ্যতা দুটোই যখন নেই—তখন এতটা বাড়াবাড়ি করা কি কর্তৃপক্ষের উচিত?

কর্তৃপক্ষ তো ক্ষেপেই ছিলেন। ক্ষেপে গেলেন ডাঃ জেমসনও। খবরের কাগজে তাঁর এতগুলো পদের খবর বের হয়ে যেতে পারে কোন দিন তা তিনি ভাবেন নি। তিনি বাকিংহামের নামে অভিযোগ করলেন সরকারের কাছে। সে অভিযোগ কার্য-কারণের যোগে বিফল হয়ে গেল।

সুতরাং বীরের মত তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিতে বাকিংহামকেই অগত্যা আহ্বান জানালেন জেমসন দ্বৈরথ সংগ্রামে।

সে লড়াইয়ের ফলাফল 'সমাচার দর্পণের' খবরেই আছে। কেউ হারলেন না। সম্মানে দু'জনেই রীতি অনুযায়ী সমান রইলেন।

কিন্তু বলা বাহুল্য, ডুয়েলে সমান হলেও জেমস সিল্ক বাকিংহাম—শুধু ডাঃ জেমসন নয়—তাঁর কালের অনেক তথাকথিত বড় মানুষের চেয়েও অনেক বড় ছিলেন। লড়াইয়ের কথাই যদি বলি, তাঁর ঊনসত্তর বছরের জীবনে বাকিংহাম অনেক লড়াই লড়েছেন। অনেক ওয়াটারলু জিতেছেন, গড়ের মাঠের বৃক্ষতলে জনৈক ডাঃ জেমসনের সঙ্গে তথাকথিত লড়াই তাঁর কাছে তুচ্ছ নগণ্য। বস্তুত বাকিংহামের দীর্ঘ ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর জীবনে কলকাতা একটা অধ্যায় মাত্র। নয় বছর বয়সে কর্ণওয়েলেসের এই ছেলে যখন একটা নগণ্য পরিচারক হিসেবে জাহাজে উঠেছিলেন, তখন তাঁর লক্ষ্য ভারতবর্ষ বা কলকাতা ছিল না। তেমনি ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষের প্রথম দৈনিক পত্রের সম্পাদক, ভারতখ্যাত জেমস সিল্ক বাকিংহাম যখন আবার পা নামিয়েছিলেন স্বদেশের মাটিতে—কলকাতার 'ক্যালকাটা জার্নাল'ই তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল না। বাকিংহাম নিজের পরিচয়েই সেদিন সম্বর্ধিত হয়েছিলেন, সম্মানিত হয়েছিলেন। কোন দিনই কোন বিশেষ পরিচয় তাঁর শেষ-পরিচয় ছিল না। এদেশের মাটিতে বিচিত্র পরিচয়ের এই বিরাট মানুষটির পাতা খোলার আগে পারিপার্শ্বিকের দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়া ভাল।

বিশেষত বাকিংহামের কলকাতার সঙ্গে সমসাময়িক সাংবাদিক হিকি বা ডুয়েনের কলকাতার মিলের মত গরমিলও ছিল অনেক। কলকাতায় তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির রাজত্ব, এবং মন্ত্রীত্বে অর্থাৎ কাউন্সিলে, দপ্তরে তখনও অ্যাডাম, বার্লোদেরই প্রভুত্ব। ওয়েলেস্‌লি নিজেকে ভাবতেন—প্রাচ্যখণ্ডের মহামান্বিত অধীশ্বর। সম্রাটোচিত জাঁকজমকের জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিল—খ্যাতি ছিল ততোধিক তেজ এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্যেও। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, তিনি বা তাঁর শাসন সমালোচনাতীত। তাছাড়া সম্পাদকের মত ক্ষীণজীবি সাধারণ মানুষেরা লাট বাহাদুরের সমালোচনা করবে—এটা ভাবতেও রীতিমত পীড়া বোধ করতেন তিনি।

এ ব্যাপারে কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার জন অ্যাডামও ছিলেন তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। সিবিলিয়ন-পুত্র অ্যাডাম ষোল বছর বয়স থেকেই ভারতবাসী। যে ইংলণ্ডকে বাল্যে দেখেছেন তিনি, পরিণত বয়সেও সেই টোরী মতাবলম্বী ইংলণ্ডের স্বপ্ন, আর বিশ্বাস জড়িয়ে ছিল তাঁর চোখে-মনে। শাসন—শাসনই। স্বাধীনতা আর শাসন এক নয়, এক নয় সম্পাদক আর সরকারী শাসন-বিভাগের দায়িত্ব।

ফলে সম্পাদকের কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে ওয়েলেস্‌লি যেদিন ঘোষণা করলেন—'আমি এর সংস্কার করব। এখানকার মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-

ধারার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটাতে চাই আমি। নয়ত যা দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসছে যেদিন কলকাতার ইউরোপীয়ান সমাজ যদি একান্তই বৃটিশ-রাজ উৎখাতে সমর্থ না হয়, অন্ততপক্ষে নিজেরাই তা চালাবে। আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যে আমার মেজাজ এবং চরিত্র তাঁরা জানার সুযোগ পেয়েছেন, সুতরাং এ সময়েই আমি তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই, সরকারী কুৎসা রটনায় যাঁরা নামতে চান, তাঁরা যেন এটা মনে রাখেন—এমন বাসনার অর্থ হবে—একটা বিরাট গভর্ণমেণ্টের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।'

দেখতে দেখতে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল তাঁর সঙ্কল্প। অধস্তন এক কর্মচারীকে আশ্বাস দিতে গিয়ে তিনি জানালেন—'ব্যস্ত হবেন না, শিগগীরই আমি এমন বিধি প্রবর্তন করছি যাতে সমগ্র সম্পাদকগোষ্ঠী (whole tribe of editors) ভবিষ্যতের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন। আর ইতিমধ্যে যদি এমনই বিপাকে পড়ে যান তবে—বলপ্রয়োগ করে ওদের কাগজ বন্ধ করে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবেন না। দরকার হয়—বে-আদব সম্পাদকদের ধরে ইউরোপে চালান করে দেবেন।' সম্পাদক মানে, তাঁর মতে একশ্রেণীর বাউণ্ডুলে। অন্য কোন মতেই রুজি রোজগারের পথ যাদের নেই—তারাই এখানে সম্পাদক!

বাচনে জন অ্যাডাম আরও স্পষ্ট। খবরের কাগজওয়ালারা সরকারের সমালোচনা করবে, মতামত নিয়ন্ত্রণ করবে এ কেমন কথা! তারা কি সরকারের চেয়েও ক্ষমতাবান? 'পাবলিক ওপিনিয়ন—' জনগণের মত?—হাস্যকর প্রস্তাব। 'I cannot imagine a greater political absurdity than a Government controlled by the voice of its own servants!'

সুতরাং অনতিবিলম্বেই বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। প্রথমবারের মত 'প্রেস সেন্সার' বা পত্র-পত্রিকা নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী হলো কলকাতায়। সে ১৭৯৯ সালের ১৩ই মে'র কথা। কলকাতার খবরের কাগজের মালিক এবং সম্পাদকেরা ভয়ে ভয়ে সরকারী চিঠি খুলে রুদ্ধশ্বাসে পড়লেন—এবার থেকে তাঁদের কাগজে মুদ্রাকরের এবং প্রকাশকের নাম দিতে হবে, প্রত্যেক সম্পাদক এবং মালিককে তাঁদের নাম ঠিকানা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সরকার বাহাদুরকে জানাতে হবে, তৃতীয়ত, গীর্জার দিনে অর্থাৎ রবিবারে ধর্মকর্ম বন্ধ রেখে বসে বসে কাগজ ছাপা চলবে না, চতুর্থত আদৌ কোন কাগজই ছাপা চলবে না, যদি আগে থেকেই তা সরকার বাহাদুরকে দেখিয়ে মঞ্জুর না করিয়ে নেওয়া হয়। এখানেই শেষ নয়, তার পরেও পঞ্চম তথা সর্বশেষ ধারায় স্পষ্টত বলে দেওয়া হলো—যদি এই চারটে আদেশের কোনটায় শৈথিল্য দেখানো হয়, তবে অবধারিত শাস্তি হবে—সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে চালান।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল সব সম্পাদকদের। ইতিমধ্যেই উপযুক্ত আইন বিহীন কর্তৃপক্ষের বে-আইনী ক্ষমতা তাঁরা দেখেছেন। এবার তৈরী হয়েছে আইনও। সুতরাং সেই দিনই কলকাতার সব কটি কাগজ সরকারী চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে উত্তর দিলেন, 'মহামান্য সরকার বাহাদুরের আদেশ প্রতিপালনে আমাদের তরফ থেকে কোন অবহেলা হবে না সবিনয়ে এই আশ্বাস

দিচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন—কখন এবং কোথায় আপনাদের প্রুফ বা প্রকাশিতব্য কাগজের কপি দেখার সময় হবে।'

কপি যিনি দেখবেন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো—এগুলো যেন কোন কাগজে না থাকে—(১) সরকারী ধনভাণ্ডারের কোন্ সংবাদ (২) সৈন্য বাহিনী, রসদ ইত্যাদি বিষয়ক সংবাদ (৩) কোন জাহাজ কবে কোথায় আছে, থাকবে বা যাত্রা করবে এসব (৪) সিবিল কিংবা মিলিটারী যে কোন বিভাগের কোন সরকারী কর্মচারীর কাজের বা আচরণের সমালোচনা (৫) ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারী বা কেচ্ছা (৬) কোম্পানী ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বা শান্তির সম্ভাবনা বিষয়ে কোন আলোচনা (৭) এমন কোন সংবাদ যা আমাদের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে পারে কিংবা আমাদের অধীন প্রজাবর্গের মনে অসন্তুষ্টি বা আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারে এবং সর্বশেষ (৮) ইউরোপীয় সংবাদপত্রাদি থেকে কোন উদ্ধৃতি যা আমাদের বা আমাদের শাসন-কর্তৃপক্ষের এদেশের প্রভাব প্রতিপত্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

অর্থাৎ—এগুলো কাগজে থাকবে না! এছাড়া যদি সংবাদপত্র হয়, তবে আপত্তি নেই, যদি না হয় তবে আমাদের করবারও কিছু নেই।

এই তখনকার কলকাতার সংবাদপত্র জগতের স্থায়ী বিধান। তার উপর আছে এখন-তখন নিত্য নতুন ফতোয়া। গভর্ণর জেনারেল যুদ্ধে যাচ্ছেন। খবরদার, যদি সে সব বিষয় কেউ ছাপ—তবে টিপু সুলতানকে খতম না করে তোমাদেরই করব। এমনি সব ফতোয়া। অত্যন্ত রূঢ়, অত্যন্ত উদ্ধত। শোনা যায় ওয়েলেসলি নিজেই নাকি পরবর্তীকালে লজ্জা পেতেন এগুলো পড়তে। তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে—খবরের কাগজ সম্বন্ধে লেখা তাঁর বিবৃতি-গুলো বাদ দিতে নাকি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন—ঐ সংগ্রহের সম্পাদককে!

সেন্সার বিধির সঙ্গে ক্রমে এল আরও বিধি। সম্পাদক-শাসনের আইন-সম্মত কৌশল। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কোন ছাপা কাগজ—তা বই, বিজ্ঞাপন, বিবৃতি বা খবরের কাগজ যাই হোক—প্রত্যেকটির নীচে ছাপাখানা, মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের নাম ছাপাতে হবে (১৮১১)। এ রীতিটা আজও চালু আছে। এর জন্ম—লর্ড মিণ্টোর আমলে। ওয়েলেসলির পরে দ্বিতীয়বারের মত গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন—লর্ড কর্ণওয়ালিশ। তারপর মিণ্টো। মিণ্টোর পর এলেন, লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস।

লর্ড হেস্টিংস ওয়ারেন হেস্টিংসের মত তো ছিলেনই না—তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গেও বিন্দুমাত্র মিল ছিল না তাঁর চরিত্রের। দৃষ্টিতে এবং চরিত্রে অনেক উদার ছিলেন তিনি।

এদেশে এসেই ওয়েলেসলির সম্পাদক-শাসনের কৌশলটি তাঁর কাছে মনে হলো, একটু বাড়াবাড়ি—হয়ত অসঙ্গতও।

এক সম্পাদক হঠাৎ বেঁকে বসলেন একদিন। সরকারী বিভাগীয় কর্তাকে পরের দিনের কাগজের কপি দেখাতে নিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। সেক্রেটারী একটা খবর দেখিয়ে বললেন—এটা বাদ দিতে হবে।

—কেন?

কুড়ি বছর মাথা নীচু করে ফতোয়ার পর ফতোয়া হজম করে করে এবং

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করে করে অবশেষে সহসা একদিন একজন সম্পাদক সেক্রেটারী বেইলির মুখোমুখি বসে জানতে চাইলেন, —কেন? কেন বাদ দেব?

—আপত্তিকর বলে।

—কে বললে আপত্তিকর?

—আমি বলছি।

—আমি ছাপব।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সম্পাদক। বসে বসে রাগে কাঁপতে লাগলেন ১৭৯৩এর সেই আইনের অন্যতম জনক, সেক্রেটারী বেইলি।

পরদিন কাগজ বের হলো। তাতে সেই নিষিদ্ধ সংবাদটিও।

সম্পাদককে কৈফিয়ত তলব করা হলো।

তিনি উত্তর দিলেন—আমি কোম্পানীর দয়ায় ভারতবর্ষে বাস করছি না। যদিও আমার পিতা ইউরোপীয় এবং বৃটিশরাজ্যের প্রজা, আমার মা এদেশের মেয়ে। আমি এদেশের সন্তান। আমি ডুয়েন নই—যে কোম্পানীর রক্ষণাবেক্ষণের অযোগ্য বলে দেশে পাঠিয়ে দেবে। এইটেই আমার দেশ এবং সে দিক থেকে তোমাদের তথাকথিত এক্তিয়ারের বাইরে আমি।

বেইলী কর্তৃপক্ষকে জানালেন—সেন্সার মানে যদি এই হয়, আমার কর্তৃত্বের কোন ক্ষমতাই না থাকে তবে কাগজে-কলমে এ রাখার আর যৌক্তিকতা কি?

—ঠিকই, কোন যৌক্তিকতা নেই। মানুষের বাচনের স্বাধীনতার উপর এত এত আইনের পাষাণ চাপানোর কোন যৌক্তিকতা নেই। ঘোষণা করলেন—লর্ড হেস্টিংস।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের সভায় দাঁড়িয়ে তিনি জানালেন—শুধু ইংরেজী কাগজ নয়, এদেশের ভাষায় এদেশবাসীদের কাগজ প্রকাশকে আমি অভিনন্দিত করি। 'It is human, it is generous to protect the feeble; it is meritorious to redress the injured; but it is god-like bounty to bestow expansion of intellect, to infuse the Promethean spark into the statue and waken it into a man.'

তিনি পত্রিকা-নিয়ন্ত্রণ-বিধি উঠিয়ে দিলেন। সেটি খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হলেও, তাঁর চার পাশে একটা কাউন্সিল ছিল। এবং অ্যাডামেরা ছিলেন তার সদস্য। তাই পূর্বতন বিধি উঠিয়ে দিলেও হেস্টিংসকে নতুন বিধি রচনা করতে হলো। তাতে সম্পাদকদের পূর্বাহ্নেই কাগজ দাখিল করার দায় থেকে অব্যাহতি দিলেও, নূতন দায়িত্ব চাপানো হলো তাঁদের উপর। এবার থেকে তাঁরাই নজর রাখবেন—কাগজে যেন আপত্তিকর বা ক্ষতিকারক কিছু বের না হয়। এটা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব এবং সরকারবাহাদুর আশা করেন—দায়িত্বশীল সম্পাদকেরা এ দায়িত্ব পালনে আপত্তি করবেন না।

যদিও প্রস্তাব হিসেবে এটা পূর্বতন বিধির চেয়ে অনেক ভদ্র এবং নরম বলে মনে হয়—তবুও দুটোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য অতি সামান্য। কারণ সম্পাদকের দায় এবং দায়িত্ব এবার থেকে বেড়ে গেল—কমল না মোটেও।

তবুও লর্ড হেস্টিংসের এই সামান্য উদার ঘোষণাটাকেই কলকাতার

সম্পাদকেরা গ্রহণ করলেন, স্বাধীনতার সনদ বলে। শুধু কলকাতা নয়, মাদ্রাজ বোম্বাইয়ে যখন এ খবর পেঁছালো—তখন রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো বিধানে বিধিতে পীড়িত সম্পাদক মহলে। মাদ্রাজে লর্ড হেস্টিংসকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা হলো, প্রায় পাঁচশো 'গণ্যমান্য, বিশিষ্ট' মাদ্রাজবাসীর স্বাক্ষর সমন্বিত এক অভিনন্দন-পত্র রচিত হলো। এবং সেটি সঙ্গে করে একজন স্বাক্ষরকারী চলে এলেন কলকাতায়। গভর্ণর জেনারেলের হাতে সেটি দেওয়া হবে।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির তৈরি আজকের এই রাজভবনের দরবারকক্ষেই লর্ড হেস্টিংস পূর্বতন গভর্ণর জেনারেলের সযত্ন রচিত বিধানসমূহের উপর লালকালির কলম চালিয়ে—গ্রহণ করলেন সেই নতুন সম্মান। হেস্টিংস অভিনন্দন-পত্রখানা হাতে নিয়ে ঘোষণা করলেন—আমি মনে করি, জরুরী বা বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া নিজ নিজ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রজাসাধারণের জন্মগত অধিকার।... তাছাড়া সরকারের উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক—তাঁদের উচিত হচ্ছে জনসাধারণের সমালোচনাকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাতে কোন অবস্থাতেই তার শক্তি হানি ঘটেনা। বরং;
That Govt. which has nothing to disguise, wields the most powerful instrument that can appertain to Sovereign Rule..

হেস্টিংসের জয়ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হলো। জন অ্যাডাম নীরবে দেখলেন। তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার। আইন প্রণেতা না হলেও আইনের রক্ষাকর্তা। মনে মনে হাসলেন সেক্রেটারী বেইলী। আইন তাঁর কাছে কতকগুলো অর্থহীন শব্দমাত্র!—ব্যবহারেই তার প্রকৃত অর্থ। কিভাবে কোন অর্থে কোনটি ব্যবহার করতে হয় তিনি জানেন।

সুতরাং সম্পাদকদের আনন্দকে অ্যাডামের মত তিনি মনে করলেন—অশত্থমার নাচ—দুধের বদলে ঘোল খেয়ে নৃত্য।

এই নৃত্যের আসরে এসে সে বছরই আবির্ভূত হলেন স্থির, ধীর বাকিংহাম। জাহাজের কাপ্তেন, খবরের কাগজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। তবুও ভারতবর্ষকে তিনি জানতেন, তিন বছর আগে, ১৮১৫ সালে—কোম্পানীর লাইসেন্স পকেটে নেই এই অজুহাতে বোম্বাই থেকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সুতরাং বাকিংহাম—এদেশের শাসকদের চিনতেন। তবুও যাওয়ার সময় 'ভারতের বন্ধুদের প্রতি' আশ্বাস দিয়ে বলে গিয়েছিলেন 'আবার আমি ফিরব, আজকের এই নিষেধাজ্ঞা যে অজ্ঞাত দেশেই তাড়িয়ে নিয়ে যাক আমায়, একদিন আবার ফিরে আসবোই আমি এই বন্ধুদের মাঝে।'

কবিতার কথা। অনেক উচ্ছ্বাসে ভরা। বন্ধুরা হয়ত তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু বাকিংহাম সত্যিই ফিরে এলেন আবার ভারতবর্ষে, বন্ধুদের দেশে। জাহাজের কাপ্তেন বাকিংহাম কলকাতায় যখন নামলেন তখন তিনি খবরের কাগজের সম্পাদক নন, নিজেই আস্ত একখানা খবর। ছোট নেই বড় নেই—গভর্ণর, চিফ জাস্টিস, বিশপ থেকে শুরু করে সকলের মুখে মুখে তাঁর কথা।

—এমন কাজ যে ছেড়ে দিতে পারে সে কি সহজ মানুষ!

বাকিংহাম যে জাহাজের কাপ্তেন সে জাহাজ কলকাতা থেকে যাওয়ার কথা মাদাগাস্কার। দাস ভর্তি জাহাজ ছাড়ছে সেখান থেকে—সে জাহাজে পাহারা দিতে হবে তাঁকে। আফ্রিকার কালো কালো মানুষগুলোকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে ইউরোপের বাজারে।

বাকিংহাম বেঁকে বসলেন। এ ঘৃণ্য কাজ তিনি পারবেন না। মানুষ হয়ে মানুষ বিকিকিনির কারবারে তিনি গররাজী। হোক না এক এক দফায় দশ হাজার পাউণ্ড মজুরী! বহুলোক আছে তার জন্যে। জেমস সিল্ক বাকিংহাম এমন কাজে নেই।

লোকে বললে, পাগল। ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবাই প্রভু হবে তাও কি হয়? বাগান চলবে কি করে, কারখানা, খনি এসব চলবে কি করে?

বাকিংহাম স্বপ্নের দেশের লোক হয়েই রইলেন। তাঁর সেই দেশে লোকেরা কেনা গোলাম না হয়েও খনি থেকে সোনা তোলে, বাগানে জমি চষে। ১৮৩৪ সালে সে স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছিল। পৃথিবী থেকে প্রকাশ্যত দাসপ্রথা উঠে গিয়েছিল সেদিন। তার বহু আগে ১৮২৫ সালে এর পুরোপুরি উচ্ছেদ দাবী করে—বাকিংহাম হাসির উপলক্ষ্য হয়েছিলেন—দাস-দরদীদেরও। আর তারও আগে দাস ব্যবসায়ে অসম্মতি জানিয়ে এই কলকাতায় বেকারত্ব বরণ করতেও সানন্দে রাজী হয়েছিলেন তিনি। বাকিংহাম একটা খবর বৈ কি!

এই অদ্ভুত লোকটিকে ঘিরে সেদিন ভীড় করেছিল যে কৌতূহলী জনতা তার মধ্যে ছিলেন কলকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ীরাও। তাঁরা—বাকিংহামকে হাত-ছাড়া করতে রাজী হলেন না। যেমন বিজ্ঞ, তেমনি বুদ্ধিমান এবং আদর্শবান মানুষ।

সুতরাং আলাপ আলোচনা পাকা হলো। বিখ্যাত ব্যবসায়ী পামার এবং অন্যান্যরাও এগিয়ে এলেন। স্থির হলো কাগজ-ই বার হবে। বাকিংহামের ব্যবসায়ী বুদ্ধি আছে, অভিজ্ঞতা আছে এবং হাতে আছে কলমও। সুতরাং কাগজই বের হোক। ব্যবসায়ীদের নিজেদের কাগজ, ব্যবসায়ের কাগজ।

বের হলো—'ক্যালকাটা জার্নাল।' ১৮১৮ সালের ২রা অক্টোবর। কলকাতার নয়টি সংবাদপত্রের সম্পাদকরা দেখলেন—এ যেন এক নতুন জগতের লোক। এর কথার সুর যেন একেবারে ভিন্ন; এ সম্পূর্ণ বেসুরো। বাকিংহাম প্রস্তাব-পত্রে লিখেছেন—

> 'নবাগন্তুকের কাছে এদেশের কাগজ এক বিস্ময়। যেমনি বেদনাদায়ক, তেমনি হতাশাপূর্ণ তাদের চেহারা। অবশ্য দীর্ঘদিন এদেশে বাস করতে করতে ক্রমে তাই সয়ে যায়। মানসিক আপত্তি আর তত তীব্র থাকেনা। তবুও এই জাতীয় কাগজের সমর্থকরাও স্বীকার করেন, এগুলোর সংস্কার অত্যাবশ্যক...কলকাতার যত কাগজ আছে, সবারই দাবী তারা জনসাধারণের মতামতের বাহক, তারাই দেশের সব সংবাদ রাখেন, তারাই দেশবাসীকে নতুন কথা বলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'একখানা কাগজকে বাদ দিলে—একটি কাগজও জনসাধারণের কথা বলেনা। আমি এর ব্যতিক্রম হতে চাই। আমি চাই আমার কাগজকে পূর্ববর্তী সব কাগজের সব দোষ থেকে মুক্ত রাখতে।'

কাগজ যখন বের হলো দেখা গেল—বাকিংহাম কথা রেখেছেন। তাঁর

কাগজ কলকাতার আর কোন দ্বিতীয় কাগজের মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, নতুন সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জার্নাল।' সুন্দর কাগজে ঝরঝরে (অবশ্য তখনকার দিনের মান অনুযায়ী) ছাপা আট পাতার অর্ধসাপ্তাহিক। দামও সস্তা। প্রতি সংখ্যা এক সিক্কা টাকা। মাসে ছ'টাকা।

আর-সব কাগজের চেয়ে কমদামী কাগজ, কিন্তু মূল্যবান বিষয়-সূচী। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া আফ্রিকার সর্বত্র নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল বাকিংহামের। তাঁরা দরকারী খবর পাঠাতেন। সেগুলো ছাপা হতো। তারপর আছে, পার্লমেণ্টের ধারাবাহিক কার্য-বিবরণী। ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলা প্রেসিডেন্সির যাবতীয় সংবাদ, কলকাতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক টুকরো খবর (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, আগমন, প্রস্থান ইত্যাদি), বাজার দর, আবহাওয়ার খবর, চিঠিপত্র ইত্যাদি। এক কথায়, আজকের দিনের যে কোন সুসম্পাদিত খবরের কাগজের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে—দেড়'শ বছর আগেকার এই কাগজটি যেন একালেরই কাগজ। সবই এক। পার্থক্যটুকু শুধু পরিমাণগত। বয়সের অনিবার্য ব্যবধানই তার জন্যে দায়ী, সম্পাদক নন। এমনকি আজকের খবরের কাগজের সাহিত্য-প্রচারের যে কর্তব্যবোধ, তারও সূত্রপাত করেছিলেন সেদিন—এই বাকিংহামই। 'ক্যালকাটা জার্নালের' প্রথম সংখ্যাতেই ছিল—লর্ড বায়রণের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' (Child Harold) এবং তাঁর নিজের বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী 'প্যালেষ্টাইন ভ্রমণের' প্রথম অধ্যায়। ক্রমে বায়রণের 'ডন্ জুয়ান', স্কটের 'আইভান-হো' প্রমুখ ইউরোপীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট রচনা কলকাতার পাঠককে উপহার দিয়েছেন তিনি খবরের কাগজের পাতায়। সাহিত্য-শিল্পের নতুন খবর, ইউরোপীয় পত্রপত্রিকার বিশিষ্ট আলোচনা ইত্যাদির স্বাদ পেতে হলে কলকাতাবাসীর 'ক্যালকাটা জার্নাল' ছাড়া উপায় নেই। অন্য কাগজে তখনও লঘুরসের কবির লড়াই-ই সাহিত্য।

সুতরাং অপেক্ষার প্রয়োজন হলোনা, 'ক্যালকাটা জার্নাল' অচিরেই কলকাতা-বাসীর মনোরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে গেল। সৈনিক, ব্যবসায়ী, সিবিলিয়ান—শত শত তার গ্রাহক। পাঠক সহস্র সহস্র। ক্রমে অর্ধ-সাপ্তাহিক থেকে 'ক্যালকাটা জার্নাল' রূপান্তরিত হলো দৈনিকে। দৈনিক—শুধু সোমবারে কাগজ নেই। রবিবার ছুটি। ধর্ম কর্মের দিন। পরে অবশ্য সোমবারেও বের হতো বাকিংহামের কাগজ।

দৈনিক কাগজ। শহরের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। হু-হু-করে বেড়ে চললো গ্রাহকের সংখ্যা, লাভের অংক। যেমন কাগজ তেমনি দাম। অন্য কাগজের প্রায় আধাআধি। নাম হয়ে গেল তার, সাধারণের কাগজ—'পেপার অব দি পাবলিক'—ক্যালকাটা জার্নালের শীর্ষে—স্পষ্ট করে ছাপা থাকতো কথা কটি।

জনতার কাগজের আর আগেকার ছাপাখানায় এখন চলেনা। নতুন জমি কেনা হলো, নতুন বিরাট বাড়ি উঠলো। বিলেত থেকে এল নতুন কলম্বিয়ান ছাপাখানা, নানা আকারের নানা হরফ।

'ক্যালকাটা জার্নাল' কাগজ, 'ক্যালকাটা জার্নাল' ব্যবসাও। পূর্ববর্তী কাগজগুলো এবং সমসাময়িক অন্যান্য কাগজপত্র ছিল প্রায় শৌখিন ব্যাপার। লাভ-লোকসান তাদেরও হতো বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের চেয়ে ব্যক্তিগত লাভ বা

লোকসানই মনে করতেন তৎকালীন পত্রিকা পরিচালকেরা। বাকিংহাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ দিক থেকে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম শিল্পপতি, সংবাদপত্র যার শিল্প—ইনডাস্ট্রি।

চল্লিশ হাজার পাউন্ড মূলধন ক্যালকাটা জার্নালের। চার ভাগের তিন ভাগের মালিক সম্পাদক নিজে। বাদবাকীর মালিকানা শেয়ার হোল্ডারদের। একশ' পাউন্ডের একশ' শেয়ার। গুটিকয় শেয়ার হোল্ডার। ব্যবসায়ীপ্রতিম পামার তাদের একজন,—অন্যতম।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে অসম্ভব, অথচ আত্মগর্ব যেখানে অনাবশ্যক রকমে উঁচু, সেখানে অক্ষমের কাছে ঈর্ষাই একমাত্র মূলধন। পাঁচ ছ'খানা কাগজ একযোগে আক্রমণ চালালে বাকিংহামের উপর। কেউ লিখলে—ভদ্রলোক, আসলে ভদ্রলোকই নয়। এ অজ্ঞাতকুলশীল। কেউ বললে—ওর প্যালেষ্টাইনের ভ্রমণ-কথা, সেরেফ অমুকের বই থেকে টুকে নেওয়া। যাঁরা আরও বুদ্ধিমান —তাঁরা বললেন, ব্যাটা একবারে যাকে বলে অধার্মিক, বাইবেল মানে না, রীতি-নীতি মানে না।

বাকিংহাম কোথাও উত্তর দিলেন, কোথায়ও চুপ করে রইলেন। এ যেন একটা হাতী চলে যাচ্ছে, পেছন থেকে কতকগুলো ছেলে ছোকরা টিটকারী দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। গজরাজ কখনও কখনও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে ওদের মজা।

সে তাকানো, বাকিংহামের কলমের সেই তীব্র ব্যঙ্গ এতই তীব্র যে তাকে সইবার বা উত্তর দেবার ক্ষমতা ওঁদের কারুর ছিল না। ছিল না বলেই, আরও কষ্ট, আরও অসহ্য।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের সে জ্বালা—জুড়িয়ে দিলেন পাঠকেরা। ক্যালকাটা জার্নালের ক্রমাগত গ্রাহক হয়ে হয়ে তাঁরা উত্তর দিলেন সম্পাদকের যোগ্যতার! ক্যালকাটা জার্নাল—একমাত্র প্রতিষ্ঠিত কাগজ হয়ে রইল কলকাতার।

দ্বিতীয় শত্রু ওয়েলেস্‌লি কথিত সেই—'একটা বিরাট গভর্ণমেণ্টের সংহত সমবেত ক্ষমতা।'

'আমি মনে করি গভর্ণরদের তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া, কর্তব্যে ত্রুটি ঘটলে তাঁদের নিঃশঙ্কচিত্তে সতর্ক করে দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে নির্ভয়ে অপ্রিয় সত্য বলা—সম্পাদক হিসেবে আমার কর্তব্য, আমার পুণ্য দায়িত্ব। বিশেষত যে দেশে কোন পার্লামেণ্ট বা আইনসভা নেই—সে দেশের সরকারকে সতত জনসাধারণের সমালোচনার অধীন রাখাই সঙ্গত।'—এই ঘোষণা করে বাকিংহাম যেদিন সম্পাদক হয়েছিলেন—সেদিন থেকেই 'একটা বিরাট সরকারের সমুদয় শক্তি' সতর্ক হয়েছিল।

তারপর কাগজে কাগজে কলমের লড়াইয়ে বাকিংহাম যখনই মুখ খুলেছেন, অলক্ষ্যে তখনই চমকে উঠেছেন সরকার।

'সহযোগী কাগজসমূহ অভিযোগ তুলেছেন—আমি নাকি অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছি। ইতিপূর্বে এদেশের কাগজে যে সব বিষয় কখনও আলোচনা করা হতো না আমরা নাকি স্পষ্টা-স্পষ্টি তারই আলোচনায় মত্ত হয়েছি। এই অভিযোগকে গর্ব-ভরে আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। ...আমি হয়ত তথাকথিত আইনের সীমানা লঙ্ঘন করেছি, আমি হয়ত...কিন্তু আপনারা

জানেন সব মানুষের অনুভূতি সমান নয়, সবার কলমে সত্য সমানভাবে আসে না, সবার সমান সতর্কতার শিক্ষা নেই, সবাই সমান রেখে-ঢেকে বলতে পারেনা। ...আমি মনে করি যাঁরা কলম হাতে নিয়ে—সত্যের মান রাখতে পারেননা তাঁরা বিশ্বাসঘাতক! ...আর কথায়-কথায় প্রশ্ন তুলি? যুক্তি চাই? যে যুক্তিতে বিশ্বাস করেনা সে তো ধর্মান্ধ, মূঢ়। যে যুক্তি জানেনা সে নির্বোধ, আর যে যুক্তি দাবী করতে ভয় পায় সে তো দাস—স্লেভ্!'

চমকে ওঠার মতই কথা! স্বাধীনতার কথা শুনে সরকার চিন্তিত হলেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র চিন্তার লক্ষণ দেখা গেল না বাকিংহামের কলমে। ঔদ্ধত্যের অভিযোগ তুলে অন্য কাগজগুলো যখন একযোগে চাল্যালো আক্রমণ বাকিংহাম তার জবাবে লিখলেন।

We still glory in avowing that triumph of freedom over slavery, unshaken principle over time-serving equivocation,—which the pubilc Press in India has recently obtained, and we are still anxious to mantain, all the envious revilings of those who oppose instead of facilitating the progress of truth and sound doctrine, the flattering distinction....etc.

এ কাগজে-কাগজে লড়াই। অসহ্য হলেও সরকার এক্ষেত্রে অসহায় দর্শক মাত্র। এর একটি কথাও তার পক্ষে শান্তির কথা নয়। তবুও তাঁরা অপেক্ষায় রইলেন।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলোনা। ১৮১৯ সালের মে মাসে 'ক্যালকাটা জার্নালে' একটি খবর বের হলো। তার মর্ম হচ্ছে—"আমরা মাদ্রাজ থেকে একটি দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি। তার চার পাশে শোক-জ্ঞাপক কালো বর্ডার। তাতে একখানা মাত্র লাইন লেখা। 'মিঃ ইলিয়ট আরও তিন বছরের জন্যে মাদ্রাজের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকছেন।' আমাদের আশঙ্কা সংবাদটি মাদ্রাজের মত ভারতের অন্যান্য অংশে শোকের কারণ হবে।"

গভর্ণমেণ্ট বাকিংহামকে সতর্ক করে দিলেন।

বাকিংহাম উত্তর দিলেন--কর্তৃপক্ষের মনোবেদনার কারণ হয়েছি বলে আমি নিরতিশয় দুঃখিত।

ক্ষমা প্রার্থনা! অন্তত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ করলে তাই দাঁড়ায়। কর্তৃপক্ষ চুপ রইলেন। বিশেষত লর্ড হেস্টিংস তখনও গভর্ণর জেনারেল। খবরের কাগজওয়ালাদের বেশি ঘাঁটাতে তাঁর মত নেই।

দু'বছর পরে বাকিংহাম আবার মনোবেদনার কারণ হলেন। ১৮২১ সালের ১০ জুলাই ক্যালকাটা জার্নালে কলকাতার লর্ড বিশপ সম্পর্কে একটা খবর বের হলো।—

> 'গেল ডিসেম্বরে মহামান্য বিশপ সব যাজকদের অন্যকাজে লাগিয়েছেন। অসময়ে বিয়ের মরশুম পড়ে যাওয়ায় তাঁরা গীর্জা ফেলে এখন সেইদিকেই ব্যস্ত। ফলে বড়দিন উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যা হওয়ার কথা তা যথাযথভাবে হয়নি, এমনকি—খৃষ্টমাসের বিশেষ দিনটিই এবার কোন অনুষ্ঠান ছাড়া প্রতিপালিত হয়েছে।'

গভর্ণমেণ্ট জানতে চাইলেন—কে লিখেছে এসব?

বাকিংহাম উত্তর দিলেন—পত্র লেখকের নাম আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, এতে ভাল হবে, এই ধারণা থেকেই নাম না-জানা সত্ত্বেও এটি আমি ছেপেছি।

সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হলেন না। দীর্ঘ এবং কড়া একখানা চিঠি লিখে বাকিংহামকে তাঁরা জানালেন, তিনি সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। সরকার বাহাদুর সেন্সার উঠিয়ে নিয়েছেন, তার অর্থ এই নয় যে, বাকিংহাম তাঁর ইচ্ছামত লিখতে পারেন। হেস্টিংসের নব-বিধি অনুযায়ী তাঁর দায়িত্ব আগের মতই। যদি তিনি একান্তই এটা ভবিষ্যতে ভুলে যান, তবে সরকার তাঁকে অগোণে চালান করে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবেন না।

বাকিংহাম এই দীর্ঘ চিঠির জবাবে এক দীর্ঘতর চিঠি লিখলেন—

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকামী যাঁরা তাঁরা আপনাদের চিঠির ভাষা দেখে বিস্মিত হবেন। এর চেয়ে সেন্সার যে অনেক ভালো।—নৈতিক বিধি বিধান? কোনটি তার মানদণ্ড?—কে তার বিচারক?—তথাকথিত এই সব মনগড়া বিধানভঙ্গের দায়ে—যদি নির্বাসনের মত কঠিন দণ্ড আপনারা আরোপ করতে পারেন, তবে আমার আশঙ্কা আমার প্রাণপণ আন্তরিক চেষ্টাও আমাকে সেই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। আইনভঙ্গের বিপদ আমার যাত্রাপথে এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে বলে আমার অনুমান—যে তাকে এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ এই আইন আপনাদের মনে, এবং আপনারাই তার বিচারক!...'

সরকার জানালেন, বাকিংহামের চিঠি পড়ার পরেও তাঁদের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন না। অর্থাৎ—দরকার হলে তাঁরা বাকিংহামকে নির্বাসন দেবেন। বাকিংহাম দিন গুনতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নতুন করে কাগজে বিতর্ক উঠেছে। এবারকার বিষয় বস্তুও খবরের কাগজের স্বাধীনতা।

একটা কাগজ লিখল—খবরের কাগজের স্বাধীনতা আবার কি? ওটি মিঃ বাকিংহামের আবিষ্কার।

বাকিংহাম প্রশ্ন তুললেন, 'তবে তোমরা সেন্সার উঠে যাওয়ায় যে আনন্দ-উৎসব করেছিলে সে কিসের নামে?'

—মহামান্য হেস্টিংস বাহাদুরের উদারতার নামে।

—'আমিও মহামান্য হেস্টিংস বাহাদুরের কথা অনুযায়ীই মনে করি এদেশের খবরের কাগজ স্বাধীন। অবশ্য যদি আইনের কথা বল, তবে হেস্টিংসের বিধান আর একটা বাজে কাগজে পার্থক্য কিছু নেই। ধর, গভর্ণর জেনারেল বললেন—অযোধ্যার নবাব আসছেন তোমার বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে, তোমার শোবার ঘরটাও ছেড়ে দাও, ওখানে তাঁর বেগমেরা থাকবেন, আর তোমার বসবার ঘরে থাকবে তাঁর চাকর বাকরেরা। তা হলেই কি আমরা ছেড়ে দিতে বাধ্য?—নিশ্চয়ই নই।—হেস্টিংস বাহাদুরের তথাকথিত ফতোয়াও তাই। যে পর্যন্ত সেটা সুপ্রীম কোর্ট বিধিবদ্ধ না করছে, ততক্ষণ সেটা আইন নয়, ফতোয়া—ব্যক্তিগত হুকুমনামা। তা মানা-না-মানা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর। আমি ব্যক্তিগতভাবে—সেটার চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করি হেস্টিংস সাহেবের মৌখিক কথাকে। তাতে স্বাধীনতার স্বীকৃতি আছে।'

ব্যাকিংহাম তাঁর কাগজে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধই লিখে বসলেন। নাম দিলেন তার 'মার্কুইস অব হেস্টিংসের স্বপক্ষে।'

সেই প্রবন্ধেই সরকারের নির্বাসনের হুমকী প্রসঙ্গে লিখলেনঃ the more the monstrous doctrine of transmission is examined, the more it must excite the abhorrence of all just mind.

অ্যাডামেরা সব দেখলেন। কিন্তু তাঁরা অসহায়। করবার তাঁদের কিছুই নেই। প্রবন্ধের নাম—'মার্কুইস অব হেস্টিংসের স্বপক্ষে।' মার্কুইস অব হেস্টিংস তাঁদের ওপরওয়ালা, গভর্ণর জেনারেল। তাঁরা জানেন, বাকিংহাম আসলে নিজের স্বাধীনতা, নিজের যদৃচ্ছচারিতাকেই রক্ষা করতে চেয়েছেন চারদিকে তার গভর্ণর জেনারেলকে রক্ষাব্যূহ হিসাবে দাঁড় করিয়ে। সেই প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে হেস্টিংসের উদ্ধৃতি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছাত্রদের সভায় তাঁর বক্তৃতা, মাদ্রাজবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে তাঁর উদার ভাষণ—বাকিংহামের প্রতিপাদ্য। তিনি কতকগুলো দাস সম্পাদক এবং কিছু কিছু মূঢ় সরকারী হীন কর্মচারীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে চান।

সুতরাং অগত্যা আডামের পক্ষে মুখ বুজে তা সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু বেশীদিন চুপ করে থাকতে হলোনা তাঁকে।

ঐ বিতর্ক প্রসঙ্গেই বাকিংহাম একদিন মন্তব্য করলেন—সরকার যদি তাঁদের সেক্রেটারী কিংবা কর্মচারীদের মাধ্যম ছাড়া অন্য কারও অভিযোগে কর্ণপাত না করেন, মন্দকে ভাল করার ব্যাপারে অন্য কারও পরামর্শ না শোনেন, তবে স্বভাবতই কোন অভিযোগেরই কোনদিন নিষ্পত্তি হবে না। যদি কারও কিছু হয়—তবে একমাত্র হবে ঐ সব কর্মচারীদের প্রিয়জনদেরই।

অ্যাডাম সুযোগ পেয়ে গেলেন। সাতজন সেক্রেটারীর সই নিয়ে বাকিংহামের নামে অভিযোগ তুললেন আদালতে। মানহানির মামলা। বাকিংহাম বলতে চায়—আমরা সরকারী কর্মচারীরা, আত্মীয় পোষণ করি। এ অন্যায়ের বিচার হোক।

বিচার হলো।

কিন্তু অভিযোগ আইনে টিকল না। বাকিংহাম তো আর কারও নাম করে কিছু বলেননি। তাছাড়া তাঁর লেখা একটা মত মাত্র—কোন ঘটনার বিবরণ নয়।

বাকিংহাম জিতে গেলেন। অবশ্য ৬০০ পাউণ্ড পকেট থেকে গেল—মামলার খরচ বাবদ। কিন্তু সে তুচ্ছ। যাঁদের বিরুদ্ধে তিনি জিতেছেন—শুধু টাকার বলে তাঁদের হারানো যায় না। তাছাড়া 'ক্যালকাটা জার্নালের' বছরের আয় তখন প্রায় বারো হাজার পাউণ্ড। সুতরাং সম্পাদকের কাছে ৬০০ পাউণ্ড তখন তুচ্ছ মামলা। এর চেয়েও আরও অনেক কঠিন, অনেক শক্ত মামলা আছে তাঁর জীবনে বাকিংহাম তা জানতেন। জানতেন, তাঁর শত্রুপক্ষও।

'ক্যালকাটা জার্নালে' এর পর একদিন একটা চিঠি বের হলো। 'জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি' প্রেরিত চিঠি। তিনি লিখেছেন—

মিঃ এডিটার,

আপনি নেটিভদের যে কল্যাণ ইতিমধ্যেই সাধন করেছেন তার জন্যে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি আপনাকে এবং সেই সঙ্গে নেটিভদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা রাখি সেদিনও আমি দেখতে পাব, যেদিন—আজ যাঁরা এদের তথাকথিত রক্ষাকর্তা বলে দাবী রাখেন—এদের হাতেই নেটিভেরা এদেরই রচিত বিধি বিধানে—এমনকি আদালতে পর্যন্ত প্রপীড়িত হবে।

অ্যাডাম জানতে চাইলেন এ ভবিষ্যতবক্তাটি কে?

পীড়াপীড়িতে পড়ে বাকিংহাম জানালেন—অবশ্য পত্র প্রেরকের সম্মতি নিয়েই, তাঁর নাম লেঃ কর্ণেল রবিনসন এবং তিনি নাগপুরে থাকেন।

এখানে বাকিংহামের 'নেটিভ কল্যাণের' একটু উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ বাকিংহামই তৎকালে অন্তত একমাত্র প্রকাশ্য সম্পাদক যিনি নেটিভ বা আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সে সহানুভূতি নীচুর প্রতি উঁচুর করুণা নয়, দীনের দিকে ধনীর ছুঁড়ে-দেওয়া দাক্ষিণ্য নয়, সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী এবং আদর্শবাদী বিজ্ঞের নিজস্ব ধ্যান-ধারণাই ছিল তার মূল। 'ক্যালকাটা জার্নালের' প্রস্তাব-পত্রে নেটিভদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর কাগজে যোগ দিতে। যাঁরা লেখক তাঁরা লিখুন, যাঁরা ধনবান ব্যবসায়ী তাঁরা ব্যবসায়ের অংশীদার হোন। ক্যালকাটা জার্নালের দরজা সকলের জন্যে খোলা।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বেঙ্গল গেজেট' ক্যালকাটা জার্নালের চেয়ে বয়স্ক কাগজ। দু'বছর আগে তার জন্ম। বাকিংহাম এ কাগজটিকে গ্রহণ করেছিলেন আন্তরিকভাবে। ক'বছর পরে অন্তরঙ্গ বন্ধু রামমোহন রায় যেদিন গ্রহণ করলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ-কৌমুদি'র দায়িত্ব বাকিংহাম তখন 'সংবাদ কৌমুদি'কে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন:

the pleasure with which we regard the effusious of the native press does not arise from the instrinsic value of these production, but as an earnest of what it may produce when it has attained maturity. অর্থাৎ ভালমন্দের বিচার করে নয়, এগুলোর ভবিষ্যত সম্ভাবনাকেই আমি অভিনন্দিত করি। রামমোহনের অন্যান্য কাগজগুলোর প্রতি সংখ্যায় কি আছে না আছে, তাই তিনি নিয়মিতভাবে ছাপতেন ক্যালকাটা জার্নালে। 'Spirit of the Press' শিরোনামা দিয়ে এসব দেশী কাগজের বক্তব্যও বের হতো 'ক্যালকাটা জার্নালের' পাতায় ইউরোপীয় পাঠকদের জন্যে।

তাছাড়া এদেশের সমাজ, শাসন ব্যবস্থা, এদেশের রীতিনীতি বিষয়েও বাকিংহামের আগ্রহ ছিল প্রবল। এই আগ্রহই শেষে রূপান্তরিত হয়েছিল দায়িত্বশীল সমতায়। 'ক্যালকাটা জার্নালের' পাঁচ বছরের জীবনে বাকিংহাম এ দায়িত্বের অনেক পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর তখনকার লড়াইয়ের বিষয়বস্তু ছিল: (১) সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ (২) পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে কর আদায় বন্ধ (৩) ভারতে ইংরেজ কলোনী স্থাপন (বহু বাঙালী নেতা এর স্বপক্ষে ছিলেন) (৪) সংবাদপত্রের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা (৫) ইংরেজ অধিবাসীদের জুরীর বিচারের আওতায় আনা (৬) সরকারী কর্মচারীদের বসবাসের উদ্দেশ্যে জমি কেনার অধিকার স্বীকার করা (৭) ব্যবসায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

একচেটিয়া কর্তৃত্ব বন্ধ করা (৮) স্বাধীন ব্যবসার অধিকার দান এবং (৯) এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার।—ইত্যাদি।

এর চেয়েও বাকিংহামের ভারতীয়দের জন্যে বিশিষ্ট কীর্তি—ভারতে শাসন-সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব রচনা। সেটি অবশ্য কলকাতায় থাকা কালে রচিত হয়নি। এদেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে তাঁর চিন্তাশীল মৌলিক প্রস্তাবনা—Plan of Future Government in India ১৮৫৩ সালে প্রথম বের হয় বইখানা। ১৮৫৪ সালে বের হয়, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ। বইখানা পড়লে তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানে শুধু এটুকুই উল্লেখ করলে বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে সিপাহী বিদ্রোহের আগেকার ইংলণ্ডে যখন ভারতবর্ষে চিরাচরিত শাসন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তার কোন কারণ ঘটেনি—বাকিংহাম তখন তাঁর এই লেখায়, কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘোষণা করে মহারাণীকে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করতে দাবী জানিয়েছিলেন। তিনি দাবী জানিয়েছিলেন—অগৌণে ভারতবর্ষে একটি সরকার গঠন করা হোক, পার্লামেণ্টে ভারতের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হোক, ভাইসরয় নিয়োগ করা হোক—ইত্যাদি। তাছাড়া ভারতের রাজস্ব বিভাগ কি করে পুনর্গঠন করা হবে, কি করে শাসনযন্ত্রকে দোষমুক্ত করা যাবে—সে সম্বন্ধেও কার্যকরী পরামর্শ দিয়েছিলন সে আলোচনায়। তৃতীয় সংস্করণে এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন তিনি প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয়দের ইংরেজের প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার বিষয়ে মনোভঙ্গী, ভারতস্থ ইংরেজদের মতামত ইত্যাদি।

বাকিংহামের এই প্রস্তাব তখন অবশ্য কেউ গ্রহণ করেনি, কিন্তু ক'বছরের মধ্যেই পার্লামেণ্টকে এর অধিকাংশ মতই কাজে পরিণত করতে হয়েছিল। অবশ্য বাকিংহামের উল্লেখ তাতে ছিল না।

যা হোক, বাকিংহামের প্রতি কর্ণেল রবিনসনের শ্রদ্ধানিবেদন যে ভিত্তিহীন ছিলনা, এতেই তা বোঝা যায়। নেটিভদের কল্যাণ সত্যই ছিল তাঁর নিত্য চিন্তা। এবং বুদ্ধিমান চিন্তাশীলের মত বাকিংহাম, তাদের সমস্যার সমাধানও খুঁজেছিলেন যথার্থ স্থানেই।

কিন্তু অ্যাডাম বা বার্লো বেইলীরা সে স্থান নয়। বেইলীর মতে· সবচেয়ে দৃঢ়চিত্ত উন্মাদ সংস্কারকও নিশ্চয়ই কখনও এ নিয়ে তর্ক করবেন না যে নেটিভদের তাদের ইচ্ছামত নিজেদের ভাষায়—তাদেরই প্রভুদের কাজের বা চরিত্রের সমালোচনাও করতে দেওয়া উচিত কিংবা বিজ্ঞ কাজ হবে।

সুতরাং রবিনসন ও বাকিংহাম দু'জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ গঠিত হলো। প্রথম জনের অপরাধ—সৈন্য বিভাগের কর্মচারী হয়েও তিনি নেটিভ চিন্তায় বিব্রত। দ্বিতীয়জনের অপরাধ—তিনি নেটিভ কল্যাণে মত্ত। এবং এজন্য তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মধ্যেও অবাধ্যতা জাগিয়ে তুলতে চান। কাউন্সিল বসল। অ্যাডাম প্রস্তাব করলেন, প্রথমত কর্নেল রবিনসনকে পদচ্যুত করা হোক। দ্বিতীয়ত এ খবরটা সৈন্য বিভাগের সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হোক যাতে—ভবিষ্যতে মনের দুঃখ খবরের কাগজওয়ালাদের জানাবার সাহস আর কারও কোনদিন না হয়। এবং সর্বশেষে, বাকিংহামের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হোক। তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বলা হোক।

বেইলী হাত তুললেন, সম্মতি জানালেন ফেনডেলও। কাউন্সিল সিদ্ধান্তে ঐক্যমত হলো। কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল।

তিনি বললেন—আপনারা আর আমি সমান নই। আমি গভর্ণর জেনারেল, আর আপনারা হচ্ছেন আমার কাউন্সিলের সদস্য। আপনাদের কাজ এইখানেই শেষ। আর আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে পার্লামেণ্টের কাছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে আমি দেখেছি মিঃ বাকিংহামের অপরাধের তুলনায় এটা গুরু দণ্ড হয়ে যায়। এতখানিতে আমার মত নেই।

বাকিংহাম ছাড়া পেলেন তখনকার মত। কিন্তু কর্নেল রবিনসনের শাস্তি বহাল রইল। তেজদৃপ্তভাবে সে শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে জাহাজে চড়লেন বেচারা। কিন্তু ইউরোপও পৌঁছাতে হলোনা তাঁকে। রাস্তায়ই তিনি মারা গেলেন।

এদিকে দেখতে দেখতে বাকিংহামের উপর ঘনিয়ে এল নতুন বিপদ। বাকিংহাম নিজেই বলেছিলেন—বিপদের জাল পাতা, পদে পদে বিপদ যেখানে, সেখানে আমার সাধ্য কি তার বাইরে থাকি। এবারকার অভিযোগ—ডাঃ জেমসনের তরফ থেকে। এ নিয়ে একদিকে কাউন্সিলের রায়, অন্যদিকে ডাঃ জেমসনের পিস্তল উঁচিয়ে এল সম্পাদককে লক্ষ্য করে। প্রথমটি থেকে যে তাঁকে তখনখকার মত বাঁচিয়েছিল হেস্টিংস এবং শেষেরটি থেকে নিতান্ত ভাগ্য এবং আকস্মিকতা—তা গোড়াতেই বলেছি। হেস্টিংস যদি না থাকতেন —তবে অ্যাডামের পক্ষে বাকিংহাম নিধনের এই ঘটনাটি ছিল যথেষ্ট। অন্যদিকে সাক্ষীহীন হলে—'তৃতীয়বারের মত ডাঃ জেমসন পিস্তল নিক্ষেপে বিরত থাকতেন' কিনা তাও সন্দেহ। হয়ত সেদিনই, গড়ের মাঠের ঐ কোণটিতে হয়ে যেত চিরকালের মত সরকারী বিচার। কিন্তু সরকারের দুর্ভাগ্য। বাকিংহামের মাধ্যমে যে লড়াই চল্লিশ বছর ধরে চলবার, যে লড়াইয়ে সরকারী চেহারা দুজন নয়, লক্ষ লক্ষ লোক সাক্ষী হবার, তা ভোর রাত্রির অন্ধকারে শেষ হয়ে গেলনা। বোধ হয় কোনদিনই তা যায় না।

অগত্যা অ্যাডামদের অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া গতি নেই। ক্রমে লর্ড হেস্টিংসের বিদায় নেওয়ার সময় এল। নতুন গভর্ণর হয়ে আসার কথা ক্যানিং সাহেবের। কিন্তু তাঁকে হঠাৎ অন্য দায়িত্বে রেখে দিতে হলো স্বদেশেই। সুতরাং অগত্যা পরবর্তী গভর্ণর স্থির না হওয়া অবধি সুপ্রিম কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার জন অ্যাডামই বসলেন লাট বাহাদুরের তক্তে।

আত্মীয়-পোষণ এবং বাকিংহাম-শাসন যুগপৎ চালাতে মনস্থ করলেন তিনি। এবং কাল বিলম্ব না করে। কলকাতার প্রেসবেটেরিয়ানদের প্রধান যাজক তথা বাকিংহামের চিরশত্রু রেঃ স্যামুয়েল জেমস ব্রাইস সাহেবকে হাতে তুলে নিলেন তিনি অস্ত্র হিসেবে। বাকিংহামের কলকাতার জীবন শুরু হয়েছিল এই ডাঃ ব্রাইসের সঙ্গে বিতর্কের মধ্য দিয়ে। ব্রাইস তখন 'এশিয়াটিক মিরার' নামক সরকারপন্থী কাগজের সম্পাদক। এই বিতর্কের অবসান হয়েছিল 'এশিয়াটিক মিরারের' দরজা বন্ধে এবং সেই সঙ্গে ক্যালকাটা জার্নালের নতুন বাড়ির উদ্বোধনে।

ব্রাইস ক'বছর পরে নবরূপে এলেন, কলকাতার টোরীদের একমাত্র মুখপত্র —'জন বুলের' সম্পাদক হয়ে। 'জন বুল' জন্ম থেকেই প্রায়-সরকারী কাগজ।

সুতরাং বাকিংহামের সঙ্গে বিবাদ এবং বিতর্ক ছিল তার নিয়মিত কাজ। এ কাজে দক্ষতা দেখিয়ে সম্পাদক ব্রাইস অ্যাডামের মন জয় করে নিলেন।

তারই পুরস্কার দেওয়ার সময় এখন অ্যাডামের। তিনি এখন গভর্ণর জেনারেল। কলকাতার কোম্পানীর রাজত্বের 'শেষ কথা' তাঁর মুখে। ব্রাইসকে তিনি বসিয়ে দিলেন সরকারী স্টেশনারী বিভাগের কেরানীর পদে। অর্থাৎ যাজক ব্রাইসের এখন কাজ হবে দেখে শুনে ফাইল, কালি, কলম, আঠা, ফিতে ইত্যাদি কেনা।

বাকিংহাম ক্ষেপে গেলেন। তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন—

'এ্যানুয়েল ডাইরেক্টরী' নামক যে 'ইয়ারবুক' খানা প্রকাশিত হয় তার থেকে আমরা জানতে পেরেছি এই মাননীয় ভদ্রমহোদয়টি ধর্মতত্ত্ববিষয়ের 'ডক্তর' এবং তিনি এখানকার প্রেসবেটেরিয়ান সমাজের প্রধান। ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের আনুকূল্যে এবং পৃষ্ঠপোষণায় এখন যখন তিনি একই ব্যক্তি হয়ে একসঙ্গে একদেহেই কেরানী এবং যাজককে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর এ কাজে যোগ্যতা আছে!

তার পরে বাকিংহাম লিখছেন,—ডাঃ ব্রাইস যেহেতু একাজে একেবারে অনভিজ্ঞ সুতরাং তাঁর কেনা আঠায় কাগজ সাঁটবেনা, তাঁর কেনা ফিতায় ফাইল বাঁধতে গিয়ে দেখা যাবে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তা যাক, তবুও তো নিজেদের লোক। নিজেদের লোকেরা সবাই সব কাজ পারে!

This country abounds with surprising insiances of that kind of genius which fits a man in a moment for any post to which he may be appointed. অর্থাৎ—আশ্চর্য এই দেশ! এদেশে এমন প্রতিভাবান হামেশাই পাওয়া যায় যাঁরা, যে কোন কাজে দিন, মুহূর্তে তার যোগ্য হয়ে যেতে পারে!

স্কটল্যাণ্ডে তা হয় না। ডাঃ ব্রাইস যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের যাজকদের চাকুরিতো পরের কথা, খবরের কাগজ নিয়ে অনাবশ্যক কোন্দল করারই সময় হয় না তাঁদের।

কর্তৃপক্ষকে লিখলেন—দিন, তাঁকেই দিন—যাঁর অনেক দায়িত্ব আছে, তাঁকে আরও দিন, আর যাঁদের কিছু নেই, তাঁদের যতখানি আছে ততটুকুই কেড়ে নিন।

ক্রোধে অন্ধ হয়ে গভর্ণর অ্যাডাম কাউন্সিলের সভা ডাকলেন। এবার আর নয়। ঔদ্ধত্যের একটা সীমা আছে।

সকলে হাত তুললেন।

বাকিংহামের নির্বাসনের রায় হয়ে গেল।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩ সাল। 'ক্যালকাটা জার্নালের' পাতায় বাকিংহাম সে সংবাদ দিলেন।

মহামান্য সরকার বাহাদুর নিরতিশয় বিজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই সকল রকম অভিযোগের অতীত। তাঁরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞতা প্রণোদিত হয়েই এই রায় দিয়েছেন। এজন্য আমি বাধিত। তবে কলকাতায় আমার স্বল্পকালের জীবনে তাঁরা যে দৃষ্টান্ত আজ দেখালেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। আমার ধারণা ছিল, যদি নেহাৎ রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদের কারণ না হয় তবে কাউকে এমন শাস্তি দেওয়া হবেনা। আর যদি একান্তই

কাউকে দেওয়া হয় তবে নিশ্চয়ই আইনের আশ্রয়ে তা করা হবে। তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হবে। কিন্তু হায় আমার ধারণা! এখানে যে গভর্ণর জেনারেল নিজেই অভিযোগকারী, নিজেই নিজের সাক্ষী, নিজেই বিচারক, নিজেই জুরী এবং ঘাতক!

বাকিংহাম পাঠকদের আশ্বাস দিলেন আবার তিনি ফিরবেন। কলকাতা থেকে যদি সত্যিই তাঁকে একেবারে বিদায় নিয়ে যেতে হয় কোনদিন, তবে কারও আদেশে তা তিনি করবেন না। এ রায় তিনি পাল্টাবেন। পৃথিবীতে এ্যাডামই একমাত্র রায়-দানেব কর্তা নয়।

সময় অল্প। কিন্তু কাজ অনেক। বিরাট বিষয়সম্পত্তি। দশ বছর সবে মাত্র স্ত্রী এসে মিলেছেন কলকাতায়। সমুদ্রে সমুদ্রে ভবঘুরে জীবনের অন্তে সবে মাত্র সংসার গড়ে উঠেছে এখানে। এ সংসার গুটোতে হল। জিনিসপত্তর তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হলো। কাগজ বন্ধ করলে চলবেনা। বাকিংহাম সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করলেন নতুন দু'জন সাংবাদিকের উপর। স্যাণ্ডফোর্ড আরনট ও জেমস সাদারল্যাণ্ড। নগদ সাতাশ হাজার টাকা তুলে দিলেন তাদের হাতে—কাগজ বন্ধ হতে দিয়োনা যেন, আমি আসছি।

দেখাশুনার ভার পড়লো স্বভাবতই পামার এবং ব্যালার্ডের ওপব। আধাআধি শেয়ারের মালিক তাঁরা। তাড়াহুড়োয় মোটামুটি একটা চলনসই ব্যবস্থা করে বাকিংহাম স্ত্রীকে নিয়ে জাহাজে চড়লেন।

জেমস সিল্ক বাকিংহাম কলকাতা ত্যাগ করলেন। বিনা বিচারে ভারতের প্রথম দৈনিকপত্রের, প্রথম জনগণের কাগজের প্রিয় সম্পাদক দেশত্যাগে বাধ্য হলেন। কেউ প্রতিবাদ করল না, কেউ প্রশ্ন তুলল না, কিন্তু সবাই ভাবল। বাকিংহামের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কথাও ভাবলেন কলকাতার অনেক ইংরেজ। কেউ কেউ হয়তো কাঁদলেনও। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্ব। কেউ কিছু বললেন না। বাকিংহাম চলে গেলেন।

এর পরের কাহিনী আরও দীর্ঘ। হিকির মত মেরে ফেলা গেল না বাকিংহামকে, ডুয়েনের মত এড়িয়েও চলল না তাঁকে। শতাধিক বইয়ের লেখক, বুদ্ধিদীপ্ত বাকিংহামকে হিকির মত উন্মাদ সাব্যস্ত করা গেল না, রক্তে আমেরিকান দোষ দেখিয়ে ডুয়েনেব মত খারিজ কবেও দেওয়া গেলনা। বাকিংহাম যোগ্যার্থে ইংরেজ-সাংবাদিক।

সুতরাং গল্পটা যেখানে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, শুরু হলো আবার সেখান থেকে। এবার পূবের আর পশ্চিমের দুই নগরী তার পটভূমি। এদিকে কলকাতা, ওদিকে লণ্ডন। একদিকে প্রজাব দেশ ভারতবর্ষ, ওদিকে নিজেদের পিতৃভূমি, গণতন্ত্রের দেশ ইংলণ্ড। দুই দেশকেই শুনতে হলো বাকিংহামের কথা। শোনায় যাদেব মত ছিল না তাঁরাও শুনতে বাধ্য হলেন, এতদিন যাঁরা চোখ বুজে ছিলেন, এবার চোখ খুলতে হলো তাঁদেরও। বাকিংহাম হিকির মত মিলিয়ে গেলেন না, ডুয়েনের মত হারিয়েও গেলেন না। অ্যাডামদের আতঙ্ক হয়ে এর পরেও বত্রিশ বছর বেঁচে রইলেন। এই বত্রিশ বছরের প্রতিটি দিন--ভারতের কর্মচারীরা, লণ্ডনের বোর্ড অব ডাইরেক্টর, বোর্ড অব কণ্ট্রোল, বৃটিশ পার্লামেণ্ট—এক কথায় সমগ্র বৃটিশ জাতি জানলেন

—ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহাম জীবিত। অ্যাডামের পাপ পোয়াতে হল তাঁদের দীর্ঘ বত্রিশ বছরের প্রতিটি দিন।

ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়েই বাকিংহাম শুরু করলেন আন্দোলন। এই অন্যায় আচরণের বিচার চান তিনি। সেই সঙ্গে তিনি চান—কোম্পানীর শাসন, একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বাতিল করা হোক।

এই আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে প্রকাশিত হলো—'ওরিয়েণ্টাল হেরল্ড'। মাসিক রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা। অন্য কথায়, ক্যালকাটা জার্নালের লণ্ডন-সংস্করণ। এ আন্দোলনের প্রথম ফল হলো ডাঃ ব্রাইসের নিয়োগ বন্ধ। যে নিয়োগের যৌক্তিকতা তুলে বাকিংহাম নির্বাসনের দণ্ড ডেকে এনেছিলেন—বিলাতের কর্তৃপক্ষও তা সমথর্ন করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবেটেরিয়ান চার্চ ডাঃ ব্রাইসকে জানালো—কেরানীর কলম হাতে নেওয়ার আগে তিনি যেন যাজকের আলখাল্লাটা ছেড়ে নেন।

—যদি ডাঃ ব্রাইসকে চাকুরি দেওয়া আপনারা গর্হিত কর্ম বলে মনে করেন, তবে এ প্রশ্নে আমাকে নির্বাসন দেওয়া কি সঙ্গত?—বোর্ড অব ডাইরেক্টারদের সভায় প্রশ্ন তুললেন বাকিংহাম—আমি ভারতে ফিরে যেতে চাই।

কোম্পানী উত্তর দিলে—না তার অনুমতি দেওয়া হবে না।

—কেন আমাকে যেতে দেওয়া হবে না—বোর্ড অব কণ্ট্রোলের দরজার হুঙ্কার দিলেন বাকিংহাম।

—কেন তা আমরা বলছিনা, তবে আপনাকে আবার ভারতবর্ষে যেতে দিতে আমরা সম্মত নই। বোর্ড অব কণ্ট্রোল রায় দিলেন।

সেখান থেকে বাকিংহাম গেলেন পার্লামেণ্টে। সবাই তাঁর কাহিনী শুনলেন। কিন্তু ভোটের বেলায় হাত উঠলো মাত্র একখানা। একজন মাত্র টোরী সদস্য সমর্থন করলেন তাঁকে। বাকিংহাম জীবনে কোনদিনই টোরী ছিলেন না। এর আগে অবধি টোরীরা তাঁকে হুইগ বলতেন। কিন্তু বাকিংহাম হুইগও ছিলেন না। তিনি নিজেই ছিলেন, একটি স্বতন্ত্র দল, একটি স্বতন্ত্র মত। টোরীদের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মতামতকে তিনি সমর্থন করতেন বটে, কিন্তু তাঁর কালের টোরীদের চেয়ে তিনি ছিলেন অন্তত পঁচিশ বছরের অগ্রবর্তী। কোম্পানীর একচেটিয়া কারবার বন্ধের যে দাবী তিনি তুলেছিলেন ভারতবর্ষে থাকতে ১৮৩৪ সালে তা পূর্ণ হয়েছিল। যে দাস প্রথা উচ্ছেদের দাবী তুলেছিলেন ১৮২৫ সালে—সে বছর তাও উঠেছিল। ঠিক তেমনি ইংলণ্ড একদিন স্বীকার করে নিয়েছিল—নির্বাচনের ব্যাপ্তি, সংবাদপত্রের স্বাধিকার সব। তবুও প্রতিটি ব্যাপার উপলক্ষে—বাকিংহামকে সহানুভূতিশীল হুইগরা পর্যন্ত আখ্যাত করেছেন 'স্বপনলোকের মানুষ' বলে। বলেছেন--মিঃ বাকিংহাম—এ দুনিয়ার মানুষ নন, তিনি আজবলোকের বাসিন্দা।

সুতরাং পার্লামেণ্টে বাকিংহাম হেরে গেলেন। প্রিভি-কাউন্সিলেও তাঁর মোকদ্দমা টিকল না। অ্যাডামের রায়ই বহাল রইল।

এদিকে কলকাতায় তখন জন অ্যাডাম ভূত দেখে বেড়াচ্ছেন। বাকিংহামের ভূত। যেদিকেই তাকান, সেদিকেই যেন, এই নির্ভীক সাংবাদিকের ছায়া। অ্যাডাম চমকে ওঠেন।

খৃষ্টান অ্যাডাম ব্রাহ্মণ চাণক্য-নীতি ধরলেন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তিনি তাই করবেন। যেমন করে হোক ক্যালকাটা জার্নাল শেষ করা চাই।

লণ্ডনের বাকিংহামের লড়াইয়ের খবর কলকাতায়ও পেঁছে। সম্পাদকেরা 'ওরিয়েণ্টাল হেরল্ড'ও নিয়মিত টেবিলে পান। সুতরাং বাকিংহামকে কেউ আর ভুলতে পারেন না।

রেঃ ডাক্তার ব্রাইস, 'জন বুলের' পাতায় অনুপস্থিত সাংবাদিককে আক্রমণ করেন—গায়ের জ্বালা জুড়ান।

ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক দু'জন—সাদারল্যাণ্ড আর আরনট তার জবাব দেন। বাকিংহামের কাগজের তাঁরা সম্পাদক। ক্যালকাটা জার্নালের ভূতপূর্ব সম্পাদক তাঁদের আদর্শ। তাঁর ইজ্জত তাঁদেরও ইজ্জত।

অ্যাডাম স্বভাবতই এটা পছন্দ করলেন না। বাকিংহামকে নিয়ে আলোচনা হোক এটা তিনি চান না। বড় অস্বস্তি বোধ করেন তিনি বাকিংহামের কথা এখনও মনে পড়লে। আরনট আর সাদারল্যাণ্ডের মধ্যে তিনি যেন বাকিংহাম দেখলেন। তাঁর ভয় হলো।

কিন্তু সম্পাদক সাদারল্যাণ্ড ইংরেজ হলেও ভারতসন্তান। তাঁকে বাইরে চালান দেওয়া যাবে না। এক পারা যায় আরনটকে। ও শুধু ইংরেজ নয়, এ দেশের বে-আইনী বাসিন্দা। খবর নিয়ে অ্যাডাম জেনেছেন, কোম্পানীর ছাড়পত্র নেই ওর পকেটে। সুতরাং অচিরেই সেক্রেটারীর চিঠি পেঁছালো, ক্যালকাটা জার্নালের মালিকদের কাছে—

যেহেতু এখনও তোমাদের কাগজে নির্বাসিত বাকিংহামকে নিয়ে আলোচনা হয়, সেই হেতু আমরা চাই তোমরা সম্পাদকদের অবিলম্বে পদচ্যুত কর। কাগজের স্বার্থে সেই তোমাদের কর্তব্য। আপাতত সম্পাদক সাদারল্যাণ্ডকে আমরা কিছু করতে পারছিনা বটে, তবে অবিলম্বে আরনটকে আমরা দেশে পাঠাচ্ছি।'

আরনট বন্দী হলেন। তারপর পালিয়ে গেলেন চন্দননগরে। পরে অবশ্য সেখান থেকেই ধরে এনে তাঁকে পাঠানো হয় বিলেতে।

এদিকে সাদারল্যাণ্ডও কিন্তু বশংবদ হতে পারলেন না। বাকিংহামকেই ধরে রইলেন তিনি তখন পর্যন্ত। বাকিংহামের ওরিয়েণ্টাল হেরল্ড থেকে তিনি কালকাটা জার্নালে ছাপতে লাগলেন, লিসেষ্টার স্ট্যানহোপের বিখ্যাত রচনা—'স্কেচ্ অব দি হিস্টরি এণ্ড ইনফ্লুয়েন্স অব দি প্রেস ইন ইণ্ডিয়া।'

তখন প্রেস আইন বলবৎ। ছাপাখানা ও ছাপার কাজ সরকারী লাইসেন্স ছাড়া অচল। সরকার আদেশ দিলেন—'ক্যালকাটা জার্নালের' প্রেস বন্ধ কর।

তার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

মালিকেরা জানতে চাইলেন—অপরাধ?

—অপরাধ, তোমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত এই বইখানা ছেপেছ। উত্তর দিলেন সরকার।

অবশেষে 'ক্যালকাটা জার্নাল' সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল।

হাজার হাজার টাকার কারবার। মালিকেরা প্রমাদ গনলেন। লণ্ডনে বসে

অন্যতম মালিক বাকিংহাম বুঝলেন তাঁর চিহ্নও মুছে দিতে চায় ভীরু গভর্ণমেণ্ট।

এর আগে সরকারকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন কলকাতায় তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি জনসাধারণের জন্যে খুলে দিতে। সরকার রাজী হননি। এবার কাগজও বন্ধ হলো।

৪০ হাজার পাউণ্ড মূলধন। বিরাট কারবার, অনেক কর্মী। বাকিংহাম পরামর্শ দিলেন, মালিকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটোছুটি করতে লাগল। যদি শেষ অবধি আবার অনুমতি পাওয়া যায়। বাকিংহামের আশা শেষ অবধি হয়ত ভারতবর্ষে ফিরতে পারবেন তিনি। সরকার কথা দিলেন—দেখা যাবে।

এই কথার উপর ভরসা করে—লোকেদের মাইনে দেওয়া হলো। কাজ নেই, তবুও কাউকে জবাব দিলেন না পামার।

শেষে ভাবলেন, সরকারী লোককে সম্পাদক করলে হয়ত সুফল ফলতে পারে। পামার বন্দোবস্ত করলেন—জনৈক ডাঃ মাটসনের সঙ্গে। মাটসন কাউন্সিল-সদস্য হেরিংটনের জামাতা এবং কোম্পানীর কর্মচারী। পামারের ভরসা মাটসন সম্পাদক হলে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে পারেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ 'ক্যালকাটা জার্নাল' আবার ছাপা হোক এটা চান না। তাছাড়া মাটসন যে আর এক বাকিংহাম হবে না তাই বা কে বললে। বিশেষত, কাগজটা যখন ক্যালকাটা জার্নালই থাকছে। স্পষ্টতই তাঁরা বললেনও তা।

অবশেষে একটা রফা হলো। বেশ তবে মাটসনকে ছাপাখানাটা লীজ দিয়ে দাও। হেরিংটনের জামাতার যদি কাগজ বের করার সাধই হয়, তবে নতুন কাগজ বের করুক।

১৮২৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ক্যালকাটা জার্নালের প্রেস থেকে বের হলো ডাঃ মাটসনের নতুন কাগজ—'দি স্কচ্‌ম্যান ইন দি ইষ্ট' বাকিংহাম লিখছেন—আমার ছাপাখানা আমার টাইপ—আমার সব—আমি এক পয়সা পাই না।

প্রেসের ভাড়া সাব্যস্ত হয়েছিল মাসে পঁচিশ হাজার টাকা। বাকিংহাম ছাড়া বাকী সত্তর জন শেয়ার হোল্ডার সবাই কিছু পেতেন। কিন্তু যাঁর সম্পত্তি তিনি কিছুই না। এমন কি এক কপি কাগজও না। এদিকে সম্পাদক হিসেবে মাটসন—মাইনে নিতেন মাসে ৬০০৲ টাকা। তদুপরি লাভের অংশতো আছেই।

দিব্যি চলছিল। অদূর ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের এমনি আনুকূল্যে মাটসন হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতেন জীবনে। কিন্তু হ্যারিংটনের জামাতাটি একটি অপদার্থ! সেও বাকিংহাম হতে চায়। খবরের কাগজের স্বাধীনতা তারও প্রিয় আলোচ্য।

কর্তৃপক্ষ মাটসনকে ধমক দিলেন। মাটসন 'আন্তরিক দুঃখিত' হয়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু একবার স্বাধীনতায় পেয়ে বসলে তাকে ছাড়ানো সহজ নয়। সে ক্রমেই প্রলুব্ধ করে—ক্রমেই বাঁধা সড়ক থেকে নেমে চলতে বলে।

শুভানুধ্যায়ীরা ডেকে বোঝালেন। নিত্য ধমক নিত্য ত্রুটি স্বীকার—কত আর সহ্য হয়? মাটসন বললেন খবরের কাগজে আমার কাজ নেই, চিকিৎসা-বিদ্যাই ভালো।

মাটসন কাগজ বেচে দিলেন। মালিকদের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

অগত্যা জন অ্যাডামের স্বপ্নকে সফল করে নিলামে উঠলো ক্যালকাটা জার্নালের প্রেস।

বলা বাহুল্য, রাজদ্রোহীর সম্পত্তি, দাম পাওয়া গেল অতি সামান্য। বাকিংহাম সম্পাদকের হাতে যে নগদ সাতাশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন—সে টাকা আগেই ফুরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রেস আবার চালু হবে—এ ভরসায় পামারেরাও টাকা ঢেলেছেন বিস্তর। কাজ নেই, তবুও লোক ছাঁটাই করেননি। নিয়মিত মাইনে দিয়ে গেছেন। ফলে হিসেব-নিকেশ যখন হলো তখন দেখা গেল—উত্তমর্ণ থেকে বাকিংহাম অধমর্ণদের তালিকায় উঠেছেন। চল্লিশ হাজার পাউন্ড সম্পত্তির বদলে—তাঁর নামে খাতায় নতুন ঋণ। ভারতবর্ষে সম্পত্তি বাবদ সাতাশ হাজার টাকা তাঁর দেয়।

'ক্যালকাটা জার্নালের' দীর্ঘ ইতিবৃত্তের মত তার উপসংহারটিও সত্যিই অভূতপূর্ব। কাগজ-হত্যার এমনি ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ের সফল দৃষ্টান্ত সত্যিই বোধ হয় আর মেলে না।

'ক্যালকাটা -জার্নাল বধ' অবশেষে সম্পন্ন হলো বটে, কিন্তু বাকিংহাম মরলেন না। 'ওরিয়েণ্টাল হেরল্ডের' পাতার সীমানা পেরিয়ে ইতিমধ্যে তিনি এসে পৌঁছেছেন বৃহত্তর মানুষের মেলায়। বাকিংহাম এখন রাজনৈতিক পুরুষ, সমাজ-সংস্কারক। জনতার কাগজের সম্পাদক এখন জনতার নেতা। বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জের ছোট বড় বহু মানুষ এখন তাঁর পেছনে।

ভারতবর্ষে ফিরবার শেষ সম্ভাবনাও লুপ্ত হয়ে গেছে দেখে—বাকিংহাম এবার দাবী তুললেন—ক্ষতিপূরণ চাই।

হাউস অব কমন্সের তিরিশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হলো এবার অনুসন্ধান সমিতি। মিঃ চার্লস গ্রাণ্ট, লর্ড জন রাসেল, রবার্ট পিল, গ্রানাভিল সমরসেটের মত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তার সদস্য।

কমিটি ঐক্যমত হলেন : ক্ষতিপূরণের দাবী যথার্থ। কোম্পানীর উচিত মিঃ বাকিংহামকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

—কত?

—সেটা কোম্পানীর উপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ করলেন।

বাকিংহাম ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন না। তিনি লাট বাহাদুর নন। সুতরাং কোম্পানী সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করলেন। বাকিংহামের নামে তাঁরা বছরে দু'শ পউন্ড পেনসন মঞ্জুর করলেন। অথচ বিচারান্তে ওয়ারেন হেস্টিংসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সত্তর হাজার পাউণ্ডের তোড়া।

বাকিংহাম যে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন না! এই বৃহৎ পশ্চাদভূমিবিহীন ছিলেন বলেই বাকিংহাম—শুধু বাকিংহামই থেকে গেলেন, নয়ত তিনিও স্বীকৃত হতেন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় বেকন বলে।—খেদ করে মন্তব্য করেছিলেন একজন গুণগ্রাহী।

স্টেনহোপ বলেছিলেন—এডমণ্ড বার্ক, লর্ড কর্ণওয়ালিশ এবং মিলকে বাদ দিলে আজকে আমাদের বিচারে অপরাধী বাকিংহামের তুল্য ভারতের মঙ্গল এমন করে কেউ চিন্তা করেন নি।

আগেই বলেছি, বাকিংহামের রচিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় একশ। সেগুলো

শুধু দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর শিশুপাঠ্য কাহিনী নয়—তার মধ্যে আছে গুরুতর রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে স্বাধীন মৌলিক চিন্তা—মদ্যপানের কুফল, রোগচিকিৎসা থেকে শুরু করে, ইংলণ্ডের, ভারতের, ভবিষ্যতের জন্যে অনেক যুক্তিপূর্ণ তথ্যবহুল আলোচনা। সে আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই, সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব—সম্পূর্ণ মৌলিক।

বোম্বাই থেকে একটা বেতের তৈরি ভেলা বানিয়ে তার উপর গ্যাস বেলুন বেঁধে দাঁড় টেনে টেনে, কি করে লণ্ডন যাওয়া যায়—এরোপ্লেন আবিষ্কারের বহু আগে—ক্যালকাটা জার্নালের পাতায় বাকিংহাম তা যেমন ভেবেছেন, তেমনি সুয়েজ খাল কাটার আগে মিশরের পাশার সঙ্গে বসে বসে পরামর্শ করেছেন কি করে দুটো ভূখণ্ডকে সংক্ষেপে জুড়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে।

পরবর্তীকালে প্যারিসের বিখ্যাত পলিটিক্যাল ইকনমি ক্লাব তাঁকে আমন্ত্রণ করে পরামর্শ চেয়েছিলেন—ভবিষ্যতের রাস্তাঘাট সম্পর্কে।

এমনি আরও বহু ঘটনা, বহু কাহিনী আছে বাকিংহামের জীবনে। যা অল্প লোকের জীবনেই সম্ভব হয়। যাঁদের হয় তাঁদের আমরা অতিমানবের গৌরবে ভূষিত করি। তাঁদের নাম আমাদের কণ্ঠস্থ। দৈবাৎ যদি ভুলে যাই কখনও তবে তার জন্যে লজ্জার আর অবধি থাকে না আমাদের। কিন্তু বাকিংহামের ভাগ্যে এ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সহসা কলকাতা এসে উপস্থিত না হলে কিংবা ঘটনাচক্রে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক না হলে চিরকালই হয়ত অজ্ঞাত থেকে যেতেন তিনি আমাদের দেশে।

নিজের দেশে অবশ্য নিজের একটা পরিচয় তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেও যেন—জোর করে আদায় করা জিনিস। প্রতিভা এবং কর্মের তুলনায় তাও অত্যন্ত পরিমিত। অনুদারতার কলঙ্কে যেন রীতিমত সঙ্কুচিত।

অথচ তাঁর কালের ইংলণ্ডে বাকিংহাম যে জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকায় প্রায় হাজার চারেক জনসভায় বক্তৃতা করেছেন নাকি তিনি তাঁর জীবনে। লক্ষ লক্ষ লোক পয়সার বিনিময়ে তাঁর শ্রোতা হয়েছেন। বক্তৃতা শেষে করতালি দিয়েছেন। বাকিংহাম তাঁদের অন্তরে পোঁছেছিলেন।

১৮৩২ সালে শেফিল্ড থেকে বিপুল ভোটে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে বাকিংহাম তাঁর এই জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে সেদিন বাকিংহাম নির্ভীক সেনাপতি—ফ্রি ট্রেডের নায়ক। বাকিংহাম নাবিকদের বন্ধু, প্রকাশক সাহিত্যিকদের প্রিয় সুহৃদ। প্রগতিশীলেরা তাঁর কলম, তাঁর বাগ্মীতা, তাঁর সমর্থনের জন্যে লালায়িত, প্রতিক্রিয়াশীলেরা ভাবনায় নিয়ত সন্ত্রস্ত। বাকিংহামের মত প্রগতিশীল মানুষ তখন পার্লামেণ্টে নেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, নিজের দেশে নির্বাচনের অধিকারের আরও ব্যাপ্তি, গোপন ব্যালট প্রথায় নির্বাচন, শিক্ষার বিস্তার বিশ্ব-শান্তি ইত্যাদি বহু বহু আন্দোলনের গৌরবে তাঁর জীবন ভূষিত।

তবুও ইংলণ্ডের ইতিহাসে বাকিংহাম অজ্ঞাত পুরুষ। পার্লামেণ্টারী কাহিনীতে প্রায় অবজ্ঞাত সদস্য। তাঁর বক্তব্য তাঁর কালের সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূর বিস্তৃত হলেও—নাম তাঁর সেই সঙ্গে প্রসারিত হয়নি। পার্লামেণ্টারী

ইতিবৃত্তের সমুদ্র মন্থনকে একালের মানুষ কৌতূহলাবৃত হয়ে সে কাহিনী উদ্ধার করে আনে মাত্র।

আমাদের মত মানুষের কাছে মনে হয়—এ তাঁর দুর্ভাগ্য। সারা জীবনে ভাগ্যবানদের হাতে তৈরী দুর্ভাগ্যের গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে মুক্ত বাকিংহাম কিন্তু বলেছিলেন—এ তাঁর সৌভাগ্য। যে যন্ত্রণা তাঁর জীবনগৌরব. নিষ্ঠুর হলেও তা ভাগ্য বৈকি।

ভারতবর্ষে অ্যাডামেরা তাঁকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের সেই সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যেদিন তীরে পোঁছালেন তিনি—সেদিন ভারতবর্ষের উপহারই জানিয়েছিল তাঁকে যে অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তিনি আলোকের রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ভারতে প্রবাসী জনৈক অজ্ঞাত ইংরেজ তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় উইল করে তুলে দিয়ে গেছেন বাকিংহামের নিষিদ্ধ হাতে—মিঃ বাকিংহাম যেন সম্পাদকের জীবন ত্যাগ না করেন কোন দিন। অন্তত যতদিন সম্ভব তাঁর এই সামান্য অর্থে প্রাণে যেন বাঁচিয়ে রাখেন স্বাধীন মত প্রকাশের শিখাটিকে।

বাকিংহামের তৃতীয় কাগজ. তদানিন্তন ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্য পত্র 'এথেনিয়াম' এই ভারত প্রবাসী স্বাধীনতা—বন্ধুর প্রাণের কাগজ।

বাকিংহামের হাতে উইল করে যাঁরা স্বাধীনতাকে সঁপে দিয়ে যান সংখ্যায় তাঁরা অল্প হলেও, তাঁদের নিয়ে বাকিংহামের গর্ব কম হওয়ার কথা নয়। জীবন-যন্ত্রণা তাই তাঁর কাছে সৌভাগ্য। সমসাময়িক খ্যাতনামাদের খ্যাতি, শক্তিমানদের শঠতা কিছুই গ্রাহ্য করেননি বাকিংহাম। তাঁর শেষ দিন অবধি বিশ্বাস ছিল—তিনি তাঁর কালের বহু অগ্রবর্তি—অনেক এগিয়ে গিয়ে জন্ম হয়েছে তাঁর, অন্তত তৎকালীন ইংলণ্ডের চেয়ে চিন্তায় তিনি একশ বছরের প্রবীণ।

বাকিংহাম বোধ হয় কমিয়ে বলেছেন। বাকিংহামের প্রগতিশীলতা সময়ের গজ কাঠিতে মাপা যায় না। তিনি চিরকালের সাংবাদিক। তিনি চিরকালের স্বাধীন মানুষ। বিংশ শতকে সাংবাদিকতার সংজ্ঞা পাল্টালেও—বাকিংহাম তাতে বাতিল হন না, আদর্শ হন মাত্র।

সেকালের একজন প্রকাশক

সিপাহী বিদ্রোহের বছর দুয়েক পরের কথা। চিৎপুর দিয়ে চলতে গেলেই পথচারীদের নজরে পড়ত সিংহ-বাড়ির সামনে মস্ত একটা ভিড়। সেকালে কলকাতায় বড়মানুষের অভাব ছিল না। তাঁদের তামাশাও ছিল রকমারি। কিন্তু এই ভিড়টা একটু নতুন ধরনের। সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—হৈ হৈ লেগেই আছে। কৌতূহলী হয়ে যাঁরা উঁকি দিতেন একবার, তাঁরাও দাঁড়িয়ে যেতেন। লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। কারণ, যে বস্তুটিকে ঘিরে এই ভিড় সেটি 'মহাভারত'। মহাভারতের বাংলা অনুবাদ। সিংহ-বাড়ির কালীপ্রসন্ন নিজের পয়সায় ছেপে তাই বিলোচ্ছেন। বর্ধমানের মহারাজা যেমন বিলিয়েছিলেন তেমনি। বিনে পয়সায়।

যাঁদের 'মহাভারতে'র অমৃত কথা শোনার মত সময় এবং বিদ্যে কোনটাই নেই তাঁরাও দাঁড়ান।—যদি মিলে যায়, মন্দ কি! বাজারে ছেড়ে দিলে পঞ্চাশ ষাট টাকা অন্তত আসবে! স্বভাবতই এঁদের ভিড় ঠেলে অনেক পড়ুয়ার হাত বই অবধি পৌঁছল না। কালীপ্রসন্নের মহাভারত লুঠের মালের মত দেখতে দেখতে উড়ে গেল। শূন্য হাতেই ঘরে ফিরতে হলো অনেক আগ্রহী পাঠককে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের ঘরে বসেই একটি ছেলে নিত্য এই ফিরে-যাওয়া মানুষগুলোকে দেখতেন। ছেলেটির নাম প্রতাপ। পুরো বললে—প্রতাপচন্দ্র রায়। প্রতাপ ঘটনাটা দেখেন আর ভাবেন। কেউ কেউ তাঁর কাছেও হাত পাতেন। কারণ, সবাই জানে, প্রতাপ সিংহবাবুর কর্মচারী হলেও তিনি বাড়ির ছেলের মত। কালীপ্রসন্ন এই জোয়ান ছোকরাটাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। কালীপ্রসন্ন প্রতাপকে সত্যিই ভালবাসতেন। অনাথ প্রতাপকে তিনি যখন ঘরে তুলেছিলেন তখন তার মাইনে ছিল সাত টাকা, এখন প্রতাপ পায়—দশ টাকা। আর পায় অপরিমিত স্নেহ। টাকার হিসাবে যার কোন মাপ নেই। কিন্তু 'মহাভারত' সম্পর্কে সে নিরুপায়। কালীপ্রসন্নের মত প্রতাপও আগ্রহীদের অনুরোধ রাখতে পারেন না। কারণ, বই সংখ্যায় গোনাগুনতি, কিন্তু অনুরাগী অফুরন্ত।

ক' বছর পরে। পুণ্যশ্লোক কালীপ্রসন্ন সিংহ শত্রুমিত্রকে কাঁদিয়ে বিগত হয়েছেন। প্রতাপ এখন আর সিংহবাড়ির ছেলে নয়। সে দোকানী। চিৎপুর রোডের ওপর তখন নর্মাল স্কুল। নর্মাল স্কুলের গায়ে প্রতাপের ছোট্ট

দোকান। বাল্যশিক্ষা, বর্ণবোধ ইত্যাদি ক'খানা শিশুপাঠ্য বই আর শ্লেট খাতা পেন্সিল, বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রি হয় সেখানে।

তিনটে বছরও পুরো গেল না। দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল সেই ছোট্ট দোকানটা। প্রতাপ এখন সম্পন্ন মানুষ। কোনকালে এই ছেলেটি সম্পন্ন ছিল না। বরাবরই সে গরীব। বাড়ি ছিল বর্ধমানের শঙ্খগড় অর্থাৎ সাঁকোগ্রাম। বাবা রামজয় রায়। দারিদ্র্য এমনভাবে পদানত করেছিল তাঁকে যে, ছেলেকে জন্মের পর ক'মাসও ঘরে রাখতে পারেননি তিনি। চোখ বুজে তাকে তুলে দিয়েছিলেন গাঁয়ের এক নিঃসন্তান বিধবার হাতে। নতুন মা কৃষ্ণমণি আরও গরীব। প্রতাপকে নিয়ে তিনি চলে এলেন কালনায়। প্রতাপ সেখানে পাঠশালায় পড়ে। নতুন মা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে।

সেই পাঠশালা থেকে ষোল বছর বয়সে প্রথম কলকাতা। কালীপ্রসন্ন সিংহের স্নেহ। তারপর এই দোকান এবং স্বাচ্ছন্দ্য। প্রতাপ বিয়ে করলেন এবার। স্ত্রী গোলাপসুন্দরী সুলক্ষণা। তাঁর ভাগ্যে দিনে দিনে প্রতাপের ব্যবসা বাড়তির দিকে।

পুরনো ভাবনা এবার একটু অনুকূল হাওয়া পেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। প্রতাপ স্থির করলেন, শুধু বই বিক্রী নয়; এবার তিনি বই ছাপবেন। এবং আর কোন বই নয়, ছাপবেন—মহাভারত। কালীপ্রসন্ন সিংহের দরজা থেকে ক'বছর আগে ফিরে-যাওয়া মানুষগুলোর ছবি ভেসে উঠল তাঁর চোখে। নাঃ, যে করে হোক 'মহাভারত' ছাপতে হবে তাঁকে।

রোগটা সম্পন্ন গৃহস্থের নয়। বর্ধমানের মহারাজা কিংবা লক্ষপতি কালীপ্রসন্নের। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে প্রতাপের মত সাধারণ মানুষেরও উপায় হয়। অচিরেই বের হল প্রতাপের প্রথম 'মহাভারত'। ১৮৬৯ সালের জুনে প্রথম খণ্ড। পরবর্তী সাত বছরে বাকীটুকু। ছাপা হল তিন হাজার। দাম—বিয়াল্লিশ টাকা। কিছু লাভ না করলেও এটাই সঙ্গত দাম হয়।

ইতিমধ্যে গোলাপসুন্দরী মারা গেলেন। সংসারে নিজের বলতে প্রতাপের এখন রইল একটিমাত্র কন্যা। মেয়েটিকে পাত্রস্থ করে দেশভ্রমণে বের হলেন তিনি। যেখানেই যান সেখানেই তাঁর 'মহাভারতে'র কথা। অনেকে আক্ষেপ করলেন। বিয়াল্লিশ টাকা দাম—তেমন কিছু নয়। কিন্তু তাই-বা ক'জনের আছে?

নতুন ভাবনা মাথায় নিয়ে প্রতাপ কলকাতায় ফিরলেন। তাঁর এখন বসে খাওয়ার মত অর্থ আছে। আর রোজগার না করলেও বাকী দিন চলে যাবে। একটা ছাপাখানাও হয়েছে। এমত অবস্থায় ইচ্ছে করলে তিনিও পারেন বই কি! হ্যাঁ, কালীপ্রসন্নের মতই বিনা পয়সায় মহাভারত বিলোতে পারেন। যার চাই তাকেই। ঘরে এক হাজার বই তখনও ছিল। একদিনে সেগুলো বিলি হয়ে গেল।

এবার দ্বিতীয় সংস্করণ।। তারপর তৃতীয় হবে, চতুর্থ হবে প্রতাপ ভাবলেন। কত সংস্করণ একা ছাপতে পারেন তিনি? তাঁর একার সামর্থ্য কতটুকু? প্রতাপ স্থির করলেন, তার চেয়ে এই দাতব্য প্রস্তাবকে সর্বদেশের দায়িত্বে পরিণত করাই সঙ্গত। তিনি "দাতব্য ভারত কার্যালয়" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। দেশের লোকের অর্থসাহায্যে এদেশের প্রাচীন

সাহিত্যকে সর্বসাধারণে প্রচার করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ৩৬৭নং অপার সারকুলার স্ট্রীটে "দাতব্য ভারতে"র আপিস বসল।

দেশীয় রাজ্য, রাজা মহারাজারা অর্থসাহায্য করলেন। হায়দরাবাদের নিজাম থেকে কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ী, পুটিয়ার শরৎসুন্দরী এবং আরও অনেকে হাত খুলে সাহায্য করলেন। বিদেশ থেকে এল সংস্কৃত-অনুরাগী বন্ধুদের উৎসাহ। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির স্বনামখ্যাত ডাঃ রস্ট, অধ্যাপক ম্যাক্স মুলার, সার্ এডুইন আরনল্ড এবং আরও অনেকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন এই প্রতিষ্ঠানকে। কারণ এতে শুধু প্রাচীন বিদ্যার প্রসার ঘটবে যে তাই নয়, বিলীয়মান সংস্কৃত পুঁথিগুলোও ছাপার হরফে দীর্ঘতর জীবন পাবে। ভারতের মত তাঁদের পক্ষে সেটা খুবই আনন্দের ঘটনা হবে।

সাত বছর নিয়মিতভাবে চলল "দাতব্য ভারত কার্যালয়ে"র কাজ। প্রতাপচন্দ্র সাত বছরে বের করলেন—মূল সংস্কৃতে মহাভারতের তিনটে সংস্করণ, বাংলায় চারটে সংস্করণ, হরিবংশ—এক সংস্করণ। প্রত্যেক সংস্করণে বইয়ের সংখ্যা তিন হাজার। সব বিনামূল্যে বিলি হল। এবার 'রামায়ণ' গেল প্রেসে।

'রামায়ণ' যখন ছাপা হচ্ছে তখন প্রতাপের মাথায় 'মহাভারতে'র ইংরেজী অনুবাদ জুড়ে বসেছে। প্রস্তাব শুনে বিদেশীদের অপরিসীম আনন্দ।

অন্যদেরও প্রবল উৎসাহ। কিন্তু অনুবাদের পক্ষে 'মহাভারত' এক দুরূহ ব্যাপার। আঠারোটি খণ্ডে রচিত এই বইটি পৃথিবীর বৃহত্তম বই। এর ছত্রসংখ্যা ২,২০,০০০; শ্লোকসংখ্যা তার অর্ধেক। অর্থাৎ এক লক্ষ দশ হাজার। শ্লোকের আবার পাঠান্তর আছে, অর্থভেদ আছে। তা ছাড়া টাকা চাই। প্রতাপ স্থির করেছেন, ডিমাই অক্টেভো দশ ফর্মায় এক-একখানা খণ্ড করবেন। একশ' খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে বই। অর্থাৎ পাতা লাগবে আট হাজার। আট হাজার পাতার এই বিরাট বই ওজন করলে যেমন হবে আধ মণের ওপর, তেমনি টাকাও লাগবে এক লক্ষের কম নয়।

এদিকে ম্যাক্স মুলার উপক্রমণিকা বা প্রথম অধ্যায়টির একটা অনুবাদ পাঠিয়েছেন প্রতাপকে। অনুবাদ করেছিলেন তাঁর এক ছাত্র—জনৈক তরুণ জার্মান, শেষ করতে পারেননি। অনেকেই এমনি শুরু করেছিলেন। ভারতে থাকা কালে সার্ এডুইন আরনল্ডও কয়েক হাজার শ্লোক অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। অংশবিশেষ অনেকেই করেছেন—কিন্তু কোন ইউরোপীয় এখনও মহাভারত শেষ করেননি। এদেশের পণ্ডিতেরা তাই সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। পণ্ডিত দুর্গাচরণ দায়িত্ব নিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন গ্রাজুয়েটও নাকি কোন কোন অধ্যায়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁকে।

যা হোক, ক্রমে সকলের সাহায্য এবং জগৎজোড়া অভিনন্দনের মধ্যে ১৮৮৩ সনের ১৮ই মে বের হল 'মহাভারতে'র ইংরেজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড। অবশ্য গদ্যে। বাংলা দেশের প্রকাশনের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয়। কারণ, যুগ্মভাবে বাঙালীর এটি একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র জানালেন ঃ এই খণ্ডটি মাত্র ১,২৫০ কপি ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে ২৫০ কপি এদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরিত হবে। ৩০০ কপি দেওয়া হবে ভারতীয় শাসন-কর্তৃপক্ষকে। কারণ, গভর্নর-জেনারেল লর্ড

রিপন এবং ডাফরিন থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারীরা অকাতরে তাঁকে অর্থে এবং উৎসাহে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। কথাটা যে কত সত্য একটা ঘটনার উল্লেখেই তা বোঝা যাবে। ১৮৮৮ সনের ৬ই জানুয়ারি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কর্নেল নেভিল চেম্বারলেন—প্রতাপচন্দ্রকে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, প্রধান সেনাপতি সার্ ফ্রেডারিক রবার্টস তাঁর 'মহাভারতে'র ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহিত। এবং

"His Excellency feels sure that you will be glad to hear that Colonel Jarrett, the wellknown Oriental scholar, has kindly consented to meet your wishes..Col. Jarrett lives at 17, Elysium Row, so you might like to communicate with him on the subject."

যা হোক, অবশিষ্ট বইয়ের মধ্যে ২৫০টি বিলি করা হবে ইউরোপ আমেরিকার বিদ্বজ্জনদের মধ্যে, আর ২৫০ কপি থাকবে রিজার্ভে। এ ছাড়া যে আরও ২৫০ কপি থাকবে সেগুলো বিক্রি হবে। এদেশে হলে ৫০৲ টাকায়, বিদেশে হলে ৬৫৲ টাকায়। যাঁরা এতেও কিনতে পারবেন না—তাঁদের অবস্থা বুঝে যথাক্রমে ১২৲ এবং ২৫৲ টাকায় দিয়ে দেওয়া হবে। কাউকে বিফল করা হবে না।

চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রতাপকে অভিনন্দন জানালেন। অভিনন্দন জানালেন, গ্ল্যাডস্টোন, মার্কুইস অব হ্যারিংটনের মত ম্যাক্স মুলার, আরনল্ড, সিলভাঁ লেভি, হাণ্টার প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। লণ্ডনের "দি টাইমস" পত্রে বের হল দীর্ঘ সমালোচনা। নিউ ইয়র্ক টাইমস, ডেলি টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত দৈনিক পত্র এবং পৃথিবীর নানা দেশের গবেষণাপত্র প্রতাপের জয়ধ্বনিতে ভরে উঠল। এদেশেও কম আলোড়নের সৃষ্টি হল না। ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মশাই, শিশিরকুমার এবং মতিলাল ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রতাপকে তাঁদের আন্তরিক অনুরাগ জানালেন। স্টেটসম্যান-এর বিখ্যাত সম্পাদক রবার্ট নাইট এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলোও তুল্যভাবে সম্মানিত করলেন তাঁকে। প্রকাশক প্রতাপ তখন কলকাতায় একটা রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

তারপর মাসে মাসে নিয়মিতভাবে এক খণ্ড করে বের হয় মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ। প্রতি খণ্ডের জন্যে নতুন অর্থ চাই। প্রতাপের আবেদন আর চাঁদার খাতা হাতে চারদিকে এজেণ্টরা ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন। বাংলার জেলায় জেলায়, সারা ভারতবর্ষে। কলকাতায় 'মহাভারতে'র ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে। এমন উদ্যোগ করে বই প্রকাশ বোধ হয় আর কোনদিন হয়নি কলকাতায়।

টাকা আসে, বই বের হয়। এমনি করে বছর বারো চলে গেল। অতঃপর মহাভারত ৯৪ খণ্ডে এসে ঠেকল। পারিপার্শ্বিকে ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ বিগত হয়েছেন। প্রতাপের একমাত্র কন্যা বিধবা হয়ে আবার তাঁর ঘরে ফিরেছেন। প্রতাপ আবার দার পরিগ্রহ করেছেন। এবং ইতিমধ্যে তাঁকে তৎকালের শ্রেষ্ঠ সরকারী সম্মান সি আই ই'তে ভূষিত করা হয়েছে। এত পরিবর্তনের মধ্যেও অনুবাদের কাজ চলছিল

ঠিকই। কিন্তু এবার বোধ হয় সব যায়। কারণ, পুরো এক বছর ধরে প্রতাপ শয্যাগত। শেষে ১৮৯৫ সালের ১০ই জানুয়ারি শেষনিশ্বাস পড়ল এই স্মরণীয় ব্যক্তির। স্ত্রী সুন্দরীবালা স্বামীর মৃত্যুশয্যায় কথা দিয়েছিলেন, যেমন করে হোক শেষ খণ্ডটি পর্যন্ত প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

আমাদের সৌভাগ্য তিনি কথা রেখেছিলেন। সুন্দরীবালার নামেই ১৮৯৯ সনের জুলাইয়ে বের হল মহাভারতের শেষ খণ্ড—শততম খণ্ড। বিধবা সুন্দরীবালা তাঁর স্বামীব্রত উদ্‌যাপন করলেন। 'ডেড ম্যানস ভিক্টরি' নাম দিয়ে ভারতপ্রেমিক সার্ এডুইন আরনল্ড সেদিন এঁদের দুজনকে উপলক্ষ্য করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গোটা ভারতবর্ষকে। কারণ ভারতবর্ষের 'মহাভারত' যেমন অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি প্রতাপচন্দ্র রায়ের মত মানুষও তেমনি এদেশের স্মরণীয় ঘটনা।

শুধু সেকালে নয় বোধ হয় একালেও।

কালচার ও সোডার বোতল
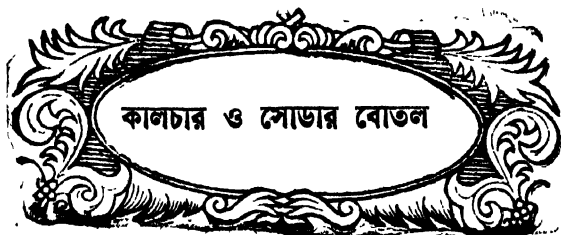
কালচারের সঙ্গে সোডার যোগাযোগ আজ অনেকটা সাহেবের সঙ্গে প্যান্টের মত। কিঞ্চিৎ ঢিলেঢালা ত নয়ই, বরং আরও আঁটোসাটোই হবে। সময়মত ভেবে দেখুন একটু, আপনারও মনে হবে, সোডা আছে বলেই বোধ হয় আমরা আছি। আমরা মানে, আমাদের কালচার আছে।

পোশাক-আসাক পুরোপুরি উঠে গেলেও হয়ত আমাদের সভ্যতা আজ বহাল তবিয়তে চলতে সমর্থ। শুধু আমাদের এই সনাতন দেশেই নয়, পশ্চিমেও তার নড়চড় ঘটার কারণ নেই। কেননা, ভারতবর্ষ যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ ওসব দেশেও তেমনি দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধক বিস্তর। এবং তাদের ক্লাবগুলো সব রেজিস্টার্ড কোম্পানী। সুতরাং কৌপীন বা বিনে-কৌপীনে ইচ্ছে করলেই চলতে পারি আমরা। কিন্তু কালিঝুলি মাখা শার্টে কিংবা পাটভাঙ্গা শাড়িতে? কক্ষনো না। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না মিঃ ডাটার? তার চেয়ে বরং মিসেস সেন একেবারেই যাবেন না আজকের পার্টিতে। এই জামাতে কালকের আপিস? অসম্ভব। রাত নটার কলে অদ্বিতীয় জামাটার কলঙ্ক মোচনে লেগে যাবেন মার্চেণ্ট আপিসের ছোট কেরানি। পয়সা দুটো কম থাকতে পারে তাঁর, তাই বলে কি কালচার নেই একটা? সোডা সেদিক থেকে আমাদের কালচারের আসল অনুপান, আমাদের পোশাকি সভ্যতার আসল দ্বারবান।

তাছাড়া, আয়ুর্বেদোক্ত বস্তু না হলেও সোডার ঊনত্রিশ গুণ। বোতলের সোডার কথাই ধরুন। বিজ্ঞাপনের কথা বলছি না। স্কুল-বয় থেকে রিটায়ার্ড মুন্সেফ, জাতি ধর্ম বর্ণ ও বয়স নির্বিশেষে সেবকেরা বলেন, সোডা ওষুধ। তা খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকে, বদহজম চলে যায়, নেমন্তন্নে নির্ভয়ে কম্পিটিশনে নামা যায় এবং ইত্যাদি। যাঁরা প্রকৃত সমজদার তাঁরা বলেন, এগুলো তুচ্ছ, সোডার আসল গুণ অন্যত্র। গরমে সোডা খান গা জুড়িয়ে যাবে, শীতে খান গাটা একটু গরম হবে। এবং দিবারাত্র সব ঋতুতে খান মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বস্তুত কাপড় কাচার চেয়ে বিনা পরিশ্রমে এই মাথা ধোলাইয়ের কারণেই নাকি আজ সোডার খাতির বেশী।

তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন, পরীক্ষার টিফিনে ছেলেরা সোডা খাচ্ছে। মেয়েদের কাঁচা সোডা সয় না। তাঁরা রেস্টুরেণ্টের টেবিলে বসে আইসক্রীম সোডা চান। নয়ত কমলা লেবুর গন্ধ মাখা সোডা পানি। তাও যদি না থাকে, তবে লেমনেড। মোট কথা, একটা কিছু চাই-ই। নারী পুরুষ, ছেলে

বুড়ো সকলের সোডা চাই। কোন না কোন দিন, কোন না কোন নামে একটা বোতল হলেও চাই-ই চাই।

মার্কিনীরা তাঁদের চলতি যুগটার নাম দিয়েছেন কোকাকোলার যুগ। কলকাতার আজকের যুগটাকেও তাই বলা ঠিক হবে, না, আইসক্রীম সোডার, তা নিয়ে তর্কাতর্কি করে দুটো বোতল না ফাটিয়ে আমার মনে হয় আপোষে একে বোতলের যুগ বলাই হবে ঠিক। বোতল শুনে আবার মতি শীলের যুগ ভাববেন না যেন। শীল মশাই টাকা করেছিলেন শুধু বোতলের ব্যবসা করে। তাই দেখে এক শুঁড়ি নাকি আক্ষেপ করে বলেছিল, কত লোক খালি বোতল বেচে বড়লোক হয়ে গেল আর আমরা ভরা বোতল বেচেও কিছু করতে পারলাম না।

সেটা হয়ত ভাগ্যের কথা। অন্তত সে বেচারা তাই ভেবেছিল। তা বলে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে সেকালে ভরা বোতলের কদর কিছু কম ছিল। ১৮০০ সনের খবর বলি। কলকাতায় তখন পঁচিশটি মদের দোকান। 'আরক' বিক্রি হয় সেখানে। সাহেবরা পা মুড়ে মাটিতে পড়ে পছন্দসই মেয়ের জুতোয় করে তাই ঢকাঢক গেলেন।

'আরক' ছাড়াও তাঁদের জানা ছিল বাটাভিয়ান 'দোয়াস্তা', আরমেনিয়ান 'আনিস', আর দেশী 'টডি'। শেষোক্তটিরও বিলক্ষণ খাতির ছিল তখন। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই পচাই সম্পর্কে যা বলেছেন, ঠিক ততখানি কিনা বলা কষ্টকর। 'আত্মজীবনী'তে বিলাত ভ্রমণ প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি লিখছেনঃ
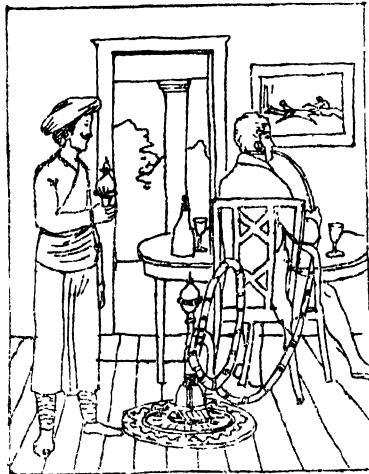
'চারিদিকে ইংরাজ জাতির পানাসক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতাম। কোথায়ও পথের পার্শ্বে দেখি, পর্বতাকার আমাদের দেশের ধান্যের স্তূপ রহিয়াছে।

দাঁড়াইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ ধান্যরাশি হইতে মদ্য প্রস্তুত হইয়া পচা-ধান্য পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

এ সংবাদটি সম্পর্কে আজ মনে সন্দেহ জাগলেও কলকাতায় যে 'টডি' সেকালে ইঙ্গ-বঙ্গ উভয় মহলে জনপ্রিয় পানীয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তাড়ি বা টডি নামেই ছিল কিনা সেকথা হলপ করে বলা যাবে না। কেননা সেকালে এসব জিনিসের সুবিধেমত নামকরণ করে নেওয়াই ছিল প্রথা। লখনউয়ের এক নিষ্ঠাবান নবাবের কথা শোনা যায়। তিনি বিলেতি মদের নাম দিয়েছিলেন—ইংলিশ সিরাপ। সুতরাং, তাড়িরও 'আরক' নাম হওয়া অসম্ভব নয়।

তাড়ি বিক্রি করতে সেকালে লাইসেন্স দরকার হত না। সুতরাং, ঠিক কত তাড়ির দোকান ছিল এ শহরে কালেক্টার তা বলতে পারবেন না। তবে তাঁর অনুমান শ'তিনেক ত হবেই। এবং তাদের বিক্রি হবে মাসে গড়ে—পাঁচ হাজার চারশ ষাট টাকা!

সাইনবোর্ডওয়ালা দোকান ছাড়াও সেকালে এসব পণ্যের জন্যে ছিল পাণ্ড-হাউস, ট্যাভার্ন ইত্যাদি। সেগুলো তাদের নাম অনুযায়ী আপাতদৃষ্টিতে খাওয়া থাকার জায়গা বটে, কিন্তু কলকাতার কালেক্টার জানেন—পানীয়ও সেখানে সহজলভ্য।

তবে হ্যাঁ, এত রকমের মদ থাকতেও কলকাতার মেজাজে তখন মাদকতা ছিল না। কারণ কলকাতায় তখন সোডার বোতল ছিল না। আর, সময়মত হাতের কাছে সোডার বোতলটি না থাকা যে কি মুশকিলের কথা তা যে শুধু পাড়ার ছেলেরাই জানে তা নয়, সাহেবরাও তা জানতেন। জানতেন বলেই তাঁদের মন উসখুস করত, গলা খুসখুস।

মাঝে মাঝে এক আধ বোতল সোডা যে তখন কলকাতায় না পাওয়া যেত তা নয়। তবে বলতে গেলে তা না পাওয়ারই সামিল। কারণ, তা আসত সুদূর জাভা থেকে। তার সরবরাহের পরিমাণ কতখানি ছিল অনুমান করতে পারবেন—যদি উৎসটির কথা শোনেন তবেই।

ইংরেজেরা যখন ডাচদের হাত থেকে জাভা কেড়ে নিয়েছেন তখনকার কথা। একদিন এক ইংরেজ কর্মচারী জাহাজ থেকে নেমে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এমন সময় সহসা তিনি দেখেন তাঁর সামনেই একটি ছোট্ট ফোয়ারা। সাহেবের মনে হল জলটা যেন কেমন তেজী। হাতে নিয়ে একটু চেখে দেখলেন—খেতে যেন কেমন সোডার মত। ব্যস, আর যায় কোথা! তক্ষুনি তিনি ছুটলেন তাঁর জাহাজের দিকে। পরক্ষণেই ফিরে এলেন লোকজন নিয়ে। ফোয়ারার মুখটা সিমেণ্ট করে ফেলা হল। ওপরে শিলমোহর আঁটা হল ডিউক অব নাসুর নামে। তারপর জাহাজের ক্যাপ্টেন সে খবর বয়ে নিয়ে নামলেন এসে কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সিমেণ্ট-আঁটা সেই ফোয়ারা নিয়ে ব্যবসায়ীদের স্পেকুলেশান! দেখতে দেখতে গঠিত হয়ে গেল বিরাট এক কোম্পানীও।

কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল কোম্পানীটি যত বড়ই হক, কলকাতার গলা ভেজাবার সামর্থ্য নেই জাভার। সুতরাং অবশেষে যেদিন টোলা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে জানা গেল—বিলেত থেকে নিয়মিত সোডা আসছে কলকাতায় সেদিন

শহরের মনের কি অবস্থা বুঝতেই পারেন। কলকাতার ট্যাভার্নে ট্যাভার্নে সেদিন উৎসব।

বার বার পড়তে ইচ্ছে করে বিজ্ঞাপনটা। 'কলকাতার মেসার্স টোলা এণ্ড কোং সানন্দে ঘোষণা করছেন যে, সম্প্রতি তাঁরা বিক্রির জন্যে কিয়ৎ-পরিমাণ সোডাপানি আমদানি করতে সমর্থ হয়েছেন।'

সোডার চেয়েও সেকালের বিজ্ঞাপনে বেশী প্রশংসা সোডার বোতলটির। পরবর্তী একটি বিজ্ঞাপন নিবেদন করছে—'পানিটুকু রক্ষিত আছে মজবুত কাচের বোতলে। প্রতিটি বোতলের জন্যে আমরা গ্যারাণ্টি দিতে রাজী। তবে হ্যাঁ, বোতলগুলো যেন সব সময়েই উল্টো করে রাখা হয়।'

১৮১২ সনের অন্য একটি বিজ্ঞাপনে—এই রাখবার কৌশলটাই হচ্ছে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য।' তাতে বলা হচ্ছে—'Care must be taken to keep the bottles on their sides—if this is not attended to, the fixed air will escape in a few days.'

সোডাপানির এই উড়ে যাওয়া নিয়েই নাকি বিশেষ ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন জনৈক এতদ্দেশীয় নবাব। সাহেবেরা তাঁকে নেমন্তন্ন করেছেন। নবাব খাচ্ছেন। এমন সময় বাটলার ফটাস করে একটা বোতল খুলে বসল। সেকি ফোঁসফোঁসানি রাগ সে বোতলের। যেন বোতল ভেঙে উড়ে যাবে পানি। দেখে নবাব বাহাদুরের চক্ষু স্থির। সাহেবেরা তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। সোডা কি করে তৈরী হয়, সোডা কেন এমনি করে, একে একে সবই বলা হল তাঁকে। কিন্তু তবুও নবাবের বিস্ময় আর কাটে না। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন—'সবই না হয় বুঝলাম সাহেব। কিন্তু আমি ভাবছি যে পানি বোতল খুললেই উড়ে যায় সেই পানি তোমরা বোতলে পুরলে কি করে?'

দেশীয় লোকেরা নাকি এসব কারণেই এই আজব-পানি'র নাম দিয়েছিল—'বিলাতী-পানি'। ট্রেভেলিয়ান সাহেব লিখেছেন—ওদের ধারণা ছিল বিলাতের নদী-নালার জলও এমনি তেজী। ('This arises from an idea which prevails in the Hindoo's mind that the ordinary water of the English rivers is bottled for exportation.')

সোডাপানির এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পুরো একটি যুগ লেগেছিল কলকাতার। নিজের হাতে সোডার জল বোতলে পুরতে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পুরো বার বছর। তবে পানিটুকু রপ্ত করতে পুরো এক বছরও যে লাগেনি সেকথা বলাই বাহুল্য। ডজন প্রতি সোডা বোতলের দাম তখন চৌদ্দ টাকা! বোতল ফেরত দিলে—বার টাকা। তবুও কবে জাহাজ আসবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকতেন খদ্দেররা।

পরের বছর (১৮১৩) দাম দশ টাকায় নেমে এল বটে, কিন্তু নিয়মিত সাপ্লাই সমস্যার কোন মীমাংসা হল না। তা হতে হতে কলকাতা এসে পৌঁছল ১৮২৪ সনে। সে বছর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের একটি বিখ্যাত কেমিক্যাল কোম্পানী ঘোষণা করলেন—তাঁরা বিলেতি যন্ত্রপাতিতে বিলেতি মসলায় এতদ্দেশে সর্বপ্রথম সোডাপানি তৈরী করেছেন। দাম বোতলসহ—ডজন সাত টাকা, বোতল ছাড়া—পাঁচ টাকা!

তবুও কি ফ্যাসাদ কম। সোডা একবার রপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং, কলকাতা এখন সোডা ছাড়া একদিনও চলতে নারাজ। অথচ জিনিসটা ত আর আকাশ থেকে পড়ছে না, কলে হচ্ছে। কল বিগড়াতে পারে, যে চালায় তার অসুখ হতে পারে। কিন্তু সোডা কলকাতার কালচারের সঙ্গে গলাগলি হয়ে গেছে। সে এখন কোন কৈফিয়ত শুনতে রাজী নয়। সুতরাং চিঠি গেল কল-মালিকদের কাছে। গালাগালি বোঝাই ক্রুদ্ধ চিঠি।

সেই বিশেষ কলটির মালিক ছিলেন বাঙালী এবং বৃদ্ধ। তিনি ইংরেজী জানতেন না। তার উপর ক'দিন ধরে শয্যাগত। সুতরাং, চিঠিখানা যথারীতি বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে।

ছেলে ত চিঠি পড়ে ভয়েই অস্থির। সে বেচারা সোডা তৈরী করতে জানে না বটে, কিন্তু এটা জানে যে 'খরিদ্দার প্রভুর সমান।' সুতরাং, তার সাকুল্য ইংরেজী বিদ্যে একসঙ্গে করে ইনিয়ে বিনিয়ে উত্তর দিল—

"Respected Sir,

This is to inform you that my father has been ill and unable to make water—but in a fews days he will be better when he will make plenty of water with lots of gas, etc. etc."

চিঠিটা অনুবাদের অযোগ্য।

আপনারা হয়ত বলবেন—'আনকালচারড চিঠি!' কিন্তু কলকাতা বলবে— 'কোন্‌টা তা হলে বেশী কালচারাল? রাগের উত্তরে এমনি একটা চিঠি ছাড়াটা, না হালের মত মাথায় একখানা আস্ত বোতল ঝাড়াটা?'

বাবুদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ
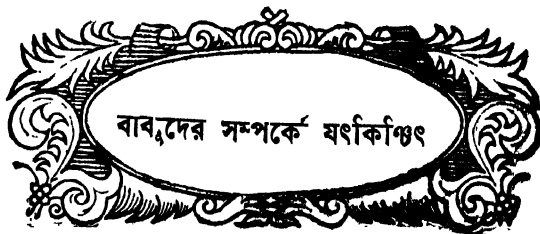
বাবু'দের সম্পর্কে জনৈক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যা লিখে গেছেন অতঃপর কোম্পানির কাগজের মত তা ভাঙিয়েই অনায়াসে আমরা গোটা দু-তিন শতক চালিয়ে দিতে পারতাম। কেননা, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় বাবুকুলে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়নি বলেই অত্র কলকাতার কনিষ্ঠতম বাবুটির (ইনি একটি মাঝারি সওদাগরী আপিসে ডেসপ্যাচ ক্লার্ক এবং তাঁর মাসিক রোজগার আশি টাকার উপর) বিশ্বাস। তবে জ্যেষ্ঠ এবং প্রতিষ্ঠিতরা (এঁদের কেউ কেউ গভর্নমেণ্ট হৌসে বড়বাবু এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ঠিকাদার) সখেদে বলেন—শুধু বঙ্কিমবাবুর সেই দশ অবতার আজ মেট্রিক সিসটেমে রাতারাতি সহস্র অবতারে পরিণত হয়ে গেল, এই যা!

আক্ষেপের কথা হলেও কথাটা সত্য। নানা রূপে, নানা ভাবে 'বাবু'রা আজও জীবিত। সুতরাং তাঁদের নিয়ে যদি কোন 'বাবু' আজ লিখতে বসেন তবে তা পরচর্চা বলে গণ্য হবে না নিশ্চয়। তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। বঙ্কিমবাবু 'বাবু'দের শ্রেণী-বিন্যাস করেছেন বটে, কিন্তু আদি সন্ধানে প্রবৃত্ত হননি। হয়ত তিনি জানতেন নদী, নারী এবং কুলের মত 'বাবু'র উৎস সন্ধান করতে গেলেও বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা।

আজ এ সম্ভাবনা একেবারে নেই এমন কথা আমরা বলছি না। তবে ভরসার কথা এই, আজ উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি ভাঙলেও তা নিয়ে কোর্ট-কাছারি হবে না। কেননা, 'বাবু'রা আজ চিৎপুর আর চৌরঙ্গীতেই শুধু বাস করেন না, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ভাড়া বাড়িটির জন্যেও তাঁরা দরখাস্ত করেন এবং তা না-পেলে খোলার বস্তিতেও আপত্তি করেন না। তা ছাড়া, তাঁরা আজ ট্রামে চড়েন এবং দরকার হলে পায়েও হাঁটেন। আমি অন্তত আসা-যাওয়ার পথে মাইল-প্রতি গড়ে এক হাজার সাত শ ষাট জন 'বাবু'র দেখা পাই। নিজেকে গুনলে অবশ্য—এক হাজার সাত শ একষট্টি জন।

সুতরাং, এমন সর্বব্যাপ্ত যে কুল তাকে নিয়ে নির্ভাবনায় আমরা আজ আলোচনায় নামতে পারি। কেননা, পদবীটা আজ যথার্থই সর্বজনীন। এবং গণতন্ত্রের শিক্ষা—যা সর্বজনের তা কারও নয়। সুতরাং এই অধম বাবুটিকে কুলকুলাঙ্গার আখ্যা দেওয়ার মত কাউকেও তাঁর কুলে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

'বাবু'কে আমরা যখন প্রথম দেখি তখন তিনি 'ফুলবাবু' হয়ে গেছেন।

তিনি ভেঁপু বাজিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যান, বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা উড়িয়ে দেন, কবির আসরে বসে নোট ফেলেন এবং এবম্বিধ। তাঁর সর্বাঙ্গে তখন 'বাবু-লক্ষণ।'

'বাবু-লক্ষণ' দু রকমের। এক ধরনের লক্ষণগুলোকে বলা যেতে পারে শাস্ত্রীয়,—অন্যগুলো লৌকিক।

লৌকিক লক্ষণের মধ্যে অগ্রগণ্য 'বাবু'র চেহারা। গায়ের রঙ সোনালী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এমন কি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হলেও আপত্তি নেই। তবে তৈলাভাস থাকা চাই। তার চেয়েও জরুরী কথা, সেই তৈলচিক্কণ দেহটির পরম্পরাগত অ্যানাটমির বাঁধন ভাঙা চাই। প্রকৃত বাবুর উদরের সঙ্গে পদযুগলের কিংবা দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের পুরোপুরি অসামঞ্জস্য থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, তাঁর বাক্য বা পোশাক এমন হওয়া চাই যাতে অনায়াসে বাঙালীদের থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া যায়। 'বাবু' ধুতি-চাদর পরতে পারেন তবে সেই ধুতিটি যেন ঢাকাই ধুতি হয়। এবং তার জরির পাড়খানা যেন কদাপি ওঁর কোমরে চোট না দিতে পারে! 'বাবু' সব সময় একদিকের পাড় ছিড়ে পরবেন এবং তার কোঁচা সব সময় 'উড়ে কোঁছা' হবে। নয়ত 'ত্রিকচ্ছ'। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তাঁর পক্ষে 'মোজা ওয়াকিং শুজ বা ইজারাদি' পরতে বাধা নেই, কিন্তু কদাপি তেমত অবস্থায় তিনি যেন শুদ্ধ বাংলা বা ইংরেজী না বলেন। প্রকৃত বাবু ভুলেও তা বলেন না। 'সমাচার দর্পণে'র খবর তিনি "যেখানে বলিতে হইবে অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হুদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও স্থানে লিএজা চুঁচড়া চুড়া ফরাসডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা (এবং) কামড়িয়েছে কেমড়েছে।" তাঁর কাছে "টাকার নাম—ট্যাকা এবং মুখের নাম বাৎ।"

ফড্ডাঙ্গার বিছাপেড়ে ধুতি পরে এই ভাষায় অতঃপর যখন তিনি বাৎচিৎ আরম্ভ করেন সাহেবের তখন সন্দেহ থাকে না যে, তিনি কোন অধস্তন মোগলের সঙ্গে কথা বলছেন। রাজ্যটা মোগলদের হাত থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাবুকে খাতির করতে হয়।

এদিকে নিজের বৈঠকখানায়ও 'বাবু'র বিলক্ষণ খ্যাতি। কেননা, এখানে তিনি কথায় কথায় ইংরেজী বাৎ বলেন। যদিচ—"নোটের নাম লোট, যডি গার্ডের নাম বোঁণিগরাদ লৌরি সাহেব নৌরি সাহেব।" এবং "এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্বদাই তিনি হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য" ব্যবহার করেন। আমার মনে হয়, এগুলো শত্রুদের রটনা। 'বাবু' যে এর চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজী বলতে এবং লিখতে পারেন তার নমুনা পরে হবে।

যা হোক, এইসব লৌকিক লক্ষণ নিয়ে 'বাবু'র মাথাব্যথা নেই। শাস্ত্রীয় লক্ষণাদি তার মধ্যে যে পুরোপুরি বর্তমান তাই তিনি প্রমাণ করতে চান। তিনি 'ব্রাহ্মণের ছেল্যা'। তাঁর ইংরেজীতে দরকার নেই। গায়ত্রী শিখলেই যথেষ্ট। তিনি বিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছু দেখাতে চান।

"ঘুড়ী তুড়ী জস আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান,
(আর) অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"

সুতরাং, বাবু দিন-রাত ঘুড়ি ওড়ান, তুড়ি মারেন, আখড়া সাজান এবং

উদ্যোগ করে 'বুলবুলাক্ষ্য পক্ষীর যুদ্ধ' দেখান। অষ্টাহে বনভোজনে, তাঁর মন ভরে না। সুতরাং পানসী করে তিনি নদীভ্রমণে বের হন। গঙ্গাসাগর অনেক দূর এবং অধিকতর বিপজ্জনক সুতরাং মাহেশই তাঁর পছন্দ। কেন, সে কথা আর নাই বললাম। 'হুতোম'ই যথেষ্ট।

আসল কথা, 'বাবু' শুধু ভোগ চান না, খ্যাতি চান। যদি ঘুড়ি উড়িয়ে হয় ভাল, যদি 'শকের যাত্রা'য় হয় তাও ভাল। যদি তাতে না হয় তবে অন্য কিছুতেই তাঁর আপত্তি নেই। তিনি 'কবিতা সঙ্গীত সংগ্রামে'র আয়োজন করতে পারেন, সুপ্রীম কোর্টে কোন কিছু উপলক্ষ্য করে ব্যয়বহুল মোকদ্দমায় নামতে পারেন, দরকার হলে নিকির মত নর্তকীকে মাসে এক হাজার টাকা 'বেতন দিয়ে চাকর' রাখতে পারেন কিংবা যা খুশী। মোট কথা, তাঁর খ্যাতি চাই। নিম্নোক্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে খ্যাতির পক্ষে কোন্‌টি অধিকতর কার্যকরী তা বিচারের ভার পাঁচজনের উপরই রইল।

ভোলানাথ চন্দ্রের বিবরণ। ৺নিমাইচাঁদ মল্লিকের শ্রাদ্ধে তাঁর আট ছেলে মিলে নগদ আট লাখ টাকা শুধু কাঙালীবিদেয় দিয়েছিলেন। এক বামুন ঠাকুর একাই পেয়েছিলেন এক ঠেলা টাকা। (এটা অবশ্য দান নয়, টাকা বিলতে বিলতে একটা ঠেলা তিনি নিজের বাড়ির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন মাত্র!)

পরবর্তী পুরুষে মল্লিকবাড়িতে আর-একটা 'গেজেটে' উঠবার মত উৎসবের আয়োজন হল। এবার বিয়ে। ৺নিমাইচাঁদের নাতি রামরতনের বিয়ে। ভোলানাথেরই খবর : সেই উপলক্ষে চিৎপুরের দুই মাইল রাস্তা গোলাপজলে ভেজানো হয়। এবং সেই শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে এমন ভিড় হয় যে মাথা-পিছু তিরিশচল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়েও ছাদের কার্নিশে একটু জায়গা পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়!

রাজা সুখময়ের দুর্গোৎসব বা রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃক্রিয়ার কাহিনী সর্বজন-বিদিত। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া প্রধান ক্রিয়া হলেও মাতৃশ্রাদ্ধ নবকিষণের চতুর্থ ক্রিয়া। তাঁর একটা ছোটখাট ক্রিয়ার কথাই শুনুন।

১৭৯১ সনের কথা। খানাকুলের বসুদের মেয়ের সঙ্গে নবকিষণের ছেলে রাজকৃষ্ণের বিয়ে। খরচপত্র বা দানসামগ্রীর কথা বলাই বাহুল্য। সেই বিয়েতে বরযাত্রী সাজলেন—'দেশের প্রধান শাসনকর্তা বা গভর্ণর-জেনারেল, প্রধান প্রাড়বিবাক এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা।' সুতরাং খ্যাতি হবে না মানে? 'নবকৃষ্ণ রাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব পঞ্চহাজারী এবং মহারাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব সাতহাজারী মর্যাদা প্রাপ্ত হন।' এই মর্যাদা অনুযায়ী মহারাজা বাহাদুর ইচ্ছে করলে সাকুল্যে সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখতে পারেন। নবকৃষ্ণ কবিদের পেট্রন। লড়িয়ে গোরার চেয়ে লড়িয়ে কবিতে তাঁর বেশী মন। তবুও তিনি বললেন—আলবত রাখব। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ধার করে চার হাজার সৈন্য নিয়ে এলেন। তাঁরা বিয়ের দিন বরের পিছনে পিছনে মার্চ করল।

অতঃপর খ্যাতি না হওয়ার কথা নয়! অবশ্য যশ যদি এতৎসত্ত্বেও অন্যের বৈঠকখানা না ছাড়তে চায় তবে তাঁকে ভুলিয়ে আনার অন্যতর উপায়ও আছে। সেটি দেখালেন চুঁচড়ার স্বনামধন্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার মশাই (১৮২৭)।

যশ কলকাতায় নজরবন্দী দেখে তিনি চিনসুরাতে বসে কোম্পানির কাগজে চুরুট ধরালেন। দেখতে দেখতে দেশ-বিদেশে খ্যাতি রটে গেল। প্রাণকৃষ্ণ এতদ্দেশে নবম 'বাবু' হলেন। তাঁর পূর্ববর্তী আটজন বিখ্যাত 'আটবাবু।' হালদার খ্যাতিটাকে চিরস্থায়ী করতে চাইলেন। তিনি দুর্গোৎসব করলেন। এমন অঢেলা উৎসব বড় একটা হয় না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গোটা কলকাতাকে নিমন্ত্রণ জানানো হল। খৃষ্টান হও, মুসলমান হও, ফিরিঙ্গী হও সকলের জন্য পছন্দ মত মেনু, মনোমত প্রমোদের বন্দোবস্ত!

প্রাণকৃষ্ণ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যশের আরাধনায় অবতীর্ণ হলেন। যশও মিললও। তবে অন্যভাবে। জালিয়াতির অপরাধে তিনি বন্দী হলেন। কলকাতা মথিত করে মোকদ্দমা হল; এবং 'বাবু'দের হাসিয়ে ও ভক্তদের কাঁদিয়ে তিনি কারাগারে চলে গেলেন। অর্থাৎ অমর হলেন।

কৃষ্ণনগরের এক জমিদারবাবু ভাবলেন—অমরত্ব কি এতই দুর্লভ? পলাশীর লড়াইয়ের মাঠটা তাঁর হাতে ছিল। কুড়ি হাজার টাকায় তাই তিনি বেচে দিলেন। তারপর সেই টাকায় সোনা এবং রুপার কাপ গড়িয়ে দু হাতে তাই বিলিয়ে দিলেন! লোকে খ্যাতির কাজ করে কাপ মেডেল পায়—তিনি কাপ বিলিয়ে খ্যাতি পেলেন।

'বাবু'র তখন ভীষণ খ্যাতি। কলকাতায়, চিনসুরায়, কৃষ্ণনগরে—সর্বত্র 'বাবু'র জয়ঢাক। সাহেবরা তাঁকে 'বাবু' বলেন, মোগলরা (!) তাঁকে 'বাবু' বলেন, নর্তকীরা তাঁকে 'বাবু' বলেন। তিনি-ভিন্ন জগৎ অন্ধকার। তিনি যে শুধু মুক্তাভস্মে পান খান তাই নয়,—তিনি 'গ্রন্থমুদ্রণার্থ চাঁদার খাতায়' নাম দেন, 'সতী'র পক্ষে বা বিপক্ষের আর্জিতে সহি দেন, 'টৌন হলে' মৃদুমন্দ সভা হলে বগি হাঁকিয়ে সেখানে হাজিরা দেন এবং দরকার হলে বাষ্পীয়-পোত নির্মাণ বিষয়ে পর্যন্ত কথা বলেন! সুতরাং, নিজের সৃষ্টিকে দেখে সৃষ্টিকর্তারাও এবার চমকালেন। তাঁরা চোখ রগড়ে বললেন—'ইজ ইট?'

বলা বাহুল্য, নিজেদের হাতে বাঙালী নামক একটা অদ্ভুত জাতিকে ('The biable plastic and receptive inhabitants of Bengal') যাঁরা বিশ্বকর্মার মত 'বাবু'ভাবে সাজিয়েছেন তাঁরা 'সাহেবলোগ' (Sahiblogue)। কী করে তাঁরা এমন একটা আশ্চর্য-দর্শন অদ্ভুত-স্বভাব মনুষ্যকুল সৃষ্টি করলেন এ বিষয়ে তাঁদের মতামতটা শোনা দরকার। কেননা, তা না হলে 'বাবু'র বংশপরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

'বাবু'রা তখন বাঙালীর বেশে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা খবর এল—সুতানটীর ঘাটে জাহাজ ভিড়েছে। 'বাবু' শুনলেন—জাহাজ যারা নিয়ে আসে তাদের মাঝি বলে না। তারা 'কাপ্তান'। কিয়ৎকাল তিনি মুর্শিদাবাদে এবং অন্যত্র মসনদ ধরার কারবার করেছেন। এবার 'কাপ্তান ধরা' তাঁর ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। অনেক বাঙালী তাতে 'জেণ্টু' হয়ে গেলেন। তাঁরা সাহেবের সঙ্গে ভাবেভঙ্গীতে কথা বলে বিস্তর রোজগার করে ফেললেন। ইতিহাসে এঁরা—'দোভাষী'। বিনে মূলধনের কারবারে কলকাতায় তাঁরাই প্রথম 'বাবু'। এ শ্রেণীর বাবুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রতু সরকার এবং পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নকু ধর,—ওরফে লক্ষ্মীকান্ত ধর। বিশুদ্ধ ব্যবসা করে যাঁরা বড়লোক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বল্পখ্যাত

উল্লেখযোগ্য তিনজন—পীড়িতরাম 'মাড়' (১৭৮০), কৃষ্ণপান্তি এবং বিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠের বাবা। পীড়িতরাম 'মাড়' পদবী পেয়েছিলেন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাঁশ বেচে এবং কৃষ্ণপান্তি আড়ংঘাটার ছোলা বিক্রি করে। শেঠবাবুর ব্যবসা ছিল গঙ্গাজল এক্সপোর্ট করা।

পরবর্তী শ্রেণীর 'বাবু'রা চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী তা স্থির করা একটু কষ্টকর। কেননা, তাঁদের পদবী 'সরকার'। তাঁরা সাহেবের কুঠিতে কাজ করেন বটে, কিন্তু মাইনে নেন না। তাঁদের একমাত্র প্রাপ্য 'দস্তুরি'। সওদাগরী হৌসে দালালের দস্তুরি তখন টাকায় আধা পয়সা। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন—

'Dustoor is the breath of a Hindoo's nostrils, the mainspring of his actions and the staple of his conversations? (G. O. Travelyan, 'The competitionwallah')

ডাকঘরে টিকিট কিনতে গিয়েও 'বাবু' দস্তুরী দাবী করেন। আর একবার এক সাহেব দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর আসবাবপত্র সব বিক্রি হচ্ছে। একজন মস্তবাবু এসেছেন সেগুলো কিনতে। দরদাম সব ঠিক হল। টাকা নিতে গিয়ে সাহেব দেখলেন—কিছু যেন কম। তিনি বললেন,—বাপু হে, কি ব্যাপার? (প্রসঙ্গত বলা দরকার—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'বাবু' শব্দটি 'বাপু' থেকে জাত এবং বঙ্গদেশে তা পশ্চিম থেকে আগত। তাঁর মতে—'বাপু' মুণ্ডারি শব্দ। অবশ্য কোন কোন সাহেবের অনুমান—শব্দটি আসলে এসেছে পূব থেকে। জাভা বালি কিংবা ওসব এলাকা থেকে। সেকালের 'বাবু'দের অযোগ্য উত্তরপুরুষ হলেও আমি তা মানতে নারাজ। কেননা, সন্ধান নিয়ে দেখেছি ওদিকে 'বাবু' মানে এখনও—'মেয়েছেলে' ('Female attendant'!)

যাহক, সাহেব বললেন—কি হে বাপু, চুপ করে রইলে যে?

'বাবু' মাথা চুলকে উত্তর দিলেন—আমার পাওনাটা কেটে রেখেছি, মি লর্ড!

—তোমার পাওনা?

—ইয়েস, মি লর্ড, মাই দস্তুর!

সাহেব হাসলেন। হেসে আরও দুটো টাকা বখশিশ দিয়ে দিলেন। 'বাবু' পরমানন্দে তা পকেটে পুরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

ট্রেভেলিয়ান লিখছেন—কি করে বিনে পরিশ্রমে রোজগার করা যায় 'বাবু'র কেবল সেই চিন্তা। রোজগারের জন্যে সে সব কর্মে রাজী। কেবল ইউরোপীয়ানরা যাকে বলে 'কাজ' (work) সেটি বাদ দিয়ে। আমি ভেবে পাই না আমরা এদেশে আসার আগে এই মানুষগুলো কি করে পথঘাট তৈরী করত, নৌকো বানাত বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করত!

'বাবু'র এসব রহস্যালাপে কান দেওয়ার সময় নেই। তাঁর হাসি ঠাট্টার নিজস্ব সময় আছে, স্থান আছে, পদ্ধতি আছে। আপাতত তার বিজনেস বা কাজ (work নয় কিন্তু) 'বাবু' খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। যথা—ব্রীজমোহন। (আমরা তাকে 'বাবু বি বানরজী' লিখতে পারতাম কিন্তু 'সমাচার চন্দ্রিকা'র 'কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষর ত্যাগে বিরক্তস্য' মহাশয়ের জন্য

তা সম্ভব হল না। সুদূর ১৮২৯ সনে তিনি লিখেছিলেন—'যাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ K. Banerjee বা কৃ. বানরজী লিখেন। বানরজীর বা অর্থ কি?')

ব্রীজমোহন বাবু-বিষয়ক একটি বিশিষ্ট ইংরেজী বইয়ের নায়ক। (The Baboo and other Tales by Augustas Smith) তার বাবা সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু 'বাবু' ছিলেন না। ব্রীজমোহনের ধারণা সে উচ্চতর উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছে। ভবিষ্যতের 'বাবু'র তালিকায় নাম লিখিয়েই সে পৃথিবীতে এসেছে।

সুতরাং সাধনা শুরু হল। 'কাপ্তেন-ধরা' ব্যবসা ছেড়ে ব্রীজমোহন রাইটার এবং ফাইটার ধরার কাজে হাত দিল। গোরা সৈন্যরা যখন খুঁজে খুঁজে হন্যে ব্রীজমোহন তখন তাদের সামনে আর্ক এঞ্জেল-এর মত এসে হাজির হয়। তার বেনিয়ানের তলায় দামী শেরীর বোতল!

ছোকরা রাইটাররা অসময়ে ধার চায়। ব্রীজমোহন বলে--দিতে পারি, তবে এক শর্তে। প্রমোশন হলে কিন্তু কুড়ি গুণ ফেরত চাই।

সাহেব বলল—আলবৎ পাবে।

ব্রীজমোহন বলল—তবে এই নাও।

সাহবদের একটা মস্ত গুণ ওদের আর যাই থাক, কথার ঠিক আছে। যথাসময়ে টাকাটা পাওয়া যায়। তৎসহ 'থ্যাঙ্কস' এবং বখশিশও।

ফলে, ক' বছর কাটতে না কাটতেই দেখা গেল ব্রীজমোহন 'বাবু' হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, তার আদি চেহারাটায় চার স্টোন মাংস জমে গেছে। বলা বাহুল্য, এদিকে সিন্দুকেও যথারীতি মেদবাহুল্য ঘটে গেছে।

ব্রীজমোহন একটা সিন্দুক বাঁধা রেখে একটা সরকারী চাকরী কিনল। সে এখন কালেক্টার আপিসের খাজাঞ্চী। তবে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। সুতরাং, সে পূর্ব ব্যবসাও ছাড়ল না। যুগপৎ এখনও সে বহু সওদাগরী কুঠির বেনিয়ান এবং অনেক সাহেবের সরকার। স্মিথ লিখছেন—সবাই তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ব্রীজমোহন সব সময়ই হাসে। হেসে বলে—আই এ্যাম দাই স্লেভ!

ভাববেন না, 'ইয়োর মোস্ট অবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট'এর বেশী যাঁরা এগোন না তাঁরা 'বাবু' নন। তাঁরাও 'বাবু'। 'হবসন-জবসন'-এর মতে 'বাবু' মানে—'এ নেটিভ ক্লার্ক হু রাইটস ইংলিশ।'

রাজনারায়ণ বসু শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে বিলেতের 'পাঞ্চ' কাগজ কেরানী-বাবুর ইংরেজী নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছেন। সুতরাং, আমরা এবিষয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করব না। শুধু গোটা দুই নমুনা শোনাব।

বিশ্বম্ভর মিত্র জনৈক সাহেবের কাছে কেরানীর কাজ করেন। সাহেব সেদিন কুঠিতে নেই। সন্ধ্যায় ভীষণ ঝড় এল। ঝড়ে সাহেবের আপিসের জানালা দরজা সব ভেঙে গেল। বিশ্বম্ভর প্রভুকে সে সমাচার জানিয়ে লিখছেনঃ

'yesterday vesper a great hurricane the valves of the window not fasten great trapidetion and palpitation and then

precipetated into the precinct. God grant master long long life and many many posts.

P.S. No tranquility since valve broken. I have sent carpenter to make reunite. etc.'

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে)

বিশ্বম্ভর এতটা না লিখলেও পারতেন। কেরানীদের ডাঃ জনসনের ডিক্সনারীটা পুরো মুখস্থ করতে হবে এমন কথা ছিল না। তাদের কাজ ছিল নকল করা। তদুপরি কেউ যদি শ' দুই শব্দ 'ঘোষাতে পারতেন' তবে ত কথাই ছিল না! তবুও জনৈক বিশ্বম্ভর মিত্র কেন তাঁর ইংরেজীবিদ্যা দেখাবার এই সুযোগটা হাতছাড়া হতে দিলেন না সেটা বুঝতে হলে আবার আমাদের 'বাবু'-চরিত শুনতে হবে।

'স্যার আলিবাবা ওরফে Aberigh Mackay নামে এক সাহেব এসেছিলেন এদেশে। তিনি লিখে গেছেন—প্রকৃত বাবুর লক্ষণ চারটে। (১) পায়ে পেটেণ্ট চামড়ার জুতো, (২) মাথায় সিল্কের ছাতা, (৩) মনে আবছা আবছা ইংরেজী ভাবাদর্শ এবং (৪) মুখে—
ten thousand horse-power English words and phrases!
(Mackay, 'Twenty one days in India')

কথাটাকে বিশদ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'বাবু'র ভেতরটা ঠিক লড়াইয়ের পর যুদ্ধক্ষেত্রের মত। মৃতদেহের মত এখানে ওখানে রাশি রাশি ইংরেজী শব্দ প্রবাদ প্রবচন ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছে। কোনমতে ঠেলা বোঝাই করে সেগুলোকে সাফাই করতে পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান। মুখ দিয়ে আগে কি বেরিয়ে গেল, পরে কি আসছে সে দিকে তার কোন ভাবনা নেই!

তার আসল ভাবনা ক্রমে যা দাঁড়াল তা—ইংরেজদের মত ভাবতে হবে (অর্থাৎ, রামমোহন বা দ্বারকানাথের মত)। একান্ত যদি তা না পারা যায়, তবে ইংরেজদের মত চলতে হবে, বলতে হবে এবং লিখতে হবে! সুতরাং, পাকা লিখিয়ে বিশ্বম্ভর যখন মালিককে ঐ ভাষায় চিঠি লিখছেন তখন জনৈক 'নেটিভ-বয়' খবরের কাগজের সম্পাদককে সখেদে জানাচ্ছেনঃ

'......I am a poor native boy rite butiful English—and rite good sirkulars for Mateland Sahib..very ceap, and gives one ruppes eight annas per diem, but now a man say he makes betterer English, and put it all rong and gives me one ruppes..'

অথচ কি দুঃখের কথা দেখুন। ছেলেটি যে শুধু 'ভাল' ইংরেজীই লিখতে পারে তাই নয়, তার অন্য গুণও আছে। সে লিখছে—

—I make potery (কবিতা) and country Korruspondanse."

চিঠিটা নাকি ছাপা হয়েছিল ইংলিশম্যান কাগজে। পড়ে কে কি ভেবেছিলেন আমরা জানি না। কিন্তু—একজন সাহেব ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মেকলে। তিনি বসে বসে বিশ হাজার পাউণ্ড হর্স-পাওয়ার-বিশিষ্ট ইংরেজী গদ্যে 'বাবু'কে সম্পূর্ণ করার এক পরিকল্পনা

রচনা করলেন। তাঁর সেই 'মিনিট' সর্বজনবিদিত। আমরা বরং এখানে অল্পজ্ঞাত কয়টি বিশ্বকর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি জর্জ ক্যাম্পবেল। টাকা দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে সর্বস্বান্ত বাবুরা মেকলের বিধান অনুযায়ী যখন ইংরেজী পদ্যে জীবন-দর্শন ঘোষণা করছেন—

"Here today and gone tomorrow
In this vale of tear and sorrow;
Never lend, but always borrow
Kuchpurwani, Mari Jan!"

তখন এই ক্যাম্পবেল সাহেবই তাঁদের হাত ধরে স্বর্গের তোরণে এনে দাঁড় করালেন। 'বাবু'দের তিনি সরকারী চাকরির অধিকার দান করলেন। তবে এর চেয়ে তাঁর বড় অবদান—'বাবু'দের তিনি ফুটবল ও ফুটপাথ চেনালেন। ফলে পা দুখানা একটু পুষ্ট হল এবং উদরখানা আয়ত্তাধীনে আসার লক্ষণ দেখা গেল।

লর্ড অকল্যান্ড সদাশয় ব্যক্তি। তিনি সে পায়ে জুতো পরবার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর পরবর্তীরা ক্রমে ক্রমে পেটভরে খাওয়ার অনুমতিটা কেড়ে নিলেন। ফলে মেকলের কারখানার প্রথম গ্রাজুয়েট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন—'বাবু'রা শুধু যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন তাই নয়, তাঁরা ভোরবেলায় জুতা পায়ে গোলদিঘির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেও শিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেখে লিখলেন—'বায়ুকেই ইহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্ধর্ষ কার্যের নাম রাখিবেন বায়ু সেবন।'

ম্যাকে সাহেব লিখেছিলেন—'বাবু' হাসতে জানে না। যদি জানত তবে 'সি আই ই' নামক জীবগুলোকে দেখে নিশ্চয় তার হাসি পেত। বঙ্কিম জানালেন—'বাবু' আরও এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজেকে দেখেও হাসতে শিখেছেন।

দুঃখের বিষয় এই অধম'বাবু' আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও আজ হাসতে পারছে না। কেননা, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাবু'দের দেখে হেসেছিলেন কিংবা কেঁদেছিলেন তাই আজও সে ঠাহর করে উঠতে পারছে না।
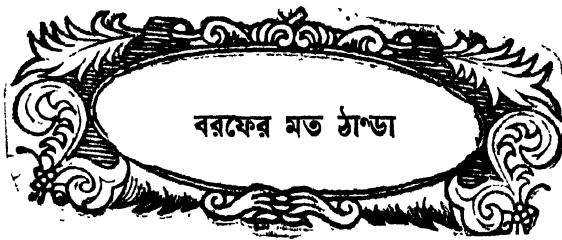
নেহেরুজী বলেছিলেন—কলকাতা 'ডেরেলিকট সিটি।' আমি বলি—কলকাতা 'ঠাণ্ডি-শহর।' বরফের মত ঠাণ্ডা।

কর্কট-ক্রান্তির কাছাকাছি হলেও কলকাতা শহরে উত্তাপ নেই, উষ্ণতা নেই। এপ্রিলের ফারেনহিটে এক শ তেরো ডিগ্রি বললেও এ শহরের প্রাণ আজ বরফের মত ঠাণ্ডা।

ভেবে দেখুন, এ শহরের নাগরিকেরা ট্রামে-বাসে গরম হয় নয়া পয়সা নিয়ে, খেলার মাঠে হারলে অথবা জিতলে, রাজনীতিতে ভোট না মিললে, বা অনুরূপ কারণেই। ছাত্ররা এখানে উত্তেজিত প্রশ্নপত্র দেখলে, কেরানীরা দুটো টাকার জন্যে, বাড়িওয়ালা বা মুদী অনাদায়ী ভাড়া বা চাল-ডালের দামের জন্যে বা এবম্বিধ। প্রতিবেশীদের রক্ত উষ্ণ হয় এখানে কলের জলের জন্যে, প্রতিবাদীদের অন্যপক্ষের মুখ বন্ধ করার জন্যে। কলকাতার নগরজীবনের আজ এটাই 'কোড'—নাগরিকের এটাই জীবন। এই আটপৌরে জীবনই কলকাতার আজ স্বাভাবিক জীবন। তার বড়-একটা ব্যতিক্রম নেই, নড়চড় নেই। অথচ জীবনের নড়চড় আছে, সেটাই তার প্রাণের লক্ষণ। প্যারি-ওয়াশিংটনে মাঝে মাঝে তা দেখা যায়। যে কোন একটা হলিডেতে শত শত লোক জীবন দিয়ে তার প্রমাণ দেয় ওয়াশিংটন-নিউইয়র্কে। আর প্যারির রিভিয়েরা? তার যে বিবরণ শুনেছি, কলকাতার রক বা 'পাড়ার ছেলে' তার কাছে হাস্যাস্পদ। এ শহর যে পচে গলে শেষ হয়ে যায় না, তার কারণ জীবনের কোন গোপন ফল্গু নয়, এ শহরের শব ডালহৌসি-বড়বাজারের আরকে জরানো আর মসলিনে জড়ানো। তাদের এই বাণিজ্য-পিরামিডে মমি-কলকাতা তাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

কিন্তু একদিন ছিল ঠিক এর উলটো। কলকাতা তখন সম্রাট। শিরায় শিরায় তার তখন নতুন তাজা রক্ত। বরফের মত ঠাণ্ডা আজকের এই শহর, বরফ দিয়েই উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারত সেদিন। তুলেছেও। পৃথিবীর কোন শহরের জীবনে যা কোনদিন সম্ভব হয়নি, কলকাতা তাই করেছে। সত্যি-সত্যিই এক টুকরো বরফ হাতে নিয়ে ছোট্ট ছেলের মত উর্ধ্ববাহু নৃত্য করেছে সে।

প্রমেথিউস স্বর্গ থেকে যেদিন আগুন চুরি করে এনেছিলেন সেদিনও বোধহয় এমন উত্তেজনা হয়নি, যেমনটি হয়েছিল কলকাতায় প্রথম বরফ-পড়ার দিনে। অন্তত সেদিনের কাহিনীটি শুনলে তাই মনে হবে আপনার।

কলকাতা ভূমণ্ডলের যেখানটায় অবস্থিত, সেখানটা বরফের রাজ্য না হলেও মাঝে মাঝে এখানেও বরফ পড়ে। ঝম ঝম বৃষ্টির সঙ্গে ইল্‌শেগুড়ি বরফ। মেমসাহেবরা দামী দামী ফ্রক কাদা করে তাই কুড়তে লেগে যান। বাধ্য হয়ে বাবুর্চী-বেয়ারাও সাহায্য করে। কিন্তু পুরো 'কোম্পানি'র আন্তরিক উদ্যমেও আস্ত একটি গ্লাস ভরে না। এক পেগ ক্ল্যারেতও ভেজে না তাতে। সাহেব-মেমদের মনে তাই ভীষণ দুঃখ। শিলাবৃষ্টি যদি নিত্য হত তাও একটা কথা। দু বছর চার বছরে একদিন আধদিন হয়। এতে কি কখনও পেট মানে, না মন ঠাণ্ডা হয়?

এক ভরসা নবাব-বাড়ির নেমন্তন্ন। এমিলি শেক্সপিয়র নামে এক মহিলা মুর্শিদাবাদে নেমন্তন্ন খেয়ে জানালেন:

There was abundance of ice—which at this season is a variety no less than a luxury and to which we are indebted for cool wine and water.

ওটা ১৮১৪ সনের কথা এবং তখন জুলাই মাস।

জুলাই মাসে বরফের খবর শুনে কলকাতার ইংরেজদের নোলা ছকছক করে উঠল। হোলি ফাদার জানেন নবাবরা কোত্থেকে এ সময়ে এমন জিনিস টেবিলে এনে হাজির করে। হয়ত বা কাশ্মীর থেকে। যেখান থেকেই হক কলকাতার তা জেনে লাভ কি? কাশ্মীর থেকে বরফ এনে খাবে, কলকাতার রাইটারদের তা স্বপ্নেরও অগোচর। তাদের কাছে নবাব-বাড়ির নেমন্তন্নও তাই।

শেষ অবধি একটা ব্যবস্থা হল। হুগলীতে কল বসল একটা—বরফ-তৈরীর কল। অধিকাংশ সময়েই তা আবার বিগড়ে যায়। কলকাতার হোটেল-রেস্টুরেণ্টেও তাই নিত্য বরফ মেলে না। চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের সাহব-কুঠিতে তো নয়ই। ফলে কাছাকাছি বরফের সন্ধান পেয়ে তেষ্টা আরও বেড়ে গেল কলকাতার নাগরিকদের। এতকাল বরফ ছিল তাদের স্বপ্ন, হুগলীতে বরফ এসে এখন তা হয়ে দাঁড়াল সাধনা। কী ভাবে দু টুকরো পাওয়া যায় তারই সাধনা। শুতে বসতে খেতে সবার এই এক ভাবনা।

অবশেষে একদিন এক অঘটন ঘটে গেল।

১৮৩৩ সনের কথা। জনৈক সাংবাদিক লিখছেন:

"সবে সকাল হয়েছে। আমি তখনও ঘুমিয়ে। সহসা চাকর ঘরে ঢুকে সে কী চেঁচামেচী!"

"কী ব্যাপার?"

"হুগলীতে বরফ এসেছে হুজুর।"

"হুগলী?"

"হুগলী নয়, আমাদের হুগলী নদীতে হুজুর।"

"বরফ? এ সময়ে"—দূর, তাও কি হয়?"

"জি হুজুর, তাই হয়েছে। পেতে চান ত শিগগির চলুন।"

"So I at once jumped up, bathed while my horse was being saddled, and rode down to the Ghaut.

"সেখানে গিয়ে একখানা পানসি নিলাম। ধীরে ধীরে পানসি গিয়ে

ঠেকল এক বিরাট জাহাজের গায়ে। এর পেট বোঝাই নাকি বরফে!"

আমেরিকান জাহাজ। চিকাগো থেকে চার মাসে শত শত মাইল পথ সাঁতরে এসেছে কলকাতাকে ঠাণ্ডা করতে। (গম বিতরণের বহু আগে ভারতবর্ষকে বরফ দানের এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ইণ্ড-মার্কিন সহযোগিতার একটি প্রাগৈতিহাসিক নজির। নয় কি?)

"কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ হল। সত্যিই তিনি বরফ নিয়ে কলকাতায় এসেছেন।"

আমাদের কলকাতার এই ভদ্রলোকটি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। সুতরাং আর পাঁচজনের ভাগ্যে যা সম্ভব হয়নি, তিনি সেখানে খাতির পেলেন। কাপ্তেন হাতে ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন জাহাজের খোলে। বরফ দেখুন! (He was allowed to peep into the abyss where the treasure lay).

"ঐ ত, ওখানে পড়ে রয়েছে রাশি রাশি বরফ। সাদা ধবধবে কাচের মত স্বচ্ছ বিরাট বিরাট চৌকো টুকরো। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যত্নসহকারে প্যাক করা। এই অনিন্দ্যসুন্দর অবয়বের উপরে বিউটি-স্পটের মত আয়াসে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে কতকগুলো গোলাপী রঙের আমেরিকান আপেল।"

"কিন্তু মুশকিল হল, একে তীরস্থ করা যায় কী করে? আর কী করেই বা সম্ভব কলকাতার আবহাওয়ায় এর সংরক্ষণ। এমন আগন্তুককে অভ্যর্থনা করার মত উপযুক্ত কোন ঘর কলকাতায় নেই. এমন কি দুই-চারদিন একে ধরে রাখবার মত একখানা বাক্সও।"

অগত্যা সাংবাদিক খালি হাতেই কুঠিতে ফিরলেন। বাড়ি এসে খানসামাকে পাঠালেন বাক্স-প্যাঁটরা দিয়ে। কাপ্তেন তাকে বলে দিয়েছেন, ফানেল কাগজে কিংবা কাপড়ে মুড়ে নিতে বলবেন, দেখবেন বাতাস যেন না লাগে।

খানসামা বরফ নিয়ে ফিরল।—কিন্তু এ কী?—মাত্র এইটুকু? "একটা রুপেয়া তোমাকে দেওয়া হল, কথা হয়েছে এক পাউণ্ড দেবে।—এখানে ত দেখছি বড়জোর আধ পাউণ্ড হবে!—ব্যাপার কী খোদাবক্স?"

"জি হুজুর, সব পানি হো গিয়া।"

"কাপড়টা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছিলে কি?"

"না সাহেব, তাতে বরফ না কি ভীষণ গরম হয়ে যায়।"

"Then the ice has had the full benefit of sun and air."

"Yes master!"

"বাক্সটা বন্ধ করেছিলে ত?"

"না সাহেব তাতেও বরফ না কি ভীষণ গরম হয়ে যায়।"

মেমসাহেব বারান্দায় মোড়া পেতে বসে আছেন, হঠাৎ নজরে পড়ল উঠোনের এক কোণে চক চক করছে বিরাট একখণ্ড বরফ।

ছুটে গেলেন ভিতরে। "বেয়ারা, বাগানে বরফ এল কোত্থেকে?"

ভৃত্য সবিনয়ে জানাল—ওটি সে-ই ভাঁড়ারঘর থেকে বাগানে ফেলে দিয়ে এসেছে।

"কেন?"

"মেমসাহেব, ওটা কালকের বরফ, বাসী হয়ে গেছে।"

"ইডিয়ট!"

যা হক শহরে সেদিন একমাত্র সংবাদ কলকাতায় বরফ এসেছে। এক টুকরো, দু টুকরো নয়, আস্ত এক জাহাজ বরফ। যে যেখানে ছিল গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে। আপিস আদালত, দোকান-বাজার আজ সব বন্ধ। আজ বরফ, শুধু বরফ খাবার দিন। এক বেলার জন্যে কোম্পানির রাজত্ব বন্ধ রইল। কলকাতা বরফ নিয়ে গরম হয়ে উঠল। স্টককুয়েলার লিখছেন:

All the business were suspended until noon, that people might rush about to pay each other congratulatory visits and device means for perpetuating the ice supply.

সবাই সবাইকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। আমেরিকান বরফে ঘরে ঘরে ক্ল্যারেত বিয়ার ইত্যাদির স্বাদে কী পরিবর্তন ঘটেছে তা চেখে দেখতে একে অন্যকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। খবরের কাগজওয়ালারা বসে গেলেন এই প্রীতিপ্রদ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে।
("Never was the Editorial pen employed upon a more delightful theme.")

দেখতে দেখতে জাহাজ অবশ্য খালি হয়ে গেল, কিন্তু বরফ-পর্ব শেষ হয়ে গেল না। নিষ্ঠাভরে কলম ধরেই রইলেন সম্পাদকেরা। বরফ-প্রশ্ন (Ice-question) আপাতত তাঁদের প্রধান আলোচ্য। বড়মানুষেরাও পরামর্শে বসলেন। ভবিষ্যতের কথা পরে, উপস্থিত এই আমেরিকান ভদ্রলোককে তাঁর প্রাপ্য দাম চুকিয়ে দিয়েই কর্তব্য সম্পাদন করা যে কলকাতার পক্ষে ভদ্রসুলভ আচরণ হবে না—এ বিষয়ে সবাই একমত হলেন। জাহাজের কাপ্তেনকে নিয়ে কলকাতার একটা কিছু করা উচিত—এটাই সবার মত। নয়ত শহরের ইজ্জত থাকবে না। নেতারা গিয়ে ধরলেন লাট বাহাদুরকে। মহামতি বেণ্টিঙ্ক তখন গভর্নর-জেনারেল। সুযোগ পেলেই জনসেবা করা তাঁর নেশা। এ-সুযোগটাও তিনি হাতছাড়া হতে দিতে রাজী নন। তিনি সব পরামর্শ শুনলেন। অতঃপর স্থির করলেন, কলকাতায় একখানা গুদাম তৈরি করবেন তিনি। বরফের গুদাম; আজকাল যার নাম কোল্ড-স্টোরেজ! জনসাধারণের চাঁদায় তৈরী হবে সেটি এবং যে যার ইচ্ছেমত বরফ রাখতে পারবে সেখানে। এমন কি নিজ নিজ বাক্সে পুরে মদ্য-মাংসও রাখা চলবে।

আর ঠিক হল, আমেরিকান জাহাজের কাপ্তেন রোজার্সের নামে একটা সম্বর্ধনা হবে।

যথাসময়ে টাউন হলে মহা ধুমধাম করে আয়োজিত হল সে সভা। ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কলকাতাবাসীর হয়ে সে সভায় পড়লেন—বরফওয়ালা রোজার্সের প্রতি কলকাতার অভিনন্দনপত্র:

"To W. C. Rogers Esq. of Boston.

Sir,—The importation of American ice into Calcutta is an enterprise so novel and beneficial that I cannot resist the desire of my expressing to you my sense of the spirit and skill by which it has been planned and executed."

আমি আপনাকে তাই অনুরোধ করছি, আপনি আজ আপনার এই অভূতপূর্ব উদ্যোগে এবং তার সফল রূপায়ণের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের এই সামান্য উপহারটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করুন।"

বলেই বেণ্টিঙ্ক সাহেব কাপ্তেন রোজার্সের হাতে তুলে দিলেন একখানা সোনার কাপ। কলকাতাবাসীর চাঁদার টাকায় তৈরী স্মারক। চার দিক থেকে আনন্দধ্বনি উঠল। তার মধ্যেই আবেগমথিত কণ্ঠে মহামান্য গভর্নর বলে চললেন:

ক্যাপ্টেন রোজার্স, ক মাস আগেও আপনার এই পরিকল্পনা হয়ত আখ্যাত হত অলীক কল্পনা বলে। কিন্তু আজ আমি নিঃসন্দেহ যে, আপনার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা সবাই একমত। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, আপনার এই কর্মের ফলে জনসাধারণের প্রভূত উপকার হবে।"

তারপর রোজার্স সাহেবের প্রতি এই আবেদন জানিয়ে বেণ্টিঙ্ক তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন যে, তিনি যেন তাঁর এই 'মহৎ পরিকল্পনা' অনুযায়ী ভবিষ্যতও কাজ করে যান।

বরফ নিয়ে বেণ্টিঙ্ক এ পর্যন্তই এগিয়েছিলেন। কলকাতা একটা ঠাণ্ডি-ঘরও তৈরী করেছিল। তার পরের গভর্নমেণ্ট এগিয়ে গেলেন আরও অনেক-দূর। তাঁরা নিজেরাই বরফের কল বসালেন লক্ষ্ণৌতে। হুগলীর ফ্যাক্টরি ছিল প্রাইভেট সেক্টার-এ, লক্ষ্ণৌর বরফ সরকারী জিনিস, পুরোপুরি পাবলিক সেক্টারের কল। সুতরাং গর্ব করে গভর্নমেণ্ট বিজ্ঞাপন দেন কাগজে:

Ice is now procurable at the Govt. Manufacturing, Lucknow, at two annas per seer. The Govt. is now in a position to offer this invaluable luxury to the public at a price which defies competition and special attention is invited to the fact, that their principlcs are small profit and quick returns.

Observe—Two annas per seer only!—Only two annas per seer!

'দু আনা, মাত্র দু দু আনা সের!' এমন করে আজ আর কলকাতায় সরকার বাহাদুর বরফ ফিরি করে না, কোল্ড ড্রিঙ্কের চেয়ে 'কোল্ড ওয়ার' আমাদের মস্তিষ্ককে আজ বিব্রত করে বেশী, বরফের মত ঠাণ্ডা জিনিস নিয়ে তাই আর কেউ লেখেনা,—লিখতে জানে না।

তাই বলছিলাম, কলকাতা আজ বরফের মত ঠাণ্ডা।

মৎস্য-পুরাণ
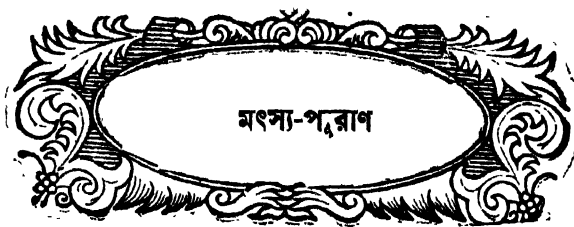
মৎস্য কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুন মাছ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা।
তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিংড়ির মাথা॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥

উপরের লাইন কয়টি থেকে যে-রান্নাঘরটির গন্ধ আপনার নাকে এসে লাগছে সেটি বরিশাল জেলার অন্তর্গত।

বরিশালের গৃহস্থ বধূরা যখন পরম সন্তোষে পা ছড়িয়ে বসে মাছের এই বাটিগুলো সাজাচ্ছেন, চৈতন্যদেবের তখনও জন্ম হয়নি। এমন কি, এই সেদিন ঢাকার বসাকমশাই যখন 'বাল্যশিক্ষার' মাছের ফর্দটি মিলাচ্ছেন, তখনও বোধ হয় তিনি ভাবতে পারেননি যে, অদূর ভবিষ্যতেই এমন দিন আসবে যখন তাঁর পাঠকদের একজনমে এতগুলো মাছের মৌখিক ত পরের কথা, চাক্ষুষ দর্শন লাভের সৌভাগ্যও আর মিলবেনা। 'চাঁদা, বাচা, চিংড়ি, বাতাসি, বোয়াল' ইত্যাদি কবিতার মতই স্পর্শাতীত হয়ে থাকবে তাদের জীবনে। কারণ অচিরেই শোনা গেল: বিজয়গুপ্তের বরিশালের সেই রান্নাঘরে কপাট পড়েছে, এবং যশোহরের কৈ ও পদ্মা-গঙ্গার ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্যের তালিকায় উঠেছে। 'বাল্যশিক্ষার' সমস্ত শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে বাঙালী কবি তখন সুর ধরেছেন:

'জোলা মরে তাঁতে
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মরে মাছে আর ভাতে।'

নতুন কবিতা, নতুন সুর। কিন্তু অনেক কবিতার মতই বোধহয় এই কবিতাটিও মিথ্যে। বাঙালী যদি মাছ খেয়ে মারা যেত তবে বাংলাদেশ শহীদের গৌরব পেত। তাতে আমার আপত্তি ছিলনা। কিন্তু ঘটনা তা নয়। ইতিহাসে এমন অনেক কথা আছে যেগুলো আসলে প্রবাদ নয়, অপবাদ। 'মাছে ভাতে বাঙালী' প্রবাদটিও তাই। ভাত বাঙালী কোনদিন খায়নি, খেতে পায়নি। 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে' বাঙালীর উচ্চাকাঙ্খা মাত্র। এক ইংরেজ-আমলেই বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে আঠার বার, আর প্রায়-দুর্ভিক্ষ—যার

আফিসিয়াল নাম 'স্কারসিটি', সেটি অসংখ্যবার। মাছের ঘটনাও তাই। পৃথিবীতে যেসব জাত 'মেছো' বলে খ্যাত, তাদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে বাঙালীর বসাই চলে না। ইংরেজেরা মাথাপিছু বছরে মাছ খায় ৪৯ পাউণ্ড বা প্রায় আধমন। ডেনমার্কের লোকেরা ২৪ পাউণ্ড আর আমরা বাঙালীরা মাত্র ৯ পাউণ্ড! এমন কি, আমাদের ভোজবাড়ির চ্যাম্পিয়ানদের কনজামশানও হপ্তায় দু-আউন্সের বেশী নয়। সুতরাং 'ভেতো বাঙালী' এবং 'মেছো বাঙালী' দুই-ই মিথ্যে রটনা।

তবে শীতের কোন সন্ধ্যায় বৌবাজারের কোন উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে বৈঠকখানার গলিপথের দিকে ধাবমান কেরানী বাঙালীর দিকে এক নজর তাকালে কিংবা গুপ্তকবির রচনাবলীর একখানা মাত্র কবিতা, "এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ" মন দিয়ে পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়, মাছে বাঙালীর মন আছে। অন্তত, মাছ সম্পর্কে সে উদাসীন নয়।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বাংলাদেশে তখন নতুন অনুরাগীরা এসে দেখা দিয়েছেন তাঁরা অনুরাগের মূল্য দিতে জানেন!

'ব্যয় হেতু কোনমতে না হয় কাতর।
থানায় আনায় কত করি সমাদর॥
ডিস্ ভরে কিস্ লয় মিস্ বাবা যত।
পিস্ করে মুখে দিয়ে কিস্ খায় কত॥'

গুপ্তকবির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা বিশেষত কলকাতার বাঙালী বুঝতে পারলেন—এহেন মৎস্য-প্রীতির সঙ্গে তাঁদের পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা অবান্তর। সুতরাং তাঁরা ভেটকি, চিংড়ি, ইলিশের বাজার ছেড়ে কুচো চিংড়ি এবং চুনো ইত্যাদিকে অবলম্বন করলেন এবং বিদেশী মৎস বিলাসী দেশী তপসেকে নিয়ে পড়লেন।

এই তপস্বী মাচ্ছি (Topsee Muchee) বা তপ্‌সে মাছ ছিল অষ্টাদশ শতক এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার ইংরেজের আরাধনা। এর নাম এবং স্বাদ নিয়ে তাদের সাহিত্যে আলোচনা গবেষণার অন্ত নেই। একজনের মতে—যেহেতু আমের মরসুমে এর আবির্ভাব সেই হেতু বাংলার এই White ban এর নাম—ম্যাঙ্গোফিশ। তাছাড়া এর গন্ধের সঙ্গেও আমের গন্ধের বিলক্ষণ মিল আছে। গুপ্তকবির মতে

এমন অমৃত ফল ফলিয়াছে জলে।
সাহেবরা সুখে তাই ম্যাঙ্গো ফিশ বলে॥

সাহেবরা বলেন, আমাদের তপ্‌সে নামের অর্থও তাঁরা জানেন। একজন লিখেছেন, 'The natives have named them Tapaswi (Penitent) fish (abbreviated by the Europeans to Tapsi) from their resembling a clan of religious penitents, who never shave, but who, like the mango fish, disappear during the rainy season.'

বর্ষা শুরু হলেই তা কাড়াকাড়ি পড়ে যেত একে নিয়ে। কলকাতার বাজার লুটেপুটে খেয়ে সাহেবরা বড় বড় নৌকা নিয়ে পাড়ি জমাতেন। এদিকে উলুবেড়ের ওদিকে আর ম্যাঙ্গোফিশ আসে না। একগাদা 'কৈ হ্যায়' (Qui Hye!) বা চাকর-খানসামা নিয়ে তাঁরা হানা দিতেন ফোর্টগ্লষ্টার,

ফলতা প্রভৃতি অঞ্চলে। দশ-পনের মাইল জুড়ে চলত তাঁদের তপস্বীর সন্ধান!

'এ ত তুচ্ছ!' জনৈক রিটায়ার্ড কর্নেলের মত 'এক ডিস তপসে মাছ খেতে পেলে—বিলেত থেকে কলকাতার ক মাসের সমুদ্রযাত্রার ধকল কিছু নয়।'

আর একজন বলেন, 'Perhaps there is not in the world a greater delicacy than the Mango fish of the Hooghly.'

তপস্বীর আর এক বিদেশী ভক্ত গর্ব করে লিখছেন, It is true that I have destroyed my liver in Calcutta, but I have eaten Topsi mutchees! 'সত্য বটে কলকাতায় আমি আমার লিভারটিকে নষ্ট করেছি, কিন্তু তপসে মাছও তেমনি খেয়েছি।'

এ ভাবে খেতে খেতে ইংরেজের লিভার যখন নষ্ট হয়ে এসেছে, বাঙালী তখন মাছের অভাবে যায় যায়।—খালি তপ্‌সে? সাহেবেরা না খায় কী? সিংহল থেকে রাশি রাশি শামুক ঝিনুক আনায়, তাই খায়। বাড়িতে চৌবাচ্চা করে ঝিনুক পোষে, মুক্তা যদি পায় বিবিদের গলায় পরায়, নয়ত মাসটুকু খায়। এমন কি কাঁকড়াও উধাও বাজার থেকে। কাঁকড়ার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে শৌখিন বাঙালী অগত্যা এসে হাজির হলেন ইংরেজী হোটেলে। জানেন. কাঁকড়াই বল, আর চিংড়িই বল এখানে সব আছে। ভাঙা ইংরেজীতে তিনি সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন।

"Do you serve crabs here?"

"Why not? We serve anybody, sit down!"

বাটলাররা হাসাহাসি করে। কিন্তু মাছে বাঙালীর মন মজেছে। এখন তার মান অপমান সবই সমান। হাসতে হাসতে মাথা নিচু করে বাবু বসে পড়লেন।

হাজার হোক, রাজা প্রজা সম্পর্ক। বাঙালীর এই দুরবস্থা সাহেবদের সহ্য হল না। তাঁরা স্থির করলেন, এর যা হক একটা বিহিত তাঁরা করবেন। কিন্তু কী ভাবে? সরকারী শাসনশালায় 'মস্তিষ্ক' বরাবরই ছিল। তাদেরই একজন সরকার বাহাদুরকে কানে কানে বললেন; খাল বিলতো সেচে খাওয়া সাঙ্গ, হুগলীও চষে সারা, এবার গভীর জলে চলুন। নিমকহারাম বাঙালীর পেটে কিছু নোনা জলের মাছ পড়ুক।

গভীর জলের মাছ! গভীর জলের মাছ!

কলকাতায় রব পড়ে গেল: বৈঠকখানা, চিৎপুর, টৌরিটিবাজারে জেলেদের মুখে শোনা গেল এবার কলকাতায় আর মৎস্য-কষ্ট থাকছে না। সাগর থেকে মাছ শিকার করে এনে সাহেবেরা এবার বাঙালীর পেট ভরাবেন।

এটা ১৮২৯ সনের কথা। তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ত দূরের কথা, কংগ্রেসেরই জন্ম হয়নি। বাংলা সরকার গভীর জলের মাছ নিয়ে পড়লেন। প্রস্তাব উঠলেই কোন সরকার কাজে নেমে পড়েন না। তার আগে তাঁদের কমিটি বসাতে হয়। এবারও কমিটি বসল। তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু: কলকাতায় যথার্থই মাছের অভাব আছে কিনা তা নির্ণয় করা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে গভীর জলের মাছ শিকারের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা।

কমিটি কলকাতার বাজারগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, মাছ দেখলেন,

হিসেব নিলেন। তারপর বের হল তাঁদের রিপোর্ট। এপ্রিলে তাঁরা কাজে নেমেছিলেন, ২২শে সেপ্টেম্বরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ছাপা হল তাঁদের মৎস্য-পুরাণ। স্ট্যাটিসটিকসের ফিগারে কিছু এদিক ওদিকে হলেও তাঁদের রিপোর্টটি কলকাতার মাছের বাজার বিষয়ে সনাতন বলে দাবী করতে পারে। তাই সংক্ষেপে সেটি উল্লেখ করছি এখানে।

কমিটির মতে (১) কলকাতার বাজারে চাহিদা অনুপাতে ভাল এবং পুষ্টিকর মাছের সরবরাহ অত্যন্ত কম। (২) গরিবেরা এখানে উচ্চ দামে বাজে মাছ কিনতে বাধ্য হয়, যদিও এ দামে তাদের পক্ষে ভাল মাছ পাওয়া উচিত। (৩) কলকাতার বাজারে যে-সব মাছ আমদানী হয়, যানবাহনের অভাবে তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। (৪) জেলেদের অবস্থা যারপর নাই খারাপ। তারা মাছের ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান লাভের কিছুই পায় না। সুতরাং উত্তম মাছ সরবরাহের দিকে তাদের কোন উৎসাহ নাই। (৫) কলকাতার বাজারে দৈনিক গড়ে মাছ বিক্রি হয় ১৭৮০ সিক্কা টাকা ৩ আনার। (৬) এখানে মাছের কারবারে লাভের পরিমাণ টাকায় ছ আনা। (৭) দাম বাড়ান কমানর ব্যাপারে যৌথভাবে ব্যবসায়ীদের কোন চেষ্টা এখানে নেই।—অর্থাৎ শেষেরটিকে 'হাঁ' বাচক ধরলে এবং ৬নং তথ্যে ছ' আনার বদলে টাকায় একশ' ষোল আনা করলে কলকাতার সেদিনের মাছের বাজারের সঙ্গে আজকের কোন পার্থক্য নেই।

তারপর কমিটি হিসেবটিসেব করে বার করলেন, কলকাতায় বছরে মাছ বিক্রি হয় ১,৮২,৫০০ সিক্কা টাকার। জাহাজ কিনে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতে খরচ পড়বে ২ লক্ষ টাকা। তার উপর মাসে মাসে লোকের মাইনে, জাহাজ চালানর খরচও আছে, তাতে লাগবে কমপক্ষে মাসে ১০,০০০ টাকা বা বছরে ১,২০,০০০ টাকা! ঘাবড়ানর কিছু নেই। যা মাছ ধরা পড়বে তার থেকে এটা বাদ দিন। দেখবেন মোট ৬২,৫০০৲ টাকা বা শতকরা ৩১ টাকা লাভ হচ্ছে সরকারের। সুতরাং তাঁরা বললেন, গভীর জলের মাছ ধরার চিন্তা অত্যন্ত সাধু চিন্তা এবং অত্যন্ত গভীর বুদ্ধির পরিচায়ক!

কিন্তু কী ঘটে গেল, কে জানে। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে পরিকল্পনাটি আর সমুদ্র অবধি গেলনা। এদিকে বৈঠকখানা, বাগবাজারের দু পুরুষ কেটে গেল। একালে যারা গভীর জলের নোনা মাছ খাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন, তাঁদের নাতিরা জানতে পেলেন, এবার সত্যিই সরকার মাছ ধরতে সাগরে চলেছেন। এবার আর জেলেদের মুখের সংবাদ নয়। ১৯২০-২১ সনের কথা। খবরের কাগজেই বার হল—বঙ্গ সরকার জাহাজ কিনেছেন। মাছ ধরার জাহাজ। তার নাম 'গোল্ডেন ক্রাউন' বা 'সুবর্ণ তাজ'।

কিছুদিন পরেই আবার খবর পাওয়া গেল; না, মাছ ধরায় সুবিধা হচ্ছে না। সরকার বোধ হয় জাহাজটা বিক্রিই করে দেবেন। সমর্থকদের মুখে কতখানি কালো ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে 'সুবর্ণ তাজ' বিক্রি হয়ে গেল। বেসরকারী জেলেরাই মুচকি হেসে আবার দায়িত্ব নিল কলকাতার, তথা বাঙালীর।

তার পরের ইতিহাস ত সবারই মুখস্থ। ছ জাহাজের বহর 'কল্যাণী'র কল্যাণে মাছ না পেলেও ইতিমধ্যেই গভীর জলের উবর অনেক পেয়েছেন আপনারা। ইতিহাসের পথ ধরে সাগরের দিকে চলেছেন আমাদের দেশী

সরকার। তাঁদের জাহাজও মাঝে মাঝে বিগড়াবে, মাঝে মাঝে মাছের আয়ে তেলের খরচ পোষাবে না; মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে জাপানীরা চলে যেতে চাইবে। কিন্তু তাতে কী? সরকারের সঙ্কল্প সাধু। এমন কি, একদিন যদি 'গোল্ডেন ক্রাউনের' মত 'কল্যাণী'রও বিক্রির খবর শোনেন বাজারে, মন খারাপ করবেন না।

জানবেন তার জন্য দায়ী সরকার নয়; দায়ী ইতিহাস আর কলকাতা শহর। ইতিহাসের দোষ এই, মাঝে মাঝে সে 'রিপিট' করে। বিশেষত কলকাতায় যেন তার মতিগতি ওদিকেই বেশী।

অরণ্য রোদন

ছোটবেলায় যখন দেশে ছিলাম তখন শুনতাম—কলকাতায় গাছ নেই। গাছ তো দূরের কথা, একখানা দুর্বাঘাসও নেই। সারা শহর সান্-বাঁধানো। পথ-ঘাট, দাওয়া মাঠ সব। সব ঠন্‌ঠনা পাক্কি জমি। শুনতাম আর হা হয়ে ভাবতাম।—দূর তাও কি হয়! সত্যি বলতে কি ট্রামগাড়ী নয়, বায়স্কোপেও নয়—এই গাছ না থাকাটাই ছিল আমার কাছে এ শহরের সবচেয়ে আজব ব্যাপার।

তারপর যখন কলকাতা এলাম, দেখলাম—গাছ আছে। চেনা অচেনা, না জানা-না-জানা অনেক গাছ। চারতলা বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম এ সহর গাছে গাছময়। কিন্তু আশ্চর্য—বনময় নয়। গাছ এখানে এলোপাথারি নেই, ইচ্ছেমত নেই, গাছের এখানে বন নেই। মনে হলো এই তো ভালো। বনবাদারের দেশে লালিত আমার কিশোর মন ভালবাসলো কলকাতার এই সভ্য বৃক্ষকুলকে। গাছ আমার এ নগরে প্রথম ভালবাসা।

লোকে ভালবাসার জনকে নিয়ে কাঁদে, আমিও ওদের জন্যে একটু কাঁদব। হোক না অরণ্য-রোদন। যদি আমার চোখের জলে একটি নারকেল চারাও খুশী হয়, আমার কাছে সেই-বা কম কি? আমি তাহলেই খুশী।

গাছ। কলকাতার গাছ—নাগরিক গাছ। এ শহরে আছে এরা প্রকৃতির নিয়মে নয়, মানুষের আইনে। মানুষ গাছ লাগায় আজ এখানে আইনমত। (বলা বাহুল্য বন-মহোৎসব ঠিক আইন না হলেও প্রায়-আইন। ল' না হলেও ওপরওয়ালার সার্কুলার।)

যা হোক্, গাছ এখানে আইনে জন্মে যেমন, খাবারও তার তেমনি রেশন। বরাদ্দমত সার পায়, জল পায়। জাত বুঝে বয়স বুঝে তার গোড়ায় দেওয়া হয় সালফেট্ অব এমোনিয়া কিংবা সুপার-ফসফেট্। বৃদ্ধিও তার আইন মাফিক। বংশ বৃদ্ধি তো বটেই। এ্যাসপ্লানাডের গাছগুলোকে একটু নজর করে দেখবেন শীর্ণ লিক লিকে গাছগুলো বুকে বুকে ধরে রয়েছে টিনের প্ল্যাকার্ড। পরিবার নিয়ন্ত্রণ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। নিজেরা বাধ্য হয়ে সভ্যতার বুলি মুখস্ত করে আজ মানুষকে শেখানোর কাজে সাহায্য করছে বেচারারা।

দেহস্ফীতির অধিকারও তাদের বংশবৃদ্ধির মতো। বাড়তে চাইলেই বাড়তে দিতে রাজী নয় শহর, সভ্যতা। ছাগলে মুড়িয়ে দিয়ে যায়। দুর্গা-পূজার পাগলেরা বিসর্জনের লরীতে ঢাক ঢোলক বাজী বাবুদের সঙ্গে দা

রাখে একখানা। পাছে মায়ের যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটে। পাছে ব্যাঘাত জন্মে স্বচ্ছন্দ গতায়তে—ট্রামকোম্পানীও মাঝে মাঝে তাই দুর্বিনীত কর্মীর মতো ছাঁটাই করে লাইনের ধারের ডালপালা।

অঙ্গহানির সঙ্গে প্রাণহানির নিকট সম্পর্ক। সুতরাং গাছ এখানে মরে। নানা নাগরিক কারণে গাছ এখানে সভ্যতার সঙ্গে না পেরে উঠে নিঃশব্দে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এ-শহরে এদের জন্মের চেয়ে মৃত্যুহারটাই আজকাল উচ্চতর। দুঃখের বিষয়, এ-ব্যাপারে সেন্সাস রিপোর্ট সম্পূর্ণ নীরব, ততোধিক নির্বাক খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। খবরের কাগজে সচিত্র বন-মহোৎসব সংকীর্তন আমি দেখেছি। মাঝে-মধ্যে বৃক্ষবন্দনা বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পড়ার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে কিন্তু মৃত্যু সংবাদ কদাপি না। তাই বলে ভাববেন না গাছ মরে না এ-শহরে, কিংবা মরলেও শোকের মতো সংবাদ তৈরী করে মরে না। মনে করে দেখবেন, আপনিও দেখেছেন, শুধু মরে নয়, মরে, মরিয়াছিল, মরিতেছে, মরিবে, মরিতে থাকবে ইত্যাদি নানা অবস্থায় আমি প্রতিদিন তাদের দেখছি। নিজ চোখে এই কলকাতা শহরে এই চৌরঙ্গীতে আমি দেখেছি গাছ মরে, অল্প বয়সে মরে, অসুখে মরে—এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। নয়ত আজ যাকে দেখলাম—তরুণ বনস্পতি রাতাবাতি শেষ পাতাটিসহ সে শুকিয়ে যায় কি করে। বিজ্ঞ লোকেরা হয়ত বলবেন, বাজ পড়ে কিংবা ওষুধ প্রয়োগেই এবম্বিধ মৃত্যু সম্ভব। অর্থাৎ তাঁদের মতে দৈব অথবা মানুষই তার জন্যে দায়ী। দুঃখের বিষয়, ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্তে আমি অসম্মত।

যাক্ সে কথা। গাছ মরে এবং আমাদের মতো আত্মহত্যাও করে—এ-দুটো সংবাদের সঙ্গে আমাদের জীবনের ঐক্য সুস্পষ্ট। তবে এক বিষয়ে ওরা আমাদের চেয়ে কিঞ্চিৎ ভাগ্যবান বলেই আমার ধারণা। আমাদের মতো মরলেই ওদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয় না অন্যদের জন্যে। শহুরে মানুষেব পক্ষে এই ঔদার্যটুকু যেন কেমন একটু অপ্রত্যাশিত। তাই একদিন কৌতূহলী হয়ে এক কর্পোরেশনম্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর কারণ। তিনি বলেছিলেন, ডেথ্ সার্টিফিকেট ইস্যু হতে টাইম লাগে কিনা, তাই। অর্থাৎ রেড্ টেপইজমের দৌলতেই মরেও ওরা কবরস্থ হয়না, রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আমার ধারণা একটু ভিন্ন। নন-অফিসিয়াল হিসেবে আমার অভিমত—পৌর-কর্তাদের সৌন্দর্যবোধ বা এ্যাস্থেটিক সেন্স-ই মরা গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখে রাস্তায়। বোধ হয় অনেকের মতো তাদেরও বিশ্বাস, মরা গাছ অনেক সময় জ্যান্ত গাছেব চেয়ে সুন্দর, অনেক বেশী নয়নাভিরাম। মনে মনে একটু তাকিয়ে দেখুন:

তিরিশ ফুট নীচে কচুরীপানাস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ জলা। তার ওপরে বাঁশের মাচা। তার ওপরে এলোপাথারি হোগলার ছাউনি, জনবসতি। মানুষ এবং গরু একসঙ্গে বাস করে এখানে। স্বভাবতঃই জলাটি পূতিগন্ধময়। এমন অবস্থায় এই ছবিটির দিকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই চোখে পড়বে আপনার যে জিনিষটি, তা হচ্ছে বিশালকায় গুটি দুই গাছ। মরা গাছ। তিরিশ ফুট উঁচুতে দণ্ডায়মান এই গাছ দুটোর শীর্ষে উপবিষ্ট গুটি তিন শকুন। উদাস

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নীচের দিকে, আগামীকল্য বা আগামী মাসে মরবে যে গো-বৎসটি তার দিকে।

দৃশ্যটি একটু ভালো করে কল্পনা করুন। দেখবেন, এই গাছ দুখানা মরা না হয়ে জ্যান্ত হলেই শকুনেরা উড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ লঘু হয়ে যায় আপনার ভাবনাও। আমার জনৈক ফটোগ্রাফার বন্ধুর অন্ততঃ তাই অভিমত। তিনি বলেন: এমন পারিপার্শ্বকে গাছগুলো জ্যান্ত হলেই এমন সাধের ল্যান্ডস্কেপটি মাটি হয়ে যায়। কম্পোজিশান থাকে না।

শুধু এই একটি জায়গাতেই নয়, জ্যান্ত এবং মরা গাছ না থাকলে কম্পোজিশান নষ্ট হয়ে যায় গোটা শহরের। গাছ না থাকলে কয়েক হাজার মানুষের জীবনই থাকে না। মুচি, নাপিত, সাধু, ভিখারী এবং ভ্যাগাবন্ডরা নাগরিক হতে পারে না। নগর-জীবনের রং থাকে না। আশ্রয় পায় না বানর-নাচওয়ালা, ভেল্কিবাজীওয়ালারা। এদের জন্যে অক্সিজেন বরাদ্দ নেই শহরে, বে-আইনীভাবে মোটা মোটা গাছের গোড়া জড়িয়ে ধরে তাই এরা শ্বাস টানে। গাছ এদের একমাত্র আশ্রয়। পুরুষানুক্রমে কৃপণ শহরে অকৃপণভাবে তারা আজও পালন করছে এই পুণ্য কর্তব্য। শাখায় শাখায় আজও সে আশ্রয় দিয়ে আসছে শ্রীমর্কটদের এবং তলে যুগপৎ তাদের উত্তর পুরুষ তথা ভক্তদের। ভক্তদের বললাম এজন্যে যে পিতৃসম্বন্ধ ছাড়াও শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরদের সঙ্গে অদ্যাবধি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কলকাতাবাসী যে-কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একটু নজর করলেই বুঝতে পারবেন এ-শহরের শতকরা ৮০টি পাবলিক স্কাল্পচার বা প্রকাশ্য প্রতিমূর্তি তাদের বিশ্ববিনিন্দিত দেহের প্রতিমূর্তি এবং তন্মধ্যে শতকরা ৯৯টি-ই স্থাপিত এবং পূজিত বৃক্ষতলে। যেখানে তা নয় বলে মনে হয়, সেখানেও একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন—বাইরে থেকে বাড়ী বা মন্দির বলে মনে হলেও, শ্রীহনুমানজীর পাদপীঠ আসলে বৃক্ষমূলেই সংস্থাপিত। অদ্ভুত উপায়ে এ-সব ক্ষেত্রে কলকাতার মানুষ এ্যাড্‌জাষ্ট করেছে লাছপালাকে। গাছকে নির্মূল করে, তারা বাসা বাঁধেনি। গাছের অসভ্য অবস্থিতিকে স্বীকার করেই গড়ে উঠেছে তাদের আস্তানা। ফলে কোথায়ও হয়ত দেখবেন, পরিমাণ-মত টিনের চালা ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে নারকেল গাছ, কিংবা ইঁটের দেওয়াল ভেদ করে অশ্বত্থের শাখা। কলকাতা ছাড়া অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর শহরে এমন জিনিস সম্ভব হয়েছে বলে আমি শুনিনি। এমন কি লর্ড ক্লাইভের হুকুমে পর্যন্ত কলকাতাবাসী হাত তুলোনি এদের গায়ে। শোনা যায়, সিরাজদ্দৌলাকে হারানোর পর লর্ড ক্লাইভ তাঁর দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করেন কলকাতার বৃক্ষকুলের ওপর। সে-বছরই (১৭৫৭) নাকি খুব বড় রকমের একটা মহামারী হয় কলকাতা শহরে। শহরের স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় ক্লাইভ ঢেরা পিটিয়ে দিলেন সহর্ষে—গাছ কাট, যার যা খুশী। 'আজ থেকে অত্র কোম্পানীর এলাকা থেকে যে-কেহ নিজ ব্যয়ে কমলালেবু এবং অন্যান্য ফলকর উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য যে-কোন গাছ কাটাইয়া নিতে পার। কোম্পানীর তাতে আপত্তি নেই।' লোক গাছ কাটলো, কিন্তু প্রচুর গাছ কাটলো না। টিঁকে গেল আম, নারকেল আর অশ্বত্থ। ধর্ম তাদের বাঁচালো। আজও

কলকাতার লোক ধর্মের নামে তাদের রক্ষা করে। যদি তা না করতো, তবে পাতাবাহার ছাড়া কোথায়ও অন্য গাছ চোখে পড়তো না আজ।

কিন্তু গাছ ব্যক্তি হিসেবে বাঁচলেও জাতি হিসেবে বাঁচে না তাতে। বিশেষ করে কলকাতায় যে মহাজাতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিল এরা, তার বিন্দুমাত্র গৌরব রক্ষিত হয় না এই দু'চারটে গাছে। কলকাতার বৃক্ষ-যুগের একটু নমুনা দেওয়া যাক। তা হলেই বোঝা যাবে—এ-নগরের অতীত বৃক্ষ-গৌরব কতখানি কি ছিল। চার্ণকের ক' বছর পরের কথা বলছি। ১৭০৭ সালের কথা। কোম্পানীর কলকাতাকে তখন ভাগ করা হতো চারটে অঞ্চলে। গোবিন্দপুর, সুতানুটী, বড়বাজার এবং শহর কলকাতা। এর মধ্যে শুধু শহর কলকাতার কথাই ধরা যাক্। তখনকার সময়ে এই খোদ শহর এলাকায় কি পরিমাণ গাছপালা ছিল, আশা করি তার একটা মোটামুটি অনুমান করতে পারবেন নীচের হিসেবটি থেকে।

বাড়ী-ঘর	..	...	... ২৪৮	বিঘা	৬	কাঠা
ধানক্ষেত	...	...	... ৪৮৪	বিঘা	১৭	কাঠা
কলাগাছ	...	...	... ১৬৯	বিঘা	১৮	কাঠা
তরিতরকারী	...	...	... ৭৭	বিঘা	১৮	কাঠা
তামাক	...	...	... ৩৮	বিঘা	১৭	কাঠা
বাগান	..	...	... ৭০	বিঘা	১	কাঠা
তুলা	...	...	... ১৯	বিঘা	১৫	কাঠা
ঘাস	...	...	... ১৫	বিঘা	৯	কাঠা
বাঁশ	...	...	... ১	বিঘা	৬	কাঠা
ফুল	...	...	... ৬	বিঘা	২	কাঠা
খাল	...	...	... ০	বিঘা	৯	কাঠা
জঙ্গল	...	...	... ৩৬৩	বিঘা	১৫	কাঠা
এবং অন্যান্য	...	...	... ৩৬৩	বিঘা	১৫	কাঠা
পতিত জমি	...	...	... ২৭	বিঘা	৩	কাঠা
মোট জমি	...	...	...১,৭১৭	বিঘা	১৪	কাঠা

বাঁশকে ঘাস ধরে দুর্বা থেকে হিসেব শুরু করলে শহর কলকাতার যে বৃক্ষ পরিস্থিতি দাঁড়ায় নগরের অন্য তিন খণ্ডের হিসাবও তার অনুরূপ। আজকের এই ময়দানের কথাই ধরুন। তৎকালে এটি ছিল গোবিন্দপুরের অন্তর্ভুক্ত। গোবিন্দপুর অর্থাৎ জনবসতি ছিল এই বিরাট ভূমিখণ্ডের এক কোণে একটি জীর্ণ গ্রাম মাত্র। মাত্র ৫৭ বিঘা জমিতে ছিল তার এলাকার সীমা। অথচ ময়দানের মোট ভূমি পরিমাণ—১,১৭৮ বিঘা। আজ যেখানে গড় সেখানে ছিল সেদিনের গ্রামটি। আর বাদবাকী জমি জুড়ে ছিল ধান ক্ষেত আর বন। বাঘ, শেয়াল, সাধু আর ডাকাতের আস্তানা। কোম্পানীর লোকেরা বড় একটা আসতো না এ অঞ্চলে। পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরের সেলামীর টাকায় গোবিন্দপুরের জনবসতি উঠিয়ে তৈরি হয় তাদের গড়। তারপর ১৭৫৭ থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে গড়ের মাঠ! বনকে মাঠ কি করে করা হলো তার পদ্ধতি আগেই বলেছি।

মনে রাখবেন—বৃক্ষ হিসাবে স্বাভাবিক কাজ (যথা ঘর-বাড়ীর উপাদান

কিংবা হে'সেলের ইন্ধন) ছাড়াও কলকাতার গাছ বিশেষ শহীদের মর্যাদা পাবার অধিকারী। তারা হাড়িকাঠ হয়েছে কালীঘাটে, চিৎপুরে এবং এখানে ওখানে। তারা চড়কের চড়ক গাছ হয়েছে আবার ফাঁসীর সময়ে ফাঁসী কাঠ। এমনিভাবে অনভিপ্রেত মনুষ্য সমেত বহুবিধ প্রাণীকে শহর থেকে বিদূরিত করে পত্তন করেছে মহানগরীর। এখানেই শেষ নয়। বণিকের কলকাতা এবং সংস্কৃতির কলকাতা দুই কলকাতারই মূল তারা। শোনা যায় চার্ণকের সিন্ধি ছিল সুতানুটীর একটি গাছ, তৎকালীন বই পাড়ারও তাই।

চার্ণক সাহেব নাকি একখানা ঢিলে কামিজ আর পাজামা পরে উল্লেখিত বটতলায় বসে গুড়গুড়ি টানতেন আর দরদস্তুর করতেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। তার 'ক্যায়া ভাও' শুরু হয়েছিল ওখানেই। এমনকি চার্ণকের কাউন্সিলও নাকি বসতো এই বটগাছের তলেই। ওটাই ছিল তাঁর বৈঠকখানা। আর তার থেকেই নাম হয়েছে আজকের বৈঠকখানার। গাছখানা ছিল বৌবাজার আর সার্কুলার রোডের মোড়ে—অর্থাৎ শিয়ালদহে। শোনা যায়, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেসলি সাহেব বৌবাজার ষ্ট্রীট গড়তে গিয়ে কাটিয়ে ফেলেন ওটিকে এবং তাঁর এই কাজে যারপরনাই ক্ষেপে গিয়েছিল দেশীয় লোকেরা। কারণ তাদের মতে এতে নেটিভের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এতকাল চলতি ইতিহাস তাই বলে আসছে আমাদের। কিন্তু সম্প্রতি আমার চোখে অন্য একটি তথ্য পড়ছে। একজন গবেষক জানিয়েছেন চার্ণকের প্রিয় গাছটি ছিল নিম গাছ, বট গাছ নয় এবং ওখানা ছিল বেনিয়াটোলা আর শোভাবাজারের মাঝামাঝি জায়গায়। গঙ্গার ধারে। —অর্থাৎ নিমতলায়। এখানেই ছিল চার্ণকের তথাকথিত বৈঠকখানা। ঐ গাছটিও চার্ণকের মৃত্যুর পরেও বহুদিন ওখানে ছিল। ১৭৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দে ওটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কেন বা কে পুড়িয়ে ফেলল অতশত তিনি লিখেননি। তবুও এ লেখকের মতকে গ্রহণ করতে আমি রাজী। কারণ এতে বৈঠকখানার গৌরব কমে না, অথচ নিমতলাও স্থান পায়। আজকের মহাশ্মশানকে যদি প্রমাণ করতে পারি, এককালের এ শহরের প্রাণভূমি, তবে ইতিহাসকে কিছু কেটে ছেঁটে হলেও আমি তাতে সম্মত। তেমনি বটতলার খ্যাতির আজ যদি দাবীদার হয়ে ওঠে কোন বেল কিংবা সেওড়া তাহলেও আপত্তি করবো না আমি।

যা হোক, কলকাতার গাছপালা সম্বন্ধে আমার এই এলোপাথারি বক্তব্য শুনে যদি গাছ-গাছ প্রাণ হয়ে ওঠে আপনাদের হঠাৎ, তাহলে অনুরোধ করবো একটু ধৈর্য ধরতে। বন মহোৎসবের দরকার নেই। হাত পা গুটিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকুন মাত্র দশটি বছর। দেখবেন গুটি-সুটি করে আবার ফিরে আসছে চার্ণকের কাল, এ শহর হয়ে উঠছে অরণ্য নগর।

যদি তাতে রাজী না হন, তবে এটুকু অন্তত করুন। মনে মনে শুধু একবার কদমতলায় কদম, বেলতলায় বেল, বাঁশতলায় বাঁশ: এমনি করে বড় (বট) বট, আমড়া, নিম, নেবু, বাদাম এবং তাল লাগিয়ে যান। লাগিয়ে যান কলা বাগানে কলা, ফুল বাগানে ফুল, হরীতকী বাগানে হরীতকী, সুর্তি বাগানে তামাক এবং নারকেলডাঙ্গায় নারকেল। দেখবেন এ শহর বন এবং আমরা গৃহী হইয়াও বনবাসী।
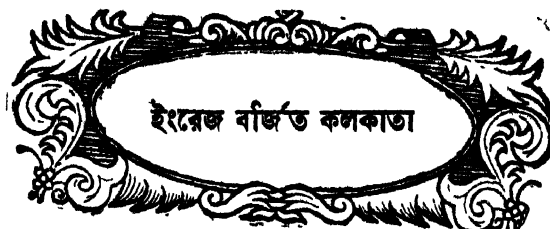
ইংরেজ বর্জিত কলকাতা

কলকাতাকে দেখতে হলে সামনাসামনি দেখা চাই। মুখোমুখি। সেকালের নবাগত সায়েব সুবারা তাই দেখতেন। এ শহরে পা দিতেন তাঁরা ডায়মণ্ড-হারবার খিদিরপুরের পথে। রিফিউজিদের মতো শেয়ালদার নালা দিয়ে নয়। ফলে সার্কুলার রোড বা বৌ-বাজারের আগে চৌরঙ্গীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখখানাই চোখে পড়তো তাঁদের। গভর্নর-হাউস, মনুমেণ্ট, হোটেল কণ্টিনেণ্টাল আর মিউজিয়ামের চৌরঙ্গী। একবার তাকালে আর চোখ ফেরায় তার সাধ্যি কার। বিশেষত ময়দানের দক্ষিণ সীমান্তে দাঁড়িয়ে দেখলে।

এখানে দাঁড়িয়েই মেকলে সাহেব ক'লকাতার নাম দিয়েছিলেন—প্রাসাদ-পুরী।—*দি সিটি অব প্যালেসেস্*। কিপলিং সাহেব মেকলের মতো সিধে বুদ্ধির মানুষ ছিলেন না। ট্যাঙ্ক স্কোয়ার বা নিউ মার্কেট তাই ক'লকাতার আসল চেহারাটা গোপন করতে পারেনি তাঁর কাছে। ক'লকাতা তাই তাঁর মতে একটা আকস্মিক ব্যাঙের ছাতার মতো ভুঁইফোঁড় শহর! প্রাসাদ আর কুটির, দারিদ্র্য আর প্রাচুর্য তাই পরমানন্দে এ শহরে সহাবস্থান করে।

ক'লকাতা আমাদের ভালোবাসার শহর। কিপলিংএর মতামত তাই আমাদের শুনতে ভালো লাগে না। এমনকি বলতেও না। আমি তাই মেকলের পেছনে পেছনেই ঢুকতে ভালোবাসি এ শহরে। খিদিরপুরের পথে ময়দান থেকে দেখা ক'লকাতা আমারও মনের মতো ক'লকাতা।

আজ এ পথে পা দিলে খিদিরপুরের ব্রিজটা পার হতে না হতেই জানতে পারবেন—ক'লকাতা এখন স্বাধীন। ক'লকাতা কোনদিন স্বাধীন ছিল না। ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন ছিল। ছিল বাংলা দেশও। কিন্তু ক্রীতদাসীর সন্তানের মতো ক'লকাতা চিরকালের গোলাম শহর। সিরাজদ্দৌলা মাস কয়েকের জন্যে এ সহরকে 'আলীনগর' করেছিলেন জানি; কিন্তু ক'লকাতা তাতে স্বাধীনতার আনন্দ পেয়েছিল এমন সংবাদ পাইনি। শুনেছি ক'লকাতার একমাত্র চেষ্টা ছিল সেদিন ফলতার রিফিউজিদের ফিরিয়ে আনা। পলাশীর পর "রেষ্টোরেশান মানি"তে এ শহর সাজাতে তাই লজ্জা পাইনি আমরা। কিন্তু আজ খিদিরপুরের ব্রিজ পার হতে না হতেই জানতে পাবেন ক'লকাতা স্বাধীন। চিরকালের নফর ক'লকাতা আজ বাদশা। তা না হলে ওয়ার্ক'স ডিপার্টমেণ্টের রাশি রাশি জঞ্জালের মধ্যে স-ঘোড়া গড়াগড়ি যেতে পারতেন না জেনারেল আউটরাম। ১৮৫৭ সালের চেয়েও বড়ো 'মিউটিনি' কোনদিন ভারতবর্ষে হতে পারে এবং কোন অর্ধ-উলঙ্গ যষ্টিধারীও কোনদিন তারচেয়ে

বড় হিরো হতে পারেন এদেশে, এ খবরটা জেনে যেতে পারেন নি বেচারা। কিন্তু তার জন্যে ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের গুদামে নির্বাসন্ দণ্ড বোধ হয় গুরুদণ্ড হয়ে গেল।—নয় কি?

স্বাধীন ক'লকাতাকে বড়ো 'সেণ্টিমেণ্টাল' মনে হয় আমার। নয়ত রাতারাতি এতোগুলো রাস্তার নাম বদলের কোন যোগ্য ব্যাখ্যা পাই না আমি। রাস্তার নাম ইংরেজেরাও কিছু কিছু পাল্টেছে। কিন্তু সব নয়। তাহলে গুলু ওস্তাগর লেন, গুমখানা লেন কিংবা রসা রোড (রস পাগলা থেকে উদ্ভূত) থাকতে পারতো না এ শহরে। কেউ কেউ বলেন—নতুন রাস্তার নতুন নাম দিলেই চলে। পুরানো নাম পুরানোই থাক। তাতে ক'লকাতার বৈচিত্র্য থাকবে। থাকবে ধারাবাহিকতাও। দিল্লীতে তা আছে। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে জনতা রোড সব আছে সেখানে। যাঁরা এ প্রস্তাব করেন তাঁরা জানেন না—দিল্লী যেভাবে বাড়ে ক'লকাতা সে হারে বাড়ে না। করপোরেশান বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছেন পাঁচ বছরে—চার মাইল নতুন রাস্তা করেছেন তাঁরা! তাও টালিগঞ্জে। অথচ আমার নিজের গলিটাতেই অন্তত গোটা দশেক দেশপ্রেমিক আছেন যাঁরা মনে করেন—তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয় বন্ধুদের নামে কমপক্ষে সতেরখানা রাস্তা হওয়া উচিত কলকাতায়। এবং সবই এক ওয়ার্ডে।

যাকগে সে কথা। আবার চৌরঙ্গীর কথায় ফিরি। মেকলে যে-বাড়ীর সারিটা দেখে 'প্রাসাদপুরী' আখ্যা দিয়েছিলেন কলকাতাকে স্বাধীনতার পরে তাতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এতকাল ইংরেজের গর্ব ছিল লাট ভবন, রাইটার্স বিল্ডিংস, হাইকোর্ট ইত্যাদি। ময়দান থেকে আজ প্রথমেই নজরে পড়ে তেরো-তলা নেটিভ কীর্তি নতুন সেক্রেটারীয়েটখানা। পত পত করে তার ওপরে উড়ছে তিনরঙ্গা নিশান। কিন্তু সেই নিশানের নীচে খুপরী ঘরখানার কাঁচের জানালা দিয়ে মিঃ ব্যানার্জি তীক্ষ্ণ নজরে যে জিনিষটির সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন কলকাতার আকাশে ১৭৫৯ সালে মিঃ মার্টিন, ১৮৪৫ সালে মিঃ জন পিপস তাকেই তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন লম্বা লম্বা রিপোর্ট লিখে। কলকাতার এই সনাতন শত্রুটির নাম—ধোঁয়া। বিশেষজ্ঞরা চিৎপুর রোডের বাড়ীর ছাদ থেকে ধুলো সংগ্রহ করে তাকে ধুয়ে মুছে অনুবীক্ষণে ফেলে বিচার করে জানিয়েছেন—কলকাতার ধুলো নাগরিকের শত্রু নয়। আসল শত্রু কলকাতার ধোঁয়া। মিঃ ব্যানার্জি বা মিঃ ভট্টচারিয়ার তাই দায়িত্ব পড়েছে সেই শত্রুকে খুঁজে বের করা। গঙ্গার ঘাটের জাহাজ, পথের বাস-লরী, কারখানার চিমনী অথবা গেরস্থের চুলো—কে এর জন্যে কতখানি দায়ী তা খুঁজে বের করা। তাতে দেখা গেছে, অর্ধেক ধোঁয়ার দায় আমাদের। কারণ আমরা খাই। এবং এটা ১৯৬০ সালে বলেই কাঁচা খেতে লজ্জা করে; তাই আগুন জেবলে রেঁধে খাই। অথচ আমরা জানি না আমাদের এই ছোট চুল্লিখানা ক'লকাতার স্বাস্থ্যের পক্ষে কতো ক্ষতিকর! কারখানার চুল্লি ততো ক্ষতিকর নয়। কারণ তারা ধোঁয়া ছাড়ে ক'লকাতার আকাশের সীমানার বাইরে। চিমনী যাদের ছোট, তেতলা বাড়ীর জানালা বরাবর—মিঃ ব্যানার্জি তাদের ফাইন করেন।

কর্পোরেশান আরও উদার। এ শহরে ২৮০ খানা ছোট এবং মাঝারি কারখানা চলে তাদের অনুমতিতে। প্রকাশ্য রাস্তার উপরে, বসত বাড়ীর

পাড়ায় কিংবা হাসপাতালের পাশে মোটর সারাই অথবা ওয়েল্ডিং-এর কারখানা কিংবা করাত কল। নিষিদ্ধ রাস্তায়ও তারা আছে এবং শোনা যায় অনেকে লাইসেন্স ছাড়াই আছে। সংখ্যায় তারা একশ' কিংবা তারও বেশি।

এই আইনসম্মত এবং বে-আইনী মিলিয়ে—৩৮০ খানা কারখানার বলে কলকাতাকে শিল্প শহর বলতে পারেন। কিন্তু কলকাতার লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি! ধরমতলার ওয়েল্ডিং কারখানায় কিংবা চৌরঙ্গী লেনের গ্যারেজে তাদের ক'জন কাজ করে অনুমান করতে পারেন। বাদবাকী সব রাইটার্স বিল্ডিংয়েও ধরে না। কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তারা কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে ভোর চারটে থেকে লাইন দেয়। বিকেলে ভালো খেলা থাকলে—গাছে চড়ে খেলা দেখে, নয়ত বাড়ী ফেরার পথে কোন মিছিল পেলে তাতে যোগ দেয়।

মিছিল আর মিছিল। স্বাধীন ক'লকাতাব অন্যতম মজা ক'লকাতার মিছিল। সব মিছিলের সময় এক, লক্ষ্য এক। সকলেই ৫টা নাগাদ পৌঁছাতে চায়—চৌরঙ্গীতে। কেরানীদের তখন বাড়ী ফেরার সময়। মিছিল জমে ভালো। ট্রাম ঘণ্টা দেড়েক অন্তত দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলে তবে না লোক উৎসাহ দেখাবে মিছিলে। জানতে চাইবে কিসের মিছিল। কিংবা মিছিল কেন হয়। কিন্তু ফল হলো উল্টো। এমন উল্টো যা কলকাতার রাজনৈতিক চেতনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। বিশিষ্ট নাগরিকদের মুখে এই শহর সেদিন সারা জগতকে বিস্মিত করে জানিয়েছে—মিছিল নুইসেন্স। তাঁরা এর থেকে মুক্তি চান! কাগজে তাঁদের বিবৃতি নিশ্চয় পড়েছেন আপনারা। স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতায় মিছিল এবং তার হাত থেকে মুক্তি চাওয়ার এই দাবী দুই-ই নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা!

কিন্তু মিছিল কেন হয়? যাঁরা মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে চলেন, তারাও সকলে তার কারণ জানেন না। জানলে শত শত লোক ভুল শ্লোগান আউড়ে মাইলের পর মাইল রাস্তা কাঁপিয়ে চলতে পারতেন না। কলকাতার কাগজে সে খবরও ছাপা হয়েছে।

তাই আমার মনে হয়, মনুমেণ্টতলার ভীড় এবং পথে পথে মিছিল কোন সঠিক শত্রুর বিরুদ্ধে নয়। এ গোটা নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে। নগরের বিরুদ্ধে। এ শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ নেই। ইউনিভারসিটির গবেষকদের মতে ১৫ থেকে ২৪ বছরের ছোকরাদের শতকরা ৬৩ জন বেকার। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা। বাঙ্গালী এ শহরে প্রতি একশ'জনে ৬৬·৬ জন, বেকারের তালিকায় তাদের সংখ্যা একশ'জনে সাড়ে সাতাত্তর জন!

শুধু ছেলে নয়। কাজ নেই মেয়েদেরও। মেয়েরা এ শহরে কম। কারণ কলকাতা হোটেলখানার মতো শহর। লোক এখানে কাজে আসে, ঘর বাঁধতে নয়। মেয়েরা তাই বাড়ীতে থাকে। হুগলী হাওড়ার গ্রামে, নয়ত রাজস্থানের মরুভূমিতে। এ শহরে তাই পাঁচজন পুরুষে তিনজন মেয়ে। কাজ চায় আরও কম জন। শতকরা দশের চেয়েও কম। কিন্তু পায় না। ছেলেদের মতোও কাজ পায় না কলকাতার মেয়েরা।

অথচ কাজ না হলে সংসার চলে না। কলকাতার সংসারও এক আজব

ঘটনা। শতকরা ৩৬টি পরিবারে মাথা পিছু আয় এখানে তিরিশ টাকারও কম!

অথচ কলকাতা সভ্য শহর। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে হয় এখানে। সভ্যতার কারণে যতখানি, পেটের কারণে তার চেয়েও বেশি। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা তাই চল্লিশ হাজার। ডাঃ জে সি ঘোষ বলেছেন—তার শতকরা ৩১ ভাগ সেই তিরিশ টাকার পরিবারের ছেলেমেয়ে। তারা যে ঘরে পড়ে—সেই ঘরখানা ছোট ভাইবোনদের পাঠশালা, মা'র অন্তঃপুর এবং বাবার বৈঠকখানা। রাত্রিতে এখানেই বিছানা পড়ে। গোটা সংসার ঘুমোয়।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন: ক'লকাতার বাসস্থানের অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয়। ক'লকাতার ২৮.৩৪ বর্গমাইল এলাকার তিন বর্গমাইল বস্তিতে আচ্ছন্ন। আর বস্তি মানেও ডেম ইভলিন সার্পের সংজ্ঞা-সম্মত বস্তি নয়—পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নিবাস এগুলো। অথচ ক'লকাতার প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ লোক তার বাসিন্দা।

ষ্টেট স্টেটিসটিক্যাল ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী তাদের শতকরা ৬২ ভাগের জন্য কোন জলের বন্দোবস্ত নেই এবং একখানা পায়খানা ব্যবহার করে ২৩ থেকে ৪৫ জন লোক।

অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে বস্তিতে এমন লোক অনেক আছেন যাদের মাসিক আয় দু' হাজার টাকার উপর। আর মাসে সাড়ে তিনশ' টাকা আয় যাদের, তাদের সংখ্যাও অনেক।

সুতরাং দেড়শ' টাকা মাইনের লোয়ার ডিভিসনের কেরাণীবাবু পঞ্চাশ টাকায় সাহস করলেও বালীগঞ্জে বাড়ী পাবেন কি করে? পিছিয়ে যাক না তার বিয়ের তারিখ!

বাড়ী অভাবে বিয়ে করতে পারছেন না--এমন ঘটনাও আছে বৈ কি এ শহরে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করবো যে, বিয়েও, স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার মতো এক দুরূহ ব্যাপার।

এবং কষ্টসাধ্য বলেই দুটিই আজ জমজমাটি কারবার এখানে। একজন মারোয়াড়ী বন্ধু বলছিলেন—দেশ থেকে তার এক শ্যালক আসতে চাইছে ক'লকাতায়। উদ্দেশ্য ব্যবসা করবে।—"হম বোল দিয়া, দুঠো টিচার লিয়া আসতে। এইসা কৈ দুসরি কাববার আভি নেহি হায় কোলকাত্তামে।" শুধু গোটা দুই তিন কোনমতে পাশ দেওয়া টিচার আর কিঞ্চিৎ জায়গা। ঘর না থাকলে ভাবনার কিছু নেই। কারণ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু এবং বিবেকানন্দ রোডের ফুটপাথেও স্কুল বসে। কারও রান্নাঘরের পেছনে বসাতে পারলে তো আরও ভাল। কিণ্ডারগার্টেন নাম দেওয়া যাবে, কিংবা মন্তেসারী।

বিয়ের কারবারও তাই। মডার্ণ ঘটকদের আফিস পাড়ায় পাড়ায়। কোনকালে ক'লকাতায় এত ঘটক ছিল না। এখন আপিস, কলেজ, সিনেমা হল তাদের দায়িত্ব বরং আরও কমিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে তাদের বংশতালিকা ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। ছেলেরা মনের মতো মেয়ে পাচ্ছে না, মেয়ের বাবারা পাচ্ছেন না ছেলে।

এই যাবতীয় বিরক্তিই ক'লকাতার পথে ভুল শ্লোগান আউড়ে মিছিলে

ছোটে, আধ চিবোতে চিবোতে রোদে পিঠ মেলে মিটিং শোনে, খামাখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো বাঁদর নাচ কিংবা মাদ্রাজী মেয়ের রোপম্যাজিক দেখে।

এ ছাড়া স্বাধীন ক'লকাতার কোন 'কালচারাল লাইফ' নেই—এমন অভিযোগ কিপলিং এলেও করতে পারবেন না। কেননা আজ ক'লকাতায় হেন পাড়া নেই যেখানে বছরে অন্তত দুটো সংস্কৃতি সম্মেলন না হয়। টালিগঞ্জের অবস্থাও মন্দ নয়। সিনেমার মতো সিনেমার কাগজের কাটতিও হুহু। তবে আক্ষেপের কথা এই স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত পাঁচটা দৈনিক কাগজের মৃত্যু দেখতে হয়েছে এ শহরকে! বছরের পর বছর এশিয়াটিক সোসাইটির অষ্টাদশ শতকের বাড়ী পড়ো পড়ো অবস্থায় পড়ে থেকেছে তার চোখের সামনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রাহক সংখ্যা কমতির দিকে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশন হয় প্রায় ফাঁকা ঘরে। এগুলো খবর মাত্র। "ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সাসাইটি" নামে এককালের একটি কর্মঠ প্রতিষ্ঠান যে আজ বলতে গেলে প্রায় অবলুপ্ত সেটিও খবর।

তবে সাহেবরা যে চলে গেছে সে খবরে সন্দেহের কোন কারণ নাই। 'ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে'র বাড়ী সরকার কিনে নিয়েছেন, বিখ্যাত 'থ্রি হাণ্ড্রেড' তিন টাকা দরে ডিস বেচে দিয়েছে এবং মার্কটুয়েনের 'হোটেল কণ্টিনেণ্টালের' দরজায়ও তালা ঝুলছে। ইংরেজ চলে যাওয়ার পক্ষে আরও একটা বড়ো প্রমাণ নিউ মার্কেট। সেখানে এখন পাঁচ টাকার যাঁরা রুমাল কিনেন তারা ঠকেন। কারণ পরের দোকানটিতে একটু দর করলেই জানতে পারবেন—এটির দাম আসলে পাঁচসিকে। যেমন খদ্দের তেমন কৌশল। নিউ মার্কেট এখন নয়া জমানায় পড়েছে, তাই দরাদরি এখন এখানকার নিয়ম; একদর—ইতিহাস।

নিউ মার্কেটের স্বভাব পাল্টালেও ক'লকাতার স্বভাব কিন্তু পাল্টায়নি। নগর কোতোয়ালের রিপোর্ট দেখুন। "জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যে কথা—এই নিয়ে কলকাতা"—এই পুরানো প্রবাদটির ব্যাখ্যা তাতে পাবেন। ক'লকাতায় ২৫ হাজার ভবঘুরের বাস এবং কয়েক লক্ষ মানুষ বেকার এখানে। সুতরাং এখানে বছরে ৪১টি দাঙ্গা হবে সেটি খুব বিস্ময়কর কথা নয়। গেল বছরে একটু কম হয়েছে—সাকুল্যে ৩৩টি। খুন ৩৭টি এবং অন্যান্য অপরাধ সেই অনুপাতে। সব দিকেই কমতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। একমাত্র চাকর কর্তৃক চুরি বাড়তির দিকে। তাতে ভাবনার কিছু নেই। কেননা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে পেশাদার সাধুও আছে অনেক। সুতরাং কয়েক শ' সাধুর শহরে গুটি কয় চোরের ভাবনায় ভীত না হয়ে আসুন আমরা আবার স্বাধীনতার কথায় ফিরি।

এই ক'লকাতায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে যেখানে নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছিল কোম্পানীর ফৌজ, তারই একটা ঘরে জন্মেছিল একদিন ভারতের ভবিষ্যত জাতীয় কংগ্রেস। ক'লকাতা দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রামমোহনের শহর। সুতরাং স্বাধীন ক'লকাতা স্বাভাবিক ঘটনা। ক'লকাতা যদি ভারতবর্ষের আগে স্বাধীন হয়ে যেত তা'হলেও অস্বাভাবিক কিছু হ'তো না। কিন্তু তা হয়নি।

কলকাতার স্বাধীনতা এই সেদিনেরই। সুতরাং ইতিমধ্যেই যে শহরে আমরা প্রতিদিন ভোরে পরিস্রুত (!) দুধ খেতে পাচ্ছি এবং অদূর ভবিষ্যতে যে একটি গোয়ালার মুখও দেখা যাবে না এখানে—সেটি কম কথা নয়। তেরো

তলা সেক্রেটারীয়েটটার পরে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। দু' নম্বর কৃতিত্ব, রাশি রাশি বাঘ-মার্কা বাস এবং ছোট ছোট ট্যাক্সি। বাঙালী শুধু কলম চালাতে নয়—বাস-ট্যাক্সীর মতো যন্ত্রও চালাতে পারে—সেটা এবার জানা গেছে।

ক'লকাতার রাস্তায় রিফিউজিরা জানাচ্ছেন—ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁরা অপারগ নন। সুতরাং ভবিষ্যৎ কলকাতার ভাবনা নেই।

আপাতত, নেহাৎ সামনে গরম আসছে দেখেই শুধু কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাবো—টিউবওয়েলগুলো এবার যেন সত্যিই তাবা কাগজ থেকে নামিয়ে আমাদের গলির মোড়ে একখানা দিয়ে যান।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—কলেরাকে তারা যেন আর "স্বাভাবিক ঘটনা" বলে প্রকাশ্যে কখনও না ঘোষণা করেন। মরার ভয়ে বলছি না। শুনতে লজ্জা করে তাই বলা। কেননা, ক'লকাতা এখন স্বাধীন। এবং কলকাতা বিনে খরচে স্বাধীন হয়নি।

নির্দেশিকা

কলকাতার নাম

কলকাতার নামকরণ সম্পর্কে প্রচলিত প্রায় সব মতামতগুলোই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কালিঘাটে গুপ্তযুগের মুদ্রাপ্রাপ্তির সংবাদটি (পৃঃ ২) এবং 'কালিকট'-এর অনুকরণে 'কলিকাতা' নামকরণের চেষ্টার কাহিনীটি (পৃঃ ৬) বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। প্রথমটির জন্যে দ্রষ্টব্য—Martin's—'Eastern India' (vol-3, p-48) এবং দ্বিতীয়টির সূত্রের জন্য—প্রমথনাথ মল্লিক-এর 'কলিকাতার কথা' (আদিকাণ্ড, পৃ-৪৯)। তবে উল্লেখযোগ্য, (কলকাতা কর্পোরেশন সহ) আধুনিক কালে সকলের অভিমত এই যে 'কলিকাতা'—'কলি' (চুন) + 'কাতা' (গুদাম) থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। এই মতটির প্রথম প্রবক্তা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে একই কারণে হুগলী জেলায় আমতা থানায় 'রসপুর কলিকাতা' এবং ঢাকা জেলায় লোহজঙ্গ থানায় 'কলিকাতা ভোগাদিয়া' নামে দুইটি গ্রাম ছিল। সুনীতিকুমারের সেই মূল্যবান আলোচনাটির জন্য দ্রষ্টব্য,—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫ সন, পঞ্চচত্বারিংশ সংখ্যা।

কলকাতার দাম

'কেল্লা' (পৃঃ ৮) মানে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম। এটি তৈরী হয় পলাশী যুদ্ধের পরে, ১৭৫৭ সনের শেষের দিকে। উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড ক্লাইভ এবং তত্ত্বাবধায়ক ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়ার। ইঁট তৈরীর জন্য বিলেত থেকেও লোক আনা হয়েছিল। কিন্তু তবে তারা কোম্পানির কাজ ফেলে স্থানীয় লোকেদের কাজে লেগে যায়। তাই নিয়ে অনেক গোল। শেষে ক্লাইভের জবরদস্তিতে এবং কর্নেল ওয়াটসনের তত্ত্বাবধানে দেশীয় শ্রমিক দিয়েই ১৭৮১ সনে কাজটি শেষ হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ A. B. N. Churchill—'Short Notes on the History of Fort William', কিংবা 'Fort William Flag Day Souvenir, 1957.' রাজভবনের কাহিনীর (পৃঃ ৯) জন্য দ্রষ্টব্য—লর্ড কার্জনের 'The British Govt. In India' (Vol-1), এবং N. V. H. Symons—The Story of the Govt. House.' কলিকাতার জমিদারী প্রাপ্তির সংবাদটির জন্যে—William Foster—'English Factories in India' দ্রষ্টব্য। বইটি ১৬১৮ সন থেকে ১৬৬৯ সন পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা চিঠিপত্রের সটীকা সংকলন। মোট তের খণ্ড। জমি প্রাপ্তির কাহিনীটির জন্যে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য—১৬৫৫-৬০ সম্পর্কিত খণ্ডটি।

কলকাতার আদি ইতিহাস সম্পর্কিত অনুরূপ অপরিহার্য দুইটি গ্রন্থ Rev. J. Long—Selections from Unpublished Records..etc. (1748-67) এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'Fort William India House Correspondence, Vol-I, (1748-56), Ed. K. K. Dutt. জমিবিলি তথা তৎকালীন রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্যগুলি প্রধানত R. C. Sterndale—'A Historical Account of the Calcutta Collectorate..etc.' থেকে সংগৃহীত। অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য—C. R. Wilson—Early Annals of the English in Bengal (3 Vols.)', Mesrovb J. Seth—'The Armenians in India' এবং Holden Furber—'John Company at Work'

হবসন জবসন

'হবসন-জবসন' শব্দটির আসল অর্থ 'হায় হাসান, হায় হোসেন'। ১৬১৮ সন থেকে এই শব্দটাই ইংরেজদের কানে 'Hossees Gossen', 'Hossy Gossy', 'Hossein Jossen', 'Jaksom Baksom', 'Hassein Jassein' ইত্যাদি হয়ে অবশেষে ১৬৩৮ সনে 'হবসন-জবসন'-এ এসে স্থিতি নেয়। তারপর থেকেই শব্দটি ইঙ্গ-ভারতীয় ভাষার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত। Arthur Burnal এবং Colonel Yule—সাহেব সে কারণেই তাঁদের বিখ্যাত অভিধানটির নাম দেন 'হবসন-জবসন'। বার্নাল (১৮৪০-৮২) মাদ্রাজে বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়ুল সাহেবের সম্পাদনায় বইটি ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত হয়। শুধু এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ভাষার ইতিহাস নয়, 'হবসন-জবসন' সেকালের বহু বিষয়ে তথ্যেব খনিবিশেষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমান রচনায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত যেসব শব্দ জন্মেছে প্রধানত তারই অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এর পরও এই বিংশ শতক অবধি 'হবসন-জবসন' প্রক্রিয়া যথারীতি অব্যাহত রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে প্রধানত জন্মলাভ করে সামরিক এবং রাজনৈতিক শব্দাবলী। (যেমন—Lootiewallah, Nabob-maker, Dewani, ইত্যাদি) হেষ্টিংস-এর বিচারের সময় এসব শব্দ এমন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যে তখন শ্রোতাদের জন্যে লণ্ডনে ইঙ্গ-ভারতীয় ভাষার একটি অভিধান পর্যন্ত প্রচারিত হয়। উনবিংশ শতকে জাত শব্দাবলীর একটা বিশিষ্ট অংশই ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক। (যেমন—Juggernaut, Pundit, Pooja, Mela, Maya ইত্যাদি)। বিংশ শতকে যুদ্ধ এবং স্বদেশী আন্দোলন। ইঙ্গ-ভারতীয় ভাষায় তারও সাক্ষ্য রয়ে গেছে। (যথা—Swaraj, Swadeshi, Hartal, Izzat, Zindabad,..Signalwallah, Cooly, '..to do a jildi move', ..'the engine does not chell well ...ইত্যাদি ইত্যাদি) বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্যঃ G. Subba Rao 'Indian Words in English'.

'চাউ চাউ' (পৃঃ ১৯) একটি বইয়ের নাম। লেখিকার নাম—Lady Falkland (Cary Amelia)। লেখিকার মতে শব্দটির মানে—'a mixture of things good, bad, and indifferent; of sweet little oranges and bits of bamboo sticks.' আমরা বাংলায় বলেছি—'কমলালেবু আর বাঁশের কঞ্চির তরকারী।'

ওয়ারেন হেষ্টিংস ও আমার বড় মামা

হেষ্টিংসের নির্ভরযোগ্য জীবনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—G. R. Gleig—'Memoirs of Waren Hastings' (3 Vols.) এবং Rulers of India সিরিজের A. Lyall—'Waren Hastings'। এ ছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত Keith Feiling—'Waren Hastings' একটি নির্ভরযোগ্য বই। তবে কবি-হেষ্টিংসের জন্যে Gleig ছাড়াও বিশেষভাবে পাঠ্য—Charles Lawson—'Private Life of Waren

Hastings', Sidny C. Grier (Miss Gleigh) 'Letters of Waren Hastings to his wife', এবং T. D. Dunn—Poets of the John Company'.

সংক্ষেপে আমার স্ত্রীর কাহিনী

সমসাময়িক বহুজনের রচনা অবলম্বনে লিখিত হলেও মিসেস গ্রাণ্ডের কাহিনীটি তাঁর স্বামীর জবানীতেও লভ্য। জর্জ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড-এর একটি আত্মজীবনী আছে। নাম—'The Narative of a Gentleman Long Resident In India'। মিসেস গ্রাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে এবং বিচ্ছেদ সেই বইয়ে একটি অন্যতম অধ্যায়। অবশ্য মাত্র আট পৃষ্ঠার। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সনে। গ্রাণ্ড তখন উত্তমাশা অন্তরীপে এবং তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন। ......মিসেস গ্রাণ্ড-এর অবশিষ্ট কাহিনীটির তথ্য সংগৃহীত হয়েছে প্রধানত গ্রাণ্ড-এর আত্মজীবনী (W. K. Firminger সম্পাদিত ১৯১০ সনের কলকাতা সংস্করণ) এবং H. E. Busteedকৃত 'Echoes from Old Calcutta' (4th Edition, 1908) থেকে। ..... মিসেস গ্রাণ্ড-এর প্রতিকৃতি নিয়েও এককালে যথেষ্ট আলোড়ন হয়েছিল কলকাতায়। দ্রষ্টব্য—Calcutta Historical Society প্রকাশিত 'Calcutta, Faces and Places in Pre-Camera Days' (Ed. Wilmot Corfield)। ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং ইম্পের পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্যে যথাক্রমে—Joseph Parkes & Herman Merivale—'Memoirs of Sir Philip Francis' এবং E. B. Impay—'Memoirs of Sir Elijah Impay' দ্রষ্টব্য। মীর্জা আবু তালেব খান—সেকালের একজন ভারতীয় ভ্রমণকারী। তিন খণ্ডে তিনি সেই কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জ্ঞাতব্যের জন্য—Selections from Cal. Gazettee Vol-IV, p-181, কিংবা Asiatic Journal, Vol-XIX, N. S. 1836...বারওয়েল-এর যে কাহিনীটি (পৃঃ ৩৫) মাদাম গ্রাণ্ড-এর মুখে বলান হয়েছে সেটিও একটি বইয়ের ভিত্তিতেই। বইটির নাম—'Intrigues of a Nabob, or Bengal Fittest Soil for Lust'। লেখকের নাম—Henry F. Thompson. বইটি লণ্ডনে প্রচারিত হয়—১৭৮০ সনে।

একটি কবিতার ইতিহাস

সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানাটি (১৭৬৭-১৭৯০) কলকাতার ইংরেজের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি মন্দির বিশেষ। কবরখানাটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতির জন্য W. K. Firminger—Thackers Guide to Calcuita কিংবা A Short Guide to South Park Street Cemetery Restoration Committee, Calcutta (1953) সুখের কথা, এই কবরখানাটির বহুল পরিমাণে সংস্কার করা হয়েছে।......এলমার-এর কাহিনীটির জন্য দ্রষ্টব্য Busteed—'Echoes from Old Calcutta' এবং Malcolm Elwin কৃত 'Lander.' (p-62-) ......হিকি (পৃঃ ৪২)—দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট—'করিম বক্স বাহাদুর।' মিঃ রিকেটস-এর কাহিনীটি (পৃঃ ৪২) Kicaid—'British Social Life in India.' থেকে বিবৃত। .

মারাঠা ডিচ

বাংলাদেশে বর্গি আক্রমণ (১৭৪৩) সম্পর্কে বাংলার যে কোন প্রামাণ্য ইতিহাস দ্রষ্টব্য। কবি গঙ্গারাম কৃত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ (১৭৫৩)। দ্রষ্টব্যঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৫নং সংখ্যা। মারাঠা ডিচের ইতিহাসের জন্যে Stewart—'History of Bengal', C. R. Wilson—'A

'Short History of Fort William', (Bengal Past and Present, 1907) এবং B. P. & Present Vol-27|1924, ঐ Vol-24|1922 দ্রষ্টব্য।

একটি পিতলের পাত

সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণের জন্যে—'Cambridge History of India'. (Vol.-V, Chapt.-VII), Ramsay Muir—'The Making of the British India (1756-1858)', Hill—Bengal in 1756-57', বা J. T. Wheeler—Early Records of British India' পুরানো ফোর্ট উইলিয়ামের বিস্তারিত কাহিনীর জন্যে দ্রষ্টব্য—C. R. Wilson—'Old Fort William in Bengal'.

ইজ্জতের লড়াই

ঘাকিংহাম ও জেমসন-এর লড়াইটির জন্য—'সেকালের একজন সাংবাদিক' (পৃঃ ২০২) নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। সাংবাদিকদের অন্যান্য লড়াই কাহিনীগুলো (পৃঃ ৫৩) Margarita Burns—'Indian Press, History of Public Opinion in India' এবং বিশেষ করে ষ্টকক্যুইলার কাহিনীটির (৫৩) জন্যে তাঁর J. S Stockquilor—Memoirs of a Journalist' দ্রষ্টব্য।......ইংল্যাণ্ডের সংবাদগুলো (পৃঃ ৫২) N. C. Sydney—'England and the English in the 18th Century' থেকে সংগৃহীত।.....শেরিডন এবং ক্যাপ্টেন ম্যাথুস-এর লড়াইটি হয় ১৭৭২ সনের মে মাসে। ফক্স এবং অ্যাডামস-এর লড়াইটি ১৭৭৯ সনের নভেম্বরে এবং পিট-টিয়ার্নের লড়াইটি ১৭৯৮ সনের মে মাসে। সম্ভবত ইংল্যাণ্ডে এটাই শেষ ডুয়েল। ......কলকাতার প্রথম ডুয়েল হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের। সেটি ১৭৮০ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখের ঘটনা। বিস্তৃত বিবরণের জন্য হেষ্টিংস-এর জীবনীসমূহ (দ্রঃ নিঘণ্ট-'ওয়ারেন হেষ্টিংস ও আমার বড়মামা') দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে হেষ্টিংস-এর নিজের লেখা একটা ৪৫ পাতার বিবরণও নাকি রয়েছে। সেটি আবিষ্কার করেছিলেন লর্ড কার্জন। (দ্রঃ B. P. & P. Vol-30, 1925)।.....ক্লেভারিং ও বারওয়েল-এর লড়াইটির (পৃঃ ৫২) দ্রষ্টব্য—'B. P. & P.—Vol-III, 1919'.... সম্ভবত 'মিঃ জি' ও 'মিঃ এ'র লড়াইটি (পৃঃ ৫৪) কলকাতায় শেষ ডুয়েল। এসব ছোটখাট ডুয়েল সমাচার গুলোর জন্যে 'Selections from Calcutta Gazettee' দ্রষ্টব্য। এই সংকলনটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম তিন খণ্ডের সম্পাদনা করেছেন—W. S. Seton Carr তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদক—H. Sandemann. এই পাঁচ খণ্ড ১৭৮৪ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত গেজেটে প্রকাশিত সংবাদের সংকলন। ১৮২৪-৩২ পর্যন্ত কালসীমা ধরে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চম তথা সর্বশেষ খণ্ড। তার নাম—'In the days of Company.' সম্পাদক—এ. সি. দাসগুপ্ত। এই মূল্যবান সংবাদপত্রটির সংক্ষিপ্ত কাহিনীর জন্য—Margarita Burns কিংবা Dasgupta—'The Story of Calcutta Gazette' (1958) দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই শ্রেণীর আর একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন—Thomas S. Smith—'Selection from Cal. Review'.

অসবর্ণে আপত্তি নাই

জব চার্ণক সম্পর্কিত কবিতাটি (পৃঃ ৫৭) James Rainey—'A Historical & Topographical Sketch of Calcutta' থেকে উদ্ধৃত। চার্ণক জীবনীর জন্য—Hamilton ছাড়াও Philip Woodruff—'The men who ruled India, Vol-I', (1953) দ্রষ্টব্য। কির্ক প্যাট্রিক-এর কাহিনীটির (পৃঃ ৫৮) জন্য 'Blackwood Magazine, 1893' কিংবা 'Calcutta Review, 1899'-এ

জ্যুলিয়ান কটন-এর রচনাটি দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—Cal. Review, Vol-18 এবং Vol-25 (1855)-এ প্রাচীন কলকাতা সম্পর্কে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে। লেখক—জে. সি. মার্সম্যান।......কর্ণেল গার্ডনার-এর কাহিনীটি (পৃঃ ৫৯) সবিস্তারে লিখেছেন Fanny Parkes তাঁর 'Wonderings of a Pilgrim in Search of Picturesque' (Vol-I, Page-418—)-এ। ফেনি ছাড়াও তাঁর কাহিনী আছে—H. G. Keene—'Hindustan under Free-Lancers (1770-1820)' এবং H. Compton—'European Military Adventurers in India' নামক বই দু'টিতে।......De Boigue'র কাহিনীটি (পৃঃ ৬১) এবং এবং 'অসবর্ণের' আরও কাহিনীর জন্য—Kincaid দ্রষ্টব্য। ...এশিয়াটিকাস (পৃঃ ৬০) ছদ্মনাম। আসল নাম—Philip Dromer Stanhope। তাঁর বইটির নাম—'Genuine Memoirs of Asiaticus' (দ্রষ্টব্য—কলকাতা সংস্করণ, পৃঃ ৪৩)। .....মিসেস শেরউড (পৃঃ ৬১)—Mary Sherwood—'George Desmond'। ৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদ্যাংশটি ভুলক্রমে ডি'ওলির বলা হয়েছে। এটি একটি কাব্যকাহিনীর অংশ বিশেষ। পুরো কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্যঃ G. F. Atkinson—'The Adventrues of Qui Hi (1816)। .....কর্ণেল পিয়ার্স (পৃঃ ৬২)—ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর মিলিটারী সেক্রেটারী বন্ধু, 'The Father of 'Indian Artillery'. হেষ্টিংস-ফ্রান্সিস-এর লড়াইয়ে তিনি হেষ্টিংস-এর পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথার জন্য দ্রষ্টব্য—Bengal Past and Present, 1911.

কালিঘাটের বিয়ে

গ্রেটনাগ্রীন সম্পর্কিত কাহিনীটির (পৃঃ ৬৫) জন্য E. S. Turner—'A History of Courtship' দ্রষ্টব্য।...এদেশীয় মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে কোম্পানির আদেশটি (পৃঃ ৬৭) ৫৮ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখিত হয়েছে। মূল হুকুমনামাটির একটি অংশ '..Induce by all means you can invite our soldiers to marry with the Native Women, because it will be impossible to get ordinary young women..etc.' (Order from the Directors of the East India Company, Jany., (1688). এবিষয়ে আরও তথ্যের জন্য শ্রীপান্থ—'আজব নগরী' ('রোটি আউর বেটি') এবং H. W. B. Moreno—'Anglo-Indian Women in the Past' (B. P. & P.—Vol-39, 1930) ও H. Hobbs—Old Time European Women..etc. (B. P. & P.; Serial 132, 1950)..সেণ্ট জন চার্চের (পৃঃ ৬৭) ইতিহাসের জন্যে—Elliot Walter Madge—'Illustrated Handbook of St. John Church' এবং ..'How St. John Church was built' দ্রষ্টব্য। সোফিয়া গোল্ডবোর্ণ (পৃঃ ৬৮) সেকালের একজন প্রসিদ্ধা লেখিকা। তিনি কলকাতায় ছিলেন—১৭৮৩-৮৪ সনে। উপন্যাসাকারে লিখিত তাঁর বইটির নাম—'Hartly House, Calcutta'......বিশপ হিবার সম্পর্কিত উক্তিটি (পৃঃ ৬৮) Kincaid-এর বই থেকে গৃহীত। প্রসঙ্গত কলকাতার দ্বিতীয় বিশপ রেঃ রেজিনল্ট হিবার (১৮২৩-২৬) সাহেবের জার্নালটিও (Hebers' 'Indian Journal') উল্লেখযোগ্য। ভারতের এতদাঞ্চলে পাদ্রীদের ক্রিয়াকলাপের জন্য—H. B. Hyde—Patriarchal Annals of Bengal'. T. W. Kaye—'Christianity in India', Alexander Duff—'India and Indian Misson' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।.....হিকি (৬৮ পৃঃ) সম্পর্কে অন্যত্র পরিশিষ্ট—('করিম বক্স বাহাদুর') দ্রষ্টব্য।.....ম্যাকবেরী (পৃঃ ৬৮)—ফিলিপ ফ্রান্সিসের শ্যালক ও একান্তসচিব।.. ৬৯ পৃষ্ঠার হিন্দুস্তানী ছড়াটি প্রমথনাথ মল্লিক—'কলিকাতা কথা'

(২ খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত। অন্যান্য ছিন্ন ছড়াগুলোও সেখান থেকেই গৃহীত।....
ব্যাণ্ডেল গীর্জা (পৃঃ ৬৯) সম্পর্কে Rev. Long—'The Portuguese in Northern India' (1846), এবং J. A. A. Campas—'History of the Portuguese in Bengal' (1919) দ্রষ্টব্য।......ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন (পৃঃ ৬৯)—চার্ণক প্রসঙ্গেও উল্লেখিত হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ Capt. Alexander Hamilton—'A New Account of East Indies', (Vol-II)। কালিঘেটে বিয়ে সম্পর্কে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য—সেকালে ইংরেজ মেয়েদের নিয়ে লটারী পর্যন্ত হত। অন্তত 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশিত একটি চিঠি তাই বলে। দ্রষ্টব্য—'Selections from Cal. Gazette', Vol-V অথবা B. P. & P.—Vol-X, 1915. •

শ্বেত ব্রাহ্মণ ও পীত ব্রাহ্মণী

'Journal to Eliza' এবং স্যার ওয়াল্টার স্কট কৃত স্টার্ন-এর জীবনী ছাড়াও H. G. Rawlinson—'British Beginings in Western India' ও 'A Book of Anecdotes (Ed. Danie George) (1958) দ্রষ্টব্য। •

সিপাহী বিদ্রোহের দিনে কলকাতা

Kaye & Mellson—'A History of the Sepoy War..etc.' (Vol-II Page-83), Col. Malleson—'Red Pamphlet', Cotton—'Calcutta Old & New' এবং Russel—'My Diary in India' (Vol-II)। বিশেষভাবে তৎকালীন খবরের কাগজের মনোভঙ্গী জানতে হলে Sir George Trevelyan—'Letters of a Competitionwallah.' মিউটিনি সম্পর্কে বাঙ্গালীর মনোভাব জানতে হলে Sambhu Chandra Mukhopadhyaya—'The Mutinies and the people.' (By a Hindu), 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' (মে, ১৮৫৭), 'সম্বাদ প্রভাকর' (১৮৫৭) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।...ডেকার্স লেন ও মিঃ ডেকার্স (পৃঃ ৮১) সম্পর্কিত তথ্যাদি Sterndale—'An Historical Account of the Cal. Collectorate' থেকে গৃহীত। ভলানটিয়ার বাহিনী বিষয়ে আরও জ্ঞাতব্যের জন্য দ্রষ্টব্য—H. Hobb—'Cadets' (Bengal Past & Present, Vol-I, Part-II & Vol-LIX, Part I & II.)

রুশ কর্তৃক কলকাতা আক্রমণ

তৎকালীন ভারতে রুশাতঙ্ক যে গুজবমাত্র নয় তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় অনেক। আলোচ্য কাহিনীটি একটি দুর্লভ এবং অখ্যাত বইয়ের ভিত্তিতে রচিত। বইটির নাম রচনায় উল্লেখিত হয়েছে। মনে হয় 'আজগুবি সাহিত্য' হলেও বইটি সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কেননা, তার অন্য একটি সংস্করণও আমার চোখে পড়েছে। সেখানে লেখকের নাম—I. Patiukshka. বলা বাহুল্য, এটাও ছদ্মনাম। এই কাহিনীর ভিত্তিভূমিস্বরূপ এখানে একটি সাম্প্রতিক প্রকাশের নাম উল্লেখযোগ্য—K. S. Menon—'The Russian Bogey' and British Aggression in India & Beyond' (1957).

ব্ল্যাক টাউন আর ব্ল্যাক জমিদার

ব্ল্যাক টাউন সম্পর্কে প্রত্যেক দর্শকের রচনায়ই কিছু না কিছু রয়েছে। ব্ল্যাক জমিদার সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : John Zephanial Holwell 1)'Indian Tracts' (1774). 2) Sterndale, J. C.—'Interesting Historical Events', Marshman, —'Notes on the Left or Calcutta Bank of the River Hoogly' (Cal. Review, '1851) এবং Carey—'Good Old days of the John Company' (2vols.) স্টার্নডেল লিখেছেন গোবিন্দরামের জনৈক

উত্তরপ্রদেশ নাকি গোবিন্দরামের একটি 'আত্মজীবনী' ('Autobiography') প্রকাশ করেছেন। সেটি আমার নজরে পড়েনি। ম্যাকিনটস (পৃঃ ৯৩)—William Macintosh 'Travels in Europe Asia & Africa (1777-1781) etc'

কিপলিং-এর উদ্ধৃত কাব্যাংশটির (পৃঃ ৯৩) মূল কবিতার জন্য 'Departmental Dieties' দ্রষ্টব্য। মার্টিন (পৃঃ ৯৪) James Roland Martin—'Notes on the Medical Topography of Calcutta' এটি এবং সরকারী কমিটির রিপোর্টটির জন্য দ্রষ্টব্য—'Census of India, 1951, Vol—VI, Part—III'.

হিকি (পৃঃ ৯৫) দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট—(করিম বক্স বাহাদুর')। মহারাজা নবকৃষ্ণের (পৃঃ ৯৫) জন্য দ্রষ্টব্য—N N Ghose—'Memoirs of NubKissen'

পয়রচি পিনহা

প্রথম যুগে এদেশে সাহেবদের পোষাক সম্পর্কে নিম্নোক্ত পত্রাংশটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার মুর্গীবাজার' থেকে 'An old country Captain' ইন্ডিয়া গেজেট'-এ (২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৭৮১ সন) লিখছেন যে তিনি ১৭৩৬ সনে কলকাতায় এসেছেন। তাঁর মতে—' Those were the days when gentleman studied Ease instead of Fashion, when even the Members of Council met in Banyan shirts, long Drawers and Conjee Caps, with a case of good Arrack etc' ১০১ এবং ১০২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাংলা খবরগুলো সংবাদপত্রে সেকালের কথা' থেকে গৃহীত। ১০২ পৃষ্ঠায় যে সরকারী আদেশনামাটির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি 'Selection from Cal Gazettee (Vol—I, Part II, p—122) থেকে এবং লর্ড অকল্যান্ড সম্পর্কিত কাহিনীটি Janet Dunbar—'Golden Interlude—The Edens in India থেকে নেওয়া।

করিম বক্স বাহাদুর

'বাহাদুর'টা আমাদের দেওয়া। আসল নাম—করিম বক্স। ১০৭ পৃষ্ঠার ছবিটি তার একটি তৈলচিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত। মূল ছবিটি এখনও রাজভবনে আছে। তবে দেওয়ালে নয়—গুদামে। কর্নওয়ালিস এবং মিন্টো সম্পর্কিত সংবাদগুলোর (পৃঃ ১০৫—৬) জন্য কার্জন এর 'British Govt In India (Vol—II) দ্রষ্টব্য।

হিকি—William Hickey—'Memoirs of William Hicky (4 Vols) Ed Alfied Spencer হিকি সেকালের লন্ডন এবং কলকাতায় অন্যতম 'সামাজিক মানুষ। তাঁর স্মৃতিকথা, (বিশেষ চতুর্থ খণ্ডটি) সেকালের কলকাতার সমাজ এবং মানুষের একটি জীবন্ত আলেখ্য। সম্প্রতি (১৯৬০) Peter Quennell-এর সম্পাদনায় এক খণ্ডও সেটি লভ্য। কিন্তু কলকাতা অনুরাগীর পক্ষে সম্পূর্ণ সংস্করণটিই উপযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যাওয়ার সময় হিকি চাকরদের দু'হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। জামদানী (Jemdanee) বা তাঁর হিন্দুস্তানী বান্ধবীটির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। চাকরদের চেয়ে বেশী পেয়েছিল চাকরানীরা—Kiraun, Gulab এবং Tippee রা। 'কোরামস অব জমিনদারস (পৃঃ ১০৮) এর জন্য Busteed Cotton দ্রষ্টব্য। জন লরেন্স এর (পৃঃ ১০৭) কাহিনীটির জন্য দ্রষ্টব্য—Michael Edwards—'The Necessary Hell' (1958) মিসেস ফে (পৃঃ ১০৯) সেকালের একজন দুর্ধর্ষ ভ্রমণকারিণী। দ্রষ্টব্যঃ Mrs Fay—'Original Letters From India (1817)। তাঁর সমস্ত উক্তি এবং উদ্ধৃতিই এই বই থেকে সংগৃহীত। Cal Historical Society প্রকাশিত আধুনিক সংস্করণও লভ্য। এছাড়াও সেকালের ভৃত্যজীবনের অনেক আলেখ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—C Grant—'An Anglo-Indian Domestic sketch' (1849), Capt

Alban Wilson—'Our Indian Servants and How to treat them', (1899) : Lady Anne C. Wilson—'Hints for the First years of Residence in India' (1904) এবং EHA—'Behind the Bungalow' (1897). শেষেরটি যদিও বোম্বাইয়ের ভৃত্যদের নিয়ে লিখিত তবুও কলকাতার সঙ্গে আশ্চর্য মিল। ২৩৪ পৃষ্ঠার ছবিটি এই বইটি থেকে পুনর্মুদ্রিত। •

গুণ্ড শিক্ষক

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য—Capt T Roebuck—'The Annals of the College of Fort William' এবং G S. A. Ranking—'History of the College of Fort William from its first Foundation, (B P. & P.—Vol.—7, 21, 22, 23) ছাত্ররা তখন মাসে তিনশ' টাকা ভাতা পেতেন। তদুপরি ' all the candidate received usual allowance for a Moonshee.' তৎকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্যের জন্য— N N Law—'Promotion of Learning in India by Early European Settlers upto about 1800' এবং রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', 'Presidency College Centenary Volume' (1955) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ১৭১৫ সনে মাদ্রাজে একজন স্কুল শিক্ষকের বার্ষিক বেতন ছিল ৫০ পাউণ্ড। মাদ্রাজের মাস্টার মশাইয়ের কাহিনীটি এবং অন্যান্য সামাজিক খবরের জন্য দ্রষ্টব্য—Henry Dodwell—'The Nabobs of Madras' সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত শ্লোক দুটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত। প্রসঙ্গত মুন্সীদের সম্পর্কে G F Atkinson—'Curry & Rice'-এ একটি সুন্দর ব্যঙ্গাত্মক রচনা আছে

বেকার জিন্দাবাদ

'Sleep make baby ' কাব্যাংশটি (পৃঃ ১২৩) Pearson—'Eastern Interlude' থেকে উদ্ধৃত। জাহাজের সন্ধানে বেয়ারারা তখন দশ পনের নয় তিরিশ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যেত সমুদ্রের দিকে লিখেছেন—চার্লস ডিওলি। দ্রষ্টব্যঃ Tom-Row, the Griffin, (এবং 'The European in India') তখনকার কলকাতায় নেটিভ ভবঘুরেদের নাম দেওয়া হয়েছিল—'রাম জনি' ('Ram Johnies')। পরবর্তীকালে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে যে তাদের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল তা জানতে হলে দ্রষ্টব্য—H Hobbs—'Scoundrels and Scroungers' দোভাষীদের বিষয়ে কোম্পানির মূল আদেশনামাটি কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৬৭১ সনে প্রেরিত। সম্পূর্ণ চিঠিটির জন্য দ্রষ্টব্য• Rao—'Indian Words in English'। ১২৯ পৃষ্ঠার প্রথম বিজ্ঞাপনটি এবং বিয়ের খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল ক্যালকাটা গেজেটে। দ্রষ্টব্যঃ Selections from the Calcutta Gazette, Vol. I

কোম্পানির লেখক

এই রচনাটিতে যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ E. F Oaten—'Sketch of Anglo-Indian Literature (1904), T. D. Dunn—'Poets of the John Company'; R S Seneourt—India in English Literature; W.F.B. Lauri—Anglo-Indian Periodical Literature; এবং Bhupal Singh—'A Survey of Anglo-Indian Fiction' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—জন মাস্টার্স (পৃঃ ১৩৫) সম্ভবত তাঁর

পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছেন। প্রায় প্রতি বছরই গড়ে একখানা করে উপন্যাস প্রকাশ করলেও মাস্টারস সব সময় ভারত নিয়ে লিখছেন না। অন্তত তাঁর একটি বইয়ের পটভূমি নিঃসন্দেহে স্পেন।

কোম্পানির দুর্গোৎসব

সূচনার পদ্যটি 'Eastern Interlude' থেকে উদ্ধৃত। জন চীপস-এর কাহিনীটির (পৃঃ ১৪০) জন্য W Hunter—'Annals of Rural Bengal' দ্রষ্টব্য। 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ বিবরণটির (পৃঃ ১৪১) প্রকাশ তারিখ—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ (Vol —V, No —194)। পরের প্যারাতে কাগজটির নাম ভুলক্রমে ক্যালকাটা গেজেট' উল্লেখিত হয়েছে তা 'ক্যালকাটা জার্নাল হবে। গভর্নমেণ্ট 'গেজেটে' (পৃঃ ১৪১) মানে ক্যালকাটা গেজেট। এটি এবং ১৮২৪ সনের পরবর্তী ক্যালকাটা গেজেট সম্পর্কিত খবরগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ In the days of Company' 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' (পৃঃ ১৪৪)—সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর। ' কেউ কেউ কুৎসার পথ ধরলেন (পঃ ১৪৫) যথা ' especial Patronage of idolatry by Christian officers is often found to have been result of native female influence' লিখেছিলেন বোর্ড অব রেভেন্যুর একজন ভূতপূর্ব সেক্রেটারী (দ্রষ্টব্য ঃ B P & P —Vol —LVI, 1939) বেঃ পেগ (পৃঃ ১৪৫) ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজক। কোম্পানি এবং এদেশীয়দের ধর্ম সম্পর্ক ছাড়াও সতীদাহ, সন্তান বিসর্জন, দাসপ্রথা ইত্যাদি বিষয়ে তর একাধিক বই রয়েছে। ওয়ার্ড সাহেব (পৃঃ ১৪০)—William Ward—A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoo তাঁর মতে প্রথমদিকবার পুজোয় কলকাতায় বছরে খরচ হত কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং। ১৮২৯ সনে ক্যালকাটা গেজেট' এর মতে তার পরিমাণ—সে টাকার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রসঙ্গত কোম্পানির পুজো বিষয়ে একটি তথ্যবহুল মূল্যবান প্রবন্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। 'State Patronage to Hindu & Muslim Religions during the East India Company's Rule'—R C Banerjee (B P & P Vod —LVI 1939).

বারোয়ারীর তেরো কথা

বেহালার সংবাদটির (পঃ ১৪৬-৭) জন্য সম্বাদ ভাস্কর' ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৪০ কিংবা সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮১) দ্রষ্টব্য। গুপ্তিপাড়া (পৃঃ ১৪৯) তথা বারোয়ারী পূজার ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য—'Friend of India' (May, 1820) অন্যান্য খবরগুলো প্রায় সবই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (২য় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত কিংবা উক্ত।

পাল্কী থেকে ট্রাম

কলকাতার ট্রাম ব্যবস্থার আদি ইতিহাসটির জন্য The Statesman, Bengal Chamber of Commerce Centenary Number, এবং পাল্কী ধর্মঘটের বিস্তৃত বিবরণের জন্যে Colsworthy Grant—'An Anglo-Indian Domestic Sketch' দ্রষ্টব্য।

ডাক্তার বদ্যি

এই রচনার জন্যে Busteed ছাড়াও বিশেষভাবে যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'Census of India', 1951, Vol —VI, Part III; 'Selections from Cal Gazettee', Vol —1, D G. Crawford—'Notes on the Early Hospitals of Calcutta' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮২৮ সনে ডাঃ হ্যালিডে ৩৮৪ সিক্কা টাকার দাবীতে (ছ'বারের ভিজিট) জনৈক রোগীর

বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। এবং এটাও উল্লেখযোগ্য যে ইংরাজেরাও তখন জানতেন না যে জলের সঙ্গে কলেরার বা মশার সঙ্গে জ্বরের কোন সম্পর্ক আছে। চার্নক স্বয়ং মারা যান ম্যালেরিয়ায়। অন্তত, লক্ষণগুলো শুনে আজকের চিকিৎসক তাই বলবেন।

কোম্পানির চিত্রকর

এই প্রবন্ধে যেসব বই থেকে উপকরণাদি সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: W. G. Archer & Mildred Archer—'Indian Painting for the British; Do—'Patna Painting'; W. G. Archer—'Bazar Paintings of Calcutta'; Graham Reynolds—'The Art of India & Pakistan'; Redgrave — 'Dictionary of British Artists'; Ramgopal Sanyal — 'Bengal Celebrities'; V. Manners & Williamson—John Zoffany, his life and worth'; T. Daniell—'A picturesque voyage to India'; Emily Eden—'Letters from India'; D. C. Ganguli — 'Victoria Memorial Hall'; Journal of the Royal Society of Arts (Vol.—XCVII, 1950); The Walpole Society (Vol.—XV, 1926); Exhibition of a Century of Historic Prints, Calcutta 1954, A Historical & Descriptive Catalogue', এবং Bengal Past & Present' (বিভিন্ন সংখ্যা)।

একটি দশ টাকার কবর

ওয়াজির আলীর কাহিনীটি যে কোন ইতিহাসে লভ্য। তাঁর কবর সম্পর্কিত খবরগুলোর জন্যে—Firminger—'Thacker's Guide to Calcutta' এবং 'Bengal Past & Present' (Vol.—II, Page—100) দ্রষ্টব্য।

সুকেশ স্ট্রীটের দ্বাদশসংখ্যক ভবন

দ্রঃ চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়—'বিদ্যাসাগর'।

শীতে শহর তুমি

'ঠেলা বোঝাই মাছি' (পৃঃ ১৯০) অবশ্যই প্রবাদ। এজাতীয় আরও কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য: H. Hobb—'John Barley Corn Bahadur..etc'.. স্যার চার্লস ডি'ওলির (পৃঃ ১৯০) কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। কলকাতার গরম সম্পর্কে (পৃঃ ১৯১) অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রচলিত আছে। চিত্রকর হামফ্রে নাকি বলতেন—বাব্বা; যেন বাস্তিলে আছি! লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক টেবিলে পিঠ ঘসতেন। ঘামাচির নাম দিয়েছিলেন তিনি—'Red dog'. কেউ কেউ বলতেন—'Fiery pimple'. কর্নওয়ালিস নাকি ঘরে ঢুকেই বলতেন—'কোটস অফ্!' ইত্যাদি। এমিলি ইডেন (পৃঃ ১৯১)—লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন। সৌখিন চিত্রকর ও লেখিকা। 'Letters from India' (2 Vols.) এবং 'Up the Country' (2 Vols.) সেকালের দুইটি বিশিষ্ট স্মৃতি চিত্র। অধিকাংশ উদ্ধৃতিগুলোই প্রথমোক্ত বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য Janet Dunbar লিখিত 'Golden Interlude: The Edens In India' (1832—42) মুখ্যত এমিলিব বইগুলোব ভিত্তিতে লিখিত। ২২৪ পৃষ্ঠার ছবিটি ফেনী ইডেন অঙ্কিত। ফেনী এমিলি এবং অকল্যাণ্ডের বোন তথা সহযাত্রী। M. L. De Grandpre (পৃঃ ১৯২)—জনৈক পশ্চিমী অভিযাত্রী। তাঁর ভ্রমণকাহিনীটির নাম—'Voyage to the Indian Ocean and to Bengal' (1803)। গ্রাণ্ডপ্রি'র রচনাটির কালোল্লেখ করা হয়েছে—১৮৭৯, আসলে তা হবে ১৭৮৯।...ভোলানাথ চন্দর (পৃঃ ১৯২) প্রখ্যাত ভ্রমণকারী এবং সেকালের

একজন বিশিষ্ট বাঙালী। (দ্রঃ 'Travels of a Hindu' (1869) এবং নরেন্দ্রনাথ লাহা—'সুবর্ণবণিক কীর্তি ও কথা'।...ফোর্ট উইলিয়মে কেরানী কর্তৃক পাখা আবিষ্কারের কাহিনী Busteed থেকে সংগৃহীত।

একটি প্রেম ও কয়েকটি কবিতা

সমসাময়িক একজন লেখিকা (পৃঃ ১৯৫) মানে—F. A. Steel. ১৮৯৪ সনে বোম্বাইয়ে আদেলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। (দ্রঃ পৃঃ ১৩৫) মাউ—(পৃঃ ১৯৬) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার (Vol—VI, p—375) অনুযায়ী মাউ উজ্জয়িনী থেকে ৪২ মাইল দূরে—ইন্দোর রাজ্যের একটি শহর। সেখানে একটি সেনানিবাসও ছিল।... আদেলার স্বামী নিকলসন (পৃঃ ১৯৫) এককালে (১৮৯১) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'এডিসি' ছিলেন। সমরসেট মম (পৃঃ ১৯৭) 'A Writer's Note Book নবাব নাসির-উদ্দিনের কাহিনীটির জন্য (পৃঃ ২০০) দ্রষ্টব্য—Dewars—'By gone days in India'. ফেনি পার্কাস লিখছেন—' . poor thing, I felt ashamed of the circumstances when I saw her chewing with all the gusto of a regular Hindoostani. etc' (Wanderings of a Pilgrim etc. Vol.—I, Page—412) ফেনির মতে এই মেয়েটির মা নাকি পরে একজন নেটিভ বেনিয়াকে ('Buniya') বিয়ে করে। লরেন্স হোপ এর প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা তিনঃ ১) The Garden of Kama (1901) ২) The Stars of the Desert (1903) ৩) Indian Love (1905) এছাড়াও পরবর্তীকালে (১৯২২) আরও একটি সংকলন বের হয়েছিল। M J Nicolson (Ed)—'Selected poems from the Indian Love Lyrics of Lawrence Hope. এই নিকলসন আদেলার পুত্র। আদেলার জীবনকাহিনীর জন্যে দ্রষ্টব্যঃ Coronet, Sept 1951 আদেলাকে কবর দেওয়া হয় মাদ্রাজের সেন্ট মেরী কবরখানায়।

সেকালের একজন সাংবাদিক

যেসব বইপত্র সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—J S Buckingham—1) 'Autobiography' (2 Vols), 'The Coming Era of Practical' Reform etc' 3) 'Proceedings before His Majesty's Most Honl. Privy Council etc' 4) Parliamentary enquiry into the claims of etc' 5) 'Appeal to the British Nation on the greatest Reform etc' 6) 'Plan for the future Govt. of India' 7) 'A Brief History of Banishment of Mr. Buckingham from India', Dr Ralph E Turner—'James Silk Buckingham' John Adams—'A Statement of Facts etc.' Margarita Burns—'The India Press' এবং 'Calcutta Journal' (1818-1823) ইত্যাদি।•

সেকালের একজন প্রকাশক

ভাবতে প্রথম বই ছাপা হয—১৫৫৬-৫৭ সনে। বাংলা ভাষায প্রথম (অবশ্য রোমান হরফে) ১৭৪৩ সনে। বাংলা বর্ণমালায ১৭৭৮ সনে। সুতরাং প্রতাপচন্দ্র রায অনেক পরবর্তীকালের প্রকাশক। তাঁর পূর্ববর্তী যুগের সংবাদের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যঃ 'The three First Type-printed Bengali Books' By—H Hosten (B. P. & Present, 1914); এবং 'A Brief Note on Early printing in India' (The Carey Exhibition of Early printing and Fine

printing). প্রতাপচন্দ্র রায়ের সম্পূর্ণ জীবনী—Dwijendra Chandra Roy—'Life of Pratap Chandra Roy.'....প্রসঙ্গত সেকালের প্রকাশন খরচ সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রতাপচন্দ্র বিজ্ঞাপন মারফতে প্রকাশ করেছিলেন বলে উক্ত।—এক রিম ডিমাই কাগজের দাম—সাড়ে পাঁচ টাকা, এক ফর্মা ছাপা খরচ—বার টাকা, দশ ফর্মা আড়াই হাজার বই বাধানোর খরচ—পঁচিশ টাকা, এক ফর্মার অনুবাদকের (ইং) দক্ষিণা—পঁচিশ টাকা, একজন প্রুফ রীডারের (ইং) মাসিক মাহিনা—পঁচিশ টাকা ইত্যাদি।

কালচার ও সোডার বোতল

কলকাতায় আবগারী বিভাগের কার্যকলাপের জন্য Sterndale দ্রষ্টব্য। জাভার খবরটির জন্যে দ্রঃ Ema Roberts—Scenes and Characteristics of Hindoostan' (1835) অন্যান্য খবরের জন্য—H Hobbs—'John Barley-Corn Bahadur etc.,' এবং 'Spences Hotel and Its Time' দ্রষ্টব্য।

বাবুদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ

রচনায় বইয়ের নাম উল্লেখিত আছে। সেকালের বাঙালীর অন্যান্য সংবাদের জন্য—দ্রষ্টব্য কলকাতার বাঙালী' (শ্রীপান্থ—'আজব নগরী')।

বরফের মত ঠাণ্ডা

এমিলি সেক্সপীয়ার (পৃঃ ২৪৬) মুর্শিদাবাদ যান ১৮১৪ সনে। ১৮২৪ সনে কলকাতায় এক পাউণ্ড বরফের দাম ছিল এক পাউণ্ড। সাংবাদিক (পৃঃ ২৪৪)—ইংলিশম্যান এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক—J H Stocquiler (দ্রষ্টব্য ঃ 'Memoirs of a Journalist' (p—88) এবং 'European Social Life in India')
বেণ্টিংক (পৃঃ ২৪৬)-এর সভাপতিত্বে ঐ সম্বর্ধনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয—১৮৩৩ সনের ২২শে নভেম্বর। অভিভাষণটি ছাপা হয—'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ (No—23 1833)

মৎস্য-পুরাণ

দ্রষ্টব্যঃ H Hobbs এর উল্লিখিত বিভিন্ন পুস্তকসমূহ। গভীর জলে মৎস্য শিকারের বিস্তৃত পরিকল্পনাটির জন্য দ্রষ্টব্য—'Bengal Past & Present' (Vol—I No—2) এবং 'In the days of Company' (P—321)

অরণ্য রোদন

কলিকাতার জমির এই বিবরণটি (পৃঃ ২৫৬) 'Bengal Consultation June, 1707 এর অংশবিশেষ। 'Census of India', 1951 (Vol—VI Part III) থেকে উদ্ধৃত বটতলার অবদান সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সুকুমার সেন—'বটতলার বেসাতি' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৫) চার্নকের বসবার জায়গাটি যে বৈঠকখানায় ছিলনা এই তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ 'Job Charnock'—A F M Abdul Ali (B P & P—Vol—65|1945).

ইংরেজ বর্জিত কলকাতা

১৯৫৮ সনের স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষ্যে রচিত। ভিত্তি সমসাময়িক বিভিন্ন রিপোর্ট ও দৈনিক খবরের কাজ। ৫৮র পরবর্তী কোন তথ্য এতে যোগ করা হয়নি যদিও পরিমাণে ইতিমধ্যেই তা প্রভূত।

[উল্লেখিত বইসমূহ ছাড়াও কলকাতা এবং কলকাতার ইংগ-ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে বিবিধ শ্রেণীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যা নানাভাবে এই বইয়ের রচনাবলীকে প্রভাবিত করেছে তার নামও এখানে দেওয়া হল। শুধু কলকাতা বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জীর জন্য Cotton—'Calcutta Old & New' দ্রষ্টব্য।]

Rev J Long—1) 'Calcutta in Olden Times', 2) 'Peeps

into the Social Life in Calcutta'; H. Blochman—1) 'Calcutta during Last Century'; 2) 'A Paper on Old Calcutta'; Charles Moor — 'The Sheriffs of Fort William' Veritas Psed — 'Second City'; M. Massey—'Recollections of Calcutta'; Charles Kingsley — 'Soldiers Women in India'; Samuel Foote — 'The Nabob'; J. M. Haltzman — 'The Nabobs in England'; T. G. P. Spear — 'The Nabob'; William Knighton— Private life of an Eastern Calcutta'; R. G. Wallace—'Fifteen years in India'; Mrs, Major King'; W. G. Jonson—: Strangers in India or three years in Clemons—'The Manners and Customs of Society in India'! Mrs, Fenon—'Journal' (1827-8); Mrs Kindersley—'Letters from East India' (1777); Buckland—'Sketches of Social Life in India'; Capt. Bellow—'Memoirs of Griffin'; Capt. H. B. Henderson—'The Bengalee or the Sketches of Society'; R. Kerr—'Social Evils in Calcutta'; Maria Graham—1) 'Journal of a Long Residence in India' 2) 'Letters on India'; Lady Lawrence — 'Indian Embers'; J. W. Kaye — 'Peregrine Pultunery'; Quir—'The Grandmaster or Adventures of Quitti in Hindustan'; Mary Sherwood—'George Desmond'; A. Emily Beacher — 'Personal Reminicenses of India & Europe'; A. Fenton ('A Bengalee')—'Memoirs of a Cadet'; J. Forbes—'Oriental Memoirs'; Lady Maria Nugent—'A Journal from the year 1811 to the year 1815';. W. Tayler—'Thirty years in India'; H. Furber—'John Company at work'; W. H. Beveridge—'India Called Them'; M. Bellasis—'Honarable Company'; Helen Mackenzie—'Life in the Mission, the Camp and the Zenana or Six years in India'; W. Hedges—'Travels in India' (1780—83); Hilton Brown—'The Sahibs'.